শ্রীমদ্ভগবদগীতা

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে

শ্রীঅনিলবরণ রায়

কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

(৪র্থ খণ্ড)

।৵

পৌষ—১৩৪৭

প্রকাশক

গীতা-প্রচার কার্য্যালয়

১০৮।১১ মনোহরপুকুর রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

মূল্য :

সাধারণ পক্ষে—১৵০ গ্রাহকপক্ষে—৮০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(৪র্থ খণ্ড)

(শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতাপ্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।

প্রকাশক :
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
গীতাপ্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড
পোঃ আঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

মূল্য :
সাধারণের জন্য—১৶০
গ্রাহকদের জন্য—৸০

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—হে বার্ষ্ণেয়! অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত! তাহা হইলে কিসের দ্বারা চালিত হইয়া এই পুরুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া পাপাচরণ করে?

ব্যাখ্যা

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং—অর্জ্জুন কর্ম্মী, তিনি এমন একটি নীতি বা ধর্ম্ম নিশ্চিতভাবে জানিতে চাহিয়াছেন, যেটিকে ধরিয়া তিনি উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু গুরু কোন বাহিক নীতি বা আদর্শ না দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিতে বলিলেন। এরূপ কর্ম্মে কোন দোষই হয় না। অর্জ্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধি এই শিক্ষার মর্ম্ম ঠিক-মত বুঝিতে পারিল না। প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইবে? কিন্তু প্রকৃতিই কি মানুষকে জোর করিয়া পাপে প্রবৃত্ত করায় না? অর্জ্জুন যে পাপাচরণে ভয় পাইতেছেন, প্রকৃতির অনুসরণ করিলে কি সেই পাপেই লিপ্ত হইতে হইবে না? অর্জ্জুন নিশ্চিতভাবে জানিতে চাহিলেন যে, কোন্ জিনিষটি মানুষকে পাপের মধ্যে টানিয়া আনে, তাহা হইলে তিনি সেইটিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তিনি ক্ষত্রিয় বীর, বাহিরের শত্রুই হউক, আর ভিতরের শত্রুই হউক, কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন, কেবল তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া চাই যে, প্রকৃত শত্রু কে, কাহার সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যম্?

পাপং চরতি পুরুষঃ—রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ৩৩ শ্লোকে যে জ্ঞানবান পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, এখানে "অয়ং পুরুষঃ" বলিতে তাহাকেই বুঝাইতেছে। পাপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ। যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের সাধনা করিতেছেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ভোগে প্রবৃত্ত করায়

কে? কিন্তু এখানে অর্জ্জুনের মনে জ্ঞানযোগীর কথা উঠে নাই, সাধারণতঃ মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপে প্রবৃত্ত হয় কেন, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। আর পাপ বলিতে ইন্দ্রিয়ভোগ কিম্বা বাহিরের কোনরূপ আচরণই বুঝায় না। মানুষের হৃদয় মন সঙ্কল্পের যে-সব অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া বাহ্য কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে, সেইগুলিই পাপ। আত্মা প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছে, কিন্তু আমাদের নীচের প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, উর্দ্ধের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতে চাহে না, নিজের অশুদ্ধ বৃত্তিসকলকে অনুসরণ করিতে চায়, ইহাই পাপ। প্রকৃতির মধ্যে নানা গুণের খেলা চলিতেছে। পুরুষ যদি রজঃ ও তমঃ গুণের ক্রিয়ায় সম্মতি দেয় তাহা হইলেই পাপাচরণ হয়; তাহাকে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াতে সম্মতি দিতে হইবে, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রকৃতি ক্রমশঃ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়—পাপাচরণের সময় মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে অর্জ্জুন এখানে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। এই দ্বন্দ্ব হইতেছে সত্ত্বাদি তিন গুণের দ্বন্দ্ব। যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণের কিছুমাত্র বিকাশ হইয়াছে, তাহারই পাপাচরণের সময় মনে হইবে যে, সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। রজঃ ও তমোগুণ মানুষকে অজ্ঞান ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে টানে, কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্ব্বদাই চায় জ্ঞান, শান্তি, সুশৃঙ্খলা। যেখানে সাত্ত্বিক ইচ্ছার শক্তি যথেষ্ট নহে, সেইখানেই মানুষ নীচের গুণের দ্বারা চালিত হইয়া পাপাচরণ করে।

বলাদিব নিয়োজিতঃ—মানুষ যখন পাপ করে, সে কি তাহা স্বাধীনভাবে করে; না আর কোন শক্তি তাহাকে জোর করিয়া পাপ করায়? ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াছেন, এমন জ্ঞানী, সচ্চরিত্র, সাধু ব্যক্তিও যখন পাপে প্রবৃত্ত হন, ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাঁহার মন বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয় (২।৬০), তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যায় যে, এ-বিষয়ে মানুষের কোন স্বাধীনতা আছে? এইরূপ যুক্তি দ্বারা যাঁহারা মানুষকে পাপের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিতে চান, তাঁহাদের মত আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। পাপ করিবার সময় মানুষের মনে হইতে পারে বটে যে, সে নিজে তাহা করিতেছে না, আর কেহ তাহাকে জোর পূর্ব্বক করাইতেছে। কিন্তু বস্তুত

এই "আর কেহ" তাহার নিজেরই অতীতের কর্ম ; আমরা যদি প্রকৃতির নীচের প্রেরণা-সকলকে প্রশ্রয় দিই তাহারা প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন আমরা ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দমন করিতে পারিব না। যখন মনে হয় তাহাদিগকে জয় করা হইয়াছে, তখনও তাহারা অবচেতনার অন্তরালে লুকাইয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলেই আমাদের সব সদিচ্ছা ও চরিত্রবলকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবচেতনা হইতে তাহারা সহসা উত্থিত হয় বলিয়াই ভ্রম হয় যেন বাহির হইতে কোন শক্তি আমাদিগকে চালিত করিতেছে। বাহিরের অনেক অশুভ শক্তি আছে, তাহারা মানুষকে যন্ত্রবৎ চালিত করিয়া পাপে প্রবৃত্ত করায়, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে ছিদ্র না পাইলে তাহারা আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। আমাদের কাম ক্রোধাদি সংস্কারই এইরূপ ছিদ্র। সাধনার দ্বারা ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। কাম ক্রোধকে যদি আমরা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিই, যতবার তাহারা প্রকৃতিতে উত্থিত হইবে দৃঢ়সংকল্পের সহিত তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করি, আমাদের মধ্যে যে শুভ সাত্ত্বিক প্রেরণা রহিয়াছে সর্ব্বদা এক-নিষ্ঠার সহিত তাহাতেই সম্মতি দিই, তাহা হইলে ক্রমশঃ পাপ প্রবৃত্তি-সকল প্রশামত হইবে। পাপ প্রবৃত্তিকে জয় করা কঠিন, কিন্তু না করিলে তাহার তিক্ত ফলভোগও আমাদিগকে করিতে হয়। সংসারের যত দুঃখ তাপের মূলই হইতেছে আমাদের মধ্যে এই নীচ প্রবৃত্তি। তএব এখনই দৃঢ়সংকল্পের সহিত ইহাকে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। গুরু অর্জ্জুনকে অতঃপর সেই উপদেশই দিতেছেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

অন্বয়—এষঃ কামঃ, এষঃ ক্রোধঃ, [এষঃ] রজোগুণসমুদ্ভবঃ, মহাশনঃ মহাপাপ্মা, ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

অনুবাদ—ইহা কাম, ইহা ক্রোধ, ইহা রজোগুণের সন্তান, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে।

ব্যাখ্যা

কাম এষঃ—আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণ করাই সিদ্ধিলাভের পন্থা, কিন্তু ইহার অর্থ নহে নীচের প্রকৃতির গুণসকলের অধীন হওয়া, কারণ তাহা অপূর্ণতা, অসিদ্ধিরই লক্ষণ। বিশেষতঃ রজঃ গুণ হইতে উৎপন্ন কাম এবং তাহার সহচর ক্রোধই লোককে পাপে প্রবৃত্ত করায় এবং শোক দুঃখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। বাংলা ভাষায় কাম শব্দ যৌন-লালসা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু গীতা কাম বলিতে সকল প্রকার রাজসিক বাসনা ও কামনাই বুঝিয়াছে। সংসারের বস্তুসকলকে ধরিবার, অধিকার করিবার, ভোগ করিবার বাসনাই কাম এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা, প্রভাব প্রতিপত্তি, যশ মানের লালসা ইহার অন্তর্গত।

কামের মূল হইতেছে অজ্ঞান অহংভাব। অহংভাবের বশে আমরা নিজদিগকে বিশ্ব হইতে এবং বিশ্বের সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেখি। আমাদের "আমি" অস্পষ্ট ভাবে জানে যে, সে বিশ্বের অধীশ্বর, বিশ্বের সকল বস্তু তাহারই, কিন্তু সে নিজের এই ঐশ্বরিক ভাগবত স্বরূপের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার ফলে হয় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত দ্বন্দ্ব, তাহাদিগকে পাইবার, জয় করিবার, ভোগ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস এবং তাহার ফলস্বরূপ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তুকে উপভোগ করিতে হইবে—ইহাই বিশ্বজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু অবাধ মুক্তভাবে সব কিছুকে ভোগ করিতে হইলে প্রথমেই চাই সব কিছুর প্রতি বাসনা পরিত্যাগ করা। বাসনা হইতেছে পরাধীনতার লক্ষণ এবং দ্বন্দ্ব ও দুঃখের মূল। শুদ্ধ, মুক্ত ঈশ্বর যিনি, তিনি কোন বাসনা করেন না কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, সবই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, সবই তিনি ভোগ করিতেছেন।

বাসনাত্যাগের অর্থ নহে, নৈতিক বিধি নিষেধের অনুসরণ করিয়া বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ, পরন্তু অন্তরকে বস্তুসকলের বাহ্য রূপের প্রতি সকল প্রকার লালসা হইতে মুক্ত করা; এই মুক্তির লক্ষণ হইতেছে অহংভাব হইতে মুক্তি এবং তাহার ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তি। কার্য্যতঃ এই ত্যাগের অর্থ হইতেছে এই যে, আমরা বিশ্বের কোন বস্তুকেই

প্রাপ্তব্য বা গৃহীতব্য বলিয়া মনে করিব না, অপরের দ্বারা অধিকৃত আমার দ্বারা নহে এরূপ মনে করিব না, কোন বস্তুকেই হৃদয় বা ইন্দ্রিয়ের লোভের বস্তু বলিয়া মনে করিব না। এই ভাব আসে ঐক্যের অনুভূতি হইতে। কারণ সকল জীবই হইতেছে আত্মা, ঈশ্বর, অধিপতি ; যদিও ঈশ্বর পৃথক পৃথক বস্তুতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া মনে হয় তথাপি সকল বস্তুই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহার বাহিরে নহে। অতএব ক্ষুদ্র অহংভাবের অতীত হইয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে এক বিশ্ব-প্রসারিত চৈতন্যের মধ্যে লাভ করি—এবং শারীরিক ভাবে কোন কিছু লাভ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিলে সকল বস্তুতে অনন্ত মুক্ত আনন্দ লাভ করিবার সম্ভাবনা হয়, সেই জন্য আর কোন বাসনা করিবার প্রয়োজন হয় না। সকল জীবের সহিত এক হইয়া তাহাদের সহিত আমরাও ভোগ করি, বিশ্বমাঝে বিশ্বপুরুষের আত্মপ্রকাশে যে আনন্দ তাহা লাভ করি। এই যে আনন্দ, যাহা একই সঙ্গে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত, এই আনন্দের দ্বারাই মানুষ আত্মায় মুক্ত হইতে পারে, অথচ এই সংসারে থাকিয়া বিশ্বলীলায় ঈশ্বরের ন্যায়ই পূর্ণ কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে পারে।

ক্রোধ এষঃ—কামনা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে, অতএব ক্রোধও এই কাম, সেই জন্য মূলে উভয়ের নামোল্লেখ করিয়াও এক বচন ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কামই ষড় রিপুর মূল, তাহারা কামেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও প্রকাশ। ইহারা প্রকৃতির মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহাদের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই মানুষ পাপাচরণ করে এবং অশেষ দুঃখভোগ করে। এই শরীরে যাহারা কামক্রোধাদি রিপুর বেগ সম্বরণ করা অভ্যাস করিয়াছে, কেবল তাহারাই প্রকৃত সুখ ও শান্তির আস্বাদ পায়।

রজোগুণসমুদ্ভবঃ—এক প্রকার কাম আছে, তাহা হইতেছে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির যাহা মূল প্রেরণা, তাহার বিরোধী নহে, তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই আত্মভোগেচ্ছা। কিন্তু এখানে যে কামকে পাপের মূল বলা হইতেছে তাহা ভিন্ন জিনিষ, তাহা হইতেছে নীচের প্রকৃতির ভোগবাসনা—ইহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। রজোগুণ প্রবৃত্তিমূলক,

ইহাই জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং তাহারই জন্য জীবের অন্তরে তীব্র বাসনার সৃষ্টি করে। নীচের প্রকৃতির ক্রিয়া যন্ত্রবৎ, mechanical, ইহা কাম ক্রোধের দ্বারা জীবকে চালিত করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। অপ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তুর প্রতি তীব্র বাসনার বশেই লোকে সাধারণতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; এই রজোগুণই মানুষের মধ্যে কর্ম্মের নেশা সৃষ্টি করে, মানুষ যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসের ন্যায় অবশভাবে কর্ম্ম করিয়া যায়। আবার ইহাই শোক দুঃখ এবং সকল প্রকার সন্তাপের সৃষ্টি করে। কারণ যে মানুষ রজোগুণের অধীন হইয়া কর্ম্ম করে সে বস্তুকে অধিকার করিতে চায় কিন্তু ঠিক মত অধিকার করিতে পারে না, আবার কাম্য বস্তু লাভ করিয়াও তাহাকে ঠিক মত ভোগ করিতে পারে না—তাহার ভোগ হয় বিক্ষুব্ধ, অস্থায়ী, কারণ তাহার স্পষ্ট জ্ঞান নাই, কেমন করিয়া জিনিষকে অধিকার করিতে হয়, ভোগ করিতে হয় তাহা সে জানে না, কাজেই সে সর্ব্বদা ভোগের তৃষ্ণাতেই কাতর থাকে, সে তৃষ্ণার কখনও শান্তি হয় না। মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করেন রজোগুণের প্রেরণায় নহে, কামনার তাড়নায় নহে; তাঁহার প্রেরণা আসে উর্দ্ধের দিব্যপ্রকৃতি হইতে; তিনি কর্ম্ম করেন অধ্যাত্ম সঙ্কল্প লইয়া, অমুক্ত মনের বাসনা কামনা লইয়া নহে, তাই তিনি তীব্রতম কর্ম্মের মধ্যেও শান্ত, শুদ্ধ, আনন্দময় থাকেন। অর্জ্জুনকে কাম ক্রোধের বশে কর্ম্ম করিতে বলা হয় নাই, ত্রিগুণাতীত হইয়া দিব্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবদিচ্ছার প্রেরণায় কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে।

মহাশনঃ—কামকে ভোগ দিয়া কেহ শান্ত করিতে পারে না। মহাভারতে যযাতি রাজার উপাখ্যানে ইহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরু নামক নিজ পুত্রের যৌবন লইয়া যযাতি এক হাজার বৎসর সমানে বিষয় সুখ উপভোগ করিলেও পরিণামে তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্যবস্তু একজন মনুষ্যেরও সুখবাসনা তৃপ্ত করিতে পারে না। তখন তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল,

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

অর্থাৎ "সুখের উপভোগে বিষয় বাসনার তৃপ্তি হয় না, হবন দ্রব্যের দ্বারা অগ্নির ন্যায় বিষয়ের উপভোগে বিষয় বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়।"

আমাদের যে আত্মা তাহা অল্পে তৃপ্ত হয় না, তাহার চাই অনন্ত আনন্দ, ভূমৈব সুখম্‌, নাল্পে সুখমস্তি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মন, প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনন্তকে গ্রহণ বা আলিঙ্গন করা যায় না এবং বৃথা সে চেষ্টার দ্বারা কেবল বিক্ষোভ ও দুঃখেরই সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র আত্মাই অনন্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে পারে, অনন্তের আলিঙ্গন গ্রহণ করিতে পারে—অতএব আমাদিগকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, দেহ প্রাণ মনকে অধ্যাত্ম শক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, আত্মার শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে, তখনই আমরা ভগবানের বিশ্বলীলায় যে অনন্ত আনন্দ তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিব।

মহাপাপ্মা—কামের তৃপ্তি কিছুতেই হয় না, তাই তাহা অতিশয় উগ্র এবং লোককে পাপে প্রবৃত্ত করায়। মানুষের তীব্রতম কামনার জিনিষ হইতেছে তিনটী—কামিনী, কাঞ্চন ও আধিপত্য। মানুষ যত পাপাচরণ করে তাহাদের অধিকাংশের মূলে ইহারা রহিয়াছে। জগতে নানা আসুরিক, রাক্ষসী, দানবী শক্তি আছে—তাহারা মানুষের মধ্যে এই সকল কামনার প্রশ্রয় পাইয়া তাহার উপর ভর করিয়া বসে এবং তাহাকে যন্ত্র করিয়া নিজেদের দানবীয় লালসা চরিতার্থ করে। কামই আমাদের মধ্যে এই সকল নারকীয় শক্তিকে প্রবেশ করিতে দ্বার খুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রভাবে মানুষ আসুরিক ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও পাপ আচরণ করে। অতএব আমাদের ঘরের শত্রু এই কামকে সর্ব্বাগ্রে বিনষ্ট করিতে হইবে।

বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌—ভগবান প্রকৃতির অনুসরণ করিবার কথা বলিয়াছেন ; অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উঠিয়াছে, তাহা হইলে প্রকৃতির মধ্যে কাম-ক্রোধাদি যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাদেরই কি অনুসরণ করিতে হইবে ? ভগবান তাই এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, কাম ক্রোধ শত্রু, ইহাদের বশে চলিলে মানুষের সর্ব্বনাশ হয়, ইহাদের সহিত কোনরূপ আপোষ করা বিপজ্জনক, ইহাদিগকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না, অতএব দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে, প্রকৃতি হইতে ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

অন্বয়। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন আব্রিয়তে, যথা গর্ভঃ উল্বেন আবৃতঃ, তথা তেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানং) আবৃতম্।

অনুবাদ। ধূম যেমন অগ্নিকে আবৃত করে, মল যেমন দর্পণকে আবৃত করে, জরায়ুচর্ম্মের দ্বারা ভ্রূণ যেমন আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ তাহা দ্বারা (কামের দ্বারা) ইহা (জ্ঞান) আবৃত আছে।

ব্যাখ্যা

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ। কাম কেমন করিয়া বৈরিতা সাধন করে তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুট করা হইতেছে। সংসারে সকল দুঃখ ও পাপের মূল হইতেছে অজ্ঞান। আমরা ভগবানের অংশ, মূল সত্তায় ভগবানের সহিত এক, তাঁহারই ন্যায় সচ্চিদানন্দ, কিন্তু আমরা আমাদের সেই ভাগবত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, আত্মজ্ঞান হারাইয়া প্রকৃতির অনিত্য লীলার সহিত নিজদিগকে এক করিয়া দেখিতেছি। আমাদের যে অধ্যাত্ম সত্তা তাহা হইতেছে শান্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, জ্ঞানের জ্যোতি ও আনন্দে পূর্ণ, কিন্তু আমাদের বাহিরের চৈতন্যে আমরা সেই আত্ম-সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান। কাম আমাদের চিত্তে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, তাহাই আমাদের সেই আত্ম-স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। আমাদের অহং এই জগতে নিজের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চায়, নিজের ভাবে এই জগৎকে ভোগ করিতে চায়, অনিত্য বস্তুসকলে আসক্ত হইয়া পড়ে, এবং এইভাবে অশেষ দুঃখ ও বেদনার সৃষ্টি করে।

আমাদের মধ্যে জ্ঞান-সূর্য্য অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ঋগ্বেদ বলিতেছে, তৎ সত্যম্ সূর্য্যম্ তমসি ক্ষীয়ন্তাম্, সেই সত্য সূর্য্য অন্ধকারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা যখন এই অজ্ঞানমেঘ অপসারিত হয়, তখন সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান আপনি প্রকাশিত হইয়া আমাদের মধ্যে পরম আত্মাকে দেখাইয়া দেয়।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্। গীতা ৫।১৬

কামনা কেমন করিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে

গীতা তিনটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছে। জ্ঞান অগ্নির ন্যায় প্রকাশাত্মক, তাহা আপনিই প্রকাশিত হয় এবং অপরকে প্রকাশ করে, কিন্তু কামনা ধূমের ন্যায় অপ্রকাশাত্মক, তাহা আবরণ স্বরূপ হয় বলিয়া আমরা জ্ঞান-জ্যোতি দেখিতে পাই না। ধূম যেমন বহ্নির সহিত একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জীবও তেমনিই অজ্ঞান লইয়া এবং অজ্ঞানের ফল স্বরূপ অহংভাব ও কামনা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাই তাহার আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। জীব ভগবান হইতে উদ্ভূত, ভগবানের অংশ—তথাপি কেন সে অজ্ঞান লইয়া সৃষ্ট হয় এবং সংসারে অশেষ দুঃখ বেদনা ভোগ করে, মানুষ আবহমান কাল হইতে এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতেছে। কিন্তু মানসিক যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সমস্যার সমাধান হয় না। যাঁহাদের মধ্যে সাধনা দ্বারা অজ্ঞান-ধূম সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞানবহ্নি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্বের মর্ম্ম পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝা যায় যে, আনন্দময়, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বশক্তিময় ভগবান শুধু দুঃখের জন্যই দুঃখ সৃষ্টি করেন নাই। সকল দুঃখ ও বেদনাকে অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিণত করা, এই মর্ত্ত্যের মানবজীবনকেই অমৃতত্বে পরিণত করা, ইহাই জীবের সংসার যাত্রার নিগূঢ় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

যথাদর্শো মলেন চ—কাম কেমন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত মলাচ্ছন্ন দর্পণ। আমাদের চিত্ত যখন কামনাশূন্য হয় তখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাহাতে আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয়। ধূম অগ্নির সহজাত, কিন্তু দর্পণে মল আসে বাহির হইতে। যখন আমরা সকল বাসনা কামনাকে দূর করিয়া দিই, তখনও আমরা নিরাপদ নহি। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি আমাদিগকে অজ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, সেখান হইতে বাসনা কামনার ঢেউ পুনঃ পুনঃ আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের চিত্তকে মলিন করিয়া দেয়। সাধনা দ্বারা এমন অবস্থা লাভ করিতে হইবে যেন বাহির হইতে কোন বাসনা কামনা আর কখনও আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিতে না পারে।

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভঃ—ধূমাবৃত বহ্নি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় না, মলাচ্ছন্ন দর্পণেও কিছু প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, কিন্তু জরায়ুচর্ম্মাবৃত গর্ভাশয়স্থত শিশু একেবারেই অদৃশ্য। সংসারী লোক অহংভাব ও কামনায় এমনই

বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, তাহার হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, সে নিজে ভগবানেরই অংশ—এই সত্য তাহার ধারণার কল্পনার অতীত হইয়া যায়। সে নিজকে এই ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ মনে সীমাবদ্ধ অহং ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারে না। সর্ব্বদা কাম্যবস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় বুদ্ধি এমন স্থূল ও বহির্মুখী হইয়া পড়ে যে, আত্মজ্ঞানের প্রকাশ আর কিছুমাত্র থাকে না। এই তিনটি দৃষ্টান্তই বুঝাইতেছে যে, জ্ঞান আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে, অন্তরালে থাকিয়া প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে—কামনা-আবরণ অপসারিত হইলেই তাহা স্ব-মহিমায় প্রকটিত হইবে, জীব ভগবৎ জ্ঞানে, ভাগবত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে।

তথা তেনেদমাবৃতম্—এখানে "ইদম্" শব্দের অর্থ মাধবাচার্য্য ও রামানুজ বুঝিয়াছেন জীবাত্মা; ভ্রূণ যেমন গর্ভে বদ্ধ হইয়া থাকে, জীব তেমনই কামের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সত্যকে, ভগবানকে দেখিবার আর তাহার কোন ক্ষমতাই থাকে না। শঙ্কর বলিয়াছেন, এখানে ইদম্ শব্দের দ্বারা কি বুঝাইতেছে তাহা পরের শ্লোকেই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। জ্ঞানই কামের দ্বারা আবৃত হয়। অন্যান্য স্থানেও জ্ঞানের এইরূপ আবৃত হওয়ার কথা আছে,

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্ তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।
—গীতা ৫।১৫

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
—ঈশা উপনিষদ্।১৫

তবে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, সত্যং জ্ঞানং ব্রহ্ম, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ, অতএব এখানে "ইদম্" শব্দে আত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান বুঝিলেও গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

অন্বয়—হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় কামরূপ অনলের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা

আবৃতম্ জ্ঞানমেতেন। ভারতীয় যোগশাস্ত্রে জ্ঞান শব্দ সর্ব্বদাই পরম আত্মজ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা আত্মাকে, ভগবানকে জানিতে পারি, ভগবানের সাধর্ম্ম্য গড়িয়া উঠিতে পারি। এই জ্ঞান পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, অনুমান আদির দ্বারা বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না, ইহা সূর্য্যের ন্যায় স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্ব-প্রকাশ, ইহা আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে, কেবল কামনা মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কাম জ্ঞানীরই চিরশত্রু, মূর্খের নহে, কারণ মূর্খ ব্যক্তি তৃষ্ণাকালে কামকে প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করে এবং তাহারা পরিণামে দুঃখ পাইলে তখন ইহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে, এই কামের দ্বারা তিনি অনর্থে প্রেরিত হইতেছেন এবং সেই জন্যই তিনি সর্ব্বদা কামকে শত্রু বলিয়াই জানেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কামের দ্বারা বিচলিত হন কেন? কাম তাঁহার মধ্যে স্থান পায় কেমন করিয়া? বস্তুতঃ যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন, কাম আর কখনই তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন, শত্রুতা সাধন করিতে পারে না, তিনি যেখানেই থাকুন, আর যাহাই করুন তাঁহার আর পতন হয় না,

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ৬।৩১

অতএব ইহা স্পষ্ট যে গীতা এখানে জ্ঞানী বলিতে এইরূপ সিদ্ধ যোগীকে বুঝে নাই। জ্ঞানযোগের সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও, যতদিন না ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রূপান্তর সাধিত হইতেছে, ততদিন যে কোন মুহূর্ত্তে রজঃ প্রবল হইয়া উঠিয়া জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানকে আবৃত করিয়া দিতে পারে,

এই জন্যই গীতা কামকে জ্ঞানীর চিরশত্রু বলিয়াছে। প্রকৃতির পূর্ণ শুদ্ধি ও রূপান্তর শুধু জ্ঞানমার্গের সাধনার দ্বারা হয় না, জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তিরও প্রয়োজন। ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা করিয়া আমাদের মধ্যে কামের শক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে, অনন্যভক্তির সহিত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে ভগবান নিজেই আমাদিগকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, এই জন্যই গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনের সমন্বয়ে ত্রিধা সাধনার শিক্ষা দিয়াছে।

দুষ্পূরেণানলেন চ। অনল শব্দের অর্থ, যাহার অল বা পরিতৃপ্তি নাই। কাম এইরূপ অনল, কিছুতেই ইহাকে তৃপ্ত করা যায় না, আর তৃপ্ত করিতে না পারিলেও কাম শোক ও সন্তাপের হেতু হয়, অনলের ন্যায় ভিতর হইতে মানুষকে দগ্ধ করে।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে মানুষের সকল রকম আচরণের ব্যাখ্যা করিতেই ফ্রয়েড্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মনোবিকলন শাস্ত্রের অবতারণা করা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* এই মতানুসারে অতৃপ্ত কামনা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানুষকে নানা অস্বাভাবিক ও অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত করে। ইহা হইতে এই ব্যবহারিক

---

* "It is becoming more and more common to explain everything human beings do, in terms of starvation and repression"—Y. Y. in New Statesman aud Nation (Dec. 19, 1936).

এই ব্যাখ্যা কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক Major Yeats Brown লিখিত Lancer At Large নামক পুস্তক হইতে ভারতীয় বিপ্লবীগণ সম্বন্ধে একটি মহিলার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন :—"As a matter of fact", she said, "sex has a lot to do with their going off to raid. They marry early, and they don't have any experience of love and courtship in the European sense, for their wives are chosen for them. There is no suspense or romance about their love affairs. Many of them have had a large family before they are out of their teens. By the time they are twenty, they have had a glut of marriage and family life. But they are passionate, from what my friends have told me, they are the most passionate people on the face of the earth. They have to have some outlet."

শিক্ষা বাহির করা হইতেছে যে, বাসনা কামনাকে অতৃপ্ত রাখা, ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা ঠিক নহে। যাহাদের মধ্যে কামনার অনল জ্বলিতেছে তাহাদের নিকট এই শিক্ষা খুবই উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, এবং আজকাল সকল দেশের সাহিত্যেই এই আদর্শ বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হইতেছে। যে-সমাজে অবাধে বাসনা কামনার তৃপ্তি করা যাইতে পারে, এইরূপ আদর্শ সমাজের স্বপ্ন অনেকেই দেখিতেছেন। কিন্তু এই স্বপ্নকে লোকে যতটা আধুনিক বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ ইহা তত আধুনিক নহে। সকল দেশে সকল যুগেই লোক আত্মহারা হইয়া বাসনা-তৃপ্তির দিকে ছুটিয়াছে এবং সেইটিকেই আদর্শ-জীবন বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষীগণ বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, তৃপ্তি ও শান্তি ও প্রকৃত সুখলাভের এইটি পন্থা নহে—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, ভোগের দ্বারা কামের জ্বালা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যায়, তাহাতে তৃপ্তি কোথায় ?

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।

যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো অশ্বাদি পশু, পরমা সুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না। এতদ্‌বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ ভোগের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছে না, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাহাদের বিচিত্র আয়োজনের অন্ত নাই—তথাপি সমগ্র সমাজ বুভুক্ষার অনলে জ্বলিয়া ছারখার হইতেছে। তাহাদেরই কথায়, "suffering from various forms of starvation"। অনেকেই মনে করেন, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন ও সম্ভোগের সুবিধা করিয়া দিলেই আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজন হইবে না, বুভুক্ষার জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ পরম আনন্দ ভোগ করিবে। বল্‌শেভিক বিপ্লবের প্রথম উন্মাদনায় রুশিয়া যৌন ব্যাপারে নরনারীকে পূর্ণতম স্বাধীনতা দিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার দুর্ব্বিসহ পরিণাম দেখিয়া তাহাদিগকে সংযত

হইতে হইয়াছে। বল্‌শেভিকেরা ধর্ম্ম মানে না, পরকাল মানে না, কিন্তু ঐহিক সুখশান্তির জন্যই তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, যৌন ব্যাপারে অনেকখানি সংযম প্রয়োজন এবং সেজন্য স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিতে সম্প্রতি তাহারা নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছে *। ভারতীয় সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে সমাজ গঠন সম্বন্ধে অনেক রকম পরীক্ষাই হইয়া গিয়াছে, পুরাণাদিতে আজও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীপুরুষের মিলন বিষয়ে ভারতে এককালে খুবই স্বাধীনতা দেওয়া ছিল, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যতদিন না মানুষের ভিতরটা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ততদিন সে-স্বাধীনতা পাইলে সে তাহার অপব্যবহার করে এবং তাহাতে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও কল্যাণ হয় না। পূর্ণতম স্বাধীনতা, সকল রকম বিধিনিষেধের শাস্ত্র ও সমাজ-শাসন হইতে মুক্তি—ইহাই মানব জাতির চরম আদর্শ, মানবের সত্যযুগের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে, মানুষকে আগে পশুর স্তর ছাড়াইয়া, এমন কি সাধারণ মানবীয় মানসিক স্তরও ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন কামক্রোধাদিকে রিপু বলিয়া স্বীকার করা এবং তাহাদিগকে জয় করিবার সাধনা করা। শুধু নিগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে জয় করা যায় না, তাহাতে আত্মাকে অবসন্ন করা হয়, আবার অবাধ ভোগ দিয়াও ইহাদিগকে তৃপ্ত করা যায় না, তাহাতেও আত্মাকে অবসন্ন করা হয়। কামাদিকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয়, নির্ম্মূল করিতে হয়, ভারতের যোগ-শাস্ত্রে সে-সম্বন্ধে যে গভীর নির্দ্দেশ আছে তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বা মনোবিকলন অতি নগণ্য। প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, কাম শত্রু, রিপু, ইহাকে বধ করিতে হইবে, ইহার সহিত কোনরূপ আপোষ করা চলিবে না। আধুনিক মানব এখন পর্য্যন্ত এইটি ঠিকমত উপলব্ধি করে নাই, তাই কামকে জয় করিবার প্রকৃত পন্থাও তাহারা দেখিতে পায় নাই, শুধু ভোগের দ্বারা ইহাকে দুর্ন্নিবার করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াও আজ পাশ্চাত্য জাতির ক্ষুধা মিটিতেছে

* "The light view of sexual intercourse, flighty Don Juans and priestesses of free love will not be encouraged in the new society"—Krilenko, the Commissar of Justice in *Bolshevik* (September, 1936).

না, এখন তাহারা পরস্পরকে গ্রাস না করিয়া আর ক্ষান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে; এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ মোহয়তি।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি—ইহারা কামের অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া কথিত হয়। কাম ইহাদের দ্বারাই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে বিমূঢ় করে।

ব্যাখ্যা

ইন্দ্রিয়াণি—কামকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয়, অতঃপর তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। শত্রুকে জয় করিতে শত্রুর গড় বা আশ্রয়-স্থান কোথায় তাহার সন্ধান লইতে হয়। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই কাম মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। ইন্দ্রিয়গণই কামের প্রধান সহায়, তাহারা আপন আপন বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সে-সবকে ধরিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহাদের এই বহির্মুখী বেগই কামনার মূল। বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত ইন্দ্রিয়গণ মনকে টানিয়া লয়, বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। মন কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসাদির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধিকে অভিভূত করে, বুদ্ধি সত্যাসত্য, সৎ অসৎ বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে—এইভাবে কাম মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া তাহাকে বিমূঢ় করে।

মনঃ। পাশ্চাত্য দর্শনে মন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, বুদ্ধি মনের অন্তর্গত। কিন্তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মনকে বুদ্ধি হইতে পৃথক করা হয়, "মনো নাম সংকল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ, বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃ-করণবৃত্তিঃ"—বেদান্তসার। মন হইতেছে আদি ও প্রধান ইন্দ্রিয়, চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন বাহ্যবস্তুর স্পর্শ গ্রহণ করে, এইভাবে মনে বাহ্য

জগৎ সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান জন্মে এবং কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, মনে এইরূপ সঙ্কল্প বিকল্প উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধি বিচার করিয়া সত্যাসত্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া দেয়। বুদ্ধির নির্ণয় অনুসারে মন হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা নানা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনুভূতিসকলও মনের অন্তর্গত। সঙ্কল্প, বাসনা, ইচ্ছা, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারুণ্য, উৎকণ্ঠা, প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ, ইত্যাদি সমস্ত মনেরই গুণ বা ধর্ম্ম (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৫।২, মৈত্রোপনিষৎ ৬।৩০)। এই সকল মনোবৃত্তি যেমন যেমন জাগ্রত হয়, তেমনি তেমনি কর্ম্ম করিবার দিকে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মনের ঊর্দ্ধে হইতেছে বুদ্ধি; চিন্তা, বিচার, বিবেক, এই সব বুদ্ধির ক্রিয়া। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও বুদ্ধির বিকাশ খুবই কম, তাহাদের জীবন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদিম যুগের মানুষের বাসনা কামনা ছিল প্রধানতঃ শারীরিক; অন্ন, বস্ত্র এবং বাসের গৃহ পাইলেই তাহাদের সকল অভাব মিটিয়া যাইত এবং প্রাচীন যুগের সরল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে এইসব প্রয়োজন পূর্ণভাবেই সিদ্ধ হইত। কিন্তু মানুষের প্রাণ ও মনের বিকাশের সঙ্গে তাহার বাসনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ধন সম্পদ, বিলাসিতা, সুন্দরী স্ত্রী, উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, এই সব প্রাণিক বাসনা আদিম শারীরিক বাসনাসকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের পরিতৃপ্তির জন্য প্রাচীন সরল সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অত্যাচার, অসাম্য, অন্যায়, প্রতারণা, শ্রেণীগত, পরিবারগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা অশুভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জগন্মাতার রহস্যময় বিধানে অশুভের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাণের ভোগবাসনা বিক্ষোভের প্রভাবে মনের ভাব ও অনুভূতিসকলও অধিকতর তীব্র ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে; প্রেম, ঘৃণা, জিঘাংসা, ক্রোধ, আসক্তি, ঈর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিসকল পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছে। এই সকল ভাব ও বাসনার তৃপ্তির জন্যই আধুনিক সমাজ ও জাতিসকলের অস্তিত্ব, ইহাদের জন্যই বাণিজ্যের প্রসার, যুদ্ধবিগ্রহ, আর আধুনিক জড় বিজ্ঞান ইহাদেরই প্রয়োজনীয় উপাদান জোগাইতেছে।

বুদ্ধিঃ। বুদ্ধির যাহা নিজস্ব ক্রিয়া, তাহা হইতেছে শুদ্ধ চিন্তা ; তাহা দেহ, প্রাণ, মনের বাসনা, কামনা, আবেগের দ্বারা বিচলিত বা আচ্ছন্ন হয় না। কিন্তু এখনও খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, ইহার পূর্ণতা লাভ ত দূরের কথা। কেবল মহৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই তাঁহাদের গভীর চিন্তার সময়ে বুদ্ধিকে নীচের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সকলের প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারাও ঐ সব নীচের ক্রিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাও উহাদের প্রভাবে কলুষিত হয়। কেবল যোগসিদ্ধ ব্যক্তিরাই বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিকাশ করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধি অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধিকে মন ও প্রাণের সকল প্রকার বিকার ও বিক্ষোভ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে অধিকাংশ লোকই চিন্তা করে না, তাহাদের আছে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ভাব ও প্রতিক্রিয়া ও গতানুগতিক সংস্কার। অল্পসংখ্যক লোক অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে ; তাহাদের চিন্তা তাহাদের বাসনা, আসক্তি, হৃদয়াবেগ, পক্ষপাতিত্ব, সংস্কার প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত। যাঁহারা প্রকৃতভাবে চিন্তা করেন তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁহারাই পৃথিবীর প্রকৃত অভিজাত শ্রেণী। আজ জগতে যে ধন সম্পদ ও ভোগ বিলাসিতার বৈষম্য দেখা যাইতেছে, শ্রেণীকর্তৃক শ্রেণীর শোষণ—ইহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন যে নূতন আভিজাত্যের আবির্ভাব হইতেছে তাহা হইতেছে জ্ঞানের, অবিক্ষুব্ধ অন্তর্দৃষ্টির এবং বুদ্ধিশক্তির। এই শ্রেণী এখনও ঠিকমত আবির্ভূত হয় নাই, কেবল তাহার সূত্রপাত হইতেছে, মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সংগঠনে এই স্বাভাবিক বৈষম্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে—দেহ, প্রাণ, মনের পূর্ণ বিকাশ ও কর্ম্ম ও ভোগ—ইহাই আধুনিক মানবের পরম লক্ষ্য। মন ও বুদ্ধির উপরে যে আত্মা রহিয়াছে, আধুনিক যুগের মানুষ তাহার সন্ধান করিতে চাহে না, আত্মার সন্ধানকে তাহারা mysticism বা দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়া দূরে রাখিতে চাহে, তাহা দুই চারিজন লোকের আত্মবিলাসের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানবের জন্য তাহা নহে, মানবজাতির প্রগতির প্রয়োজন তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। মানবজাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে অবিশ্রান্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া, মনবুদ্ধির যুক্তিতর্কের আলোকেই তাহাকে পথ দেখিয়া চলিতে হইবে,

আধ্যাত্মিকতারূপ বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকা সাধারণ মানবের জন্য নহে। মানুষ যখন দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি লইয়া গঠিত, তখন ইহাদের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন যে মানুষের স্বধর্ম্ম সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং গীতাও দেহের মধ্যেই, ইহৈব, ভাগবত সত্তার বিকাশকে মানবের আদর্শ সিদ্ধি বলিয়াছে। তবে গীতা বলিয়াছে যে, ইহজীবনেরই পূর্ণ বিকাশ করিতে হইলে শুধু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, কারণ মানুষের পরম শত্রু কাম ইহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া মানুষকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, জরা মৃত্যু শোক দুঃখের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। ভূত যদি সরিষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়াইবে কেমন করিয়া? তাই আধুনিক যুগের অস্থির অব্যবস্থিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা গীতার অনুমোদিত নহে, এবং বাসনা কামনার অধিষ্ঠান-ভূমি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপরেও গীতা নির্ভর করিতে বলে নাই। আমাদের মধ্যেই দিব্য শক্তিময় জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় আত্মা রহিয়াছে, মন বুদ্ধি যখন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আর কাম তাহাদের নাগাল পায় না। তখনই বুদ্ধি ঠিকভাবে সত্যাসত্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে, মনও স্থির শান্ত হইয়া বুদ্ধির বিশুদ্ধ যন্ত্র হয়, ইন্দ্রিয়গণও রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নতার সহিত বিষয় সমূহের উপর বিচরণ করিতে পারে,—কেবল তখনই মর্ত্ত্যের মানব অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

অন্বয়—[হে] ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানং এনং প্রজহি।

অনুবাদ—অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী পাপরূপ এই কামকে বিনষ্ট কর।

ব্যাখ্যা

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ—কামকে জয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে। মন ও বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মাতে

নিবদ্ধ করিতে না পারিলে কাম নির্ম্মূল হইবে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে মন-বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করা সম্ভব হয় না। যখন আমরা বাহ্য বস্তু ভোগের লোভকে জয় করি, তখনই আমাদের ভিতরে যে আত্মা রহিয়াছে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে আরম্ভ করি। অতএব স্বভাববশতঃ ইন্দ্রিয়গণ যখনই বাহিরের দিকে ঝুঁকিবে তখনই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ, তাহা হইলেই কাম আর আমাদের মধ্যে আশ্রয় পাইবে না, তাহাকে বিনষ্ট করা সহজ হইবে। কঠোপনিষদে শরীরের সহিত রথের উপমা দিয়া বলা হইয়াছে যে, শরীররূপ রথে যোজিত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সকলকে বিষয়োপভোগ-পথে সুনিয়মে চালাইবার জন্য বুদ্ধিরূপ সারথিকে মনরূপ লাগাম ধৈর্য্য সহকারে টানিয়া ধরিতে হইবে। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইতেছে ততক্ষণ কেহই নিরাপদ নহে। সাধারণ জীবনে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় লোকে কিরূপ হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজের এবং অপরের অনিষ্ট সাধন করে তাহা সুবিদিত। এমন কি যাঁহারা জ্ঞানের সহিত যত্নপূর্ব্বক আত্মজয়ের সাধনা করিতেছেন, এমন জ্ঞানী, সাধু, সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাও ইন্দ্রিয়গণকে একটু প্রশ্রয় দিলে তাহাদের টানে ভাসিয়া যান (গীতা ২।৬০)। অতএব সকলের পক্ষেই সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

নিয়ম্য ভরতর্ষভ। ইন্দ্রিয়গণকে সুনিয়ন্ত্রিত করা সহজ নহে, এবং সাধারণতঃ যেভাবে এই চেষ্টা করা হয়, নানারূপ বিধিনিষেধের কঠোর বন্ধনে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা হয় তাহাতে সাময়িক কিছু সাফল্য হইলেও তাহার পরিণাম শুভকর নহে। জীবনের লক্ষ্য হইতেছে আনন্দ, জগৎ আনন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ঘুরিয়া আনন্দের দিকেই চলিয়াছে। রসগ্রহণ স্পৃহা মনের স্বভাব, মন যদি উচ্চতর রসের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে সে নীচ অশুদ্ধ কামোপভোগের দিকে ধাবিত হইবেই। একবার যদি মন ভগবদ্ রসের আস্বাদন পায় তাহা হইলে সহজেই কামনাকে জয় করা যায়। রসো বৈ সঃ, তিনিই সকল রসের উৎস, রসময় রসস্বরূপ আনন্দ ব্রহ্ম।

বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো
কামনা কুসুম শুকালো
মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

কিন্তু এইভাবে শ্যামাপদ নীলকমলে মনকে মজান, এমন কি বিষয়রসে আসক্ত মনকে সেদিকে ফিরানও সহজ নহে। মনকে ফিরাইবার এক সহজ উপায় হইতেছে সৌন্দর্য্যের উপাসনা, সৌন্দর্য্যের দিকে মানুষ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য্য উপাসনার ভিতর দিয়া মানুষ সহজে ও আনন্দে চিরসুন্দর ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। সংসারে যেখানে যাহা কিছু সুন্দর আছে বা সৃষ্ট হইতেছে, সে-সবই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বা বিভূতি। মনকে সৌন্দর্য্যরস আস্বাদনে অভ্যস্ত করা ইন্দ্রিয়জয়ের পক্ষে এবং অধ্যাত্মজীবন লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত কামনা-বিক্ষোভহীন রসের আস্বাদ পায় এবং এই ভাবে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া উঠে। ভারতে আর্ট বা চারুকলা চিত্তশুদ্ধি ও অধ্যাত্মজীবন গঠনে যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল, জগতে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই।

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার আর এক সহায় হইতেছে কর্ম্মযোগের অভ্যাস। কর্ম্মের দিকে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কর্ম্মে রত থাকিলে মানুষের ইন্দ্রিয় প্রশমিত হয়। ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের মধ্যে বাসনা-কামনার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে, এবং ক্রমশঃ প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর সাধিত হয়। গীতা ইন্দ্রিয়-সংযমের অন্যান্য পন্থার ইঙ্গিত করিলেও প্রধানতঃ কর্ম্মযোগের উপরেই জোর দিয়াছে। গীতার এই কর্ম্মযোগের ভিত্তি হইতেছে জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি হইতেই ইহার প্রেরণা আসে—এই যে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়, গীতার মতে ইহাই ইন্দ্রিয়জয়ের এবং ভগবানের সহিত সাধর্ম্ম্য লাভের প্রকৃষ্ট সাধনা।

ভোগাকাঙ্ক্ষা যখন খুব প্রবল থাকে তখন কোনরূপ যোগাভ্যাসই সম্ভব হয় না, তখন জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া কিছু ভোগ দিয়া প্রশমিত করা ইন্দ্রিয়জয়ের একটি বিশিষ্ট পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, রসগোল্লা খাইবার জন্য যদি খুব আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে দুইটা রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিবে, "মন, এরই নাম রসগোল্লা—আস্বাদন ক'রে নে, আর যেন এর প্রতি লোভ করিস্ না।" ভোগের ফলে যখন প্রতিক্রিয়া আসিবে, বাসনার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিবে, সেই সুযোগে তাহাকে নিগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণভাবে কাম জয় হয় না, তাহার বীজ থাকিয়াই যায় এবং

সুযোগ পাইলেই আবার পল্লবিত হইয়া উঠে। ভোগ ও নিগ্রহের দ্বারা কামকে ক্ষীণ করিয়া সংযম অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে নির্ম্মূল করিতে হয়। যোগী পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি দেখেন যে, বাসনা কামনা প্রভৃতি বৃত্তিসকল প্রকৃতির খেলা, পুরুষ কেবল তাহাদের সাক্ষী, অনুমন্তা, ভোক্তা— পুরুষ যদি কামকে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করে, বর্জ্জন করে, তাহার খেলায় কিছু মাত্র সায় না দেয়, তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়া যাইবে। গীতা পরে পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ বিশদভাবে ব্যক্ত করিবে। উপস্থিত আমাদের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির উপরে আমাদের মধ্যেই যে আত্মা বা পুরুষ রহিয়াছে তাহার ইঙ্গিত দিয়াই এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছে।

এখানে গুরু অর্জ্জুনকে "ভরতর্ষভ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া উৎসাহ দিলেন, অর্জ্জুন মহাশৌর্য্য-বীর্য্যবন্ত কুলসম্ভূত, তিনি কামরূপ ভীষণ শত্রুকে বিনাশ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। অধ্যাত্মজীবনের সাধনায় সকলেরই চাই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বীর হৃদয়, সাধনমার্গের সকল শত্রুকে জয় করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহস।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং। গীতা এখানে কামকেই পাপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। বস্তুতঃ বাহিরের কোন আচরণের উপর পাপ পুণ্য নির্ভর করে না, ভিতরে বাসনা কামনা লইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতেই বন্ধনের সৃষ্টি হয়, আত্মবিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, সেইজন্যই তাহা পাপ। কামিনী-কাঞ্চন মনের মধ্যে কাম উৎপন্ন করে, সেইজন্য সন্ন্যাসিগণ কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন করিয়া সংসার ত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে পাপের মূল কাম দূর হয় না, তাহা থাকিয়াই যায়। গীতা এইভাবে কামকে অবশিষ্ট রাখিতে উপদেশ দেয় নাই, প্রকৃষ্টভাবে তাহাকে নাশ করিতে বলিয়াছে, প্রজহি। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে রাগদ্বেষবর্জ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে,—অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকিয়া কামকে জয় করা যায় না। তবে সাময়িকভাবে বৈরাগ্য কাহারও কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করিবার সহায় হইতে পারে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়জয়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, ভিন্ন ভিন্ন লোকের অবস্থা ও প্রয়োজন ভিন্ন, গীতা কেবল এ-বিষয়ে মূলতত্ত্বগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে। শাস্ত্র হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া সদ্গুরুর সাহায্যে দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত অভ্যাস ও সাধনা করিতে হয়, তাহা হইলেই যথাকালে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায়।

জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মাদি সম্বন্ধে যে [পরোক্ষ] বোধ লব্ধ হয় তাহাই জ্ঞান, এবং ধ্যানাদি দ্বারা তাহাদের [অপরোক্ষ] অনুভবই বিজ্ঞান"। কেহ কেহ বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—জ্ঞান অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞান। জ্ঞান শব্দে গীতা সর্ব্বত্রই আত্মবিষয়ক, ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই বুঝিয়াছে। এই জ্ঞানের দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে মূল ভাস্বর জ্ঞান, পরমাত্মা সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি, আর একটি হইতেছে পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি সকল তত্ত্ব লইয়া ব্যাপক জ্ঞান বা বিজ্ঞান। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে গীতা জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলিতে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের এই দুইটি দিকই বুঝিয়াছে। যাহাই হউক, যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা এবম্বিধ সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কামের হস্ত হইতে তাঁহারও নিস্তার নাই। কাম যাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট করিতে না পারে সেইজন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহা গীতার পন্থা নহে, গীতা মুক্ত ব্যক্তিকেও সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে, এবং সেইজন্যই প্রথমে কামকে নির্ম্মূল করিবার কথা বলিয়াছে এবং তাহার উপায়ও দেখাইয়া দিয়াছে। ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ আছে, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ, কামী মাত্রেই অশুদ্ধ ; যে নিষ্কাম সে শুদ্ধ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়-সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কথিত হয় ; ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই [চেতন আত্মা, পুরুষ]।

ব্যাখ্যা

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান-ভূমি বলা হইয়াছে, অতএব কামকে জয় করিতে হইলে ইহাদের অতীত অন্য

কোন বস্তুকে আশ্রয় করিতে হইবে এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। এখানে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গীতা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা হইতেছে সাংখ্য অনুযায়ী। এক দিকে রহিয়াছে পুরুষ, স্থির, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর, অদ্বিতীয়, আত্মা, তাহার মধ্যে বিবর্ত্তন বা বিকাশ নাই, তাহা চিরদিন যেমন তেমনই আছে। অন্যদিকে রহিয়াছে প্রকৃতি, চৈতন্যময় পুরুষ ব্যতীত সে নিশ্চল, সে সক্রিয় কিন্তু কেবল পুরুষের সান্নিধ্যে পুরুষের সংস্পর্শেই সে কর্ম্ম করিতে পারে, তাহার বিবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন দুই-ই হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইতেই আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্য জগৎ উদ্ভূত হয়, আমাদের পক্ষে যেটি আভ্যন্তরীণ সেইটিই প্রথমে উদ্ভূত হয়, কারণ পুরুষের চৈতন্যই হইতেছে প্রথম ও মুখ্য কারণ, প্রকৃতি হইতেছে দ্বিতীয় ও আপেক্ষিক কারণ, তথাপি আমাদের ইন্দ্রিয়াদি আভ্যন্তরীণ করণসমূহ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়, পুরুষ হইতে নহে। পর্য্যায়-ক্রমে প্রথমেই আসে বুদ্ধি, প্রকৃতি হইতে বিবর্ত্তিত নির্ণয়াত্মিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি, পরে দ্বিতীয় বিবর্ত্তনরূপে বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হয় মন; তৃতীয় বিবর্ত্তনরূপে মন হইতে দশটি ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়, চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, তাহার পর আসে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির আপন আপন বিশিষ্ট শক্তি, রূপ রস ইত্যাদি এবং ইহাদের স্থূল আধারস্বরূপ ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতই বিভিন্ন ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাহ্যজগতের বস্তুসকল উৎপন্ন করে।

জড় জগতে যে ক্রম বিবর্ত্তন তাহা উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। জড়-প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে হয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির বিকাশ। কিন্তু জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞান যে, আধুনিকতম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, জড় অণুপরমাণুর মধ্যেও একটা বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে। জড়ের সূক্ষ্মতম উপাদান ইলেক্ট্রনের (electrons) গতিবিধি পরীক্ষা করিতে যাইয়া হাইসেন্‌বার্গ প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়মগুলি ঠিক যন্ত্রের মত চলে না, উহাতে একটু অসম্পূর্ণতা আছে। ইহাই হইল বর্ত্তমান যুগের অনির্দ্দিষ্টতাবাদ বা অনিশ্চয়তাবাদ (Indeterminism of Nature)। সূক্ষ্ম জড় জগতে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে কোন্ বস্তু কি ভাবে কার্য্য করিবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম

নাই, তাহা তাহার ভিতর হইতেই নির্ণীত হয় এবং ইহাই বুদ্ধির ক্রিয়া। সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রনের রাজ্যের এই অনির্দ্দিষ্টতা শুধু বৃহৎ রাজ্যেই সমষ্টিগত ভাবে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের আকারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধরূপে দেখা দেয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব দেখিয়া মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে এ বৎসর কতজন লোক আত্মহত্যা করিবে—কিন্তু বস্তুতঃ কোন্ কোন্ লোক আত্মহত্যা করিবে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান জড় জগৎ সম্বন্ধে যত নিয়ম (Laws) নির্দ্ধারণ করিতেছে সে সব এইরূপ statistical, গড়পড়তায় সত্য, তাহাদের পিছনে প্রকৃতির সূক্ষ্মরাজ্যে একটা অনিশ্চয়তার ক্রীড়া চলিতেছে, সেখানে এক বুদ্ধি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিগূঢ় ভাবে প্রকৃতির কার্য্য-পরম্পরাকে চালিত করিতেছে। প্রকৃতির বিবর্ত্তনে প্রথমেই বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহার ক্রিয়াতেই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণের সহিত আধুনিক জড় বিজ্ঞানের মিল রহিয়াছে। কিন্তু জড়ের ক্রিয়া বুদ্ধিতে কিরূপে চৈতন্যের আভাস হয়, আধুনিক বিজ্ঞান তাহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। সাংখ্য সে ব্যাখ্যা দিয়াছে, জড় প্রকৃতির এই সব ক্রিয়া পুরুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের সচেতন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়রূপে প্রতিভাত হয় এবং এই সব লইয়াই হয় আমাদের অন্তঃকরণ। অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহাই ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়, বাহ্য জগৎ।

জীব পুরুষেরই অংশ, মমৈবাংশঃ, প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য হইতে ইন্দ্রিয়াদি কর্ষণ করে, এবং সেই সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিয়া বদ্ধ হয় অথবা বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে হইলে যে পর্য্যায়ক্রমে সে প্রকৃতির মধ্যে নামিয়াছে তাহার বিপরীত পর্য্যায়ক্রম অনুসরণ করিতে হয়; উপনিষদে আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি-সকলের বিকাশের এই ক্রমই বর্ণিত হইয়াছে এবং গীতাও এখানে প্রায় উপনিষদের ভাষাতেই সেই ক্রমের বর্ণনা দিয়াছে*।

---

* ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ।

—কঠোপনিষৎ ১।৩।১০

ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে যাইবে তখন তাহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে, তাহাদের উৎপত্তিস্থল মনের মধ্যে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া ধরিতে হইবে, মনকে বুদ্ধির মধ্যে লইয়া শান্ত করিতে হইবে, বুদ্ধিকে আত্মার মধ্যে লইয়া শান্ত করিতে হইবে—তখন জীব আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করিবে কিন্তু তাহার অধীন হইবে না, বাহ্য জগৎ, বাহ্য জীবন যাহা দিতে পারে এমন কোন জিনিষেরই কামনা করিবে না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতির বিবর্ত্তনে প্রথমেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। কিন্তু জড় অণুপরমাণুতে যে বুদ্ধির ক্রিয়া তাহা খুবই সীমাবদ্ধ, কারণ সেখানে বুদ্ধির প্রকাশের উপযোগী যন্ত্র নাই। প্রকৃতি মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ করিয়াই জড়জগতে বুদ্ধির ক্রিয়ার উপযোগী যন্ত্র পাইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বিবর্ত্তনের বহু ধাপ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। জড়জগতে প্রাণের আবির্ভাব হওয়াতেই মনের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সংবেদন, সুখ-দুঃখ বোধ, স্মৃতি, আভ্যন্তরীণ প্রেরণা প্রভৃতির স্থূল উপাদান†। বিবর্ত্তনের কোনও স্তরে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ হওয়ায় মনেরও উচ্চতর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধির বিকাশেই মানুষ পশু-স্তরের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহারও উপরে উঠিয়া মানুষ অতিমানবত্ব লাভ করিবে, ইহাই পৃথিবীতে মানব-জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহার জন্য বুদ্ধির উপরে যে আত্মা রহিয়াছে, যাহা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের শ্রেষ্ঠতম কারণ, তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা জানিতে হইবে, তাহাতেই আমাদের সকল সঙ্কল্প নিবদ্ধ করিতে হইবে।

যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ—বুদ্ধির উপরে যে আত্মা তাহাকেই গীতায় অক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি লইয়াই আমাদের সাধারণ মানব জীবন। আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ হইতেছে বুদ্ধিরই পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাহার সাহায্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা, ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে যতক্ষণ

---

† জগদীশচন্দ্র সূক্ষ্মতম যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ আমাদের জীবনের মূল নীতি হইবে কামনা এবং তাহা আমাদিগকে জীবন সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে সকল সত্য জ্ঞান হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে সংযত করিয়া এক নির্ব্যক্তিক শান্ত ভাব লইয়া অহংকার শূন্য হইয়া বস্তু-সকলকে দর্শন করা। কারণ কামনা-মেঘের উৰ্দ্ধে সেই শান্ত নির্ম্মল আকাশেই আমরা সত্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি, জগৎ ও প্রকৃতির সত্য সমুজ্জ্বল আলোক দর্শন করিতে পারি। এই যে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, যাহার পরাকাষ্ঠাকে আমরা শ্রেষ্ঠ গতি বলিয়া মনে করি, ইহা হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রকৃতির হস্তের অক্ষম পুত্তলিকা। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক নির্ব্যক্তিক আত্মা, সকলের মধ্যে এক, তাহা সব জিনিষকেই দেখিতেছে, জানিতেছে, এক সম, নিরপেক্ষ, বিশ্বব্যাপী সত্তা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে, এক সাক্ষী চৈতন্য প্রকৃতিকে জিনিষসকলের স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ করিতে দিতেছে, কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যে বদ্ধ হইতেছে না, নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে না। অহং এবং বিক্ষোভময় ব্যক্তিত্ব হইতে সরিয়া এই শান্ত, সম, সনাতন, বিশ্বগত, নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে আসাই হইতেছে দৃষ্টিসম্পন্ন যৌগিক কর্ম্ম করিবার প্রাথমিক সাধনা।

প্রকৃতির বিকাশে বুদ্ধিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, কিন্তু যতক্ষণ না আমরা প্রকৃতির উৰ্দ্ধে যে পুরুষ রহিয়াছে তাহাকে জানিতেছি ততক্ষণ আমাদের এই প্রাকৃত জীবনকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে। বুদ্ধিই মুক্তি আনিয়া দেয়, বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ তাহার বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মানসিক সত্তা হইতে তাহার শান্ত শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিয়া গিয়া অবশেষে জন্ম ও কর্ম্মের চির-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সেই মুক্তিতে দিব্যভাবে কর্ম্ম করাই গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ; যে ভাগবত সত্তা ও অব্যর্থ ইচ্ছা আমাদের নিকট এখন অপরিস্ফুট হইলেও বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকট করিতেছে, তাহার সহিত সজ্ঞান যোগেই এইরূপ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা আত্মানং আত্মনা সংস্তভ্য, হে মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

অনুবাদ। হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধির উপর অবস্থিত শ্রেষ্ঠ আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মাকে আত্মার দ্বারাই অবিচল ও শান্ত কর এবং কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনষ্ট কর।

ব্যাখ্যা

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা—গীতা যে সুখ দুঃখ সমানভাবে সহ্য করিবার উপদেশ দিয়াছে, তান্ তিতিক্ষস্ব, তাহার উদ্দেশ্য হৃদয়কে পাষাণবৎ অনুভূতিহীন করিয়া তোলা নহে; মানবের মানবত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য হৃদয়বৃত্তিরও বিকাশ চাই এবং গীতা প্রেম ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। তবে এই পূর্ণত্বের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাহারই একটি উপায়-স্বরূপ গীতা সুখ দুঃখকে সহ্য করিতে বলিয়াছে, কারণ এইরূপ শান্ত ও সমভাব অভ্যাস করিয়া আমরা সাধারণ বিক্ষোভময় জীবনের পশ্চাতে যে শান্ত, সম, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী আত্মা রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সচেতন হই, এক নূতন চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হই, এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ। সাত্বিক বুদ্ধির দ্বারা সাংসারিক সুখ দুঃখের অনিত্যতা বিচার করাও আত্মজ্ঞান লাভের একটি সাধনা। কিন্তু নৈতিক ইচ্ছা-শক্তি বা সাত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যে আত্মসংযম বা ইন্দ্রিয়জয় তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে, তাহা কেবল প্রকৃত মুক্তিলাভের সহায় হইতে পারে এবং সেই হিসাবেই গীতা এই সবের উপদেশ দিয়াছে। নীচের প্রকৃতির খেলা সকল সময়েই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের খেলা, এবং সাত্বিক মনুষ্যকে কবলিত করিবার জন্য রজঃ ও তমঃ সতত ওৎ পাতিয়া থাকে। "সিদ্ধিলাভে যত্নশীল ব্যক্তির মনকেও প্রবল বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে" ২।৬০। সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণের উপরে, বুদ্ধির উপরে যে আত্মা বা পুরুষ রহিয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই,—উহা গুণত্রয়ের অতীত, বিজ্ঞানময়। সকল সাধনার উদ্‌যাপন করিতে হইবে ঊর্দ্ধের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্য জন্ম লাভ করিয়া।

সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা—আত্মাকে আত্মার দ্বারা স্থির ও শান্তপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। এই কথাটির নানারূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়, যথা,

"মনকে মনের দ্বারা" "মনকে বুদ্ধি দ্বারা" "মনকে আত্মা দ্বারা" ইত্যাদি। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সংস্কৃত মনের দ্বারা সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক"। কিন্তু এই দুইটি শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে, আত্মা মন ও বুদ্ধির উপরে, তাহা হইলে এখানে "আত্মা" শব্দে কেমন করিয়া মন বা বুদ্ধি বুঝা যাইবে? উপনিষদ দুই পুরুষের কথা বলিয়াছে, এক পুরুষ প্রকৃতিতে বদ্ধ, প্রকৃতির সহিত এক হইয়া প্রাকৃত জীবনের সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, আর এক পুরুষ চিরমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী। এই সাংখ্যতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া গীতাও দুই পুরুষ বা দুই আত্মার কথা বলিয়াছে। দেহ, প্রাণ মনে আমাদের যে অহংজ্ঞান, ইহাই নীচের আত্মা। এই আত্মা অজ্ঞান, ইহা প্রকৃতিতে বদ্ধ, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখের অধীন। ইহার উর্দ্ধে রহিয়াছে মহত্তর প্রকৃত সচেতন আত্মা। বুদ্ধির দ্বারা এই প্রভেদ উপলব্ধি করা, উর্দ্ধের আত্মার দ্বারা আমাদের নীচের আত্মাকে, দেহ, প্রাণ, মনের জীবনকে শান্ত ও উদ্বুদ্ধ করা, ইহাই অধ্যাত্মজীবন লাভের প্রাথমিক সাধনা।

যতক্ষণ আমরা বাসনা কামনাকে নিজেদের বলিয়া মনে করিতেছি ততক্ষণ তাহাদিগকে প্রকৃত ভাবে জয় করা, বর্জ্জন করা যায় না। বাসনা কামনা হইতেছে দেহ প্রাণাদিতে প্রকৃতির খেলা, পুরুষ ইহার উর্দ্ধে, আমরা মূল সত্তায় সেই পুরুষের সহিতই এক, এই উপলব্ধি লাভ করিলেই কামকে জয় করা যায়। বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত না হইয়া অন্তর্মুখী হইলেই এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। বুদ্ধিকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত রাখিলে, আত্মার নিজস্ব শান্ত, সম, অক্ষর ভাব আমাদের দেহ, প্রাণ, মনেও সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে স্থির ও শান্ত করিয়া তুলে এবং এইভাবেই মর্ত্ত্য দেহে, ইহৈব, দিব্য অধ্যাত্মজীবনের, অমৃতত্বের, প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়।

জহি শত্রুং মহাবাহো—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রকৃতির অনুসরণ করেন, ইন্দ্রিয়াদির উপর জোর জবরদস্তি করিয়া কানও লাভ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, প্রকৃতির মধ্যে যে বদ্ধমূল কাম রহিয়াছে, অবশ হইয়া আমাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। শুধু ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্যই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কোন সার্থকতা নাই, কিন্তু আত্মাকে জানিবার জন্য যতটুকু নিগ্রহের প্রয়োজন তাহা করিতেই হইবে—কারণ ইন্দ্রিয়গণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলে বুদ্ধি কখনই অন্তর্মুখী হইতে পারিবে না,

আত্মার দর্শনও মিলিবে না। জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিলেও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি রস বা রাগদ্বেষ থাকিয়া যায় এবং তাহাই কামের মূল। যতক্ষণ এই লালসা আছে ততক্ষণ কেহই নিরাপদ নহে। এই রস বা লালসা দূর হয় বুদ্ধির উপরে অবস্থিত আত্মাকে দর্শন করিয়া, পরং দৃষ্ট্বা।

কামরূপং দুরাসদম্—এই কামকে জয় করা অতিশয় কঠিন কারণ ইহার নানা মূর্ত্তি, নানা ছল, দুর্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি (শঙ্কর)। যখন মনে করা যায় নিষ্কামভাবে দেশের সেবা, সমাজের হিত, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছি তখনও এই সব মহান আদর্শের অন্তরালে যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তির কামনা সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করে। যতক্ষণ না আত্মার দর্শন মিলিতেছে, ততক্ষণ বহু যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াও কামনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মনে কর্‌ছি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে।" এই জন্যই গীতা আমাদের মধ্যে যে নিশ্চল, নির্ব্বিকার, অক্ষর, নিষ্ক্রিয় সাক্ষী পুরুষ রহিয়াছে, প্রথমেই তাহার উপলব্ধি লাভ করিতে বলিয়াছে। এই উপলব্ধি না হইলে, প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম, যথার্থ কর্ম্মযোগ সম্ভব নহে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্র-বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদে কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

উপসংহার

কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ হিংসাত্মক কর্ম্ম কেমন করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য হইতে পারে, ধর্ম্ম হইতে পারে অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন লইয়াই গীতার আরম্ভ। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য যে জগৎ-তত্ত্বের সম্যক আলোচনা করিতেই হইবে তাহা নহে। কোন যৌক্তিক নৈতিক বা ব্যবহারিক আদর্শ ধরিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা যায়। জীবহিংসা করাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের মনে হইবে যে, কোন কারণেই কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ রক্তপাত কর্ত্তব্য হইতে পারে না। আমাদের দেশে যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা বাহ্যিক যুদ্ধ নহে, তাহা হইতেছে অন্তরের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি সকলের সহিত যুদ্ধ। গীতা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কথা বলিয়াছে,

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

কিন্তু গীতা বাহ্যিক ও শারীরিক যুদ্ধেরও প্রয়োজন ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রকে কেবল আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের রূপক বলিয়া বর্ণনা করিলে, সমগ্র মহাভারতকেই রূপক বলিতে হয় এবং তাহা হয় অতিশয় কষ্ট-কল্পনা, মহাভারত বা গীতার ভাষা হইতে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না। জীবহিংসা যেমন পাপ বলিয়া বোধ হয়, তেমনই আবার ক্ষেত্রবিশেষে বলপ্রয়োগ বা জীবহিংসা না করাটাই সমাজের প্রতি মহান কর্ত্তব্যের অবহেলা রূপ পাপ বলিয়া অনুভূত হয়। ন্যায় ও সত্যের জন্য অত্যাচারীকে দমন করা মহান নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য। কোন অবস্থাতেই রক্তপাত না করা, আত্ম-শক্তির (soul-force) প্রয়োগে সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধানের চেষ্টা করা অতি উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার অন্যপক্ষে ইহাও স্বীকার্য্য যে, জগতে এখনও আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সকল মনুষ্যের মধ্যেই আত্মার বিকাশ হয় নাই এবং এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য অস্ত্রধারণ করা অনেক সময়েই অপরিহার্য্য— ইহাও অতি উচ্চ ও মহান আদর্শ। কে কোন্ আদর্শ গ্রহণ করিবে, তাহা

তাহার স্বভাব, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, তাহার বিশিষ্ট আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই ভাবে চরম সমাধান হয় না, কারণ এই সমাধান হইতেছে সাধারণ মানবীয় মন দ্বারা; সেই মনের আছে বিচিত্র প্রবৃত্তি ও ধারা, সে-সবের মধ্যে কোন রকম একটা সামঞ্জস্য করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এই ভাবে একটা সাময়িক কাজ চলা সমাধান করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের অন্তর্পুরুষ স্থায়ী ও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, ভিতরে দ্বন্দ্ব ও সংশয় থাকিয়াই যায় এবং ইহাই সাধারণ মানব জীবনের স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তৎকালীন সমাজের ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আদর্শ অনুসারে অর্জ্জুনের সমস্যার একটা সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, আর তিনি তাহা গ্রহণ করেন গুরুর এরূপ ইচ্ছাও ছিল না। তখন গুরু এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাধান দিলেন এবং তাহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। তাহা হইতেছে আমাদের যুক্তি, তর্ক, নৈতিক সমস্যা-সকলের উর্দ্ধে এক অন্য চৈতন্যের মধ্যে উঠা, সেখানকার ধারা বিভিন্ন এবং কর্ম্মের নীতিও বিভিন্ন। সেখানে আর ব্যক্তিগত বাসনা কামনা দ্বারা, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের দ্বারা কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় না। সেখানে সকল দ্বন্দ্ব লুপ্ত হয়। সেখানে কর্ম্ম আর আমাদের নিজেদের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পাপপুণ্য বোধের উর্দ্ধে উঠা যায়। সেখানে বিশ্বগত, নির্ব্যক্তিক, ভাগবত সত্তা আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন; সেখানে আমরাও এক নূতন ও দিব্য জন্মের ভিতর দিয়া সেই সত্তার সত্তা, সেই শক্তির শক্তি, সেই আনন্দের আনন্দ হইয়া উঠি। তখন আর আমরা আমাদের নীচের প্রকৃতির মধ্যে বাস না করায় আমাদের নিজেদের কোন কাজ করিবার থাকে না, তখন আমরা কেবল ভগবানের কাজ করি; আমাদের বাহ্য প্রকৃতি হয় কেবল নমনীয় যন্ত্র মাত্র, তাহা আর কর্ম্মের কারণ হয় না বা প্রেরণা দেয় না, কারণ প্রেরণা-শক্তি আসে উর্দ্ধ হইতে—আমাদের কর্ম্মের অধীশ্বরের দিব্য ইচ্ছা হইতে। ইহাই গীতার সমাধান, আমাদের জীবনের যাহা প্রকৃত সত্য তাহারই উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ সমাধান।

এই যে আমাদের সত্তার কেন্দ্রকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করা এবং এই ভাবে আমাদের সমগ্র জীবন ও চৈতন্যকে রূপান্তরিত করা, এবং তাহার

পরিণামস্বরূপ আমাদের কর্ম্মের ভাব ও লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন সাধন—ইহাই কর্ম্মযোগের সার মর্ম্ম। তোমাকে যে কর্ম্মই করিতে হউক তাহা এমন ভাবে কর, যেন তাহা তোমার আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম নবজন্মের, দিব্য জন্মের উপায়স্বরূপ হয় এবং ভাগবত হইবার পরেও ভাগবত কর্ম্ম কর ভগবানের যন্ত্ররূপে, লোক সংগ্রহের জন্য। অতএব এখানে দুইটি জিনিষ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতির এই রূপান্তর সাধনের, উপরে উঠিবার, দিব্যজন্ম লাভ করিবার উপায় কি, পন্থা কি, তাহা বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মের স্বরূপ কি হইবে তাহা বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ভিতরে কি ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাই বুঝিতে হইবে, কারণ কর্ম্ম বাহ্যতঃ কি রকম হইবে সে বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, তবে কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন হইবে। কার্য্যতঃ এই দুইটি জিনিষই এক, কারণ, একটিকে ভাল করিয়া বুঝিলে অপরটিকেও বুঝা যায়। আমাদের কর্ম্মের পশ্চাতে ভাব কি হইবে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপ ও ভিতরের প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আবার এই স্বরূপও আমাদের কর্ম্মের ভাব ও গতির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের কর্ম্মের ভাবগতি খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাতে আমাদের সত্তা রূপান্তরিত হয় এবং ইহার ভিত্তিও পরিবর্ত্তিত হয়; চেতন শক্তির যে কেন্দ্র হইতে আমরা কর্ম্ম করি তাহা সরিয়া যায়। জীবন ও কর্ম্ম যদি একেবারে মিথ্যা বা মায়া হইত (এইরূপই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন), যদি আত্মার সহিত কর্ম্মের ও জীবনের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না; কিন্তু আমাদের মধ্যে জীবাত্মা জীবন ও কর্ম্মের দ্বারা বিকশিত হয় এবং ইহাই কর্ম্মযোগের সার্থকতা।

মানুষের যে বর্ত্তমান জীবন প্রধানতঃ দেহ ও প্রাণের ক্রিয়া, কেবল কথঞ্চিৎ মন ও বুদ্ধির দ্বারা সংস্কৃত ও প্রভাবিত, এইটিই মানবজীবনের সম্ভাবনার চরম বা শেষ নহে, এমন কি বর্ত্তমানেও ইহা তাহার সমগ্র জীবন নহে। আমাদের মধ্যে এক নিগূঢ় আত্মা রহিয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি তাহারই বাহ্য রূপ বা আংশিক প্রকাশ। দুইভাবে আমরা জীবন যাপন করিতে পারি, একভাবে জীব তাহার প্রকৃতির ক্রিয়া-সকলে নিমগ্ন হয়, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতির তত্ত্বসকলের সহিত নিজকে এক করিয়া দেখে, তাহাদের

দ্বারাই সীমাবদ্ধ হইয়া, প্রকৃতির অধীন হইয়া জীবন যাপন করে; আর এক ভাবে সে এই সকলের ঊর্দ্ধে আত্মার জীবন যাপন করিতে পারে; সে-আত্মা এই সবের অতীত, উদার, নির্ব্যক্তিক, বিশ্ব-প্রসারিত, মুক্ত, অসীম, বিশ্বাতীত, তাহা অনন্ত সমতার সহিত প্রাকৃত সত্তার জীবন ও কর্ম্মকে ধরিয়া থাকে, কিন্তু নিজের মুক্তি ও আনন্দে এই সবের অতীত হইয়া থাকে। এখন যাহা আমাদের প্রাকৃত সত্তা তাহার মধ্যে আমরা বাস করিতে পারি, অথবা আমাদের মহত্তর অধ্যাত্ম সত্তায় বাস করিতে পারি। এই যে মহান প্রভেদ, প্রথমতঃ ইহারই উপরে গীতার কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত। কেমন করিয়া জীব তাহার বর্ত্তমান প্রাকৃত সত্তার বন্ধন ও অপূর্ণতা-সকল হইতে মুক্ত হইয়া অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিবে,—এইটিই প্রশ্ন এবং গীতা ইহারই সমাধানের পথ দেখাইয়াছে। আমাদের প্রাকৃত জীবনে আমাদের প্রথম ও প্রধান তত্ত্ব হইতেছে এই যে, আমরা জড় প্রকৃতির রূপ-সকলের অধীন, বস্তু-সকলের বাহ্য স্পর্শের অধীন। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ইহারা আমাদের প্রাণের নিকট উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত হয়, বাসনা করে, আসক্ত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা করে। মন তাহার সংবেদন, প্রতিক্রিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়গণের এই ক্রিয়ারই অনুসরণ করে এবং বুদ্ধিও মনের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নিজকে ইন্দ্রিয়গত জীবনের মধ্যেই ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে জীব সম্পূর্ণভাবে বাহ্য রূপের অধীন হইয়া পড়ে। বাহ্য জগৎ আমাদের উপর যে ভাবে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে এই সবের ঊর্দ্ধে বা বাহিরে যাইতে সমর্থ হয় না। সে সমর্থ হয় না তাহার কারণ সে নিজকে অহং ভাবের বশে প্রাকৃত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি বলিয়া মনে করে, নিজকে জগতের অন্য সকল বস্তু ও ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া দেখে, এবং নানাভাবে এই স্বতন্ত্র অহং সত্তার তৃপ্তি সন্ধান করে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকা বা স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, এমন কি সমগ্র মানবজাতির সহিত নিজদিগকে এক করিতে পারি, তথাপি তাহা হয় আমাদের অহংয়েরই বৃহত্তর রূপ, এবং আমাদের সকল কর্ম্মের এবং জীবনের মূলনীতি থাকে আমরা যাহাকে অহং বলিয়া মনে করি তাহারই বাসনা কামনার তৃপ্তি। এই যে অহং ও বাসনাকে আমরা আমাদের

জীবনের কেন্দ্র করি, ইহারা বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া, সবই হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া। তমোগুণ প্রধান হইলে আমরা গতানুগতিক ভাবে সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করি, কোনরূপ বৃহত্তর প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। রজোগুণ প্রধান হইলে আমরা অস্থিরভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, এবং প্রকৃতিকে ধরিয়া নানাভাবে আমাদের বাসনা কামনা তৃপ্তির প্রয়াস করি, কিন্তু দেখিতে পাই না যে, এখানে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা প্রভুত্ব কিছুই নাই, কারণ আমাদের মধ্যে ঐ সব বাসনা কামনা প্রকৃতিরই ক্রিয়া, প্রকৃতিই আমাদিগকে অহংভাবের দ্বারা অন্ধ করিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত করে, "চোখ-ঢাকা বলদের মত"। সত্বগুণ প্রধান হইলে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, আমরা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনকে চালিত করিতে চাই, নীচ বাসনা কামনাকে সংযত করিয়া সত্য শিব বা সুন্দরের কোন আদর্শ অনুসরণ করি। কিন্তু তখনও আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য, বাহ্য রূপেরই অধীন থাকে, ঐ সকল আদর্শ হয় আমাদের অহংভাবেরই বিভিন্ন রূপ এবং শেষ পর্য্যন্ত সে সবে আমরা স্থায়ী তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তখনও আমরা অবশ হইয়া যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় এক মহত্তর শক্তির দ্বারা চালিত হই, সে শক্তি আমাদের অহংভাবের ভিতর দিয়া কার্য্য করে, কিন্তু তাহাকে আমরা জানি না, তাহার সহিত আমরা সজ্ঞানে যুক্ত হইতে পারি না। তখনও আমাদের মুক্তি নাই, স্বাধীনতা নাই।

অথচ মুক্তিলাভ সম্ভব। তাহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বাহ্য জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে ক্রিয়া করিতেছে তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের মধ্যেই ফিরিয়া আসা, অর্থাৎ আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্য বিষয় ধরিবার জন্য ধাবিত হয় তাহাদের সেই বেগকে সংযত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা, ইন্দ্রিয়গণ যে-সকল বস্তুর জন্য লালায়িত হয় সে-সব না পাইলেও কোন রূপ অভাব বোধ না করা—ইহা হইতেছে অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন, কেবল তখনই আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদের মধ্যে এক জীবাত্মা রহিয়াছে। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে মনে যে-সব বিকারের উদ্ভব হয় সে-সব হইতে সে আত্মা স্বতন্ত্র সত্তা, সে আত্মা তাহার গভীরতায় হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ, অক্ষর, স্থির, আত্ম-জয়ী, মহিমময়, শান্ত ও মহান। সে নিজেই নিজের অধীশ্বর, আমাদের বাহ্য প্রকৃতির

বিক্ষোভ তাহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বাসনার বশ ততক্ষণ ইহা সম্ভব নহে। কারণ আমাদের বাহ্য প্রাকৃত জীবনের মূল নীতিই হইতেছে বাসনা কামনা; ইহা ইন্দ্রিয়গত জীবনেই পরিতুষ্ট, ইহার অধিক আর কিছুই সে জানে না। অতএব আমাদিগকে বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে, তখন আমাদের প্রাকৃত সত্তার সেই বেগ বিনষ্ট হইলে তাহার ফল স্বরূপ আমাদের মনের বিক্ষোভসকল শান্ত হইবে, লাভ লোকসানের, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়ের হর্ষ ব্যথা, বাহ্য স্পর্শে রাগ দ্বেষ—এই সব দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা শান্ত সমতার অধিকারী হইব। আর যেহেতু তখনও আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে এবং যেহেতু আমাদের স্বভাবই হইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্ম করা, আমাদিগকে সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। নতুবা কামনা এবং তাহার সকল পরিণাম থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কর্ম্মীর এই স্বভাব কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে? আমাদের অহং ও ব্যক্তিগত সত্তাকে কর্ম্মসকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে, বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এ-সব কেবল প্রকৃতির গুণত্রয়ের খেলা, এই খেলা হইতে আমাদের অন্তরাত্মাকে পৃথক করিতে হইবে, সেই আত্মা প্রথমতঃ সাক্ষীভাবে প্রকৃতির কর্ম্মসমূহ অবলোকন করিবে, এবং ঐ সকল কর্ম্মের পশ্চাতে বস্তুতঃ যে মহান শক্তি রহিয়াছে—প্রকৃতিস্থ সেই সত্তা আমাদের অপেক্ষা মহত্তর, তাহা আমাদের ব্যক্তিক সত্তা নহে, তাহা এই বিশ্বের অধীশ্বর—তাহাকেই ঐ সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু চঞ্চল মন কি ইহা করিতে দিবে? তাহার স্বভাবই হইতেছে ইন্দ্রিয়-সকলের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া এবং বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকেও নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাওয়া। তাহা হইলে আমাদিগকে শিখিতে হইবে মনকে শান্ত ও স্থির করিতে। আমাদিগকে এমন পূর্ণতম শান্তি ও নীরবতা লাভ করিতে হইবে যাহাতে অবস্থিত হইয়া আমরা আমাদের অন্তরস্থিত শান্ত, অচল, আনন্দময় আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিব, সে-আত্মা বাহ্য বস্তু সকলের স্পর্শে চির-অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত, তাহা নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ, নিজেতেই তাহার অনন্ত তৃপ্তি।

আমাদের ভিতরে আত্মা যখন প্রকাশিত হয়, আমরা যখন ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব করি, তখন আমরা ঐ আত্মাতেই পরিণত হইতে পারি,

আমাদের সত্তার প্রতিষ্ঠাকে নীচের প্রকৃতি হইতে তুলিয়া পুনরায় ঐ আত্মার মধ্যে লইতে পারি। আমাদের আত্মায় যে স্ব-প্রতিষ্ঠ আত্মার সহিত আমরা এক হই তাহার মধ্যেই আমরা সর্ব্বভূতকে দেখি, এবং সর্ব্বভূতের মধ্যেই ঐ এক আত্মাকে দেখি, আমরা আধ্যাত্মিক সত্তায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হই। এই অহঙ্কারশূন্য শান্তি ও নির্ব্যক্তিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম আর আমাদের থাকে না, তাহা আর আমাদিগকে বন্ধন করে না, প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে বিচলিত করে না। প্রকৃতি ও তাহার গুণসকল তাহার কর্ম্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখলেশশূন্য স্ব-প্রতিষ্ঠ শান্তির হানি করিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্ব্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—অহং ইমং অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন—এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যদেবকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু ইক্ষ্বাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা

ইমং। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যে যোগকে আদি ও প্রাচীন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আচার্য্য শঙ্করের অনুসরণে অনেকেই ইহাকে সন্ন্যাসমূলক জ্ঞানযোগ বলিয়াছেন, জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ স সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগোপায়ঃ। কর্ম্মযোগ এই জ্ঞানলাভের গৌণ উপায় মাত্র। কিন্তু পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে যে যোগ বর্ণিত হইয়াছে, ইমং যোগং বলিতে শ্রীকৃষ্ণ সেইটিকেই লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেইটি কেবল সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ নহে, সেইটি হইতেছে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণযোগ। এতক্ষণ গুরু কেবল এই পূর্ণ যোগের কর্ম্ম-অংশের উপরেই জোর দিয়াছেন এবং তাহার সহিত বুদ্ধি বা জ্ঞানের সমন্বয় করিয়াছেন, ভক্তির কেবল ইঙ্গিত করা হইয়াছে, পরে এই সকল অংশ আরও বিশদভাবে পরিস্ফুট করা হইবে। এই যোগ প্রথমে ক্ষত্রিয় রাজাগণকে কথিত হইয়াছিল, ইহার দ্বারাই বুঝাইতেছে যে ইহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যে-যোগের কথা বলিতেছেন সে যোগে কর্ম্ম এবং জ্ঞান এক হয়, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, সে-যোগে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে,

জ্ঞান কর্ম্মকে সমর্থিত করে, পরিবর্ত্তিত করে, আলোকিত করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত, মানবরূপে অবতীর্ণ, সর্ব্ব জীব সর্ব্ব কর্ম্মের অধীশ্বর পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়।

বিবস্বতে যোগং—পাছে শিষ্যের মনে সংশয় হয় যে, এই যোগ একটা নূতন বা কৃত্রিম জিনিষ, সেই জন্যই গুরু এখানে ইহার পরম্পরা উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, ইহা অতি পুরাতন জিনিষ, ইহা কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই পরিকল্পিত হয় নাই, ইহার দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে এবং ইহা পরম পুরুষার্থের সাধক। এখানে যে পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, অর্জ্জুন কেবল তাহার বাহ্যিক স্থূল অর্থটিই গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাতেই গুরুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহার এক নিগূঢ় অর্থও করা যাইতে পারে। বিশ্ব জগতের দুইটি বিভাগ আছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিন লইয়া উর্দ্ধের দিব্য জগৎ, পরার্দ্ধ; এবং মন, প্রাণ দেহ এই তিন লইয়া নীচের মর জগৎ, অপরার্দ্ধ। এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রূপে রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতেই সকল জ্ঞান মনোজগতে মানবের মধ্যে নামিয়া আসিতেছে। এই বিজ্ঞানই সত্য সূর্য্য, আমাদের মধ্যে ইহা মায়া দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। ভগবানের সত্তার মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে বিজ্ঞান সূর্য্যের ভিতর দিয়া তাহাই মরজগতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহাই স্থূলভাবে বলা হইল যে, ভগবান এই জ্ঞান বিবস্বান সূর্য্যকে দিয়াছিলেন, সূর্য্য মানবপিতা মনুকে দিয়াছিলেন, মনু হইতেই ইহা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

প্রোক্তবানহমব্যয়ম্—এই যে যোগ ইহা অব্যয় অর্থাৎ নিত্য ও অবিনাশী। ইহা যে কুরুক্ষেত্রেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে। বেদে যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, গীতায় তাহারই সমাপ্তি ও সার সঙ্কলন হইয়াছে, যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ (শঙ্কর)। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানই গীতায় বেদের চরম ভাষ্য করিয়া দিয়াছেন। এই যোগ কল্পে কল্পে প্রকাশিত হয়, লোক সমূহকে অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, আবার কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। মহাভারতে ইহাকে নারায়ণীয় ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, শাশ্বত ধর্ম্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গীতায় ভগবানকে বলা হইয়াছে শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। প্রতি কল্পে এই ধর্ম্ম কি ভাবে প্রচারিত

হইয়াছে মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় উপাখ্যানে তাহার সবিস্তার বর্ণনা আছে এবং তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কল্পে ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে উহা বিবস্বান-মনু-ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে—

ত্রেতা যুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ॥
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যন্তি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ॥

"ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান্ মনুকে (এই ধর্ম্ম) দেন, মনু লোকধারণার্থ ইহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন, এবং ইক্ষ্বাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত হইয়াছে। হে রাজা! সৃষ্টির ক্ষয় হইলে ইহা আবার নারায়ণের নিকট চলিয়া যাইবে।"

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ—পুরাণশাস্ত্রমতে সূর্য্যের পুত্র মনু। বিজ্ঞানই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। মনু হইতেছেন ভগবানের মানস রূপ, সকল মানুষ তাহা হইতেই জাত। দেহ ও প্রাণের মধ্যে মনের প্রকাশ, ইহাই মানুষ। দেহ প্রাণ মনের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকে ধরিয়া রহিয়াছে, গুপ্তভাবে সুব্যবস্থিত করিতেছে বিজ্ঞান। বেদে এই বিজ্ঞানকেই বলা হইয়াছে সত্যং ঋতং বৃহৎ।

মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ—ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশের প্রবর্ত্তক আদি রাজা। এই ইক্ষ্বাকু কুলেই দিলীপ, রঘু ও ভগবান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগ ও তপস্যায় যে কুল মহৎ তাহাই ভগবানের অবতার গ্রহণের যোগ্য কুল।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

অন্বয়—হে পরন্তপ! এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ।

অনুবাদ। এইরূপ পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগ বিদিত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘ কালের বশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্—যোগ সম্বন্ধে এখানে কেবল ক্ষত্রিয় পরম্পরাই উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের কোনই উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে-কালে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা, যোগ বা অধ্যাত্ম সাধনা কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাদের সহিত ক্ষত্রিয়েরাও অন্ততঃ সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিত। বর্ণবিভাগ বলিতে আজকাল লোকে যেমন কড়াকড়ি প্রভেদ বুঝে বস্তুতঃ সেকালে সেরূপ কিছুই ছিল না। জীবনের মূল প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্মে সকল শ্রেণীরই অধিকার ছিল, কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গভীরতম জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন। কড়াকড়ি অর্থহীন জাতিভেদের দ্বারা বর্ত্তমানে সমাজের যে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, প্রাচীনকালে এইরূপ স্বাধীনতা থাকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বর্ণবিভাগের দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট হইত না। গীতা বলিয়াছে, ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ উচ্চতম অধ্যাত্ম সাধনার যোগ্যতর অধিকারী হইলেও স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ যে-কেহ ঐকান্তিকভাবে ভজনা করিবে সে-ই পরমগতি লাভ করিবে (৯।৩২, ৩৩)। প্রাণহীন সমাজের কঠোর বিধানে লোকে গীতার এই উদার শিক্ষা ভুলিয়াছে।

ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ—ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা, যাঁহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অধ্যাত্ম অনুভূতি উপলব্ধি আছে, যাঁহারা শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা সত্যের সন্ধান করেন না, পরন্তু সাধনার দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে সত্যকে দর্শন করেন এবং সেই সত্য অনুসরণে নিজেদের জীবনকে গড়িয়া তোলেন, তাঁহারাই ঋষি। তাঁহারা প্রচলিত শাস্ত্রবিধি বা লোকাচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ নহেন, পরন্তু তাঁহাদের কথাতেই নূতন নূতন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, সমাজে নূতন বিধান, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। বেদ, উপনিষদের সত্যসকল এই সব ঋষিদের অন্তরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা সমাজের জন্য যে-সব বিধি বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, সে-সব এই ঋষিদের নামেই প্রচারিত করিয়াছেন*। প্রাচীন যুগে ঋষিদের খুবই প্রভাব ও প্রাধান্য

* ভগবান এখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, মনু কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব বর্ত্তমানে মনুসংহিতা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা বস্তুতঃ মনু কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই।

ছিল, রাজারাও তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন,তাঁহাদের নিকট হইতে রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিতেন। ভারতীয় মনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে এই যে, তাহা সকল জিনিষেরই একটা আধ্যাত্মিক অর্থ দিতে চাহিয়াছে; সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যাপার-সকলকেও ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছে। ভারতের ঋষিগণই ভারতের মন, ভারতের জাতীয় মনীষার উপর এই স্থায়ী ছাপ দিয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ সকল বর্ণ, সকল শ্রেণী হইতে এমন কি অন্ত্যজ জাতির মধ্য হইতেও আবির্ভূত হইতেন।

যাঁহারা রাজা হইয়াও ঋষি, ঋষি হইয়াও রাজা, গীতায় সেই রাজর্ষিগণকেই আদর্শ যোগী বলা হইয়াছে। তাঁহাদের শক্তি আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা জ্ঞানে মহান, কর্ম্মেও মহান। আমাদের দেশে এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এমন অনেকেই রহিয়াছেন, যাঁহারা যোগ বা অধ্যাত্ম সাধনার নাম শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ধারণা অধ্যাত্ম সাধনা মানুষকে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া যায়; তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের যাহাই লাভ হউক, জগতের তাহাতে কোন হিতই সাধিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই সম্প্রদায়েরই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

বিশ্ব যদি ফিরে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে?

কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার যাহা প্রকৃত আদর্শ তাহা মানুষকে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লয় না। যোগী ঋষিরা সাক্ষাৎ ভাবে সংসারের কর্ম্মে লিপ্ত না হইলেও, নীরব অধ্যাত্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন করেন। সাক্ষাৎ ভাবেও তাঁহারা জনসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তবে আজকাল লোকে কর্ম্ম বলিতেই যে বাহ্যিক আড়ম্বর, চীৎকার, হৈ চৈ বুঝে, যোগী ঋষিদের কর্ম্মধারা তাহা হইতে বিভিন্ন। স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দ কর্ম্মযোগীর আদর্শ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমাদের নেতাদের, আমাদের কর্ম্মীদের, উভয়েরই একটা গভীরতর সাধনার প্রয়োজন,—যে ভগবান আমাদের অভিযানের গুরু ও কর্ণধার তাঁহার সহিত আরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, ভিতরে আমাদিগকে উন্নত হইতে হইবে,

আমাদের চিন্তার ও কর্ম্মের পিছনে আরও প্রবল আরও দুর্ণিবার শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বার বার ঠেকিয়া আমরা শিখিয়াছি, ইউরোপের মত আস্তিক্যবুদ্ধিশূন্য অশুদ্ধ উত্তেজনার শক্তিতে আমাদের জয় হইবে না। আমরা ভারত-সন্তান—আমাদিগকে মুক্তি দিবে, মহৎ করিবে ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের সাধনা, 'তপস্যা', 'জ্ঞান', 'শক্তি'। আর এইগুলি ইউরোপের discipline, philosophy, strength অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ। তপস্যা discipline অপেক্ষা মহত্তর ; যে ভগবৎ শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঘটিতেছে তাহাকে অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা আমাদের নিজেদের মধ্যে মূর্ত্ত ও বাস্তব করিয়া তোলাই তপস্যা। জ্ঞান philosophy অপেক্ষা মহত্তর ; প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ, তাহা হইতে যে দিব্যজ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করা যায় তাহাই জ্ঞান। শক্তি strength অপেক্ষা মহত্তর ; যে বিশ্বব্যাপী শক্তি গ্রহণক্ষত্রকে চালাইতেছে, ব্যষ্টির মধ্যে তাহার প্রকাশই শক্তি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যিনি নেতৃত্ব করিবেন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে কিম্বা তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধ যোগী। একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে, কাভুরের সহিত ম্যাট্সিনীকেও মিশিয়া যাইতে হইবে।" ইহাই কর্ম্মযোগীর আদর্শ ; ভারতের নিমি, জনক, কৈকেয় প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ছিলেন ইহারই সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

স কালেনেহ মহতা—মানুষকে তাহার লক্ষ্যে, পুরুষার্থে, লইয়া যাইবার জন্য এক শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, কোন বিশেষ যুগের বা দেশের কোন বিশেষ শাস্ত্রে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নিবদ্ধ আছে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরাণ—কোন শাস্ত্র সম্বন্ধেই এ-কথা বলা চলে না। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, মুশা, ঈশা, শ্রীচৈতন্য কাহারও সম্বন্ধেই ইহা বলা যায় না যে, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতেই সব সত্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, আর কিছুই সন্ধান করিবার, জানিবার, ব্যক্ত করিবার নাই। তাহা ছাড়া কালক্রমে মানুষের মতি গতির, মানসিক শক্তি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এক কালের লোক যে শাস্ত্র বুঝিত, যে শিক্ষা ও আদর্শকে অনুসরণ করিয়া কল্যাণমার্গে অগ্রসর হইত, অন্য কালের লোক তাহা আর সে ভাবে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে না। এক কালে যাহা জীবন যাত্রায় পথ নির্দ্দেশের কল্যাণময় নীতি ছিল, অন্য কালে

তাহাই প্রাণহীন লোকাচারে পরিণত হয়, লোকে আর তাহার মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করে, তাহার উপর প্রকৃত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকায় তাহার দ্বারা ইহকাল পরকাল কিছুই হয় না, ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ। এই জন্যই যুগে যুগে নূতন সত্যদ্রষ্টার প্রয়োজন হয়। তিনি নিজের সাধনা দ্বারা সনাতন সত্যকে নূতন ভাবে আবিষ্কৃত করিয়া দেশ ও কালের উপযোগিতা অনুসারে প্রচার করেন। বৈদিক ধর্ম্ম লোকাচারে পরিণত হইল, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন তাঁহার অষ্টাঙ্গমার্গের নূতন বিধান এবং নির্ব্বাণের আদর্শ লইয়া। মুশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক সদাচারের বিধান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া নিন্দিত হইল, উহা গতানুগতিক লোকাচার মাত্র হইয়া দাঁড়াইল, তখন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিল, জীবনের যে দিব্য বিধান উহার লক্ষ্য ছিল সেইটিকে আত্মার গভীরতর ও প্রশস্ততর জ্যোতি ও শক্তিতে সার্থক করিতে চাহিল। আর মানুষেব অনুসন্ধান ঐ খানেই থামিয়া যায় নাই, পরন্তু এই সকল বিধানকেও পরিহার করিয়াছে, যে-সত্যকে সে এককালে বর্জ্জন করিয়াছিল তাহাতেই ফিরিয়া গিয়াছে অথবা কোন নূতন সত্য ও শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সকল সময়ে সে একটি জিনিষই সন্ধান করিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধির নীতি, তাহার যথাযথ জীবন যাপনের বিধান, তাহার উচ্চতম ও মূলগত আত্মা ও প্রকৃতি।

যোগো নষ্টঃ পরন্তপ—"পর" বলিতে শত্রুপক্ষকেই বুঝায়, যে ব্যক্তি স্বীয় শৌর্য্য তেজ ও প্রতাপ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে তাপিত করেন, তাঁহাকেই পরন্তপ কহা যায়। এই শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়কেই বুঝায়। গীতা শম দম জ্ঞান ইত্যাদির জন্য ব্রাহ্মণকে উচ্চস্থান দিলেও ক্ষত্রিয় বীবকেই যোগের প্রকৃষ্ট পাত্র বিবেচনা করিয়াছে এবং যোগের পরম্পরা বর্ণনায় ব্রাহ্মণদের কোন উল্লেখই করে নাই। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিখ্যাত ভাষ্যে গীতার এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণকে যোগ জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে, যোগবলে বলবান হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের দ্বারা পরিরক্ষিত হইলে সকল সংসার রক্ষা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু শঙ্করের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা সমাজে নিজেদের প্রাধান্য চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন,

সমাজের এবং অন্যান্য স্তরের লোককে নিজেদের স্তরে তুলিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংসার রক্ষা পায় নাই, সমস্ত ভারতের অধঃপতনের সহিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরও চূড়ান্ত অধঃপতন হইয়াছে। গীতা বস্তুতঃ সমাজে এইরূপ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিবার কথা বলে নাই, গীতা সাম্যেরই আদর্শ প্রচার করিয়াছে। গীতা তৎকালীন সামাজিক বর্ণবিভাগের উল্লেখ করিলেও বাহ্যিক ভেদের উপর জোর দেয় নাই, বা নির্ভর করে নাই, পরন্তু আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেই জোর দিয়াছে। যাঁহারা বীর, কর্ম্মী, ভিতরে বাহিরে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহারা সর্ব্বদা অপরাঙ্মুখ, তাঁহারা যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়, এবং গীতোক্ত যোগ সাধনার উপযুক্ত পাত্র; অর্জ্জুনকে "পরন্তপ" বলিয়া সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে। লোকে যখন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে, অধ্যাত্ম জীবন, অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে ভুল ধারণা লইয়া কর্ম্মে বিরত হয়, যুদ্ধে বিরত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ তামসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তখনই উপযুক্ত আধার না পাইয়া সংসার হইতে যোগ সাধনা, যোগ শক্তি অদৃশ্য হইয়া যায়।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌॥ ৩

অন্বয়—[ত্বং] মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (তদ্ধেতোঃ) অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ এব ; এতৎ হি উত্তমং রহস্যম্‌।

অনুবাদ। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এইজন্য এই সেই পুরাতন যোগ আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম ; ইহাই উত্তম রহস্য।

ব্যাখ্যা

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য—আজকাল অনেকেই মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন কালের স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করিতে চান, এবং ইহার জন্য তাঁহারা গীতাকে প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, গীতা শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। কিন্তু গীতা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে শাস্ত্র অনুসরণ করিবার কথা বলিলেও কোন বিশেষ শাস্ত্রের নাম

উল্লেখ করে নাই। এমন কি বেদ উপনিষদের ন্যায় শ্রুতি-শাস্ত্র সম্বন্ধেও গীতা বলিয়াছে যে, নানা পাঠ, ভাষ্য ও টীকার জন্য উহা দ্বারা মানুষের চিত্ত বিভ্রান্ত হইতে পারে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না। সকল শাস্ত্র হইতেই জীবনে ও অধ্যাত্ম-সাধনায় কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই সাহায্য ঠিক মত পাইতে হইলে কেবল প্রাচীন পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। গীতার সময়েও বেদ উপনিষদ ও নানা দর্শন-শাস্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচলিত ছিল এবং অর্জ্জুন সে-সব শাস্ত্রে বেশই অভিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই সব শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে না বলিয়া, নিজে তাঁহার নিকট নূতন ভাবে যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নিজের সেই শিক্ষাকেই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেদ উপনিষদের সহিত মূলতঃ গীতার কোন বিরোধ নাই, তথাপি গীতা একই কথাকে নূতন ভাবে বলিয়াছে, আবার গীতার মধ্যে এমন তত্ত্বও আছে বেদ উপনিষদের মধ্যে যাহার সন্ধান মিলিবে না। আমাদের নিকট গীতাও বহু পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, গীতা হইতে জীবনে ও সাধনায় অনেক ইঙ্গিত পাইলেও ইহার মধ্যেই আমাদের আর বদ্ধ হইয়া থাকা চলিবে না। সেই এক সনাতন সত্যকে আজ আবার আমাদিগকে নূতন করিয়া দেখিতে হইবে, নূতন করিয়া পাইতে হইবে, এবং তাহার জন্য গীতা হইতে আমরা যে সাহায্য পাইব, ইঙ্গিত পাইব, কেবলমাত্র তাহাতেই এখন গীতা পাঠের সার্থকতা।

বেদ বা উপনিষদ, গীতা বা তন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আমাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হইবে না। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "We do not belong to the past dawns, but to the noons of the future," আমরা অতীত উষার নহি, আমরা অনাগত মধ্যাহ্নের। কত নূতন স্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। শুধু ভারতের নহে, জগতের মহান ধর্ম্মগুলি হইতে আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের অনুসন্ধিৎসার ফলে যে-সকল শক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে সে-গুলিরও পূর্ণ সুযোগ আমাদিগকে লইতে হইবে। পুরাতন, অতি পুরাতন যুগের কত গুপ্ত রহস্য নূতন আলোকে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা আর এক মহান, অতি মহান সমন্বয়ের সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্তু

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যেমন শেষের সমন্বয়কে ভিত্তি করিয়াই নূতন বৃহত্তর সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবারও সেইরূপ আমাদিগকে ভবিষ্যতের অভূতপূর্ব্ব বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিত্তি করিতে হইবে, গীতা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই যোগ তিনিই যে এখন নূতন আবিষ্কার করিতেছেন তাহা নহে, উহা এক রাজর্ষির নিকট হইতে অন্য রাজর্ষি গ্রহণ করিয়াছেন, এইভাবে উহা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ যখন তাঁহার অষ্টাঙ্গমার্গ এবং নির্ব্বাণের আদর্শ প্রচার করেন, তিনিও বলিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার নবাবিষ্কৃত নহে, উহা হইতেছে আর্য্যগণের জীবনের সত্য ও সনাতন আদর্শ; যাঁহারা জ্ঞানালোক লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের পুনরাবিষ্কার করিয়া জগৎহিতার্থে প্রচার করেন। কার্য্যতঃ ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, একটি আদর্শ, একটি শাশ্বত ধর্ম্ম আছে, সেইটিকে ধর্ম্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং মানুষের মধ্যে আর যে-সব শক্তি সত্য ও পূর্ণতালাভের জন্য প্রয়াস করে, সকলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-জীবনের বিদ্যা ও প্রয়োগনীতির নবতম বিবৃতিতে, নূতন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে।

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের যে সম্বন্ধ, ইহাই ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধের আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভগবান বিশ্বময়, বিশ্বাতীত, অনাদি, অনন্ত, অসীম হইয়াও মানুষের সহিত সকল সম্বন্ধ স্থাপন করেন, মানুষের মত হইয়া মানুষের সহিত ব্যবহার করেন, যে তাহাকে যে ভাবে ভজনা করে, ভগবানও তাঁহাকে সেইভাবে ভজনা করেন,—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ—।

যাহারা ভগবানকে ভালবাসে, ভগবানেই আনন্দ পায়, তাহারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়, এবং এই ভাবে ভগবানের সহিত মধুরতম সম্বন্ধ স্থাপন করাতেই মানব জন্মের, মানব জীবনের পূর্ণতম সার্থকতা। যাহারা এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তাহারাই মানবজীবনের ও বিশ্বজীবনের নিগূঢ়তম আশ্চর্য্যতম রহস্যসকল জানিবার যোগ্য অধিকারী হয়। গীতায় এখানে যে

মধুরভাবের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগের সাধনায় ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল, পুরাণাদিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্—গুরু এখানে যে রহস্যের কথা বলিলেন, গীতায় ইহার নানা ইঙ্গিত দেওয়া হইলেও কোথাও ইহাকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই, ইহা অনেকখানি গুহ্যই রহিয়া গিয়াছে। সাধকগণকে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা এই রহস্যকে নিগূঢ়ভাবে জানিতে হইবে, নিজেদের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আমরা কেবল সেই সাধনার ইঙ্গিত মাত্র পাইতে পারি।

জগৎকে আমরা এখন যাহা দেখিতেছি, ইহা হইতেছে ত্রিগুণের খেলা, জীব ইহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, সংসারের অনিত্য সুখ দুঃখ ভোগ করে। উপনিষদের ভাষায় এই জীবন মৃত্যু বলিয়াই অভিহিত, ইহার ঊর্দ্ধে অমৃতত্বের সন্ধান করিতে হইবে, গীতাও বলিয়াছে, মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। এই যে জীব মৃত্যু-রূপ সংসারে বদ্ধ হয়, সে ভগবানেরই অংশ। সে এই ত্রিগুণময়ী মায়ার খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে, নীরব, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর পুরুষের অনন্ত শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মুক্তি বা নির্ব্বাণ বলিতে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। কিন্তু গীতা ইহা অপেক্ষাও উত্তম রহস্যের সন্ধান দিয়াছে। জীব ত্রিগুণের উপর উঠিয়া, সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও কর্ম্ম করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন পুরুষোত্তমের উপাসনা করা, সকল জীবন ও কর্ম্ম যজ্ঞরূপে পুরুষোত্তমে উৎসর্গ করিয়া তাঁহারই ভাব লাভ করা, মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, এই ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে ভগবানের যে নিজস্ব প্রকৃতি, স্বাং প্রকৃতিং, রহিয়াছে তাহার মধ্যে দিব্য নবজন্ম লাভ করা। মানুষ যে এইভাবে দিব্য সিদ্ধি ও দেবত্ব লাভ করিতে পারে, বৈদিক ঋষিগণ তাহার সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ইহা পিছনে পড়িয়া যায়। গীতা আবার ইহাকে মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছে, এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সাধনায় ইহাই প্রধান স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। মানুষ কেমন করিয়া তাহার প্রকৃতির বিকাশ করিয়া এই জড় দেহেই দিব্য জন্ম লাভ করিতে পারে তাহাই নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবার জন্য ভগবান মানবদেহে অবতীর্ণ হন। ইহাই গীতোক্ত উত্তমম্ রহস্যম্।

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং, ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথম্ বিজানীয়াম্।

অনুবাদ—অর্জ্জুনঃ বলিলেন, আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম বহু পূর্ব্বে, সুতরাং আপনি যে পূর্ব্বে তাঁহাকে ইহা বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?

ব্যাখ্যা

অপরং ভবতো জন্ম—অর্জ্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবতনয়-রূপে জন্মের কথা বলিতেছেন। সে জন্ম অল্প দিনের কিন্তু বিবস্বানের জন্ম সৃষ্টির আদিতে হইয়াছে। অতএব বাসুদেব-দেহে সূর্য্যকে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অর্জ্জুন কি জানিতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান? প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়াই জানিতেন। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভগবান যাহা বলিবেন তাহা মিথ্যা এইরূপ ধারণা কাহারও না হউক সেই জন্যই অর্জ্জুন এখানে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া জানিতে চাহিলেন। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া চিনিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিপ্রভবাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরম্॥

কিন্তু অবতার রূপে ভগবান যে-ভাবে নিজকে মানবদেহের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন তাহাতে সাধারণের পক্ষে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানা সম্ভব নহে। কোনও প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া দিলেও লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না যে, তাহাদেরই ন্যায় একটি মানুষের শরীরে ভগবান রহিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

—"মোহপ্রাপ্ত মানবগণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।"

গীতায় অর্জ্জুনের কথা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারেন নাই,—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ১১।৪১

অবতারের কর্ম্মের ধারাই এইরূপ। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ যে মহান কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, "ঐ কর্ম্ম যখন স্বভাবনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্ম্মের কর্ত্তাগণ শত্রুহস্তে নির্য্যাতিত হইয়া এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ জয়ের জন্য তৈয়ারী হইতেছে—অবতার তখন অদৃশ্য, কখনও কেবল সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য দেখা দিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাও এরূপ ভাবে যে, প্রত্যেকে আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়াছে। এমন কি তাঁহার প্রিয়তম সখা ও প্রধান যন্ত্র অর্জ্জুনও নিজেকে যন্ত্রমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হইতে উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এমন কি তাঁহার ভগবদ্‌স্বরূপ না বুঝিয়াও তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছেন। কিন্তু অন্য সকলের ন্যায় তিনি নিজের অহঙ্কারের বশেই চলিয়াছেন, অজ্ঞানীকে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, পরিচালন করা হয়, অর্জ্জুনকে সেইরূপই করা হইয়াছে এবং তিনিও অজ্ঞানভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। যতক্ষণ না সব আসিয়া কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারথিরূপে (তখনও যোদ্ধারূপে নহে) ঐ যুদ্ধের নায়কের রথে না নামিলেন ততক্ষণ তিনি তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের নিকটও আত্মপ্রকাশ করেন নাই।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন আত্মগোপন করিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, ভগবান তেমনই আমাদের প্রত্যেকের দেহরথে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, সান্ত্বনা দিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন—মাঝে মাঝে বিজুলি চমকের মত তাঁহার কিছু আভাস আমরা পাই, কিন্তু আবার

তখনই ভুলিয়া যাই, আমাদের চিরসাথী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও দেখি না, চিনিয়াও চিনি না। মনে করি, আমরা বুঝি নিজেদের বুদ্ধিতেই, নিজেদের শক্তিতেই সব করিতেছি—মনে করি, ভগবান কত দূরে, হয়ত বা তাঁহার কোন অস্তিত্বই নাই, এ সংসারে আমরা অতি নিরাশ্রয়, নিরুপায়। শেষে একদিন আসে যখন এই রহস্যের সম্মুখে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

পরং জন্ম বিবস্বতঃ—সৃষ্টির আদিতেই যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিবস্বান তাঁহাদের মধ্যে একজন। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারিতেন যে, তিনি মানবদেহে এই জ্ঞান বিবস্বানকে প্রদান করেন নাই, তিনি সকল জ্ঞানের উৎস ভগবান রূপেই সূর্য্যকে এই বাণী দিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব তাঁহার জ্ঞানের রূপ, সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আলোকের প্রদাতা, ভর্গো সবিতুঃ দেবস্য ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। কিন্তু এইরূপ উত্তর না দিয়া তিনি অর্জ্জুনের প্রশ্নের সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অবতারতত্ত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজেকে দিব্য কর্ম্মীর আদর্শ দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করিয়া শিষ্যকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন যে, তিনি মানবরূপী ভগবান, তিনি অবতার।

কথমেতদ্ বিজানীয়াং—এই প্রশ্নে অর্জ্জুনের কর্ম্মী প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যবংশের আদিপুরুষকে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা কোন চিন্তাশীল বা জ্ঞানীব্যক্তির নিকট অসম্ভব না হইতে পারিত; ইহার অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে, তিনি তাহার কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু অত সূক্ষ্মচিন্তা বা বিশ্লেষণ করা অর্জ্জুনের প্রকৃতি নহে, সূর্য্যবংশের আদিপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া উপদেশ দিলেন ইহা তাঁহার বুদ্ধিগম্য হইল না। হিন্দুদের মধ্যে জন্মান্তরে বিশ্বাস বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোন পূর্ব্বজন্মে বিবস্বানকে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন ইহা সম্ভব হইলেও, সে-কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে রহিল কেমন করিয়া? কারণ জন্মান্তরকৃত কার্য্যবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভব নহে। অর্জ্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন তাহা হইলে এইরূপ প্রশ্নের কোন সার্থকতাই থাকিত না।

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ; হে পরন্তপ! ত্বং ন বেত্থ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে সকল জানি; হে পরন্তপ! তুমি জান না।

ব্যাখ্যা

বহূনি মে ব্যতীতানি—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহার ও অর্জ্জুনের ইতিপূর্ব্বে বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে। পুনর্জ্জন্মবাদ মানবজাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। গ্রীক ভাষায় ইহার নাম metempsychosis, আধুনিক ভাষায় ইহাকে reincarnation বলা হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, সংস্কৃত পুনর্জ্জন্ম শব্দের দ্বারাই তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আধুনিক মনের নিকট পুনর্জ্জন্ম কেবল একটা থিয়রি (theory) মাত্র, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই; কিন্তু তেমনি ইহার অসত্যতাও প্রমাণিত হয় নাই। কারণ বিজ্ঞান আত্মার পূর্ব্ব জীবন বা পর জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, বস্তুতঃ আত্মা সম্বন্ধেই কিছু জানে না, জানিতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতেছে ইন্দ্রিয়-গোচর জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইহা কেবল পেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী, ভ্রূণ, ভ্রূণের গঠন ও বিকাশ এই সবেরই জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে। এই সবের অতীত কোন অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম বস্তু আছে কিনা তাহা বলিবার কোন পদ্ধতি বিজ্ঞানের নাই। আর আধুনিক সমালোচনামূলক অনুসন্ধানও এই বিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারে না। কারণ ইহা কেবল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু এই সব তথ্য হইতে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইবার কোন উপায়ই নাই। সেই জন্য আজ যে সিদ্ধান্ত হইতেছে দুইদিন পরে তাহা বর্জ্জিত হইতেছে, তাহার

স্থলে অন্য সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইতেছে। কোন ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সংশয় হইলে তাহার নিরসন করিবার কোনও উপায় ইহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কেহ কখনও সত্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, এক শতাব্দী ধরিয়া গবেষণা করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ইহার দ্বারা কি মীমাংসা হইবে? পুনর্জ্জন্মের প্রমাণ-সকল হইতেছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক, কিন্তু বিজ্ঞান ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধান (modern criticism) কেবল স্থূল, ভৌতিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

পুনর্জ্জন্মের পক্ষে বা বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে-সব প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়, সেগুলি কোন কাজেরই নহে, আর খুব ভাল হইলেও তাহাদের দ্বারা কোনরূপ চরম মীমাংসা হইতে পারে না। পুনর্জ্জন্মের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হইতেছে এই যে, পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে যখন আমাদের কোন স্মৃতিই নাই, তখন পূর্ব্ব জন্ম বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ যুক্তি বালসুলভ। আমাদের এই জন্মেরই সকল কথা কি আমাদের মনে থাকে? আমাদের শৈশবের কোন কথাই আমাদের মনে নাই, ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয় যে কখনও আমাদের শৈশব ছিল না? আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক এই জন্মেরই সকল কথা মনে রাখিতে পারে না, সে পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। পূর্ব্ব জন্ম মনে করিতে হইলে আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সূক্ষ্ম স্মৃতিকে জাগ্রত করিতে হইবে। চণ্ডীতে ইহাকে বলা হইয়াছে মহাস্মৃতি। পুরাণাদিতে জড়ভরত, লীলা, সরস্বতী প্রভৃতি জাতিস্মরের বর্ণনা আছে, তাঁহাদের এইরূপ স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল।

আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহার অন্য রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অতএব ইহার দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ যে-সব সত্যকে আমরা সাধারণতঃ স্বীকার করিয়া লই, তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে বিশিষ্ট সম্ভাবনা মাত্র, moral certitudes, সেগুলি সত্য হওয়া খুবই সম্ভব কিন্তু একেবারে নিঃসংশয় নহে। পৃথিবী আপন কক্ষে ঘুরিতেছে, একথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। অবশ্য পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে এরূপ বিশিষ্ট সম্ভাবনা আমরা প্রমাণের দ্বারা

অবিশ্বাসীকে স্বীকার করাইতে পারি না। পুনর্জন্মের বাহ্যিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ নগণ্য, আর এরূপ প্রমাণ না থাকিলে আজকালকার মানুষকে তাহাতে বিশ্বাস করান যায় না। আমরা কেবল বলিতে পারি যে, পুনর্জন্ম মানিয়া লইলে সমস্ত তথ্যের যেরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, অন্য কোন থিয়রি (theory) দ্বারা সেরূপ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, অনেক সময় মানুষ এমন সব অসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পূর্ব্ব জন্ম না মানিলে তাহাদের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। কিন্তু এখানেও বিজ্ঞান আসিয়া দাবী করিতেছে যে, heredity বা বংশানুক্রমিকতা হইতেই এই সকলের ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমাদের দেহ ও প্রাণের অনেক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রতিভা ও সহজাত মানসিক শক্তির ব্যাখ্যা করিতে বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছে। তথাপি বিজ্ঞান বলিতে পারে যে, এখনও কৃতকার্য্য না হইলেও, ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির দ্বারাই সব ব্যাখ্যাত হইবে, পুনর্জন্ম মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

পুনর্জন্মের সমর্থনে আর এক যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা নৈতিক। সাধারণতঃ যেভাবে এই যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা অতি অপক্ক মনের পরিচায়ক। বলা হয় যে মানুষ এক জন্মে পাপ বা পুণ্য আচরণ করে, এবং তাহার শাস্তি বা পুরস্কার ভোগের জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। সংসারে সচরাচর দেখা যায়, অসৎ লোক সুখভোগ করিতেছে, সৎ লোক কষ্ট পাইতেছে; পুনর্জন্ম না মানিলে বলিতে হয় এ সংসারে সুবিচার নাই, ভগবান নাই। এই যুক্তি অনুসারে কোন ভাল লোককে দুঃখ ভোগ করিতে দেখিলে আমরা বলিতে পারি যে, ইহা তাহার পুর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মের ফল। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে যদি সে পাপী ছিল, তাহা হইলে এ জন্মে সে কেমন করিয়া সহসা পুণ্যবান হইয়া উঠিল? তেমনি কোনও দুষ্ট লোককে সুখ ভোগ করিতে দেখিলে বলিতে হয় যে পূর্ব্ব জন্মে সে খুবই পুণ্যবান ছিল; কিন্তু এ সংসারে পুণ্যকর্ম্মের ব্যর্থতা বুঝিয়াই কি সে এ-জন্মে অন্য পাতা উল্টাইয়াছে? যে-অপরাধ সম্বন্ধে আমার কোন স্মৃতি নাই, তার জন্য যে এ জন্মে আমাকে গুরুতর সাজা দেয়, সে ভগবানকে অন্ততঃ সুবিচারক বলিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ প্রাচীন কালে যে স্বর্গ-নরকের পরিকল্পনা ছিল, পুণ্যবানের পক্ষে

স্বর্গ সুখ, পাপীর জন্য নরক যন্ত্রণা, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি তাহারই প্রকার-ভেদ মাত্র। আজও যে সমাজে অপরাধীকে প্রতিহিংসামূলক বর্ব্বরোচিত শাস্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাও এই মতের অনুযায়ী। এই মতে ভগবানকে মানুষের মত করিয়া দেখা হয়, তিনি যেন পাঠশালার গুরুমশায় বা বিচারকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা, দণ্ডদাতা। মানুষ নিজেকে ভগবানের রূপে গড়িয়া না তুলিয়া ভগবানকেই নিজের রূপে গড়িয়া তোলে। আমাদের মধ্যে এখনও যে শিশু, বর্ব্বর বা পশু রহিয়াছে, এ-পর্য্যন্ত যাহা আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই, এই সব মত তাহারই পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সব বালসুলভ মত বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় গভীর দার্শনিকতা-মূলক ধর্ম্মের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ অতীতের মতামত ও সংস্কার সকলকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়, তাই তাহাদের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের গভীরতর চিন্তাধারার সহিত ঐসব মতকে জুড়িয়া দেয়।

এককালে হয়ত মানুষকে শিক্ষিত ও সভ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই সব মতের কিছু উপযোগিতা ছিল। কিন্তু সে উপযোগিতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। মানুষ স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করিতে থাকে অথচ স্বচ্ছন্দে পাপও করিয়া যায় এবং পাপের ফল এড়াইবার জন্য নানা রকম পন্থার আবিষ্কার করে। বলে,

একবার হরি নামে যত পাপ হরে
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।

এই ভাবে শাস্ত্রবাক্যেও বিশ্বাস করা হয় এবং ইচ্ছামত পাপের মজাও উপভোগ করা যায়। মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে, কাশীতে যাইতে পারিলে, অথবা হরিনাম শুনাইবার কোন লোক থাকিলে, জন্মব্যাপী পাপ সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যায়, বৈকুণ্ঠ হইতে রথ নামিয়া আইসে। শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মানুষ এই সব ছেলে ভুলানো কথাকে অবজ্ঞার সহিত বর্জ্জন করে। বস্তুতঃ মানুষ পুরস্কারের লোভে পুণ্য করিবে এবং শাস্তির ভয়ে পাপ হইতে বিরত হইবে, এইরূপ ধারণা করিলে মানুষের মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, তাহার অবমাননা করা হয়। গীতা সত্যই বলিয়াছে, কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।

পুনর্জন্মবাদের সত্য ভিত্তি হইতেছে আত্মার বিকাশ, the evolution of the soul; আত্মা জড়ের মধ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে, নিজের দিব্য সত্তা সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধদের কর্ম্মবাদের মধ্যে এই সত্যই নিহিত ছিল, কিন্তু তাহারা সেটিকে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই; হিন্দুরা পূর্ব্বে ইহা জানিত, কিন্তু কালক্রমে ইহাকে ঠিকমত প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়। সেই প্রাচীন সত্যকে আজ আবার নূতন ভাবে নূতন ভাষায় বিবৃত করিবার দিন আসিয়াছে। আত্মার ক্রমবিকাশ যদি সত্য হয় তাহা হইলে পুনর্জন্মের যৌক্তিকতা অকাট্য হয়। এই ক্রমবিকাশের অর্থ গতানুগতিক ভাবে পরকালে স্বর্গসুখের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করা নহে; ইহা হইতেছে মানুষের পক্ষে ক্রমশঃ দিব্য জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে বর্দ্ধিত হওয়া। এই সবই হইতেছে প্রকৃত পুণ্য, এবং এই পুণ্য নিজেই নিজের পুরস্কার।

তাহা হইলে সংসারের সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য এ-সব কি? এই সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আত্মার শিক্ষা হয়, পরীক্ষা হয়, ক্রমবিকাশে সাহায্য হয়। অনেক সময়ে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা সৌভাগ্যের দ্বারাই কঠিনতর পরীক্ষা হয়। কবি গাহিয়াছেন,

সম্পদের কোলে বসাইয়া হরি
সুখ দিয়ে একি পরীক্ষে!

বস্তুতঃ অনেক সময় দুঃখ বিপদকেই পুরস্কার বলিয়া গণ্য করা যায় কারণ আত্মা যে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিতে প্রয়াস করিতেছে, এই সব দুঃখ বিপদের দ্বারা তাহাতে বিশেষ সাহায্য হয়, দুঃখের দহনে মানুষ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া উঠে। সুখ সৌভাগ্য, ধন জন, যশ মান, আর্ট, সৌন্দর্য্য, শক্তি, এ-সবও বর্জ্জনীয় নহে, আত্মার বিকাশের ক্ষতি না করিয়া যদি এই সবকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে পার্থিব জীবনে ভগবানের কৃপা-বর্ষণ বলিয়া এই সবকেও গ্রহণ করিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। তবে প্রথমে অপরের জন্য, সকলের জন্য এই সকল জিনিষের সন্ধান করিতে হইবে। পৃথিবীতে মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করুক, সেই সঙ্গে আমরাও পূর্ণ হইয়া উঠিব।

আত্মার পক্ষে নিজের অমৃতত্বের কোন প্রমাণ যেমন প্রয়োজন নাই,

তেমনিই পুনর্জন্মেরও কোনও প্রমাণ প্রয়োজন নাই। কারণ এমন এক দিন আসে যখন আত্মা নিজেকে নিত্য, সনাতন, অক্ষর সত্তা বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে মন বুদ্ধির সকল যুক্তি তর্ক তুচ্ছ হইয়া যায়। তেমনিই একদিন আসে যখন আত্মা নিজেকে অনন্ত বিকাশশীল বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন সে দেখিতে পায় তাহার বর্ত্তমান জীবনের পিছনে কত যুগ অতীত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থানকে ক্রমবিবর্ত্তনে গড়িয়া তুলিয়াছে, জানিতে পারে যে, অতীতে কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্বের বর্ত্তমান উপাদান-সকল সৃষ্ট হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিব্য পরিণতির দিকে উহা অগ্রসর হইয়াছে। ইহাই হইতেছে পুনর্জন্মে জীবন্ত বিশ্বাস এবং ইহার উদ্ভব হইলে মনের সব যুক্তি তর্ক থামিয়া যায়।

জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া আত্মার ক্রমবিবর্ত্তন গীতা স্বীকার করিয়াছে। বলিয়াছে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পরজন্মে এমন বংশে জন্মগ্রহণ করে যেখানে সে সাধনার সুযোগ পায়, পূর্ব্বজন্মে যতদূর যাহা করিয়াছে তাহা লইয়াই যোগের পথে অগ্রসর হয়। অন্যস্থলে গীতা বলিয়াছে, স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, কারণ মৃত্যুতে আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না, আত্মা নূতন দেহে নূতন জীবন আরম্ভ করে। কিন্তু পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আত্মার বিকাশ বিপর্য্যস্ত হয়, কোন সাময়িক সুখ, সৌভাগ্য বা কৃতকার্য্যতার দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হয় না। অন্যত্র গীতা বলিয়াছে, বহুজন্ম জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠিত ও বিকশিত করিয়া মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানকে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া বা শূন্যে নির্ব্বাণ হওয়া নহে। ইহা হইতেছে পুরুষোত্তমের সাধর্ম্ম্য লাভ অর্থাৎ নীচের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে উঠিয়া পরা প্রকৃতির মধ্যে নব জন্ম লাভ। জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া মানবাত্মা ক্রমশঃ ইহারই জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

বিবর্ত্তনবাদ (Evolution) আধুনিক বিজ্ঞানের একটি প্রধান সত্য এবং ইহা একরকম সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। এই যে বিরাট বিশ্বজগতে আমরা বাস করিতেছি, সংখ্যাতীত যুগ ধরিয়া ক্রমবিকাশের ফলে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সে বিকাশ এখনও থামিয়া যায় নাই। এই ক্রমবিকাশের ফলেই একদিন আমাদের সৌরজগৎ এবং তাহার

মধ্যে পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে এবং কালক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আর মানুষে আসিয়াই যে এই ক্রমবিকাশ থামিয়া গিয়াছে এমন কথা বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কিন্তু এই আশ্চর্য্যময় বিশ্ববিবর্ত্তনের কেবল অতি বাহ্য স্থূল অংশগুলিই বিজ্ঞান দেখিতে পাইতেছে, ইহার গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র বা প্রণালী বিজ্ঞানের হস্তে নাই। পৃথিবীতে কেমন করিয়া প্রথম জীবনের আবির্ভাব হইল, আবার ব-জগতে কেমন করিয়া মনের আবির্ভাব হইল—বিজ্ঞান তাহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই, এবং দিতে পারিবে বলিয়া আশাও নাই। এই র্ত্তনের মূল-প্রেরণা কোথা হইতে আসিতেছে, ইহার লক্ষ্য কি, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান অন্ধ। অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে এত ফাঁক, এত issing links রহিয়াছে যে, ইহাকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলিয়া কিছুতেই করা চলে না, আমাদিগকে অন্য উদারতর গভীরতর ব্যাখ্যার সন্ধান করি হইবে। আমরা উপরে যে অধ্যাত্ম ক্রম-বিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছি ল তাহার দ্বারাই এই সকল জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যা এই প্রাচীন ভারতীয় ব্যাখ্যায় বিবর্ত্তন, বংশানুক্রমিকতা এবং পুনর্জন্ম তিনটিই সহযোগী-প্রণালী রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই মত অনুসা ডজগৎ, প্রাণজগৎ, এমন কি মনোজগতেরও বিকাশ হইতেছে আত্মা মবিকাশের বিভিন্ন স্তর। বিজ্ঞান জড় হইতেই আরম্ভ করিয়াছে এবং ও আত্মাকে জড় দেহেরই পরিণাম বলিয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্ম ক্রমবিবাদ আত্মা হইতেই আরম্ভ করিয়াছে; আত্মা জড়জগতে সমাহিত রহি দেহে জীবন বিকাশ করিয়াই সে আপন সত্তায় ক্রমশঃ জাগ্রত হইতেছে।

ীতে এই যে অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা চলিয়াছে, ইহাতে সাহায্য ক জন্যই ভগবানকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয়, এবং পৃথিবীর র অবস্থা অনুসারে অবতারেরও স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই জন্যই দেখা বতারের মধ্যেও যেন একটা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। পুরাণে যে বতারের বর্ণনা আছে তাহাতে এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট। সর্ব্বত্র রের বর্ণনা একরূপ নহে, তবে মোটামুটি তাহাদের মধ্যে মিল আছে এই পৌরাণিক অবতার-পরম্পরাকে ক্রমবিবর্ত্তনের রূপকাত্মক বর্ণনা

বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই মৎস্য অবতার, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতেছে যে প্রথমে সমুদ্রজলের মধ্যেই প্রাণের আবির্ভাব হয়। তাহার পর উভচর কচ্ছপ অবতার, তাহার পর স্থলজন্তু বরাহ তাহার পর অর্দ্ধেক পশু অর্দ্ধেক মানব, নরসিংহ অবতার। তাহার পর বামন অবতার, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম ক্ষুদ্র অবিকশিত রূপ। তাহার পর রাজসিক অবতার পরশুরাম, সাত্ত্বিক অবতার রাম। তাহার পর গুণাতীত অবতারের আবির্ভাব—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। এই তিনটি অবতার মানুষের আধ্যাত্ম বিকাশের তিনটি স্তর, কৃষ্ণ অতিমানস স্তরের সম্ভাবনা খুলিয়া দিলেন, বুদ্ধ চরম নির্ব্বাণের আদর্শ মানবজাতির সম্মুখে ধরিলেন। অতঃপর কল্কি আসিয়া এই সবের সমন্বয় সাধন করিবেন, আসুরিক শক্তিসকলকে ধ্বংস করি পৃথিবীতেই দিব্য অধ্যাত্মজীবন, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন।

এইগুলি হইতেছে প্রধান প্রধান অবতার, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেক অপ্রধান অবতার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি, আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভগবান বলিয়া পরিচয় দিলেও, এক স্থানে নিজেকে বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি। অতএব ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে জন্মে তিনি কেবল বিভূতিরূপেই অবতীর্ণ হন, পূর্ণতর ভাগবত চৈতন্য সেখানে প্রকট হয় না, অন্তরালে থাকে। ভাগবত পুরাণে দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ আছে, এবং অবতার অসংখ্য একথাও আছে। সেখানে বলা হইয়াছে, এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং এসব অসংখ্য অবতার হইতেছেন তাঁহার অংশ ও কলা বা বিভূতি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের পথ প্রদর্শন করাই অবতারের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে এইটিই বেশ যুক্তিসঙ্গত হয়। যখনই মহান্ পরিবর্ত্তনের সময় হয় তখন ভগবান অবতার রূপে আবির্ভূত হন, অন্য সময় বিভূতিরূপে আসিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিবর্ত্তনে সহায়তা করেন।

জন্মানি তব চার্জ্জুন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ভগবান সত্যই মানবদেহে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা নহে, মায়ার বশে মনে হয় যে তিনি এইরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন, দেহবান্ ইব ভবামি। কিন্তু ইহা অতিশয় কষ্টকল্পনা, গীতার স্পষ্ট ভাষা হইতে ইহার কোনও সমর্থন পাওয়া

যায় না। এই শ্লোকেই ভগবান নিজের জন্মের সহিত অর্জ্জুনের জন্মের তুলনা করিলেন, অর্জ্জুনের জন্মের ন্যায়ই পূর্ব্বে তাঁহার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহা মিথ্যা মায়া নহে। মানুষের জন্মগ্রহণ এবং ভগবানের জন্মগ্রহণ একরূপ নহে, মানুষকে আত্মবিকাশের জন্য প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ভগবানের জন্মগ্রহণের এরূপ কোনও প্রয়োজন নাই, তিনি মানুষের আত্মবিকাশে সহায়তা করিবার জন্য প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মানবদেহ গ্রহণ করেন,—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি। আত্মা অক্ষর, অবিনশ্বর, অবিনাশী, নিত্য, সনাতন। তাহা জন্মেও না, মরেও না, ন জায়তে ম্রিয়তে বা। তাহা সর্ব্বব্যাপী, সকলের দেহের মধ্যেই রহিয়াছে; তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন দেহে নাই, বরং সকল দেহ, সকল জগৎ তাহার মধ্যে, তাহার দ্বারাই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই আত্মা জগতের সকল পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে, এই সকল পরিবর্ত্তনকে পরিচালিত করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কখনও বদ্ধ হইতেছে না। এই আত্মাই আমাদের মূল সত্তা, যখন আমরা এই আত্মাকে অবগত হই, এই আত্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখনই আমরা প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করি, তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। আমরা যে আত্মার ক্রমবিকাশের কথা বলিয়াছি তাহা জীবাত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। জীবাত্মা ভগবানের অংশ, এই জড়জগতে অবতীর্ণ হইয়া দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিতেছে, যেন এই পার্থিব অবস্থা-নিচয়ের মধ্যেই দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়,

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥১৫।৭

এই বিকাশের প্রয়োজনেই জীবাত্মাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতে হয়। এই সবের পশ্চাতে রহিয়াছে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা। ভগবান যখন অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি জীবের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হন না; বাহিরের মানবচৈতন্যের পশ্চাতে ভাগবত আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত থাকে, তাই তাঁহার নিকট জগতের কোন কিছু অবিদিত থাকে না, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একই সঙ্গে তাঁহার নিকট প্রতিভাত;

তিনি যেমন নিজের বহু পূর্ব্ব অবতার ও জন্মের কথা জানেন তেমনিই অর্জ্জুনের ন্যায় অন্য সকল মনুষ্যেরও জন্মের কথা জানেন।

ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ—এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইলেন না। তিনি জানেন মানুষের অন্তরের মধ্যে এই জ্ঞান জাগ্রত না হইলে, যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা যায় না। তিনি শুধু বলিয়া দিলেন, "আমি যে-সব জন্মের কথা জানি, তুমি এখনও জান না।" অর্জ্জুন আদর্শ শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁহার অবিশ্বাস নাই, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীতে তাঁহার সকল সংশয় দূর হইতেছে, কেবল যেখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, সেইখানেই প্রশ্ন করিয়া সেই কথা পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন। অর্জ্জুন কেবল রাজসিক মনুষ্য নহেন, তাঁহার মধ্যে সত্বগুণও বিশেষভাবে বিকশিত, তাই তিনি সকল কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে চান, যেন কোনরূপ সংশয় না অবশিষ্ট থাকে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

অন্বয়—অজঃ অব্যয়াত্মা সন্ অপি, ভূতানাং ঈশ্বরঃ সন্ অপি, স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

অনুবাদ—যদিও আমি অজাত, নিজ সত্তায় অবিনশ্বর এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, তথাপি আমি স্বীয় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্ম-মায়ার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা—অনাদি অনন্ত ভগবান কেমন করিয়া ক্ষুদ্র নশ্বর দেহে আবদ্ধ হইবেন, যিনি পূর্ণ তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা পরিগ্রহ করিবেন, যিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কিরূপে সৃষ্ট জীব হইবেন—এই যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়, এই সবই গীতার গুরুর মনে ছিল; এই শ্লোক হইতেই তাহা বুঝা যায়। গীতা ভগবান ও বিশ্ব সম্বন্ধে যে বৈদান্তিক মত গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে এই সকল আপত্তির খণ্ডন হয়। অনন্তের পক্ষে

সান্ত রূপ গ্রহণ করা অসম্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এই সমগ্র বিশ্ব তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। জগতে আমরা কোথাও এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহা সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ নহে। নিরাকার আত্মার পক্ষে সাকার রূপ গ্রহণ করা, জড়দেহ স্বীকার করা অসম্ভব ত নহেই, সমগ্র জগতই হইতেছে তাহাই ; আত্মা কর্তৃক বিধৃত না হইলে এই জগতের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। শুধু ভগবানই অজ, অবিনশ্বর নহেন, সকল মানুষই তাহাদের মূল সত্তায় ভগবানের সহিত এক, এবং ব্যষ্টিগত সত্তাতেও অনাদি অনন্ত, ন জায়তে ম্রিয়তে বা। মূল সত্তায় সকলেই হইতেছে এক অজ আত্মা, জন্ম মৃত্যু কেবল তাহার বিভিন্ন রূপ গ্রহণ, রূপ পরিবর্ত্তন। যিনি পূর্ণ তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা পরিগ্রহ করিতে পারেন, ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্য, কিন্তু যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহাতেই অপূর্ণতা দোষ বিরাজমান। যিনি এই সব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য্য যে আলো দেয় তাহাতে কোনও দোষ নাই, বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তিতেই দোষ বা অপূর্ণতা থাকে।

ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্—যাঁহারা ঈশ্বর বলিতে বুঝেন জগতের বাহিরে অবস্থিত বিশ্বাতীত কোন বস্তু, তিনি পার্থিব রাজার মত জগতের শাসনকর্ত্তা, নিয়ামক, তিনি বাঁধাধরা কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে এই জগৎ যন্ত্রবৎ চলিতেছে, তিনি জগতের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহাদের মতে অবতার-বাদ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বেদান্ত মতে এই জগৎ শুধুই চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে। জগতের বাহিরে কোন অনাদি চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই। সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক রূপের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত আত্মা ও মনকে অধিকার করে। সকলেই ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারই মধ্যে চলাফেরা করিতেছে, তাঁহারই মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে, সকলেরই মধ্যে তিনি রহিয়াছেন, কর্ম্ম করিতেছেন, নিজের সত্তা প্রকট করিতেছেন ; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ। ভগবান কোন দূর দেশে থাকিয়া বাহির হইতে জগৎ পরিচালনা করেন না, তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকে

পরিচালনা করেন, কিন্তু আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যে পরমাত্মারূপে বিরাজিত থাকিয়া সকলকে পরিচালিত করেন। অতএব আমাদের যৌক্তিক বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সে-সব ভিত্তিহীন। কারণ বুদ্ধি যে মিথ্যা ভেদ করিয়া থাকে তাহা জগতের সমগ্র ঘটনা, সমগ্র সত্যের বিরোধী।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, প্রত্যেক জীবই হইতেছে অনন্তের সান্ত রূপ-পরিগ্রহ, তাহা হইলে সাধারণ মানব আর অবতারে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, সাধারণ মানব তাহার অন্তর্য্যামী ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞান, তাহার বাহ্য মানবীয় চৈতন্য ও অন্তরস্থিত ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে। সকল মানুষ ভিতরের ভগবানের দ্বারাই চালিত হয় কিন্তু মায়ার বশে তাহা বুঝিতে পারে না, মনে করে যে তাহার ক্ষুদ্র অহংই তাহার প্রকৃত সত্তা, অহংই তাহার জীবনের কেন্দ্র, অহংয়ের দ্বারাই তাহার সমস্ত কর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই অহং তাহার প্রকৃতিরই একটি ক্রিয়া, প্রকৃতি এই অহংয়ের ভিতর দিয়া মানুষকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করে; কিন্তু অবতারে মানবীয় চৈতন্য এইরূপ প্রকৃতির বশ নহে, তাহা অন্তরস্থিত ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত, তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহারই সঙ্কল্প অনুসারে সজ্ঞানে পরিচালিত। অন্য কথায়, সাধারণ মানবে ভগবান রহিয়াছেন পিছনে, সম্মুখে মানুষটি অজ্ঞানের বশে চলিয়াছে—অবতারে ভগবান সম্মুখে আসিয়া মানবীয় ব্যক্তিত্বটীকেই অধিকার করিতেছেন, মানবীয় দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন।

অবতার কিভাবে কিরূপে মানবদেহ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। যে-কোন লোকের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি, প্রেম প্রভৃতি কোন ভগবদ্‌ গুণের বিশিষ্ট প্রকাশ হয় তাহাকেই লোকে অবতার বলিয়া থাকে। যে সকল মহাপুরুষ আমাদের সাধারণ স্তরের ঊর্দ্ধে উঠেন, তাঁহারা মানবজাতিকে উন্নীত করেন। আমাদের মধ্যে যে ভাগবত সত্তা নিহিত রহিয়াছে, আমরা যে তাহার বিকাশ করিতে পারি সে বিষয়ে তাঁহারাই হন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু গীতায় এইসব অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে, অবতার নহে। ভগবদ্‌গুণ থাকিলেই চলিবে না, ভগবান নিজে

সম্মুখে আসিয়া মানবীয় প্রকৃতিটি পরিচালিত করিতেছেন, এই আভ্যন্তরীণ জ্ঞানই অবতারের বিশিষ্ট লক্ষণ। অর্জ্জুন, ব্যাস, উশনা—ইহাদের মধ্যে ঐ জ্ঞান ছিল না, তাই তাঁহারা বিভূতি মাত্র, অবতার নহেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই জ্ঞান ছিল, তাই তিনি অবতার।

অবতার সম্বন্ধে আর এক মত হইতেছে এই যে, কোন মানুষ সাধনার দ্বারা নিজের দেহ, প্রাণ, মনকে প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করেন, ভগবান আসিয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করেন, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা ভগবানের সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। মানুষ তাহার সাধারণ চৈতন্য ছাড়াইয়া উঠিয়া ভাগবত চৈতন্যে প্রবেশ করিতে পারে, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সে ভগবান হইয়া উঠে না, ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার মধ্যে বাস করে। সেখানে অবতারের বিশিষ্ট চৈতন্য ও ক্রিয়া না থাকিতে পারে। কিন্তু মানুষ যেমন ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভগবানও আমাদের মানবীয় সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তখন সেইটিকে অন্ততঃ আংশিক অবতার বলা যাইতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট এইরূপই অবতার ছিলেন বলিয়া মনে হয়। Holy Spirit বা শুদ্ধ আত্মা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ঊর্দ্ধের ভাগবত শক্তি সকল আনিয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও এইরূপে মাঝে মাঝে পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইতেন বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তিনি অন্য সময়ে থাকিতেন ভক্ত ও সাধকমাত্র, কেহ তাঁহাকে ভগবান বলিলে তিনি তাহা অস্বীকার করিতেন। কিন্তু এক এক সময়ে তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়া উঠিতেন, সেই ভাবে কথা কহিতেন, কর্ম্ম করিতেন।

মানুষের অধ্যাত্ম সাধনায় এই সকল সম্ভাবনাই রহিয়াছে, কিন্তু গীতা যেরূপ অবতারের কথা বলিয়াছে তাহা ভিন্ন বস্তু। গীতার মতে ভগবান নিজের প্রকৃতিকে ধরিয়া নিজেই জন্মগ্রহণ করেন, অন্য মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইবার কোন কথাই নাই। যে উপায়ে সাধারণ মানুষের জন্ম হয়, ভগবানও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। সে উপায় হইতেছে মায়া ও প্রকৃতি,

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

জীবের জন্ম সম্বন্ধে ভগবান প্রায় এইরূপ ভাষাই পরে ব্যবহার করিবেন,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৮

"অধিষ্ঠায়" ও "অবষ্টভ্য" এই দুইটী কথার দ্বারাই অবতারের জন্ম এবং সাধারণ মানুষের জন্মের মধ্যে প্রভেদটি সূচিত হইতেছে। "অবষ্টভ্য" শব্দটির দ্বারা বুঝায় যে, প্রকৃতিকে জোর করিয়া নীচে চাপিয়া ধরা হয়। প্রকৃতি সেখানে অভিভূত, বদ্ধ, অবশভাবে নিয়ামক শক্তির অধীন, এই ক্রিয়ায় প্রকৃতি জড় যন্ত্রবৎ হইয়া উঠে এবং তাহার জীবসকল অবশভাবে সেই যন্ত্রে বদ্ধ হয়, স্বাধীনভাবে, ঈশ্বরভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না। অন্যপক্ষে "অধিষ্ঠায়" শব্দটির দ্বারা বুঝায় যে, ভগবান অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে প্রকৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রকৃতি সচেতনভাবে ভগবানের পরিচালনায় কর্ম্ম করে। পুরুষ সেখানে অজ্ঞানের বশে অবশভাবে চালিত হয় না, পরন্তু প্রকৃতিই পুরুষের জ্যোতি ও সঙ্কল্পে পূর্ণ হয়। অতএব গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, দিব্য জন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং মূলতঃ তাহা সাধারণ জন্মের বিপরীত, যদিও একই উপায়ের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্, becomings, দিব্য জন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা আত্মচেতন স্বপ্রতিষ্ঠ, being, আত্মানম্। পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তারূপে নিজের বিবর্ত্তনকে (becoming) সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, অজ্ঞানমেঘে আত্মজ্ঞানহারা হইয়া নহে। এখানে পুরুষ প্রকৃতির অধীশ্বররূপেই শরীরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, উপরে দাঁড়াইয়া নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়া তাহার যন্ত্রে অবশভাবে ঘূর্ণ্যমান হন না; কারণ তিনি জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করেন। সকলের মধ্যেই যে আত্মা গুপ্তভাবে রহিয়াছে এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছে, অবতারে * তাহা সম্মুখে আসিয়া মানবীয় রূপটিকে অধিকার করে, ভগবদ্ভাবে অধিকার করে; সাধারণ জন্মে ইহা অন্তরালের পশ্চাতে ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু সম্মুখের চৈতন্যটি

* অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, a descent, যে রেখা ভাগবত স্তরকে মানবীয় স্তর হইতে পৃথক্ করিতেছে, তাহার নীচে ভগবানের নামিয়া আসাই অবতার।

প্রকৃতি কর্তৃক অধিকৃত থাকে। সেইটি হইতেছে আংশিকভাবে চেতন জীব, সেই জীব বাহ্যতঃ প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া আত্মজ্ঞানহারা এবং কর্ম্মে বদ্ধ হয়। অতএব অবতার হইতেছে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানবত্বের মধ্যে সেই ভাগবত জীবনের প্রকটন, যাহার মধ্যে তিনি আদর্শ মানব অর্জ্জুনকে উঠিতে আহ্বান করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার সাধারণ মানবোচিত অজ্ঞান ও ক্ষুদ্রত্ব অতিক্রম করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে সেই ভাগবত জীবনের মধ্যে উঠা সম্ভব নহে। আমাদিগকে নীচে হইতে যাহার বিকাশ করিতে হইবে, উপর হইতে তাহার প্রকটনই অবতার ; মানবীয় সত্তার যে দিব্য জন্মের মধ্যে আমাদের মত মর জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভগবানের অবতরণই অবতার ; মানবজীবনেরই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শের মধ্যে দিব্যজীবন প্রকট করিয়া ভগবান মানুষকে আকৃষ্ট করেন।

সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া—শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ"—"আমি নিজ মায়া দ্বারা দেহবানের ন্যায় যেন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, বাস্তব পক্ষে জীবের ন্যায় আমার জন্ম সত্য নহে"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের ফলেই মানুষের জন্ম মৃত্যু হয়, কিন্তু ভগবান এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন নহেন, তিনি সদা জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ সম্পন্ন নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর, তাঁহার পক্ষে জীবের ন্যায় প্রকৃতির বশ হইয়া জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নহে ; তবে তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবগণের উপর অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা বশতঃ তিনি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া দেহবানের ন্যায় লক্ষিত হন। অতএব শঙ্করের মতে ভগবানের দেহ গ্রহণ একটা illusion মাত্র, তিনি তাঁহার দ্বারা লোকের মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করেন যেন তাঁহার দেহ গ্রহণ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু শঙ্কর যে যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে ভগবানের দেহগ্রহণ একটা ভ্রান্তি মাত্র বলিয়া প্রমাণিত হয় না। ভগবান যেমন অজ ও অব্যয়, জীবও তেমনিই অজ ও অব্যয়, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ। জীবের পক্ষে দেহগ্রহণ যদি সম্ভব হয়, প্রয়োজন হইলে ভগবানই বা কেন দেহ গ্রহণ করিতে পারিবেন না? তবে ভগবান জীবের ন্যায় কর্ম্মবদ্ধ হন না, প্রকৃতির বশীভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া দেহীরূপে আবির্ভূত হন, ইহাই

গীতার বক্তব্যের স্পষ্ট অর্থ। দেহ গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের লাঘব হয় না, বরং জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজন মত যদি তিনি দেহ গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহাতেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার লাঘব হয়, 'তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা" (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)।

গীতার অন্যান্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা ভগবানের মানবদেহে জন্মকে শঙ্করের ন্যায় মায়া বা ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন ভগবান নিজে দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু প্রকৃতি কর্ত্তৃক বাসুদেব প্রভৃতি দেহ সৃষ্ট হইলে ভগবান তাহাতে প্রবেশ করেন। এইরূপ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট দেহে ভগবানের অবতরণের দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে আছে, কিন্তু গীতার ভাষা এখানে অতি স্পষ্ট, অন্যের দেহে আবির্ভূত হইবার কোন কথাই এখানে নাই। ভগবান জীবের বিশিষ্ট প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া নহে, পরন্তু নিজের দিব্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া মানবজন্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ভগবানের দেহ-গ্রহণ সত্য, কিন্তু সে দেহ সাধারণ মানুষের ন্যায় জড় দেহ নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ চিদ্রূপ। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আমি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।" কিন্তু জড়কে যাঁহারা শুধু জড় বলিয়াই দেখেন, তাঁহারাই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ ভগবান হইতে পৃথক জড় বলিয়া কিছুই নাই, ঈশা বাস্যং ইদম্ সর্ব্বম্, এই বিশ্বের সর্ব্বত্র ভগবান ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, সবই বাসুদেব, চেতন পদার্থ যেমন বাসুদেব, জড়পদার্থও তেমনিই বাসুদেব, কেবল প্রভেদ এই যে জড়ের মধ্যে চৈতন্য গভীরতম নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। জড়ের মধ্যে যে দিব্য চৈতন্য সুপ্ত রহিয়াছে তাহাকে ক্রমশঃ বিকশিত ও জাগ্রত করিয়া তোলা, ইহাই পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা। প্রত্যেক জড় অণুপরমাণুর মধ্যে একই চৈতন্যের শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, কেবল মানুষের মধ্যেই সেই চৈতন্য সম্মুখে আসিয়াছে, মানুষ নিজের ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও এখনও ভগবানের সহিত পূর্ণ ঐক্যবোধের বিকাশ হয় নাই, চেতনায় পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই। ভগবান হৃদ্দেশে গুপ্তভাবে অবস্থিত হইয়া মানুষের এই অপূর্ণ প্রকাশকে

পরিচালিত করিতেছেন। অন্তর্ধ্যামী ভগবান ও মানুষের মধ্যে যে আবরণ রহিয়াছে, মানুষ নিজের চেষ্টায় কোন দিনই তাহা ভেদ করিতে পারিবে না, তাই ভগবানকে নিজে জড়দেহের মধ্যে আবির্ভূত হইতে হয় এবং বাহিরের চৈতন্যের সহিত ভিতরের চৈতন্যের সংযোগ সাধন করিয়া এই জড়দেহেই দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিতে হয়। বিশুদ্ধ চিন্ময় দেহে আবির্ভূত হইলে সে মহান উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? ভগবান মানব দেহ, মানব জীবনের সমস্ত দোষ ত্রুটি অপূর্ণতা স্বীকার করিয়াই তাহাদের সংশোধন ও দিব্য রূপান্তরের পন্থা দেখাইয়া দেন।

শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং," যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, যাহার বশে সকল জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার দ্বারা মোহিত হইয়া জীব অন্তর্য্যামী ভগবানকে জানিতে পারে না, সেই বৈষ্ণবী মায়াই আমার প্রকৃতি। কিন্তু ইহা হইতেছে নীচের প্রকৃতির বর্ণনা। মায়া মূলতঃ ভ্রম (illusion) নহে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানের বশেই জীব বস্তু-সকলকে ঠিক মত দেখিতে পারে না, বিকৃতভাবে দেখে, জীব যে মূলতঃ ভাগবত সত্তা তাহা ভুলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া মনে করে। "মীয়তে অনয়া" এই অর্থে "মা" ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে "য" প্রত্যয় করিয়া তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "টাপ্" প্রত্যয় করিয়া মায়া শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "পরিমিত করা" "জানা" ইত্যাদি "মা" ধাতুর আভিধানিক অর্থ। যে শক্তির দ্বারা ভগবান অসীম, অপরিমেয় হইয়াও সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন তাহাই মায়া। প্রকৃতি ও মায়া ভাগবত চৈতন্যের একই কার্য্যকরী শক্তির দুইটি পরস্পর সাপেক্ষ ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাগবত চৈতন্য নিজেকে বিভিন্নভাবে নিজের সম্মুখে ধরিতেছে, বিভিন্ন কেন্দ্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহাই মায়া; এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রকট করা যাহার কাজ, ভাগবত চৈতন্যের সেই কার্য্যকরী শক্তিই প্রকৃতি। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শাশ্বতের শক্তি, পরব্রহ্মের প্রকটন, এমন কি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতন প্রকৃতি ভ্রম ও অজ্ঞান উৎপাদন করিতেছে ইহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। ইহার যন্ত্রবৎ ক্রিয়াতে বদ্ধ হইয়া মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, পরব্রহ্মের জীব ও জগৎরূপে আত্মপ্রকাশে ইহারও সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে।

সাধারণ জন্ম এবং ভাগবত জন্ম উভয়ক্ষেত্রেই মায়া সৃষ্টি বা প্রকটনের উপায়, means, কিন্তু ভাগবত জন্মে ইহা হইতেছে আত্ম-মায়া দ্বারা, আত্মমায়য়া, অজ্ঞানাত্মিকা নীচের মায়ার মধ্যে বদ্ধ হওয়া নহে, পরন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার সজ্ঞানে বাহ্য রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে তাহার বিদিত,—গীতা অন্যত্র ইহাকেই যোগমায়া বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে নিম্নতর চৈতন্য হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের কারণ হয়, অবিদ্যা মায়া। কিন্তু এই একই যোগমায়ার দ্বারা আত্ম-জ্ঞান প্রকটিত হয়, আমাদের চৈতন্য ভগবানে ফিরিয়া আইসে, ইহা হয় জ্ঞানের কারণ, বিদ্যা মায়া, আর দিব্য জন্মে এই ভাবেই কর্ম্ম করে—সাধারণতঃ যে-সব কার্য্য অজ্ঞানের বশে করা হয়, ইহা জ্ঞানরূপে সেই সকল কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অন্বয়—হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং [চ] ভবতি, তদা অহং আত্মানম্ সৃজামি।

অনুবাদ—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত! তখনই আমি জন্ম গ্রহণ করি।

ব্যাখ্যা

যদা যদা হি—কোন্ সন্ধিক্ষণে ভগবান ভূতলে অবতীর্ণ হন, এইবার তাহাই বর্ণিত হইতেছে। বাহ্যিক ভাবে দেখিলে মনে হয় যখনই স্থূল জগতে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তখনই অবতার আবির্ভূত হন এবং সাধারণতঃ লোকে অবতারের প্রয়োজন এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভারতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, জরাসন্ধ, কংস

প্রভৃতি ধর্ম্মদ্রোহী দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচারে দেশে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্য জগতে কোনও মহান কর্ম্ম সম্পাদন ভগবানের অবতীর্ণ হইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না, কারণ সে কর্ম্ম তিনি অন্যভাবে তাঁহার যন্ত্রদের দ্বারাই সম্পন্ন করিতে পারেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর, যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে, তাঁহার পক্ষে রাবণ বা কংসকে বধ করিবার জন্য নিজে অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এমন কি ধর্ম্মসংস্কার, ধর্ম্মপ্রচারও সাধু, মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষদের দ্বারাই হইতে পারে। অবতার আসিয়া বাহ্য জগতে সাধুগণের রক্ষা, দুর্ব্বৃত্তদের বিনাশ, ধর্ম্ম প্রচার—এই সবই করিতে পারেন। কিন্তু এইগুলিই অবতারের মূল উদ্দেশ্য নহে, গীতায় এই বিষয়ে অন্যত্র যাহা বলা হইয়াছে তাহার আলোকে এই অংশটির ব্যাখ্যা করিলেই ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, এবং এই ভাবেই গীতার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

অবতার যে-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন তাহা হইতেছে মূলতঃ মানবজাতির ক্রমবিকাশের-এক সন্ধিক্ষণ। যখনই মানব চৈতন্যের কোন মহৎ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, কোন নূতন বিকাশ সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়, তখনই ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হন। সেই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য একটা ভাগবত শক্তির প্রয়োজন হয়। যখন পরিবর্ত্তনটি প্রধানতঃ বুদ্ধিগত ও ব্যবহারিক, তখন অবতারের আবির্ভাব আবশ্যক হয় না; মানব চৈতন্যে এক মহান আন্দোলন উপস্থিত হয়, এক মহান্ শক্তি আবির্ভূত হয় এবং মানুষ সাময়িকভাবে তাহাদের সাধারণ জীবনের ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। আর চৈতন্যের ও শক্তির এই প্রকাশ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠে, তাঁহারাই বিভূতি, তাঁহাদের নেতৃত্বেই প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনটি সুসিদ্ধ হয়। ইউরোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফরাসী বিপ্লব ছিল এইরূপই সন্ধি সময়; এইগুলি মহান আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, এইগুলি কেবল বুদ্ধি ও ব্যবহারিক জগতের পরিবর্ত্তন—একটি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভাব, অনুষ্ঠান ও আদর্শের পরিবর্ত্তন, অপরটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন; আর ইহাদের ফলে সাধারণ মানব চৈতন্যের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা ছিল মানসিক ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন, আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন নহে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করা উদ্দেশ্য, তখন তাহার উদ্ভাবক বা নেতারূপে

মানব মন ও আত্মার মধ্যে ঐশী চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক প্রকটন হয়। তাহাই অবতার।

মানব জাতির চৈতন্যের ইতিহাসে দুইটি মহান সন্ধিক্ষণে দুইটি প্রধান অবতার দেখা যায়, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ। মানুষের মধ্যে যে আত্মা নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমবিকাশের দ্বারা ভগবান ও ভগবৎ জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের (terrestrial evolution) প্রকৃত অর্থ। এই বিকাশের এক মহান সন্ধিক্ষণ হইতেছে মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিকতার বিকাশ ও প্রাধান্য ; ইহার দ্বারা মানুষ পশুর স্তর হইতে মানবীয় স্তরে উঠে। আমাদের মধ্যে যে সব পাশবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাদিগকে দমিত ও সংযত করিয়াই আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করি। মানবকে তাহার দিব্য সম্ভাবনা-সকলের বিকাশ করিতে হইলে সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবন আবশ্যক এবং তাহার জন্য প্রয়োজন পাশবিক ও আসুরিক শক্তি-সকলকে দমন করা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-গুলিকে সংযত করা, সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করা, শাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করা। এই যে সাত্ত্বিক আদর্শ, রাম অবতারে এইটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও সেই আদর্শের প্রভাব সর্ব্বত্র মানব চৈতন্যের মধ্যে কাজ করিয়া মানুষকে উর্দ্ধের জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছে। রামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজসিংহাসনে তাঁহার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, সাধারণের কল্যাণের জন্য সমাজনীতি ও শৃঙ্খলার আদর্শ অটুট রাখিবার জন্য তিনি নিজের ও সীতার ব্যক্তিগত সুখকে বলিদান দিয়াছিলেন, এবং এই সবের উপরেই সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সব আদর্শ হইতেছে মানসিক ও নৈতিক, মানুষ মন বুদ্ধির দ্বারা যে সব ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে, সে সবের দ্বারা তাহার নীচ পাশবিক প্রবৃত্তি-সকল সংযত হয়, সে সাত্ত্বিক ও নৈতিক হইয়া উঠে ; * কিন্তু মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে এই সবেরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, মানসিক আদর্শ ও নীতিসকল ছাড়াইয়া উঠিয়া, মনের উপর যে অধ্যাত্ম চৈতন্য

* আমাদের যুগে মহাত্মা গান্ধী এই সাত্ত্বিক ও নৈতিক আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন। তিনি বিশেষ করিয়া রামচন্দ্রের ভক্ত ; তুলসীদাসের রামায়ণ এবং বাইবেলের নৈতিক অনুশাসনগুলিই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র। তাঁহার স্বরাজের আদর্শ রামরাজ্য।

রহিয়াছে তাহার উদারতা ও মুক্তির মধ্যে, তাহার দিব্য জ্যোতি, শক্তি, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সত্ত্বের দ্বারা রজঃ ও তমঃকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্ত্বকেও ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে। মানুষের এই অধ্যাত্ম বিকাশেরই পথ খুলিয়া দিতে এবং ইহার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানবজাতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সারমর্ম্ম হইতেছে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব, এই ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়া, মন বুদ্ধির উপরে যে আত্মা রহিয়াছে, তাহাকে লাভ কর, দিব্য প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হও; এবং ইহার উপায় হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, সকল মানসিক ও নৈতিক ধর্ম্ম, আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর।

এই যে মানুষের মধ্যে দেবত্ব বিকাশের সম্ভাবনা শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন, ইহাকেই পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য, পৃথিবীতে অতিমানস চৈতন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবার এক মহা সন্ধিক্ষণ আজ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন এক নূতন অবতার। পুরাণাদিতে ইহাকে কল্কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মানবজাতি ও মানবীয় সভ্যতা যে এক মহাসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অন্ধকারের শক্তি-সকলের এমন প্রাদুর্ভাব বোধ হয় জগতে আর কখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা এখনও স্পষ্ট বোধগম্য হয় নাই। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন রীতিনীতি আদর্শ সমূহে লোকে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কোন শাস্ত্র মানিয়াই আর তাহারা চলিতে চায় না, সে সবের দ্বারা মানুষের পূর্ণতর বিকাশ, পূর্ণতর জীবন ব্যাহত হয় বলিয়াই অনুভূত হইতেছে, মানুষ নিজের মধ্যে যাইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে এবং তদনুসারে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিতেছে। এই সবই হইতেছে যুগের প্রয়োজন, এই ভাব যুগশক্তির প্রেরণা হইতেই আসিতেছে। কিন্তু মানুষ নিজের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই যে বাসনা কামনা ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, যথেচ্ছাচারকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করিতেছে—এটা ভ্রম, সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশতা। মানুষ এতদিন ধরিয়া যে সাত্ত্বিক ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিয়া পুনরায় সেই আদিম পাশবিক জীবনে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই যুগের

ইঙ্গিত নহে এবং তাহা সম্ভব নহে। মানুষকে এক উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, এবং যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সাময়িক সকল প্রকার অধীরতা ও বিদ্রোহ সত্ত্বেও মানব জাতির সাত্ত্বিক ও নৈতিক জীবনের আদর্শ কিছুতেই বর্জ্জিত হইবে না, হইতে পারে না।

ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ—সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, ধর্ম্ম সনাতন, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন নাই, এবং কেহ কেহ বলেন যে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহা চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা হইলে "ধর্ম্মের গ্লানি" কেমন্ করিয়া হয়? বস্তুতঃ আদর্শ ও মূলতত্ত্বে ধর্ম্ম শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও তাহার রূপের অনবরত পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই সম্পূর্ণ আদর্শকে ধরিতে পারে নাই অথবা তদনুসারে জীবন যাপন করে না, পরন্তু তাহার দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে যে ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল রূপ, দেশে দেশে যুগে যুগে তাহা ভিন্ন হয়। ধর্ম্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠান-সকল যখন গতানুগতিক হইয়া পড়ে, লোকে তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য ভুলিয়া যায়, তামসিক ভাবে অনুসরণ করে, তখনই হয় ধর্ম্মের গ্লানি, তাহার দ্বারা মানব প্রগতিতে আর কোন সহায়তাই হয় না, তখন ধর্ম্মের নূতন রূপের আবশ্যক হয়, যুগ-প্রয়োজন অনুযায়ী শাশ্বত ধর্ম্মকে নূতন ভাবে প্রকট করিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য এখানে ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, এবং প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা সকলেই এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন,—লোকে যখন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান-সকল বর্জ্জন করে তখনই হয় ধর্ম্মের গ্লানি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্রাহ্মণ যদি শাস্ত্রানুযায়ী সন্ধ্যা বন্দনাদি না করে তাহা হইলেই হয় ধর্ম্মের গ্লানি। কিন্তু ইহা অতি সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা, এবং গীতা হইতে ইহার কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না। বেদবিহিত বাহ্যিক অনুষ্ঠান-সকলকে গীতায় শাশ্বত ধর্ম্ম বলা হয় নাই, বরং তাহাদের বাহুল্য নিন্দাই করা হইয়াছে। যাঁহারা বলেন শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানই হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত-স্বরূপ তাঁহারা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নিম্নলিখিত কথাগুলি অনুধাবন করিতে পারেন,—

"আমি শুনিয়াছি কালক্রমে বৈদিক বিধিবিধান সকল ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া

যাইতেছে। সত্যযুগে ধর্ম্মের একরূপ, ত্রেতাযুগে আর একরূপ, দ্বাপরে অন্যরূপ আবার কলিতে অন্য একরূপ। মানুষের বিভিন্ন বিভিন্ন সামর্থ্য অনুসারে বেদ ধর্ম্মের বিভিন্ন রূপ প্রয়োজনীয় বলিয়াছে।" —মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

অন্যত্র মহাদেব দক্ষকে বলিতেছেন, "বেদ ও স্যাংখ্য যোগ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া আমি পাশুপত ব্রত প্রচার করিয়াছি। এই ব্রত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া অপেক্ষা মহত্তর, ইহা সর্ব্বমঙ্গলময়, সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে শুভকর; বেদ সকলের পক্ষে উন্মুক্ত নহে, কিন্তু ইহা সকলেরই জন্য; ইহা কোন কোন বিষয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী, কোন কোন বিষয়ে তাহার অনুরূপ, পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহা প্রচার করিয়াছেন এবং যাঁহারা বর্ণাশ্রমের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন তাঁহারা ইহা সাধনা করিয়াছেন।"

এই সব হইতেই বুঝা যায় যে, হিন্দুধর্ম্ম বর্ণাশ্রম বিভাগ বা শ্রৌত স্মার্ত্ত সন্ধ্যা বন্দনা শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের রূপের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বেদে ও উপনিষদে যে অধ্যাত্ম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে ধরিয়াই এই সব বিভিন্ন রূপের বিকাশ হইয়াছে। এক রূপে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সাধু সন্ত মহাত্মা অবতারেরা আসিয়া তাহার স্থলে নূতন রূপ সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। গীতা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উপর কোথাও ঝোঁক দেয় নাই, স্পষ্ট বলিয়াছে ভক্তির সহিত যে কেহ পত্র, পুষ্প, ফল, জল, ভগবান্‌কে অর্পণ করে, ভগবান তাহাই গ্রহণ করেন। চাই ভিতরের শুচিতা, ভক্তি, অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষা, এবং ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহা কখন কি বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করিবে তাহা গৌণ ও আনুষঙ্গিক মাত্র।

মানুষ তাহার চৈতন্যের বিকাশ করিয়া ক্রমশঃ ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই বিকাশে যাহা কিছু আমাদিগকে দিব্য শুচিতা, প্রসারতা, জ্যোতি, মুক্তি, শক্তি, বল, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য, সৌন্দর্য্যে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা কিছু ইহার বিরোধী, যাহা কিছু এই নীতি ও সত্যকে স্বীকার করে না পরন্তু বিরোধ ও বিকৃতির দ্বারা এই বিকাশকে বাধা দেয়, অশুচিতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও ভেদ, এই সবই হইতেছে অধর্ম্ম।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য—অধর্ম্ম ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ধর্ম্মকে পরাভূত করিতে চায়, পিছনের দিকে, নীচের দিকে টানে। অধর্ম্ম হইতেছে প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি, তাহা অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। এই দুইয়ের মধ্যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে। কখনও ঊর্দ্ধমুখী শক্তি-সকলের জয় হইতেছে, কখনও নিম্নমুখী শক্তি সকলের জয় হইতেছে। বেদে ইহাই দেবাসুর সংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দেবতারা অদিতির সন্তান অর্থাৎ জ্যোতি ও ঐক্যের সন্তান, অসুরেরা দিতি অর্থাৎ অন্ধকার ও দ্বন্দ্বের সন্তান; ইহাই জোরোয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মে আহুর মাজ্দা ও অহিমানের সংগ্রাম রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকার করিবার নিমিত্ত একদিকে ঈশ্বর ও দেবদূতগণের এবং অন্য দিকে সয়তান বা ইব্লিসের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবের জন্যই অবতারের প্রয়োজন হয়, ইহাদের দ্বারাই অবতারের কর্ম্ম নির্ণীত হয়। যুগে যুগে যখন ধর্ম্ম মলিন, অবসন্ন ও হীনবল হইয়া পড়ে, অধর্ম্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে, তখনই অবতার আবির্ভূত হন এবং ধর্ম্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর যেহেতু তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মানুষের ভিতর দিয়াই প্রকট হয়, তজ্জন্য অবতারের লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয় অধর্ম্মের শক্তি-সকল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সহায়ক দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে বিনাশ করা।

তদাত্মানং সৃজাম্যহম্—সৃষ্টি বলিতে যাহা ছিল না এমন কোন নূতন বস্তু উৎপাদন করা বুঝায় না, বস্তুতঃ যাহা নাই এমন কোন বস্তুর কখনও উদ্ভব হইতে পারে না, নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ। সৃজ্ ধাতুর অর্থ নির্ম্মুক্ত করা, to loose forth, ভগবানের অনন্ত সত্তায় যে-সকল বস্তু গুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাদিগকে প্রকট করাই সৃষ্টি, ভগবান তাঁহার মায়া শক্তির দ্বারা এইভাবে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেন। তবে সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা হইতেছে ভূতগ্রামম্, তাহারা অবশভাবে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু অবতারের জন্মে ভগবান নিজেই নিজেকে সৃষ্টি বা প্রকট করেন, আত্মানম্। মূলতঃ অবতার দৈহিক ব্যাপার নহে, ইহা হইতেছে আত্মার জন্ম, a soul-birth, যদিও ইহার আনুষঙ্গিক দেহের জন্মও থাকে। মানুষও

যখন দিব্য জীবনের মধ্যে উঠে তখনও সেইটি হয় একটি অধ্যাত্ম ব্যাপার, ঊর্দ্ধের দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নবজন্ম। আত্মা স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তারূপে নিজের বিবর্ত্তনকে সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অজ্ঞান মেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া যখন জন্মগ্রহণ করে, তখনই তাহা হয় অবতার!

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

অন্বয়—সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাম্ বিনাশায় চ, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় [অহং] যুগে যুগে সম্ভবামি।

অনুবাদ—সাধুগণকে রক্ষা করিবার জন্য, দুষ্কর্ম্মকারিগণকে বিনাশ করিবার জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা

পরিত্রাণায় সাধূনাং—পার্থিব মানুষ যে ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা দেখাইবার জন্য ভগবান ভূতলে মানবরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মানুষ সাহস পায়, উৎসাহ পায়, শিক্ষা পায়। তিনি একটা ধর্ম্ম দেন—শুধু creed বা আনুষ্ঠানিক মতবাদ নহে—পরন্তু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনকে গঠন করিবার একটা প্রণালী দেন, একটা পন্থা ও নীতি দেন, যাহা দ্বারা মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবত-সত্তার বিকাশ সাধন করিতে পারে। আর যেহেতু এই বিকাশ কেবল বিশেষ বিশেষ মানবের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানের অন্যান্য জাগতিক ক্রিয়ার ন্যায় একটা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানবজাতির জন্য অভিপ্রেত, ভগবান অবতাররূপে আসেন মানবজাতিকে অগ্রগমনে সাহায্য করিবার জন্য, যুগসন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে ঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, লোকসংগ্রহায়। অধোমুখী শক্তিসকল যখন বাড়িয়া উঠে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে, যত দূরবর্ত্তীই হউক পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী অবস্থানিচয় প্রস্তুত করিতে, জ্যোতি ও সিদ্ধির উপাসক সাধুগণের জয় এবং যাহারা জগতে অশুভ ও অন্ধকারকেই স্থায়ী করিয়া রাখিতে চায় তাহাদের পরাজয় বিধান করিতে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

"এই জগৎ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধের দুইটা দিক আছে, ভিতরের যুদ্ধ ও বাহিরের যুদ্ধ; গীতা এই দুই দিকের উপরই ঝোঁক দিয়াছে। আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে শত্রুগণ হইতেছে ভিতরের, ব্যষ্টির মধ্যে, এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহঙ্কারকে বধ করিয়াই এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। কিন্তু মানুষের সমষ্টিগত জীবনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের শক্তি-সকলের মধ্যে একটা বাহিরের যুদ্ধ চলে। মানুষের মধ্যে যে ভাগবতভাব, ভাগবত প্রকৃতি রহিয়াছে এবং যে সকল মনুষ্য ইহার প্রতিভূ, বা মানবজীবনে ইহার বিকাশ করিবার সাধনা করিতেছে তাহারা ধর্ম্মের সহায় হয়; আর দুর্দ্ধর্ষ অহমিকাপূর্ণ আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতি এবং যে সকল মানুষ ইহার প্রতিভূ, ইহারই তৃপ্তি চায় তাহারা অধর্ম্মের সহায় হয়। এই সংগ্রামের রূপকস্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধের কথায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পূর্ণ, মহাভারতের যে যুদ্ধের কেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকেও এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধেরই রূপক বলা হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরা দেবগণের সন্তান, মানবীয় রূপের মধ্যে দেবগণের শক্তি, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, আর তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা দানবীয় শক্তির মূর্ত্তি, অসুর। এই বাহিরের যুদ্ধেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে, দুষ্কৃত অসুরগণের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদের দ্বারা সমর্থিত অধর্ম্মের শক্তিকে দমন করিতে এবং উৎপীড়িত ধর্ম্মের আদর্শ-সকলকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ভগবান আবির্ভূত হন। যেমন ব্যষ্টিগত মানবের অন্তরে আভ্যন্তরীণ স্বর্গরাজ্য গড়িয়া দিতে, তেমনিই সমষ্টিগত জীবনেও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যকে আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া দিতে অবতার আগমন করেন।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—অবতারের জন্ম ও কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া অনেকেই অনেক রকম সমালোচনা করিয়া থাকেন। কেহ প্রশ্ন করেন, ভগবান সঙ্কল্প করিলেই শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লোপ পায়, তিনি রাবণাদি দুষ্টদিগের নিধনার্থে অস্ত্র ধারণ করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হন, মানবজীবনেরই উচ্চতম সম্ভাবনা সকল দেখাইবার জন্য। তিনি যদি সকল কর্ম্মই অলৌকিকভাবে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মানব দেহে, প্রাণে, মনে ভাগবত চৈতন্য, ভাগবত শক্তির প্রকাশ—ইহাই অবতার। অবতার যে কোন অলৌকিক কার্য্য (miracle) করিবেন না তাহা নহে, এরূপ কার্য্য মানবশক্তির বহির্ভূত

নহে, মানুষের দ্বারাও অনেক অলৌকিক কাণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু এই সব অলৌকিক কীর্ত্তি দেখানই অবতারের মূল লক্ষণ নহে। অনেকেই সমালোচনা করেন যে, রামচন্দ্র যেরূপ অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে ভগবান বলা ত দূরের কথা, তাঁহাকে একজন সাধু ব্যক্তি বলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। এরূপ সমালোচনাও ভ্রান্ত বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। শ্রীরামচন্দ্র আসিয়াছিলেন পাশবিক শক্তি-সকলকে দমন করিয়া পৃথিবীতে মানবজাতি, মানব সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশ নিরাপদ ও সুব্যবস্থিত করার জন্য। তাঁহার কাজ ছিল বহির্জগতে রাবণ ও বালীকে বধ করা, তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বালীর সহিত রামচন্দ্র ধর্ম্মযুদ্ধ করেন নাই। কিন্তু হিংস্র পশুকে বধ করিবার সময় কেহ ক্ষত্রিয়োচিত ন্যায়-যুদ্ধের নিয়ম অনুসরণ করে না, বালীর ন্যায় অতি দুর্দ্দান্ত অতীব শক্তিশালী পশুকে যে-কোন উপায়ে বধ করাই কর্ত্তব্য এবং রামচন্দ্র প্রকৃষ্টভাবেই সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বহির্জগতে রাবণ, বালী হইতেছে আমাদের অন্তর্জগতের কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য আদি পাশবিক প্রকৃতির বাহ্য প্রতীক। এই সকল প্রবৃত্তিকে কোন রূপ প্রশ্রয় দিতে নাই, তাহাদের সহিত কিছু মাত্র আপোষ করিলেই তাহারা সুযোগ বুঝিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যে-কোন উপায়ে তাহাদিগকে বধ করিয়াই কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিতে হয়। রামচন্দ্র মানুষের মধ্যে আসিয়া মানুষ ভাবেই কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিন্তু সে-সব কর্ম্ম এমন মহত্ত্ব, শক্তি ও উদারতার সহিত করিয়াছিলেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর পরে আজও তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া অসংখ্য নরনারীর দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইতেছেন। তিনি যে-কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা প্রকৃষ্টভাবেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এমন আপত্তিও উঠে যে, পাপীগণকেও সংহার করা ভগবানের পক্ষে নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। তিনি কি সদুপদেশ ও নিজ প্রভাবের দ্বারা তাহাদের সংশোধন করিতে পারেন না? বস্তুতঃ ভগবানের মধ্যে কোনরূপ নিষ্ঠুরতা বা পক্ষপাতিত্ব নাই। সাধুগণ যেমন তাঁহার সন্তান, অসাধু ও পাপীগণও তেমনই তাঁহার সন্তান এবং সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা। পাপী পাপ কর্ম্ম করিবার শক্তি ভগবান হইতেই পাইয়াছে, অসুরেরা ভগবানের শক্তিতেই বলীয়ান। তাহাদিগকে যে-শক্তি দেওয়া হইয়াছে নিজেদের কল্যাণ

ও জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য, তাহারা যখন সেই শক্তির অপব্যবহার করিয়া নিজেদের ও জগতের অকল্যাণ করিতে অগ্রসর হয় তখন তাহাদিগকে বাধা দিতে হয়, আর যদি তাহারা কিছুতেই নিজদিগকে সংশোধন করিতে না চায়, ভগবদ্দ্বেষী হইয়া অতীব অশুভের শক্তি হইয়া উঠে তখন তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াই তাহাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ করুণা দেখান হয়, নতুবা নিজেদের অশুভ কর্ম্মের দ্বারা তাহারা নিজেদের উপর গভীরতর দুর্ভাগ্য আনয়ন করিবে। মহাকালী কর্তৃক অসুর নিধন সম্বন্ধে চণ্ডীতে ইহাই বলা হইয়াছে—

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি।

"হে দেবি, এই সকল দৈত্যগণ নিহত হওয়ায় জগৎ সুখপ্রাপ্ত হইল, পরন্তু ইহারা যেন চিরকাল নরক ভোগার্থ পাপ না করে এবং সংগ্রামে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারে এই হেতুত্রয় স্মরণ করিয়া অনুগ্রহবুদ্ধিতেই তুমি জগতের অহিতকারী মহিষাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিয়াছ।"

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্ম্ম শব্দটির একটি নৈতিক ও ব্যবহারিক অর্থ আছে, একটি স্বাভাবিক ও দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে; এই সকল অর্থের যে কোন একটিকে লইয়া এবং অপরগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল ধার্ম্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। নৈতিক অর্থে ধর্ম্ম শব্দে বুঝায়, ন্যায়, সদাচার, অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ইহার দ্বারা বুঝায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের বিধান, অথবা আরও সংক্ষেপে সমাজধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যখন অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সজ্জনগণকে রক্ষা করিতে এবং অসজ্জনদিগকে বিনাশ করিতে, অন্যায় অত্যাচার ধ্বংস করিয়া মানবসমাজে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন। এইরূপে কৃষ্ণাবতারের নৈতিক পৌরাণিক ব্যাখ্যা হয় এই যে, কুরুদের

অন্যায় অত্যাচার দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতাগণের মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া পৃথিবীর পক্ষে এমন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল যে, পৃথিবী তাহার ভারের লাঘব করিতে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্ম্মী কৌরবগণের বিনাশ সাধন করেন। বিষ্ণুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের প্রয়োজনও এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলা ধ্বংস করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলীর শাসন ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে কেবল ব্যবহারিক, নৈতিক বা সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া যে লৌকিক ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, তাহা সহজেই বোধগম্য। এইরূপ বর্ণনায় অবতারের আধ্যাত্মিক অর্থটি ধরা হয় না, আর এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনেই যদি সব হইত, তাহা হইলে খৃষ্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্য্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং সাধুগণের পরিত্রাণ মোটেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্যই এক নূতন অধ্যাত্ম বাণী, দিব্য জীবন বিকাশ ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধির এক অভিনব নীতি। আবার অন্যপক্ষে যদি আমরা ধর্ম্ম শব্দের কেবল আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম্ম বলিতে শুধু আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনের নীতি বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল তথ্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্ম্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় দিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম্ম দেখিতে পাই, এবং এইরূপই হইবার কথা, কারণ অবতার মানব সমাজে ভগবানেরই কার্য্যভার গ্রহণ করেন, জগতের মধ্যে ভাগবত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা যেভাবে কর্ম্ম করে অবতারও তাহাই অনুসরণ করেন, এবং সেই ইচ্ছা যেমন আভ্যন্তরীণভাবে তেমনই বাহ্যিকভাবে নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে আত্মার মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিকাশের দ্বারা, এবং জীবনের বাহ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা। কোনও মহান আধ্যাত্মিক গুরু বা ত্রাণকর্ত্তারূপে, খৃষ্ট ও বুদ্ধরূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক প্রকাশকাল শেষ হইবার পর তাঁহার কর্ম্মের ফলে মানবজাতির কেবল নৈতিক জীবনেই নহে, পরন্তু

সামাজিক ও বাহ্যিক জীবনে এবং মানবজাতির আদর্শ-সকলে গভীর ও শক্তিশালী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। আবার অন্যপক্ষে তিনি দিব্য জীবন, দিব্য ব্যক্তিত্ব ও শক্তির বিশিষ্ট ক্রিয়া লইয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার জন্য; রাম ও কৃষ্ণের জীবন কাহিনী বাহ্যতঃ এইরূপই; কিন্তু সকল সময়েই এইরূপ অবতারের ফল মানবজাতির আভ্যন্তরীণ জীবন গঠন ও দিব্য জন্মলাভে স্থায়ী ভাবে ক্রিয়া করে। অবতারত্ব ভাগবত জীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন বাহ্য কর্ম্মেই ইহা প্রকট হইতে পারে, কিন্তু উহার অধ্যাত্ম প্রভাব ঐ কর্ম্ম শেষ হইবার পরও স্থায়ী হইয়াই থাকিবে; আবার কোনও অধ্যাত্ম প্রভাব বা শিক্ষা দিয়াই অবতারত্ব সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যখন সেই নূতন ধর্ম্ম ও সাধনা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে তখনও মানবজাতির চিন্তা, প্রকৃতি ও বাহ্য জীবনে তাহার স্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার বর্ণনার অর্থ বুঝিতে হইলে, ধর্ম্ম শব্দের পূর্ণতম, গভীরতম, উদারতম অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য নীতি দ্বারা ভাগবত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মানবজাতির অধ্যাত্ম বিকাশ সাধন এবং তাহার উপযোগী অবস্থা ও পরিণাম-সকলের বিধান করিতেছে তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সম্ভবামি যুগে যুগে—পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প, এক কল্পে ১৪ মন্বন্তর, এবং প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগ ঘুরিয়া আইসে। কোন যুগ কত বৎসর স্থায়ী হয় তাহারও সঠিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে—যথা, সত্যযুগ ১৭২৮০০০, ত্রেতা ১২৯৬০০০, দ্বাপর ৮৬৪০০০, কলি ৪৩২০০। কিন্তু গীতার অর্থ বুঝিতে এই সকল গণিতাঙ্ক গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মানবজাতির অধ্যাত্ম বিকাশে ক্রমান্বয়ে যে কালের বিভাগ দেখা যায় তাহাকেই যুগ বলা যায়। প্রাচীন মতে সত্যযুগে মানুষ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আদর্শ জীবন যাপন করিত, তখন কোনরূপ রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না, সকলেই স্বভাবতঃ আভ্যন্তরীণ দিব্য ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া চলিত, সকলেই প্রবুদ্ধ আত্মার আলোকে দিব্যভাবে স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবন যাপন করিত। কিন্তু সেই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ ধর্ম্মের অধঃপতনের ভিতর দিয়া মানুষ কলিযুগের মধ্যে

আসিয়া পড়িয়াছে। কলিযুগের শেষে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে— এইভাবে পুনঃ পুনঃ চতুর্যুগ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীতে সত্যযুগ এ-পর্য্যন্ত আসে নাই, সেটি কেবল একটি আদর্শ মাত্র, মানুষ ক্রমশঃ সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে মানুষ যে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া চলিতেছে, তাহাতে একটি চক্রবৎ গতি (cyclic wheel of evolution) দেখা যায়। মানবজাতি, মানব সমাজ ভাল অবস্থা হইতে ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে এবং মন্দতম অবস্থায় উপনীত হইয়া আবার এক ভাল অবস্থা আরম্ভ করিতেছে এবং এইভাবেই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মন্দতম যুগটিই কলি নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে আমরা এক কলিযুগের শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি, ইহার শেষ হইয়াছে বা হইতেছে, একটা নূতন সত্যযুগ আরম্ভ হইতেছে, এ-কথা বহু সাধুসন্তের মুখেই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯

অন্বয়—হে অর্জ্জুন! যঃ মে জন্ম দিব্যং কর্ম্ম চ এবং তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম ন এতি, মাং এতি।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম এইরূপ তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, হে অর্জ্জুন! তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং—এই অধ্যায়ের পঞ্চম হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত দিব্য জন্মের ধারা এবং দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত দিব্য কর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর "দিব্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরম্, শ্রীধর বলিয়াছেন, দিব্যমলৌকিকং। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম যে সাধারণ মনুষ্যের মত নহে তাহা সত্য, কিন্তু উহা ভ্রান্তি বা অপ্রাকৃত ব্যাপার নহে, মানুষ ঐ দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া নিজেকেও ঐরূপ দিব্য ভাবে গড়িয়া তুলিবে, ইহাই অবতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ অবতারের জন্মের যে দিব্য রহস্য রহিয়াছে, সকল মানুষের জন্মে বাহ্যতঃ না হইলেও মূলতঃ সেই রহস্যই রহিয়াছে, কারণ সকল জীব মূল শাশ্বত সত্তায়

ভগবানের সহিত এক এবং ব্যক্তিগত সত্তাতেও প্রত্যেকেই ভগবানের অংশ, মমৈবাংশঃ—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ ভগবান খণ্ডে খণ্ডে ভগ্ন বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না, ইহা সেই একই চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, সেই একই বিশ্বময় আত্মানন্দ কর্তৃক বিশ্বলীলার আংশিক আনন্দ আস্বাদন, অতএব সেই এক অনন্ত অপরিমেয় সত্তারই প্রকৃতিতে আবির্ভূত সীমাবদ্ধ ও সসীম সত্তা। এই সসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, অবিদ্যা। এই অজ্ঞানের বশে মানুষ ভুলিয়া যায় যে, সে ভগবান হইতেই আসিয়াছে; এমন কি তাহারই হৃদয়ের মধ্যে গুপ্তভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই মানবীয় চৈতন্যের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন, তাঁহাকেও ভুলিয়া যায়।

মানুষের জন্ম যে দিব্য রহস্য, অবতারের জন্ম সেই রহস্যেরই আর একটা দিক। বিশ্বময় ভগবানই মানুষরূপে আবির্ভূত হইতেছেন, সাধারণ মনুষ্য-জন্মে সেই আবির্ভাবের প্রকৃতিভাবটাই প্রবল, অবতারের জন্মে তাহার ভাগবতভাবই প্রবল। একটিতে তিনি তাঁহার অংশকে মানবীয় প্রকৃতি কর্তৃক অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হইতে দেন, অন্যটিতে ভগবান স্বয়ং নিজের অংশ ও তাহার প্রকৃতিকে অধিকার করেন এবং দিব্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ মানুষের ন্যায় ক্রমবিকাশ বা ঊর্দ্ধগতির দ্বারা নহে, দিব্যজন্মের মধ্যে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়া নহে, পরন্তু ভগবান সোজাসুজি মানবীয় আধারের মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং মানবীয় রূপ গ্রহণ করেন। তবে মানুষের ঐ ক্রমবিকাশ বা ঊর্দ্ধগতিকে সাহায্য করিবার জন্যই ভগবান নামিয়া আসেন, অবতারত্ব স্বীকার করেন; এইটি গীতা খুবই স্পষ্টভাবে বলিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকটন সম্ভব, ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায় উহার স্বরূপ কি এবং নিজেরা উহাতে গড়িয়া উঠিবার ভরসা পাইতে পারে। অবতার ঐ প্রকটনের প্রভাব পার্থিব প্রকৃতিতে স্পন্দমান রাখিয়া যান এবং উহার আভ্যন্তরীণ শক্তি পার্থিব প্রকৃতির ঊর্দ্ধমুখী প্রয়াসকে পরিচালিত করে। দিব্য মানবত্ব কিরূপ তাহারই একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেওয়া অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। সাধারণ মানুষ অবতারকে চিনিতে চায় তাঁহার বাহ্যিক কর্ম্মের দ্বারা, এবং ঐরূপ সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশরূপ

কর্ম্মের জন্যই তাহারা তাঁহাকে পূজা করিতে প্রস্তুত। কেবল যাঁহারা আধ্যাত্মিক তাঁহারাই দেখিতে পান যে, শাশ্বত আভ্যন্তরীণ ভগবান তাঁহাদেরই মানবীয় মন ও দেহের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, বাহ্যিক অবতারত্ব হইতেছে মানবীয় রূপের মধ্যে তাঁহারই প্রতীক, যেন তাঁহারা উহার সহিত ঐক্যলাভ করিতে পারেন, এবং উহার দ্বারা অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের দিব্য আবির্ভাব এবং আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ মানবীয়তার মধ্যে শাশ্বত অবতারের আবির্ভাব মূলতঃ একই আভ্যন্তরীণ সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, সকল মানুষেরই আভ্যন্তরীণ জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ—সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীগণের বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন, অবতারের এই সব উদ্দেশ্য লোকবিদিত—কিন্তু বাহ্যিকভাবে শুধু এইগুলি দেখিলেই ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝা যায় না, গীতা এখানে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে। শুধু ধর্ম্ম সংস্থাপন, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্টের আবির্ভাব অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে, সে আবির্ভাবের এক মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, এক শ্রেষ্ঠতর ও দিব্যতর উপযোগিতা আছে, ধর্ম্মসংস্থাপন কেবল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে সহায় হয়। কারণ দিব্য জন্মের দুইটি দিক আছে; একটি হইতেছে অবতরণ, মানবীয়তার মধ্যে ভগবানের জন্ম, মানবীয় রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত পুরুষের আত্মপ্রকটন, চিরন্তন অবতার; অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবতের মধ্যে মানুষের জন্ম, মানুষের পক্ষে ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে উঠা, মদ্ভাবমাগতাঃ; ইহা জীবের দ্বিতীয় জন্ম, নবজন্মলাভ। এই নবজন্ম লাভে সহায়তা করাই অবতার ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য। গীতায় অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবামাত্র সহসা যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ গোঁড়া টীকাকারেরাও এই অর্থটি ধরিতে পারেন না। অথচ অবতারবাদের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে এইটি জানা প্রয়োজন।

ভাগবত জীবনের মধ্যে মানুষকে উঠিতে সাহায্য করিবার জন্যই ভগবানের

অবতরণ, নতুবা শুধু ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন নাই। অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতার সার কথা তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু শুধু এই অংশটি না ধরিয়া গীতার অন্যান্য অংশও যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। গীতা যে বলিয়াছে সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজিত, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত, আমাদিগকে এখানে তাহা স্মরণ করিতে হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাহার সৃষ্টির সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার শিক্ষা মনে করিতে হইবে; বিভূতি তত্ত্বের উপর গীতা যেরূপ জোর দিয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষায় নিঃস্বার্থ কর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের দিব্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের দিব্য অধীশ্বর উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। নবম অধ্যায়ে গীতা বলিয়াছে "মূঢ় ব্যক্তিগণ মানবদেহে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করে কারণ তাহারা সর্ব্বভূতের ঈশ্বর রূপে আমার পরম তত্ত্ব অবগত নহে।" এই সকল তথ্যের আলোকে গীতা এখানে যাহা বলিতেছে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে,—"ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাঁহাতেই পূর্ণ হইয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহারা তাঁহারই প্রকৃতি লাভ করে, মদ্ভাবমাগতাঃ।" কারণ তাহা হইলে আমরা দিব্য জন্ম ও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব, বুঝিব যে, উহা একটা বিচ্ছিন্ন বা অলৌকিক ঘটনা মাত্র নহে, জগৎ প্রকটন রূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে; আর তাহা না হইলে আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়ত একেবারেই এই অবতারতত্ত্বকে উড়াইয়া দিব, অথবা অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই ইহাকে মানিয়া লইব অথবা বর্ত্তমান যুগের মানুষ গভীর চিন্তা না করিয়া এই সম্বন্ধে যে সব তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করে, আমরা তাহাদের মধ্যেই পতিত হইব, পরন্তু ইহার নিগূঢ় সাহায্যপ্রদ অর্থটি ধরিতে পারিব না।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি। এই সংসার দুঃখময়, প্রকৃতির বশে মানুষকে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই জন্মচক্র হইতে মুক্ত হইয়া সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করাই প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ছিল, ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-

নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। গীতা এই লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে, গীতোক্ত সাধনার দ্বারাই সকল অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য মোক্ষ প্রকৃষ্টভাবেই লাভ করা যায়। তবে পুনর্জ্জন্ম বলিতে গীতা জীবের পক্ষে অবশভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণই বুঝিয়াছে। কারণ ভগবানও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি, কিন্তু সে জন্ম স্বেচ্ছায় লোক-হিতার্থ পরিগৃহীত হয়। মুক্ত পুরুষও ভাগবতভাব লাভ করিয়া ভগবানেরই ন্যায় জগতের হিতার্থে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং এইভাবে ভগবান জগৎলীলার যে আনন্দ আস্বাদ করেন তিনিও তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া সেই আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন।

মামেতি সোঽর্জ্জুন। ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলে আর কিছুই জানিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ যে ভাগবত জীবন লাভ মানবের লক্ষ্য, তাহার সকল রহস্যই অবতারের জন্ম ও কর্ম্মের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাহারা অবতারের উপাসনা করে, অবতারের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাহারা নীচের প্রকৃতির সকল অশুদ্ধি ও অপূর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া ভাগবতভাব লাভ করে, ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০

অন্বয়। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ বহবঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ।

অনুবাদ। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া, আমাতেই পূর্ণ এবং আমার শরণাপন্ন হইয়া, জ্ঞানময় তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকেই আমার ভাব (অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাগবত প্রকৃতি) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। গীতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে যে, দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে আসক্তি, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রাণিক বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে এবং সেই জন্য এই সব বিক্ষোভের কারণ হইতে দূরে সরিয়া না যাইয়া ইহাদের সম্মুখে থাকিয়াই রিপুগণের বেগ সহ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে, তান্ তিতিক্ষস্ব। এইভাবে দৃঢ়নিষ্ঠাযুক্ত সাধনার দ্বারা

ক্রমশঃ যেমন কামক্রোধাদি শান্ত হইয়া আসিবে, তেমনই চিত্তকে ভগবদ্ চিন্তা, ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ করা সম্ভব হইবে। যাহারা সর্ব্বদা কামক্রোধাদির দ্বারা বিচলিত তাহারা ভগবানে সমগ্র মন দিবে কেমন করিয়া ?

মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। শঙ্কর "মন্ময়" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ, ব্রহ্মবিৎ, পরমেশ্বর হইতে আপনাকে অভিন্নরূপে যিনি দর্শন করেন। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া মধুসূদন বলিয়াছেন, যিনি "তৎ"রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বম্" রূপ জীবকে অভেদরূপে দেখেন। শঙ্কর কিরূপ স্বেচ্ছামত গীতার ব্যাখ্যা করিয়া নিজের জ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যাটি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। মৎ+ময়=মন্ময় অর্থাৎ আমাতে পূর্ণ, full of me, আমরা যে বস্তুতে আসক্ত হই, যাহাকে ভালবাসি আমাদের সমস্ত চিত্ত তাহাতে পূর্ণ হইয়া উঠে, আমরা তাহার সদৃশ হই, তাহার ভাব প্রাপ্ত হই, সেইরূপ যখন ভগবানে আমাদের চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে তখনই হয় তন্ময় অবস্থা। এখানে ভগবানের সহিত অভেদজ্ঞানের কোন কথা নাই। গীতার অন্যান্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ শঙ্করের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, মন্ময়া মৎপ্রচুরাঃ সর্ব্বত্র মাং বিনা ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যিনি একমাত্র ভগবানেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, মদেকচিত্তঃ। যখন আমরা সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করি, আমাদের সকল কর্ম্ম হয় ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ, ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তিই হয় আমাদের সকল আনন্দের উৎস—তখনই আমাদের গীতাকথিত "মন্ময়" অবস্থা হয়। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ এই অবস্থারই বর্ণনায় গাহিয়াছেন,

ভোজন করি মনে করি
আহুতি দিই শ্যামা মাকে।

শঙ্কর "মামুপাশ্রিতাঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আমাকেই যাঁহারা আশ্রয় করেন, অর্থাৎ যাঁহারা কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ", কিন্তু এ অর্থ কেমন করিয়া হইতে পারে ? ভক্তেরাও ভগবানকে আশ্রয় করেন, কর্ম্মীরাও ভগবানকে আশ্রয় করেন। শঙ্কর এখানে মাম্ বলিতে বুঝিতেছেন নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয় নীরব ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে হইলে কেবল জ্ঞানের পথই ধরিতে হয়, কারণ সেখানে কর্ম্মের স্থান নাই, ভক্তির কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এখানে গীতা অবতারের মানবরূপে জন্ম ও কর্ম্মের কথাই বলিতেছে ; পরম সত্তায় যিনি

নিগুর্ণ মাত্র নহেন, নিগুর্ণ সগুণ, অক্ষর ক্ষর, সবই যাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে যিনি বিশ্বাতীত হইয়াও মানবরূপে অবতীর্ণ হন, গীতা "অহং" "মাম্" বলিতে সর্ব্বত্র সেই পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছে এবং এই অর্থই সহজ ও স্বাভাবিক গীতা কোথাও বলে নাই যে, জীব ভগবানের সহিত এক, অভেদ। মূল সত্তায় সকলেই পরমাত্মা, ভগবানের সহিত এক, কিন্তু ব্যষ্টিগত সত্তায় ও প্রকৃতিতে জীব হইতেছে ভগবানের অংশ,মমৈবাংশঃ ; জীবের যে প্রকৃতি, তাহা ভগবানের পরা প্রকৃতিরই অংশ, কিন্তু তাহা এখানে ত্রিগুণাত্মিকা রূপ ধারণ করিয়াছে, জীবকে এই অপরা প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া ভাগবত স্বরূপ, ভাগবত প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে, এবং তাহার উপায় হইতেছে সমগ্র সত্তা লইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। আমাদের মানবীয় চৈতন্যকে ভাগবত চৈতন্যে পরিণত করিতে হইলে, ভগবদ্‌ভাব লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে তন্ময় হইতে হইবে, আমাদের সকল চিন্তা,কর্ম্ম,ভক্তি,প্রেম ভগবদ্‌মুখী করিতে হইবে,যেন আমাদের সকল চৈতন্য ভগবানেই পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ভগবান যদি দূরতম, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ,অনির্দ্দেশ্য,নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মাত্র হন,তাহা হইলে তাঁহাকে এইভাবে সমগ্র সত্তা লইয়া আশ্রয় করা যায় না। যাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারি, যাঁহাকে হৃদয় আসনে বসাইতে পারি, যাঁহার পূজা করিতে পারি, যাঁহার কর্ম্মে, যাঁহার সেবায় আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারি, যাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও প্রেম অর্পণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি, ভগবান যদি এমন ভাবে আমাদের সম্মুখে আসেন তবেই আমাদের পক্ষে তন্ময় হইয়া উঠা সম্ভব হয়। অবতারে ভগবান ঠিক এইভাবেই মানুষের অতি নিকট, অতি আপনার জন হইয়া আসেন, কেবল মূঢ় ব্যক্তিরাই তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, চিনিতে পারে না, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে না। * অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাঁহারাই লাভ করিতে পারেন,যাঁহারা ইহা হইতে দিব্যজন্ম ও দিব্য কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারেন,যাঁহাদের চৈতন্য ভগবানেই পূর্ণ হইয়া উঠে, যাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র সত্তা লইয়াভগবানের শরণাপন্ন হন,মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ—শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্য তপস্যা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া কেবল জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারাই পরম গতি লাভ করা যায়, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য "জ্ঞানতপসা" এই প্রকার বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়াছে। শঙ্করের মতে জ্ঞানই মোক্ষ লাভের উপায়, কর্ম্ম ও ভক্তি

কেবল আনুষঙ্গিক ও প্রাথমিক সাধনা হইতে পারে। কিন্তু ইহা কখনই গীতার শিক্ষা নহে। গীতোক্ত পন্থা হইতেছে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয়। গীতা কোথাও বলিয়াছে কর্ম্মের দ্বারাই পূর্ণতম সিদ্ধি লাভ করা যায় (৩।২০), কোথাও বলিয়াছে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী ভগবানের আত্মস্বরূপ (৭।১৮), আবার কোথাও বলিয়াছে ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী (৬।৪৭)। গীতার কোন একটি অংশের উপর ঝোঁক দিয়া, অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, গীতার মতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কিম্বা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কিম্বা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই ভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন সাম্প্রদায়িক মত স্থাপন করিতে নিজেদের সুবিধামত গীতার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শঙ্করাদির মতে গীতার যোগ হইতেছে জ্ঞান যোগ; রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে গীতার যোগ ভক্তিযোগ, আবার গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মতে গীতার যোগ হইতেছে প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ। কিন্তু গীতা এইভাবে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনের জন্য রচিত হয় নাই, গীতার মধ্যে সকল মত, সকল পন্থার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গীতা যে কখনও কর্ম্মকে, কখনও জ্ঞানকে, কখনও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে, তাহার কারণ সম্যকভাবে যে কোনটিরই অনুসরণ করা হউক, তাহার মধ্যে অপর দুইটি নিহিত থাকিবেই। যিনি সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সর্ব্ববিদ্, তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রেমময় ভগবানকে দেখিবেন, সর্ব্বভাবে তাঁহার সেবা ও ভজনা করিবেন। কর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধি তখনই লাভ করা যায়, যখন পূর্ণ জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হয়। ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা, ভগবানের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারাই আমরা ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করি, কিন্তু এইরূপ সমগ্র আত্মসমর্পণের জন্য সমগ্র জ্ঞানের প্রয়োজন। ভগবানকে তাঁহার সকল তত্ত্বে জানিতে হইলে যেমন তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় সত্তায়, তেমনই সকল মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বররূপে, মানবশরীরে অবতীর্ণ অবতাররূপে জানিতে হইবে, ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে হইবে, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সমস্ত মলিনতা দূর হইয়া যাইবে, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ, তখনই আমরা ঠিক ভাবে, পূর্ণভাবে নিজেদিগকে এবং নিজেদের সমস্ত শক্তিকে ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে পারিব এবং সেই আত্মসমর্পনের শক্তিতে নীচের প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভাগবত প্রকৃতি, মদ্ভাবম্, লাভ করিতে পারিব।

শঙ্কর ভগবানের শুধু নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর সত্তার উপরেই জোর দিয়াছেন, শঙ্করের মতে উহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তা, পরম আত্মা, পরম ব্রহ্ম এবং জীব সেই ব্রহ্মের সহিত এক। জীবকে মুক্তি লাভ করিতে হইলে কোন পরিবর্ত্তন বা বিকাশের ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, জীব স্বরূপতঃ চিরদিনই যেমন তেমনিই থাকে, জীব ব্রহ্ম, কেবল অজ্ঞানের বশে সে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, .এই অজ্ঞান দূর হইলেই সে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে এবং তাহাই মোক্ষ। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে কর্ম্ম ও ভক্তি গৌণ হইয়া পড়ে, যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ হইতেছে ততক্ষণই তাহাদের সার্থকতা ও উপযোগিতা জ্ঞানলাভের সহায়রূপে। কিন্তু গীতায় আমরা এই মত দেখিতে পাই না। গীতার মতে জীব ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, ক্রমশঃ তাহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিতেছে, এবং ইহার জন্য যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রয়োজন। সিদ্ধি লাভের পরও কর্ম্ম ও ভক্তি থাকে, কারণ গীতার মতে সিদ্ধি ও মুক্তিলাভের অর্থ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে লীন হওয়া নহে, পরন্তু পুরুষোত্তমের সহিত সর্ব্বভাবে যুক্ত হওয়া, তাঁহার ভাব লাভ করা, তাঁহার মধ্যে বাস করা—এবং তখনই জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্ম ও ভক্তি তাহাদের পূর্ণতম সিদ্ধি, দিব্যতম স্বরূপ লাভ করে।

মদ্ভাবমাগতাঃ—শঙ্করের মতে "মদ্ভাব" শব্দটির অর্থ মোক্ষ অর্থাৎ এক ব্রহ্মের মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত সত্তার বিলোপ সাধন; কিন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে গীতার মত এইরূপ আত্মবিলোপ সাধন নহে, তাহা হইতেছে ভগবানের সহিত একই সঙ্গে সকল ভাবে মিলন। মূল সত্তায় জীব ভগবানের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিবে, ব্রহ্মভূতঃ, তাঁহারই ন্যায় সচ্চিদানন্দ হইবে, ইহাকেই বলা হয় "সাযুজ্য" মুক্তি। মুক্ত জীব চিরকাল পরমানন্দে ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, নিবসিষ্যসি মর্য্যেব, ইহাই "সালোক্য।" মুক্ত জীব তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানের চির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহাই "সামীপ্য"। জীবের মুক্ত প্রকৃতি ভাগবত প্রকৃতির সদৃশ হইয়া উঠিবে, কারণ মুক্ত জীবের পরম সিদ্ধি হইতেছে ভগবানের সদৃশ হইয়া উঠা, "সাদৃশ্য" মুক্তি; গীতার মদ্ভাবমাগতাঃ, সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ বলিতে এই সাদৃশ্য মুক্তিই বুঝায়। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সত্তার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, "সাযুজ্য", তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়া গণ্য করে। ভক্তিযোগ ভগবানের নিকটবর্ত্তিতা কিম্বা তাঁহার

মধ্যে নিত্য আনন্দময় নিবাসকেই মহত্তর মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, "সালোক্য", "সামীপ্য"। কর্ম্মযোগ সত্তা ও প্রকৃতির শক্তিতে ভগবানের সহিত একত্ব লাভের দিকে লইয়া যায়, "সাদৃশ্য"। কিন্তু গীতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক মহত্তম, সমৃদ্ধতম দিব্য মুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে।

মানুষের মধ্যে নীচের প্রকৃতির উর্দ্ধে যে ভাগবত প্রকৃতি রহিয়াছে, অবতার আসেন সেইটিকেই প্রকট করিতে; তিনি দেখাইয়া দেন দিব্য কর্ম্মের স্বরূপ কি—এরূপ কর্ম্ম মুক্ত, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, নির্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন, তাহা দিব্য জ্যোতি, দিব্য শক্তি, দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য ভাবে মানুষের চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহার ক্ষুদ্র অহমিকাপূর্ণ ব্যক্তিকভাব দূর হইয়া যায়, যেন সে অহং হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত বিশ্বময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। তিনি আসেন ভাগবত শক্তি ও প্রেম রূপে, তাহা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, যেন তাহারা তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন আর তাহারা মানবীয় সঙ্কল্পের অক্ষমতা, মানবীয় ভয়, ক্রোধ, বিক্ষোভকেই ধরিয়া না থাকে, এবং এই সব অশান্তি ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের শান্তি ও আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

অন্বয়—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, অহং তান্ তথা এব ভজামি; পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ। মনুষ্যগণ যে ভাবে আমার নিকটে আসে, আমি সেইভাবেই তাহাদিগকে ভজনা করি; হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পন্থা অনুসরণ করে।

ব্যাখ্যা

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। ভগবানকে তাঁহার অজ অব্যয় পরম সত্তায় জানা দেহধারী জীবের পক্ষে সহজ নহে। মানুষ সাধারণতঃ তাঁহার

কোন একটি ভাব বা রূপকেই অবলম্বন করে, এবং সেইটিকে ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন তখন তাঁহার যে-কোন ভাব আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী হয়, আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহার উপাসনা করিতে পারি এবং সেই যোগ সূত্রের দ্বারাই আমরা ভগবানকে সমগ্রভাবে জানিতে পারি, তাঁহার ভাব লাভ করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল। তাঁর অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হ'ল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।"

সব যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, শাশ্বতের সহিত মিলনের প্রয়াস। ভগবান ও শাশ্বত সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি যত পূর্ণ হয়, তদনুযায়ীই হয় সেই সন্ধানের ধারা, সেই মিলনের গভীরতা ও পূর্ণতা এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। মানুষ মনোময় পুরুষ, তাহাকে তাহার সান্ত মনের ভিতর দিয়াই অনন্তের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, এই সান্তেরই কোন সন্নিহিত দ্বার অনন্তের দিকে খুলিতে হয়। সে এমন কোনও পরিকল্পনার সন্ধান করে যেটিকে তাহার মন ধরিতে পারে। তাহার প্রকৃতির এমন কোনও শক্তিকে সে বাছিয়া লয় যাহা নিজকে চরমে উন্নীত করিয়া অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পারে, যে সত্য তাহার মানসিক ধারণার অতীত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে। সত্য অনন্ত, সেই জন্যই তাহার আছে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থের অগণ্য বাক্য, অগণ্য আত্ম-ব্যঞ্জনা, সেই অনন্ত সত্যের কোন একটি মুখকে সে দেখিবার চেষ্টা করে, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতর দিয়া সে সেই অপরিমেয় সত্যে পৌঁছিতে পারে। সে দ্বার যতই সঙ্কীর্ণ হউক, যদি তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত অনন্তের দিকে কতকটা দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে যে আহ্বান করিতেছে তাহার অপরিসীম গভীরতা ও দুরারোহ শিখরের দিকে তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সে পরিতুষ্ট হয়। আর যে-ভাবে সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, সেও তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। শঙ্কর "ভজামি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "অনুগ্রহ করিয়া থাকি"। ভগবানে পক্ষপাতিত্ব নাই। রাগদ্বেষের বশে বা মোহের বশে তিনি কাহাকেও ভজনা করেন না। যে যথা অর্থাৎ যে-প্রয়োজনে, যে-ফলাকাঙ্ক্ষায় ভগবানকে আশ্রয় করে ভগবান তাহাকে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই শঙ্করের ব্যাখ্যা। ইহাও গীতার শিক্ষা সন্দেহ নাই, গীতা অন্যত্র এই কথা বলিয়াছে (৭।২১,২২)। কিন্তু "ভজামি" শব্দে কেবল ফল প্রদান করিয়া অনুগ্রহ করা বুঝিলে অর্থটিকে অতিশয় সঙ্কুচিত করা হয়।

মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী যে-ভাবে ভগবানকে চায়, তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের সেই ভাব ও ভক্তিই গ্রহণ করেন এবং দিব্য প্রেম ও করুণার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন, ইহাই ভজামি শব্দের প্রকৃত অর্থ। মানুষ যেমন ভগবানকে ভক্তি করে, ভালবাসে, ভগবানে আনন্দ পায়, ভজন্তি প্রীতিপূর্ব্বকম্, ভগবানও তেমনিই ভক্তকে ভালবাসেন, তাহাতে আনন্দ পান, প্রীয়মাণায়। ভগবানকে যে পিতার ন্যায় ভক্তি করে, ভগবান তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, ভগবানকে যে সখ বলিয়া গ্রহণ করে ভগবান তাহার সখা হন, আর যে ভগবানকে দয়িতরূপে ভজনা করিয়া "পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন" তাঁহার চরণে নিজকে অর্পণ করে, তিনও অত্যাশ্চর্য্য দিব্য প্রেমের দ্বারা তাহাকে কৃতার্থ করেন। আর এইভাবে ভগবানের সহিত সকল প্রকার মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। শঙ্করাদি যে জ্ঞানযোগের পথ দেখাইয়াছেন, তাহার দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতা বলিয়াছে যে, সে পথ অতিশয় কঠিন, দুঃখমাপ্তুম্। কারণ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের দিকে আমরা আমাদের হৃদয়কে খুলিতে পারি না, আমাদের প্রকৃতিতে যে প্রেমের, কর্ম্মের গভীর প্রেরণা রহিয়াছে সে-সবকে চাপিয়া দিয়া শুষ্ক জ্ঞান বিচারেব দ্বারাই অগ্রসর হইতে হয়। কোন কোন লোকের প্রকৃতির পক্ষে এই পন্থা উপযোগী হইলেও, এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। পুরুষোত্তম তাঁহাব পরম সত্তায় অনির্দ্দেশ্য, অক্ষর, অব্যক্ত, কিন্তু তিনিই আবার মানবমূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হন, মানুষের হৃদয়ে চিরসুহৃদ ও প্রিয়তমরূপে বিরাজ করেন—তাঁহাকে আমাদের সকল জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম অর্পণ করাই হইতেছে তাঁহাকে লাভ করিবার, তাঁহার সাধর্ম্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২।২

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে—অবতারের কর্ম্মে সকল সময়েই তিনটি জিনিষ প্রয়োজনীয়। বৌদ্ধ সাধকগণ বিরুদ্ধ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইতে তিনটি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিধানেও আমরা দেখিতে পাই, জীবন যাপনের খ্রীষ্টীয় আদর্শ, চার্চ্চ (church) এবং খ্রীষ্ট। অবতার একটি ধর্ম্ম দেন, সাধনার এক ধারা দেখাইয়া দেন, তাহার দ্বারা নীচের জীবন হইতে উর্দ্ধের জীবনের মধ্যে বিকাশ লাভ করা যায়; কর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি বিধান এবং অন্যান্য মনুষ্য ও জীবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। উহা অষ্টাঙ্গমার্গ হইতে পারে, ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিম্বা জীবনের মধ্যে ভাগবত ভাবের এইরূপ অন্য কোন প্রকাশ হইতে পারে। আর মানুষের সকল চেষ্টারই যেমন একটা ব্যষ্টির দিক আছে, তেমনিই একটা সমষ্টিরও দিক আছে, এবং যাহারা একই পথের অনুসরণ করে তাহারা স্বভাবতঃই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য ও ঐক্যে বদ্ধ হয়। অতএব তিনি সঙ্ঘের স্থাপনা করেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার দ্বারা যাহারা মিলিত হয় তাঁহাদিগকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তৃতীয়টী হইতেছেন অবতার নিজে। তিনিই হন ধর্ম্মের এবং সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ, নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা উহাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন, এবং মনুষ্যগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে আকৃষ্ট করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও আমরা এই তিনটি দেখিতে পাই, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।

গীতার শিক্ষায় এই তিনটিই আরও উদার ও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষা ও সাধনা অপেক্ষা অধিকতর উদার ও বহুমুখী। গীতা যে ধর্ম্ম, যে পন্থা দেখাইয়াছে, সকল ধর্ম্ম সকল পন্থা ইহার অন্তর্গত, সেইজন্যই গীতার গুরু বলিলেন, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পন্থা অনুসরণ করিতেছে। মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া এক উচ্চতর ভাগবতভাবের মধ্যে উত্তোলন করা—গীতার শিক্ষায় ইহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, মুক্ত নিষ্কাম ভগবদ্‌নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম, ভগবদ্‌জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ভগবদ্‌প্রেম। ঐ জ্ঞান সকল প্রকৃতি ও সকল কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত

করে, ভাগবত সত্তা ভাগবত-চৈতন্যের দিকে লইয়া যায়—ঐ ভগবৎ-প্রেম হয় সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের পরম পরিণতি। আর গীতার শিক্ষায় প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে সমগ্র মানব-জাতি। সমগ্র জগৎ এই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেইমত চলিতেছে। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ; সাধক নিজেকে সকলের সহিত এক করিয়া, তাহাদের সুখ ও দুঃখ, তাহাদের সমস্ত জীবনকেই নিজের করিয়া লইয়া, মুক্ত পুরুষ সর্ব্বভূতের সহিত এক-আত্মা হইয়া, মানবজাতির মধ্যে যে এক-আত্মা রহিয়াছে, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই জন্য জীবন যাপন করেন। তিনি কর্ম্ম করেন লোক সংগ্রহের নিমিত্ত, মানুষ যে ভাগবতের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের সেই বিকাশকে তাহার সকল স্তরে, সকল পন্থায় সাহায্য করিবার নিমিত্ত। কারণ গীতার অবতার যদিও কৃষ্ণের নাম ও রূপ লইয়া অবতীর্ণ, তিনি কেবল তাঁহার এই মানবজন্মটির উপরেই জোর দেন নাই, তিনি "অহং" "মাং" বলিতে কেবল কৃষ্ণাবতারকেই বুঝেন নাই, পরন্তু ভগবানকে, পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন, সকল অবতার তাঁহারই মনুষ্য জন্ম, মানুষ যত দেবতার পূজা করে সকলই তাঁহারই বিভিন্ন নাম ও রূপ। গীতায় কৃষ্ণ যে পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে এ-কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পন্থা অন্যান্য পন্থাকে বর্জ্জন করে নাই, সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। কারণ সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্ম্ম ভগবানের সর্ব্বব্যাপী সত্তারই অন্তর্গত।

মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। অবতার কি নাম বা রূপ লইয়া আসেন, কোন বিশেষ ভাগবত ভাবকে ভর করিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতে মূলতঃ কিছুই আসে যায় না; কারণ মানুষ সর্ব্বপ্রকারে, আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথেরই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে, আর তিনি যখন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে আসেন, তখন তাঁহার যে-ভাবটি তাহাদের স্বভাবের অনুযায়ী হয় সেইটিই তাহারা প্রকৃষ্ট রূপে অনুসরণ করিতে পারে। মানুষ যে-ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভালবাসে, তাঁহাতে আনন্দ পায়, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে গ্রহণ করেন, ভালবাসেন, তাহাতে আনন্দ পান—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

হিন্দুদের মধ্যেই অনেকে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অবতার পূজা, গুরু পূজা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট উপাসনা পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করেন। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না? তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন; যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"ঈশ্বর লাভ হবে ব'লে যে যেটা সরল ভাবে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে, অনুষ্ঠান করে, সেটাকে খারাপ বল্‌তে নাই, নিন্দা করতে নাই। কারও ভাব নষ্ট কর্‌তে নাই। কেন না—যে কোন একটা ভাব ঠিক ঠাক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়।" বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসকলকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যত মত, তত পথ"—কিন্তু গীতার এই শিক্ষা ইহা অপেক্ষাও উদার, ইহা হইতেছে "যত মানুষ, তত পথ"। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম বিভিন্ন।

গীতার এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।"

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২

অন্বয়—ইহ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে, হি মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি।

অনুবাদ—ইহলোকে অধিকাংশ মনুষ্য কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং—যে যেভাবে ভগবানের উপাসনা করে সে তদনুযায়ী তাঁহার কৃপা লাভ করে, ভগবানের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই, রাগদ্বেষ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যই তাহাদের কর্ম্মের

সাফল্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারাও না জানিয়া সেই এক ভগবানের উপাসনা করে, কারণ দেবগণ তাঁহারই বিভিন্ন শক্তি ও রূপ,

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥৯।২৩

মানুষ এইরূপ কর্ম্মের সিদ্ধি চায়, কারণ তাহা সহজেই এবং শীঘ্র লাভ করা যায়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ রূপান্তর সাধন করিয়া যে দিব্য অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ, যাহার জন্য জ্ঞানের সহিত সকল কর্ম্ম, সকল যজ্ঞ পরম পুরুষ ভগবানে অর্পণ করিতে হয়, তাহা অনেক বেশী কঠিন। জীব এই সংসারে আইসে অজ্ঞানের দ্বারা চক্ষুকে আবৃত করিয়া, তাহার মধ্যে যে-সব দিব্য সম্ভাবনা রহিয়াছে মায়ার বশে সে-সব সে ভুলিয়া যায়, বাহিরের দেহ, প্রাণ, মনের জীবনটাকেই সে তাহার সমগ্র জীবন বলিয়া মনে করে, বাহিরের কর্ম্মের সিদ্ধিতে, ধন জন যশ মান প্রভৃতি লাভ করাতেই সে জীবনের পরম সার্থকতা দেখে। ভগবানকে ভজনা করিয়াও জীব কাম্য বস্তু, বাহ্য সুখ সম্পদ প্রার্থনা করে। কিন্তু এইরূপ সকাম উপাসনা দ্বারাও ভগবানের সহিত যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তাহার ফলে একদিন মায়ার আবরণ খসিয়া পড়িবে, জীব দেখিতে পাইবে যে, তাহার অন্তরের মধ্যেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে। সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,

আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না মন কারু দ্বারে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥

কিন্তু খুব কম লোকই এইভাবে বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তর্মুখী হইতে পারে, তাই ভগবান বর্ণ অনুসারে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, যেন মানুষ এই পার্থিব কর্ম্ম-জগতে আপন আপন গুণ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

যজন্ত ইহ দেবতাঃ—ঐহিক কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত আছে। গীতা বলিয়াছে, এই ভাবে দেবগণের উপাসনা করিয়া মানুষ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে, এবং সে ফল ভগবানই প্রদান করিয়া থাকেন।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।

আজও বাংলা দেশে পূজা বলিতে বিশেষভাবে যে শ্রীদুর্গা পূজা বুঝায়, সেইটি হইতেছে বৈদিক যজ্ঞেরই আধুনিক সংস্করণ। ইহাতে বেদ ও তন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় ইহাতেও আছে দেবদেবীগণকে আহ্বান, তাঁহাদের উদ্দেশে হোম ও নৈবেদ্য প্রদান, তাঁহাদের নিকট ধন পুত্র যশ সম্পদ প্রার্থনা। আবার যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের ধার ধারে না তাহারাও ঐহিক সুখ সম্পদের জন্য অন্যভাবে দেবশক্তিদের আরাধনা করিতেছে, এবং তাহাদের শাস্ত্র, তাহাদের বেদ হইতেছে science বা বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা জল, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য লইয়া আজিকার যুগের মানুষ যে ঐহিক সুখ সম্পদ আয়ত্ত করিয়াছে প্রাচীন মানবের তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। এই আশ্চর্য্যময় জগৎ ব্যাপারের মূলে যে এক আদ্যা চিৎ শক্তি রহিয়াছে, যাহার স্পন্দনে সমগ্র বিশ্ব স্পন্দিত হইতেছে, এই সব তথাকথিত জড় প্রাকৃতিক শক্তি তাহারই অংশ, ইহাদেরও পশ্চাতে অধিষ্ঠাতা রূপে দেবগণ রহিয়াছেন। এই সব দেবতার আরাধনার ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়, তাই আজিকার মানুষ বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বাহ্যিক যান্ত্রিক অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারাই মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেছে। কিন্তু মানুষের এই চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না, এই সব জাগতিক ব্যাপার যে বাজিকরের বাজি, তাঁহাকে না জানিলে তাঁহার সহিত সজ্ঞানে যুক্ত না হইলে, মানবজীবনের কোন সমস্যারই সুসমাধান হইতে পারে না, মানুষ প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। মানুষের এই সব অন্ধ অজ্ঞান প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করিয়াই কমলাকান্ত বলিয়াছেন—

(তুমি) বাজিকরে চিন্‌লে নাকো,
যে এই ঘটের মধ্যে বিরাজ করে।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে—সৃষ্টির আছে বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন স্তর, এই সকল স্তরকেই ভারতীয় পরিভাষায় "লোক" বলা হয়। আমরা যে সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছি ইহার শিখরে রহিয়াছে সৎ, চিৎ ও আনন্দ লোক—সেখানকার অধিবাসীরা এক অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতা, অপরিবর্ত্তনীয় ঐক্যের মধ্যে বাস করে, বিহার করে। আমাদের আরও নিকটে রহিয়াছে সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ অতি-মানুষ সৃষ্টির জগৎ, ইহাই বিজ্ঞান লোক। সেখানকার সকল অধিবাসী জ্যোতির্ম্ময় শরীর বিশিষ্ট, তাহাদের সকল গতি ও কর্ম্ম মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে

সকল অনুভূতিই গভীরতম, পূর্ণতম আনন্দের মহাসাগর। কিন্তু এই যে লোকে আমরা বাস করিতেছি, ইহা হইতেছে অজ্ঞান ও অন্ধকারের জগৎ, দেহ, প্রাণ, মনের জগৎ—এখানে আমরা আমাদের দিব্য উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, ইহাই মনুষ্যলোক, পৃথিবীই ইহার কেন্দ্র, গীতাতে ইহাকেই বলা হইয়াছে অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্। এখানে কিছুই স্থায়ী নহে, এখানে সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু, অমৃত গরল অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, মিশ্রিত। এই মর্ত্ত্যলোকে উর্দ্ধের সত্য ও ছন্দ নামাইয়া আনিতে হইবে, এই দুঃখময় জীবনকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইবে, ইহাই মানব জন্মের প্রকৃত লক্ষ্য, পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের নিগূঢ় অর্থ। এখানে কর্ম্মের দ্বারা বাহ্যিক ফল, বাহ্যজগতে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন সহজে ও দ্রুত সম্পাদন করা যায় এবং সেই দিকেই মানুষ সাধারণতঃ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু উর্দ্ধলোকের যে দিব্য অধ্যাত্ম সিদ্ধি, এখানে তাহা লাভ করা বহু সাধনাসাপেক্ষ।

সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা—অজ্ঞানের বশে যে কর্ম্ম করা যায়, ঐহিক ফলের আকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন দেবশক্তির উপাসনা করা হয়, তাহার ফল শীঘ্রই লাভ করা যায়, কিন্তু সে সব ফল ক্ষণস্থায়ী, তাহাদের দ্বারা কোন স্থায়ী সিদ্ধি বা দিব্য ভাব লাভ করা যায় না,

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

দিব্য সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে এই সহজ কর্ম্মজা সিদ্ধির মোহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, অন্তর্মুখী হইতে হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের সকল ত্রুটি ও অশুদ্ধিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্জ্জন করিয়া সমস্ত জীবন ও কর্ম্মকে নিঃশেষে পরমপুরুষ ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। মানুষ তাহার কোন কর্ম্মের দ্বারা, কোনও কঠোর তপস্যার দ্বারা সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, সে কেবল হৃদয়ের মধ্যে অচল অভীপ্সা শিখা জ্বালাইয়া রাখিতে পারে এবং সকল বিরোধী পরিস্থিতিকে নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করিতে পারে—কিন্তু সে সিদ্ধি আসিবে ভগবদ্ কৃপায় উর্দ্ধ হইতে আপন নিয়মে, আপন ছন্দে। মানুষের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়া ভগবদ্ শক্তিই মায়ার আবরণকে ছিন্ন করিয়া দিবে, এই মানবীয় আধারকে দিব্যভাবে গড়িয়া তুলিবে, এই তমিস্রার, মিথ্যার, মৃত্যুর, বেদনার জগতে নামাইয়া আনিবে সত্য ও জ্যোতি, দিব্য জীবন ও অমৃতের আনন্দ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয়—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্, তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাং অব্যয়ং অকর্ত্তারম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া অথচ অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে।

ব্যাখ্যা

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং—অনেকেই গীতার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান জাতিভেদের সমর্থন করিয়া থাকেন, বলিয়া থাকেন যে, গীতার মতে জাতিভেদ চিরন্তন, ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্টির আদিতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যপক্ষে অনেকে এই শ্লোকটিকেই ধরিয়া বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ জন্মগত নহে, গুণ অনুসারে জাতিভেদই গীতার শিক্ষা। কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের সহিত গীতার এই শ্লোকগুলির কোনই সম্বন্ধ নাই। হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা প্রাচীন আর্য্য সমাজের চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোনও মিল নাই। গীতায় বলা হইয়াছে যে কৃষি, গো-রক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা ও বাণিজ্য হইতেছে বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম (১৮।৪৪); কিন্তু পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা ব্যবসা, গো-পালন, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতিতে ব্রতী, তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে শূদ্রশ্রেণী-ভুক্ত, কোথাও কোথাও তাহারা শূদ্র শ্রেণীরও বাহিরে, অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। এখন কেবল ব্যবসাদারগণকেই বৈশ্য বলিয়া গণনা করা হয়, তাহাও সকল ক্ষেত্রে নহে। কৃষি, রাজকর্ম্ম, চাকুরী—এ-সবই হইতেছে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই বৃত্তি। অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগে এই যে গোলমাল, গুণ-বিভাগে ইহা অপেক্ষাও অধিক গোলমাল হইয়া গিয়াছে, কাহার কি প্রকৃতি বা গুণ জাতিভেদ প্রথায় তাহার কোন হিসাবই লওয়া হয় না, গতানুগতিক ভাবে জন্ম অনুসারেই জাতি নির্দ্ধারিত হয়। কি অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগ, কি

গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ, কিছুই আর জাতিভেদের দ্বারা সাধিত হয় না। বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সমর্থনে অনেকেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন যে, সমাজের যে স্তরে, যে শ্রেণীতে কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াই তাহার যথাযথ ধর্ম্ম পালন করা হয় এবং তাহার আত্মার সদ্গতি হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার নিজের সহজাত গুণ বা প্রকৃতির কোন হিসাব না লইয়া তাহার পিতার বা পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে দুধ বেচিবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারী করিবে, মুচির ছেলে জুতা তৈয়ারী করিবে—অনন্তকাল ধরিয়া এই ব্যবস্থাই চলিবে এবং এইরূপে নিজের প্রকৃতির দিকে না চাহিয়া যন্ত্রবৎ পরধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই তাহার আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও মুক্তিলাভ হইবে—এই অদ্ভুত শিক্ষা নিশ্চয়ই গীতার মধ্যে কোথাও দেওয়া হয় নাই। গীতার কথাগুলির লক্ষ্য হইতেছে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা এবং সেই প্রথাটি ধরিয়াই আমাদিগকে এ-বিষয়ে গীতার শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত ও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। সমাজের দিক দিয়া ইহা মানুষের কর্ম্মের চারি প্রকার বিভাগ করিয়াছিল—ধর্ম্ম ও বুদ্ধির অনুশীলন, রাজনৈতিক কর্ম্ম, অর্থনৈতিক কর্ম্ম এবং দাসসুলভ কর্ম্ম। এই চারিপ্রকার কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা যে কেবল ভারতেরই বিশেষত্ব তাহা নহে, মানব সমাজ বিকাশের একটা অবস্থায় অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। আজও এই চারিপ্রকার কর্ম্ম সকল সভ্য সমাজেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন সুস্পষ্ট সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন প্রথাটি সকল স্থানেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, * তাহার পরিবর্ত্তে হইয়াছিল অধিকতর শিথিল শ্রেণীবিভাগ অথবা যেমন ভারতবর্ষে হইয়াছে, উহা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক ব্যবস্থায় পরিণত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাচীন প্রথায় অর্থনৈতিক কর্ম্ম-বিভাগের সহিত

* কেহ কেহ বলেন যে, ঐ প্রথা কখনই বিশুদ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, উহা কেবল একটা আদর্শ মাত্র ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ সামাজিক শ্রেণীবিভাগে সকল সময়েই যথেষ্ট শিথিলতা ছিল।

একটা নৈতিক ও কৃষ্টিগত আদর্শও ছিল, প্রত্যেক শ্রেণীরই বিশিষ্ট শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও মর্য্যাদাজ্ঞান ছিল। জীবনের বাস্তব তথ্যের সহিত আদর্শটির মিল যে সকল সময়েই থাকিত তাহা নহে—আদর্শে ও কার্য্যে সকল সময়েই কতকটা তফাৎ থাকে—তথাপি আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার যথাসাধ্য চেষ্টা ছিল। ইহার দ্বারা এক কালে মানুষের সামাজিক বিকাশে যে খুবই সাহায্য হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার আর কোন মূল্য বা সার্থকতা নাই। শেষতঃ যেখানেই এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল, সেখানেই ইহার সহিত ধর্ম্মভাব অল্পাধিক জড়িত ছিল (প্রাচ্যে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে গভীরতর আধ্যাত্মিক মূল্য ও সার্থকতা দেওয়া হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার এই যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা, এইটিই হইতেছে এ বিষয়ে গীতার শিক্ষার মূল কথা।

গীতার যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শ ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়াছিল, গীতা সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত নীতি ও আধ্যাত্মিক উপযোগিতাটি দেখাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি"। কেবল এই কথা হইতেই বলা যায় না যে, গীতা ইহাকে চিরন্তন ও সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে ইহা সনাতন ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, বরং স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রথমে এই ব্যবস্থা ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১০।১১) এবং তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১২।৯।২) শূদ্রের উল্লেখ নাই, কেবল তিন বর্ণেরই উল্লেখ আছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে (১৮৮) বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা পৃথকীকৃত ব্রাহ্মণেরাই অন্য বর্ণে গমন করিয়াছেন।" ঐতিহাসিক গবেষণা হইতেও দেখা যায়, প্রাচীন সরল আর্য্য সমাজে কোনরূপ কড়াকড়ি শ্রেণীবিভাগ ছিল না, কর্ম্ম হিসাবে কেহ কোন মহত্তর কর্ম্ম করিলেও তাহাতে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অহঙ্কারের বোধ ছিল না, সমাজে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত হইত, মহাভারতের উল্লিখিত ভাষায় সকলেই ছিল ব্রাহ্মণ। প্রাচীন আর্য্য সমাজে ঋষির কার্য্যই ছিল মহত্তম আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্ম্ম এবং ইহা সকল শ্রেণীর, সকল বৃত্তির লোকের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল। কবষ ছিলেন "দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবঃ অব্রাহ্মণঃ", ঋত্বিকেরা তাঁহার

কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সসম্মানে ঋষিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্কলনকর্ত্তা মহীদাস ছিলেন ইতরা নাম্নী শূদ্রার গর্ভজাত। ব্রাহ্মণযুগে বিদ্যাচর্চ্চা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ কেহ বেদবিদ্যাতে ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেন না। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণেরা 'বৈশ্বানর তত্ত্ব' অবগত হইবার জন্য অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট সমিধ-হস্তে শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া বৈশ্বানর-তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন।

তথাপি গীতার কথাটি হইতে বুঝা যায় যে, সামাজিক মানবের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম তাহা সকল সমাজেরই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব উহা হইতেছে ভগবানের বিধান, ভগবান এই ভাবেই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মানবজীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন। বস্তুতঃ গীতা যে বলিয়াছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ, ইহার মূল হইতেছে ঋগ্বেদ সংহিতার বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ ঋক্, তাহা এই—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

বেদের এই ঋক্‌টির অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, সৃষ্টিকালে বিধাতার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ—ইহার অর্থ নহে যে, "ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জন্মিলেন"। বস্তুতঃ বেদের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই ঋকটি রূপকাত্মক, এখানে একটি উপমার ভিতর দিয়া একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রকটিত হইয়াছে। "বৈদিক রচনায় উপমা বা রূপক গভীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, শুধু ভাব প্রকাশের একটি কৌশল মাত্র হইলেই তাহার চলিত না, তাহাকে সত্য প্রকটন করিতে হইত। প্রাচীন যুগের লোকের নিকট কবি ছিলেন দ্রষ্টা, এই সকল দ্রষ্টাদের নিকট রূপক ছিল অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিবার উপযোগী প্রতীক। তাঁহাদের নিকট সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষের শরীরের এই প্রতীক কেবল মাত্র একটি উপমাই ছিল না, ইহা একটি দিব্য সত্যকে প্রকট করিয়াছিল। তাঁহাদের নিকট মানব সমাজ ছিল জীবনের মধ্যে বিশ্বপুরুষকে প্রকট করিবার প্রয়াস।

চারি বর্ণের প্রতীক তত্ত্ব হইতেছে এই—ইহারা মানুষের মধ্যে ভগবানকে জ্ঞানরূপে, ভগবানকে শক্তিরূপে, ভগবানকে উৎপাদন, ভোগ ও আদান প্রদানরূপে, ভগবানকে সেবা, আনুগত্য ও কর্ম্মরূপে প্রকট করিতেছে, এবং এই চারি বর্ণের অনুরূপ চারিটি বিশ্বনীতিও রহিয়াছে—প্রজ্ঞা (Wisdom) বস্তু-সকলের শৃঙ্খলা ও মূল নীতি উদ্ভাবন করিতেছে, শক্তি (Power) তাহাকে অনুমোদন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে, প্রবর্ত্তন করিতেছে, সুসঙ্গতি (Harmony) তাহার অংশসকলের সুব্যবস্থা সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্ম (Work) অন্য সকলের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিতেছে। তারপর এই পরিকল্পনা হইতে বিকশিত হইল এক সুদৃঢ়, অথচ তখনও নমনীয় সামাজিক ব্যবস্থা, তাহার ভিত্তি ছিল মুখ্যতঃ গুণ (ethical type) ও তাহার উপযোগী নৈতিক শিক্ষা ও অনুশাসন এবং গৌণতঃ কর্ম্ম, যাহা গুণের অনুযায়ী হইবে, নৈতিক বিকাশের সহায় হইবে এইরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্ম্ম। প্রথমে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মকে বেশী বা কিছুই প্রাধান্য দেওয়া হইত না বলিয়া মনে হয়, গুণ ও সামর্থ্যেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরে যখন বর্ণের আদর্শ সুনির্দ্ধারিত হইল তখন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দ্বারা তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক হইল এবং শিক্ষা ও ঐতিহ্য স্বভাবতঃই বংশপরম্পরার ধারায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এইভাবে ব্রাহ্মণের ছেলে লোকাচার অনুসারে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতে লাগিল, আর বংশানুক্রম প্রথার সহিত জন্ম ও বৃত্তির মিল হইলে ত কথাই ছিল না, বংশানুক্রম প্রথাও ক্রমশঃ বেশী বেশী বাঁধাবাঁধি হইয়া উঠিল। আর, একবার এইরূপ বাঁধাবাঁধি প্রথা দাঁড়াইয়া গেলে, গুণ প্রাথমিক প্রয়োজন হইতে দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয় প্রয়োজনে গিয়া দাঁড়াইল; যাহা এককালে বর্ণব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল, কালক্রমে তাহা পরিহার্য্য অলঙ্কার মাত্র হইয়া উঠিল। মনীষীরা এবং শাস্ত্রকারেরা অবশ্য গুণের উপর জোর দিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহা আর কার্য্যতঃ সমাজের নীতি রহিল না। একবার পরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার পর তাহার পরিহার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। শেষ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিটিও ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, এবং জন্ম, কুলাচার এবং তাহার সঙ্গে প্রাচীন ব্যবস্থার সামান্য কিছু অবশেষ, বিকৃতি এবং অর্থহীন নানা ধর্ম্মচিহ্ন ও অনুষ্ঠান—এই সবই হইল প্রাচীন সমাজের লৌহযুগে জাতিভেদ প্রথাকে দৃঢ়নিবদ্ধ করিবার শিকলগ্রন্থি। জাতিভেদের যে পূর্ণ অর্থনৈতিক যুগ তাহাতে

পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হয়, অভিজাত ও সামন্তবর্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়, ব্যবসাদার ও অর্থোপার্জ্জনকারিগণ বৈশ্য বলিয়া এবং অর্দ্ধভুক্ত অর্থনৈতিক দাসগণ শূদ্র বলিয়া পরিচিত হয়। যখন অর্থনৈতিক ভিত্তিটিও ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই পুরাতন প্রথাটির আবর্জ্জনাপূর্ণ ও রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে ; ইহা কেবল মাত্র একটা খোসা, একটা ছলনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক যুগের অগ্নিতে ইহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা যে-সমাজ ইহাকে তীব্র আসক্তির সহিত ধরিয়া থাকিবে তাহা সাংঘাতিক ভাবে দুর্ব্বলতা ও মিথ্যায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে।" —(সমাজবিকাশের মনস্তত্ত্ব—শ্রীঅরবিন্দ)

গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—সমাজের যে সুনির্দ্দিষ্ট চারি বর্ণ বিভাগ তাহা ভারতে কোন সময়ে প্রচলিত থাকিলেও কোথাও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু ঐ চারিবর্ণ বিভাগের পশ্চাতে যে অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে তাহা সনাতন, সেই সত্য হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের নীতি, এবং গীতা ইহারই ব্যাখ্যা করিয়াছে। সমাজে চারি বর্ণ বিভাগ না থাকিলেও মানুষের মধ্যে তাহাদের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে সকল সময়েই মোটামুটি চারিটি বিভাগ পাওয়া যায়, গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহারই বর্ণনা দিয়াছে। বাহ্যিক সমাজ ব্যবস্থার উপর গীতার ঝোঁক নাই, যে আভ্যন্তরীণ সত্যকে প্রাচীন ভারতীয়গণ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের দ্বারা কার্য্যতঃ রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গীতা সেইটির উপরেই জোর দিয়াছে। মানুষের কর্ম্ম তাহার গুণের দ্বারাই নিরূপিত হয়, সেই কর্ম্ম হইতেছে তাহার স্বভাব হইতে উৎপন্ন, স্বভাবজম্ কর্ম্ম, এবং তাহা তাহার স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম। গীতা বৈদিক যজ্ঞের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উপর ঝোঁক না দিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এইভাবে ইহাকে এক নূতন আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও সার্ব্বজনীনতা প্রদান করিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধেও গীতা প্রাচীন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে দেখাইয়া দিয়াছে—তাহা সকল যুগে সকল দেশে প্রত্যেক মনুষ্যই নিজের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা কোন বিশেষ দেশ বা সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের বাহ্য জীবনকে তাহার আভ্যন্তরীণ সত্তা ও প্রকৃতি অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার মূল স্বভাব হইতেই তাহার কর্ম্মের বিকাশ করিতে হইবে—এই

ভাবেই সে আধ্যাত্মিক মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিবে। যে প্রাচীন আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সেইটিকে সমর্থন করাই গীতার লক্ষ্য নহে—যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গীতার স্বভাব ও স্বধর্ম্মের নীতির কোন শাশ্বত সত্য বা মূল্য থাকিত না—পরন্তু গীতার লক্ষ্য হইতেছে মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তার সহিত তাহার বাহ্য জীবনের সম্বন্ধ,তাহার অন্তরাত্মা হইতে এবং প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহার কর্ম্মের বিকাশ।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং—গীতায় যে দিব্যকর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, স্বয়ং ভগবানই তাহার আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভগবান কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, মানুষের কর্ম্মের যে চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতি তাহা তাঁহারই সৃষ্টি (গীতা ৪।১৩)। এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করা হইতেছে, এই কর্ম্মও তিনি পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সকলকেই মারিয়া রাখিয়াছেন, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব। এখন মানব-যন্ত্র অর্জ্জুনকে কেবল তাহার নিমিত্ত মাত্র হইতে বলিতেছেন। বিশ্বমাঝে যেখানে যত কর্ম্ম চলিতেছে বস্তুতঃ তিনিই সেই সমুদয়ের কর্ত্তা। অথচ ভগবান বলিলেন তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াই জানিতে হইবে, তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্। একথার তাৎপর্য্য কি? শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ অনুসারে এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়াছেন, জগতে যত কর্ম্ম, যত সৃষ্টি চলিতেছে এই সবই হইতেছে মিথ্যা মায়া, বস্তুতঃ কোন কর্ম্ম নাই, সৃষ্টি নাই, অতএব ব্যবহারিকভাবে ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে হইলেও পরমার্থিক-ভাবে তিনি হইতেছেন অকর্ত্তা। কিন্তু ভগবানের কর্তৃত্ব মিথ্যা, মায়া, তাঁহার অকর্তৃত্বই সত্য, এরূপ কোন ইঙ্গিত গীতার এই শ্লোকে বা অন্য কোথাও নাই। ভগবান অকর্ত্তা ইহা যেমন সত্য, ভগবান কর্ত্তা ইহাও তেমনিই সত্য—এই তত্ত্বটি না বুঝিলে গীতার শিক্ষার গভীর মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যদি বল ঈশ্বর সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়দিগকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। বস্তুতঃ এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র।" অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতায় ভগবান

কেন বলিলেন যে, তিনিই বর্ণবিভাগের কর্ত্তা? প্রকৃতিই সব করিতেছে, পুরুষ কিছু করিতেছে না—ইহা সাংখ্যমত, এই মতানুসারে পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা কিন্তু কর্ত্তা নহে। পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখিতেছে, প্রকৃতির ক্রিয়ায় অনুমতি দিতেছে, তাই প্রকৃতির সংসার লীলা চলিতেছে। পুরুষ যদি এই ভ্রান্তি স্বীকার না করে, প্রকৃতির কর্ম্মে সম্মতি না দেয়, নিজেকে অকর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহা হইলেই প্রকৃতির কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই সাংখ্যমতানুসারে মুক্ত পুরুষের সকল কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও কার্য্যতঃ এই সাংখ্য মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গীতায় মুক্তির ফল হইতেছে বিভিন্ন, গীতার মতে মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম হয় মহান, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, দিব্য কর্ম্ম। অতএব সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে তাহা ঠিক গীতার মত নহে। সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি বিভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা, গীতায় তাহারা একই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার দুইটী দিক মাত্র, পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা বা অনুমন্তা নহেন, তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি, পুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া জগৎলীলা ভোগ করিতেছেন, প্রকৃতি জগতে ভগবানেরই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। পুরুষের এই যে দিব্য সত্তা ও স্বরূপ, ইহা অবগত হওয়া, ইহাতে সাড়া দেওয়া, ইহার মধ্যে বাস করা—ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য এবং ইহার জন্যই অহং ও তাহার ক্রিয়াকে ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। তখন মানুষ ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির উর্দ্ধে পরা দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া যায়।

যে সাধনার দ্বারা এই উর্দ্ধগতি লাভ করা যায়, তাহা পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতা পুরুষত্রয় তত্ত্বের দ্বারা এই সম্বন্ধ পরিস্ফুট করিয়াছে। সাংখ্যের মতে পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিচিত্র খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিতেছে, নিজেকে সগুণ ও ব্যক্তিক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, তখনই সে গীতার ক্ষর পুরুষ। আর সাংখ্যমতে ঐ গুণত্রয়ের খেলা যখন বন্ধ হইতেছে, গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লাভ করিতেছে এবং পুরুষ নিজেকে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, তখনই সে গীতার অক্ষর পুরুষ। অতএব ক্ষর নিজেকে প্রকৃতির কর্ম্মের সহিত এক করিয়া দেখে বলিয়া কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়, আর অক্ষর গুণত্রয়ের সকল ক্রিয়া হইতে নিজেকে বিযুক্ত করে বলিয়া হয় নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা এবং সাক্ষী। মানুষের আত্মা ক্ষরভাবে থাকিতে

পারে, অক্ষর ভাবেও থাকিতে পারে ; যখন সে ক্ষরভাবে থাকে তখন গুণের খেলার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং সহজেই প্রকৃতির অহংভাবের দ্বারা নিজের আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং সেইজন্যই নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, আর যখন সে অক্ষরভাবে থাকে তখন সে নিজেকে নির্ব্যক্তিক নির্গুণ অক্ষর পুরুষের সহিত এক করিয়া দেখে, এবং প্রকৃতিকে কর্ত্তা বলিয়া ও নিজেকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী বলিয়া অকর্ত্তা বলিয়া জানে। সাধারণতঃ মুক্তি বলিতে এই অক্ষরভাবে অবস্থানই বুঝায়, মানুষ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন আর তাহার কোন কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু মানুষ একই সঙ্গে এই দুইটি ভাবে অবস্থান করিতে পারে, কারণ ক্ষর ও অক্ষরের উর্দ্ধে যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন তাঁহার মধ্যে একই সঙ্গে এই দুইটি ভাব রহিয়াছে। ক্ষর পুরুষ রূপে তিনিই প্রকৃতির মধ্যে নামিয়াছেন, প্রকৃতির সমস্ত কর্ম্ম পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর, আবার অক্ষর রূপে তিনি প্রকৃতির সকল কর্ম্ম হইতে সরিয়া রহিয়াছেন, সাক্ষীভাবে সমস্ত দর্শন করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন, অনুমতির দ্বারা ক্ষরের সকল কর্ম্মকে সমর্থন করিতেছেন, এই জন্য তিনি কর্ত্তা ও অকর্ত্তা দুই-ই। মানুষ যখন পূর্ণতম আত্মসমর্পণ ও ভক্তির দ্বারা এই পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে হয় গীতার আদর্শ অনুযায়ী দিব্য কর্ম্মী, তখন সকল কর্ম্ম করিয়াও সে বদ্ধ হয় না কারণ তাহার ভিতরে থাকে অক্ষরের শান্ত, নীরব, নির্লিপ্ত, নির্ব্যক্তিক সাক্ষীর ভাব, আর তাহার শুদ্ধ ও রূপান্তরিত প্রকৃতির ভিতর দিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছা অবাধে ও অব্যর্থভাবে সম্পাদিত হয়।

বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্—এখানে "অব্যয়" বলিতে অক্ষর পুরুষকেই বুঝাইতেছে, ভগবান ক্ষররূপে কর্ত্তা, অক্ষররূপে অকর্ত্তা। "যদিও ঈশ্বর ক্ষরভাবে তাঁহার প্রকৃতি শক্তির ভিতর দিয়া সকল কর্ম্ম করিতেছেন, তথাপি অক্ষরভাবে তিনি অস্পৃষ্ট উদাসীন, সব কিছুকেই সমভাবে দেখেন, সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, অথচ সকলেরই উর্দ্ধে। তিন স্থিতিতেই তিনি ঈশ্বর, উচ্চতম স্থিতিতে তিনি পরমেশ্বর, অক্ষর স্থিতিতে তিনি "প্রভু" ও "বিভু" সর্ব্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক সত্তা, ক্ষর স্থিতিতে তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান সগুণ সক্রিয় ঈশ্বর। যখন তিনি তাঁহার নামরূপের খেলা প্রকট করিতেছেন তখনও তিনি তাঁহার নামরূপের অতীত সত্তায় মুক্ত, তিনি কেবল নির্গুণও নহেন, কেবল সগুণও

নহেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি নির্গুণো গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তিনি সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার সংকল্পের ফলেই প্রকৃতি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, তথাপি পশ্চাতে তাঁহার নির্ব্যক্তিক ভাবের জন্য তিনি কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪

অন্বয়—কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্ম্মফলে মে ন স্পৃহা [অস্তি]; ইতি যঃ মাং অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে।

অনুবাদ—কর্ম্ম-সকল আমাতে লিপ্ত হয় না, কর্ম্মফলেও কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নাই; এইরূপে যিনি আমাকে অবগত হন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি—সাধারণ মানুষ অহংভাব ও কামনা লইয়া কর্ম্ম করে, তাই কর্ম্মসকল তাহার প্রকৃতিতে সংস্কার রাখিয়া যায়, সেই সংস্কারই বন্ধন স্বরূপ হয়, সেই সংস্কারের বশে তাহাকে শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভগবান এই অহংভাবের উর্দ্ধে, নির্ব্যক্তিক; প্রকৃতির গুণসকলের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আবার পুরুষোত্তমরূপে তিনি নির্ব্যক্তিক ব্যক্তি, কর্ম্মের মধ্যেও তিনি চিরমুক্ত। দিব্যকর্ম্মের কর্ম্মী যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের নীতি অনুসরণ করিবেন তখনও তাঁহাকে গুণত্রয়ের অতীত নির্ব্যক্তিক সত্তাকে জানিতে হইবে, তাহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, এবং সেইরূপ পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হইবেন না, কর্ম্ম তাঁহার উপর কোন দাগ, কোন সংস্কার রাখিয়া যাইতে পারিবে না।

ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা—ভগবান কর্ম্ম করেন, কিন্তু কোন রূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা লইয়া নহে। এ-সংসারে তাঁহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই যাহার জন্য তাঁহার স্পৃহা থাকিবে। এ-বিশ্বজগৎ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত, তাঁহাতেই অবস্থিত, সবই তাঁহার। তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হয়, তিনি কি

কামনা করিবেন? তিনি কর্ম্ম করেন নিজের ইচ্ছার বশে, তাঁহার সত্তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রকট করিয়া নিজেই নিজেকে অনন্তভাবে ভোগ করেন।

মানুষকেও এইরূপ স্পৃহাশূন্য, কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে মানুষ কিসের প্রেরণায় কর্ম্ম করিবে? বস্তুতঃ মানুষের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম কি সম্ভব? সাধারণতঃ যে-সব কর্ম্মকে নিষ্কাম বলা হয়, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, মানব জাতির সেবা, এই সবই হইতেছে সকাম কর্ম্ম, কেবল ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কামনার পরিবর্ত্তে বৃহত্তর মহত্তর কামনার অনুসরণে এই সকল কর্ম্ম করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করিলেও তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্কাম হয় না। কারণ বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, নানা মুনির নানা মত, যে শাস্ত্র, যে-মত আমাদের কামনা বা সংস্কারের অনুযায়ী হয় আমরা তাহাই অনুসরণ করি, এইভাবে অনেক সময়ে শাস্ত্র হয় আমাদের আত্মপ্রতারণারই সহায়। আমরা নিজেদের বাহিরে কোন কিছু শাস্ত্র বা বিধান ধরিয়া ঠিক নিষ্কাম বা নির্ব্যক্তিক হইতে পারি না, কারণ আমরা কি ধরিব তাহা আমরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিয়া লই। কবির ভাষায়,

আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।

প্রকৃত নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদেরই যে উচ্চতম সত্তা সেইটিকে জানিতে হইবে, তাহাতেই সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেই সত্তা হইতেছে সর্ব্বভূতের এক আত্মা, সেই সত্তায় আমরা সর্ব্বভূতের সহিত এক হই, ক্ষুদ্র অহংভাব, ব্যক্তিগতভাব ছাড়াইয়া নির্ব্যক্তিক হই। আমরা উপলব্ধি করি, আমাদের সত্তা অনন্ত, ভগবানের সহিত এক, সমগ্র জগৎ এই সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে, বিবর্ত্তিত হইতেছে। তখনই আমরা হই নিষ্কাম, আপ্তকাম, ভগবানের ন্যায়ই আমাদেরও কোন অভাববোধ, কোন কিছু অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য থাকে না, তখনই আমাদের সকল বাসনা কামনার অবসান হয়—আপ্তকামস্য কা স্পৃহা?

ইতি মাং যোঽভিজানাতি—মাং অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে, কর্ম্মসকল তাঁহার উপর কোন দাগ রাখিয়া যায় না, কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি নাই, কর্ম্মফলে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয়,

নিশ্চল, অক্ষর সাক্ষী মাত্র নহেন, কারণ তাঁহার শক্তিতে প্রকৃত পক্ষে তিনিই সকল কর্ম্ম করিতেছেন; ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্ত্তৃক সৃষ্ট জীব-জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণু—তাঁহারই সত্তায় অনুপ্রাণিত, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহার ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁহার জ্ঞানে নির্ম্মিত। সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় তিনি এই জগৎ নাট্যের দ্রষ্টা মাত্র নহেন, তিনিই পরিচালকরূপে নিজের সত্তার মধ্যে এই নাট্য অভিব্যক্ত করিতেছেন, আবার তিনিই দ্রষ্টারূপে নির্লিপ্ত-ভাবে ইহা দর্শন করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। ভগবানকে এইভাবে সমগ্ররূপে যিনি জানেন তিনি সংসারের সকল কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না, বদ্ধ হন না, ভগবানেরই ন্যায় নির্ব্যক্তিক ভাবে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও চিরমুক্ত থাকেন।

কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে—কর্ম্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে, অতএব মুক্তি-লাভ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ করিতেই হইবে, গীতা সন্ন্যাসীদের এই মতেরই প্রতিবাদ পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত করিয়াছে। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিই যদি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগ তাহার পন্থা নহে, তাহার পন্থা হইতেছে সকল কর্ম্ম পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করা, তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তাঁহারই ন্যায় দিব্যকর্ম্মী হওয়া। (৪।৯)

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

অন্বয়—এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরং কর্ম্ম এব কুরু।

অনুবাদ—এই প্রকার জানিয়া পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব প্রাচীন পুরুষগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর।

ব্যাখ্যা

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম—এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত দিব্য কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আমরা ইতিপূর্ব্বেই এইরূপ কর্ম্মের নীতি আলোচনা করিয়াছি। দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মীকে চাতুর্ব্বর্ণ্যনীতি অনুসারে কর্ম্ম করিবার সময়েও ভগবানকে জানিতে হইবে,

ভগবানের মধ্যে বাস করিতে হইবে। ভগবানকে জানাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, মানুষের পরমতম পূর্ণতা ও সিদ্ধিলাভের উপায়। কিন্তু ভগবানকে কি ভাবে জানিতে হইবে? শঙ্কর বলিয়াছেন; "নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা এবমিতি।" ভগবান কর্ত্তা নহেন, ইহাই জানিতে হইবে। শঙ্কর ভগবানের এই অকর্ত্তৃত্বের উপরেই জোর দিয়াছেন এবং এইরূপেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগের শিক্ষায় উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু ভগবান কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়ই, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। ভগবানকে লোকোত্তর শান্তি ও নীরবতা রূপে জানাই সব নহে, যে নিগূঢ় রহস্য আমাদিগকে জানিতে হইবে তাহা অজ অব্যয় শাশ্বত পুরুষের রহস্য, আবার ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মেরও রহস্য, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। ঐ জ্ঞান হইতে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে তাহা হইবে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, ভগবান বলিলেন,

'ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্নস বধ্যতে',
—"আমাকে যে এইরূপে জানে সে কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ হয় না।"

পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ—সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভারতে বিবেচিত হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, মোক্ষলাভ করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। গীতা এই মতেরই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, মোক্ষ ও কর্ম্মের মধ্যে এরূপ কোন বিরোধ নাই; ঈশা উপনিষদেরও কথা, ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে, কর্ম্ম মানুষকে বদ্ধ করে না। কর্ম্ম করিবার দায়িত্ব হইতে, বাসনা কামনা হইতে, পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্তিলাভ করাই যদি লক্ষ্য হয়, তাহারও উপায় ও প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে এই জ্ঞান, কারণ ভগবান বলিতেছেন,

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৪।৯

—"হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয় সে দেহত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম লাভ করে না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" দিব্য জন্মের মর্ম্ম জানিয়া এবং তাহা লাভ করিয়া সে সর্ব্বভূতের আত্মা অজাত অব্যয় ভগবানকে লাভ করে; দিব্য কর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া এবং তাহা অনুষ্ঠান করিয়া সে সকল কর্ম্মের অধীশ্বর সর্ব্বভূতের অধীশ্বরকে লাভ

করে, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ। সে অজাত সত্তার মধ্যে বাস করে; তাহার কর্ম্ম হয় সেই বিশ্বেশ্বরেরই কর্ম্ম।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং—জনকাদি রাজর্ষিগণ মুক্তিলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প করেন নাই, অতএব তুমিও তোমার স্বধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম কর। গীতা পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করার উপর এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের পরবর্ত্তী চিন্তাধারায় গীতোক্ত কর্ম্মকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, সন্ন্যাসের পরম নিষ্ক্রিয়তাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া জনসাধারণের সম্মুখে ধরা হইয়াছে এবং ইহার জন্য গীতার শিক্ষাকেই বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেখানেই গীতা কর্ম্ম করিবার উপর জোর দিয়াছে সেখানেই শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মের কিছু উপযোগিতা আছে, পূর্ব্বতন কর্ম্মযোগীরা এইভাবেই প্রথমে কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিন্তু জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয় এবং সে-জন্য শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগই করিতে হয়, কারণ জ্ঞান ও কর্ম্ম এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, তাহাদের সামঞ্জস্য কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু এইরূপ মত গীতার সুস্পষ্ট শিক্ষার বিরোধী, ভগবান নিজে কখনও কর্ম্মত্যাগ করেন না কারণ তিনি কর্ম্ম না করিলে জগৎ তামসিকতায় অভিভূত হইবে এবং সৃষ্টি লোপ পাইবে এবং তাহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য তিনি অর্জ্জুনকেও পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে, সিদ্ধিলাভের পরেও লোকসংগ্রহার্থে, জগৎকে তাহার লক্ষ্যের পথে ঠিক রাখিবার জন্য, পরিচালিত করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, এখানে কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা কোথায়? প্রকৃত ত্যাগ হইতেছে ভিতরের, বাহিরের নহে, বাসনা কামনা আসক্তি ত্যাগ, পরের কয়েকটি শ্লোকে গীতা তাহাই বিবৃত করিয়াছে। আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অতি স্পষ্টভাবে জোরের সহিত বলিয়াছে।

'নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে',

—"ভগবদিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম তাহা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে।"

পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্—অর্জ্জুনকে যে কর্ম্ম করিতে বলা হইতেছে তাহা গতানুগতিক ভাবে ফলকামনায় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নহে, তাহা হইতেছে ভিতরে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত নিষ্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ।' জনক,

অজাতশত্রু, কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি যোগীগণ মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা পৃথিবীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া লোকসকলকে নিয়ন্ত্রিত ও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬

অন্বয়—কিং কর্ম্ম, কিং অকর্ম্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি।

অনুবাদ—কর্ম্ম কি অকর্ম্ম কি এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও ভ্রান্ত ও বিমূঢ় হন; আমি তোমাকে সেই কর্ম্ম বলিব যাহা জানিলে তুমি সকল অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা

কিং কর্ম্ম—কর্ম্ম কি, তাহার প্রকৃত উৎস ও প্রক্রিয়া কি, কর্ম্মের সমুচ্চ উপযোগিতা কি, সার্থকতা কি, সাধারণ মানুষ তাহা বুঝে না। রাজসিক প্রেরণার বশে তাহারা কর্ম্ম করে, কর্ম্মকে তাহাদের বাসনা কামনার তৃপ্তির উপায় বলিয়াই মনে করে, সে কামনা ক্ষুদ্র পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা হইতে পারে, অথবা দেশের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ, মানবজাতির কল্যাণের কামনা হইতে পারে। এই সবই হইতেছে অজ্ঞানের ক্রিয়া, এইরূপ অহংভাব ও বাসনার বশে কর্ম্ম করিয়া মানুষ সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে পূর্ণ জীবনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবল কোন বাহ্যিক ফল লাভ করা নহে; আমরা মনে করি আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমাদের আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল করিব, দেশের মঙ্গল করিব, জগতের মঙ্গল করিব—কিন্তু ইহা ভুল। কারণ সংসারে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, আর আমাদের কর্ম্মের দ্বারাও আমরা ইচ্ছামত জাগতিক ঘটনার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি না। অজ্ঞান অহঙ্কারের বশে আমরা ইহা স্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং জগতের ইতিহাস সর্ব্বদাই আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিতেছে। আমরা অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিলেও অনেক সময় তাহার ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।

কোন এক উচ্চতর শক্তি মানুষের সকল প্রয়াস, সকল কর্ম্মকে অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত অজ্ঞান আশা আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাহ্য করে না। যে মোগল সম্রাট ইংরাজ বণিককে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, অথবা যে সকল ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া হতভাগ্য সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন তাঁহারা কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের কর্ম্মের ফল কতদূর গড়াইবে? নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে পলাশীর প্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিয়া সিরাজদ্দৌল্লা কি নৃশংস মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন? যদি তিনি সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিবার মহৎ সঙ্কল্প লইয়া সেইদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত, বাংলার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে জগতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে, তাই যুদ্ধ করিতে আসিয়াও সঙ্গীন মুহূর্ত্তে সিরাজের বীর হৃদয় সহসা দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী পরিকল্পনা করিয়াছিল কয়েকদিনের মধ্যেই প্যারিসের বুকের উপর বসিয়া সন্ধি সর্ত্ত রচনা করিবে। সামরিক শক্তির হিসাব করিতে জার্ম্মাণীর নেতাদের কোন ভুলই হয় নাই, কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ হিসাব করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী যে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী লইয়া প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কাহারও তখন সাধ্য ছিল না যে তাহার গতিরোধ করে। কিন্তু সহসা কি ভাবিয়া একজন জার্ম্মাণ সেনাপতি এক স্থানে থামিয়া গেলেন, ফরাসী ও ইংরাজ নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইল, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেল। এই সব দেখিয়াও যাহারা মনে করে যে, ব্যক্তিগত কর্ম্মের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে তাহারা কি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নহে? বস্তুতঃ মানুষের কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা ফললাভ নহে,:তাহার কর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিকাশ ও রূপান্তর সাধন। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ কি করে বা না করে তাহাতে বাহ্য জগতের ঘটনার ব্যতিক্রম হয় না। অহিংসা মন্ত্র জপ করিয়া অর্জ্জুন যদি যুদ্ধে বিরত হইতেন তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ রক্ষা পাইতেন না, কারণ ভগবান পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে মারিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, অর্জ্জুন নিমিত্ত না হইলেও ভগবান আর কাহাকেও যন্ত্র করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।

যাঁহারা এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মের দ্বারা জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো, তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে সকলের হিত করতে পারো, নচেৎ নয়।" তাই জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনাশূন্য হইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করেন, যেন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছার বিশুদ্ধ যন্ত্র হইতে পারেন।

দিব্য জন্ম লাভ করা, এক উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে দিব্য ভাব, দিব্য জীবন লাভ করা, যতক্ষণ না ইহা লব্ধ হইতেছে ততক্ষণ উহার উপায় স্বরূপ দিব্য কর্ম্ম করা এবং উহা লব্ধ হইলে উহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কর্ম্ম করা—ইহাই হইতেছে গীতার কর্ম্মযোগের পূর্ণ তত্ত্ব। কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গীতা কোন বাহ্যিক লক্ষণের নির্দ্দেশ করে নাই। সাধারণতঃ লোকে যুক্তি তর্কের দ্বারা, শাস্ত্রবিধি, নৈতিক বোধ, দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতির দ্বারা কোন্ কর্ম্মটা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য বিচার করিয়া থাকে, গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সব লৌকিক পার্থক্য ও বিচার পরিত্যাগ করিয়াছে। গীতা দিব্য কর্ম্মের যে সব লক্ষণ দিয়াছে তাহা অতি গভীর, আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক, সাধারণ দৃষ্টিতে সে-সবকে ধরা যায় না, সে-সব হইতেছে পাপপুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক বিচারের ঊর্দ্ধে। দিব্য কর্ম্মীর প্রকৃত লক্ষণ হইতেছে নিগূঢ় জ্ঞান, পূর্ণ বাসনাশূন্যতা, নির্ব্যক্তিকতা, সমতা এবং পূর্ণ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ। প্রথমেই চাই কর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান দুর্লভ, বড় বড় পণ্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তিরাও কর্ম্ম বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, কারণ শুধু মন বুদ্ধির যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না, কেবল অন্তরাত্মার জ্যোতিতেই দিব্য কর্ম্মের নিগূঢ় লক্ষণগুলি জানিতে পারা যায়।

কিমকর্ম্মেতি—"অকর্ম্ম" পদ নঞ্ সমাস, ইহার অর্থ কর্ম্মের অভাব বা মন্দ কর্ম্ম দুইই হইতে পারে। বাংলা ভাষায় অকর্ম্ম বলিতে মন্দ কর্ম্ম বুঝায়, এবং গীতার অনেক ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গীতা পরের শ্লোকেই মন্দ কর্ম্ম, অন্যায় কর্ম্ম বুঝাইতে "বিকর্ম্ম" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। অতএব এখানে "অকর্ম্ম" পদের দ্বারা গীতা কর্ম্মের অভাব বা অকরণই বুঝাইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অকর্ম্ম অর্থাৎ তুষ্ণীভাব, কর্ম্মমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি।

কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ—পণ্ডিত ব্যক্তিরাও কর্ম্মের বিচার করিতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন কারণ তাঁহারা কর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব তাহার সন্ধান করেন না, পরন্তু সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ ও বিধিনিষেধ প্রভৃতি বাহ্য তত্ত্ব অনুসারে কর্ম্ম বিচার করেন, অহিংসা, গুরুভক্তি, দেশপ্রেম, জীবে দয়া, জনসেবা প্রভৃতি আদর্শ অনুসরণ করিতে যান, কিন্তু বস্তুতঃ এ-সবের দ্বারা কর্ম্মের চরম মীমাংসা হয় না। অর্জ্জুন শাস্ত্রজ্ঞ, হৃদয়বান, ন্যায়পরায়ণ, উন্নতচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সন্ধিক্ষণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধ করা তাঁহার স্বধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ইহা অর্জ্জুন বেশই জানিতেন এবং চিরকাল সন্তুষ্টচিত্তে তিনি এই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া, গুরুজনকে হত্যা করিয়া সেই শ্রেয়ঃ কেমন করিয়া লব্ধ হইবে তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইল না—

'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে'।

আজও আমরা দেখিতে পাইতেছি, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ, সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অ্যানার্কিজম্, ফ্যাসিজম্, কত নীতি, কত আদর্শই মানুষের সম্মুখে ধরা হইতেছে, প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে কেবল তাহার দ্বারাই জগতের হিত সাধিত হইবে। এই সব দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন, সকল কর্ম্ম, সকল জীবনই মিথ্যা কি না? শ্রান্ত ক্লান্ত মানবাত্মার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস, সংসার ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ, "অকর্ম্ম"ই চরম আশ্রয় কি না? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এইভাবে মেধাবী ব্যক্তিগণও ভ্রান্ত হন, কারণ কর্ম্ম-ত্যাগের দ্বারা নহে, "অকর্ম্মের" দ্বারা নহে পরন্তু কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও মুক্তিলাভ করা যায়।

তস্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি—ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, যে কর্ম্মের দ্বারা জীবনের সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে মুক্তি পাওয়া যায় আমি তোমাকে সেই কর্ম্ম বলিব। সেই কর্ম্ম কিরূপ? এই কর্ম্ম ভাল, এই কর্ম্ম মন্দ—এইরূপ কোন বাহ্যিক পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উত্তর। জগতের জন্য যাহা প্রয়োজন এমন কোন কর্ম্মই বর্জ্জন করিতে হইবে না, যুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক কর্ম্মও বর্জ্জনীয় নহে, মানুষের কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে কোন গণ্ডি বাঁধিয়া দিতে হইবে না, সকল কর্ম্মই করিতে হইবে, কিন্তু ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হইয়া, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। দরিদ্রের সেবা, আর্ত্তের সেবা, দেশের সেবা,—এই সব বাহ্যিক নীতি অনুসরণ না করিয়া ভগবানের হস্তে যন্ত্ররূপে জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। তাই অর্জ্জুনের যখন সকল সংশয় দূর হইল তিনি বলিলেন, করিষ্যে বচনং তব, "হে আমার অন্তর্যামী ভগবান, তুমি আমার অন্তর হইতে যে কর্ম্ম করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব"।

যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ—ভগবান বলিলেন আমি তোমাকে যে কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছি এই কর্ম্মের দ্বারা তুমি সকল অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। তিনি বলিলেন না যে, এই কর্ম্মের দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ, জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। ভগবদ্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য লইয়া আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে না, আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে যেন আমরা নিজেরা সংসারের সকল অশুভ হইতে মুক্ত হইতে পারি অর্থাৎ যে কর্ম্মই করি না কেন তাহা ভিতরের এমন ভাব লইয়া করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির রূপান্তর সাধিত হয়, আমরা দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারি। গীতার সকল প্রাচীন ব্যাখ্যাকার "অশুভ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, সংসার। এই পার্থিব জীবন, এই সংসার দুঃখময়, এই সংসারের শেষ করিতে হইবে, যেন কর্ম্মের বশে কর্ম্মফল ভোগ করিতে পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, ইহাই মোক্ষ, মুক্তি, মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, পুরুষার্থ। ভারতের দর্শন শাস্ত্রগুলির ইহাই হইতেছে সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ করে নাই, জীবন ও সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার শিক্ষা দেয় নাই, অর্জ্জুনের এইরূপ সংসার ত্যাগ প্রবৃত্তিকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াই গীতার শিক্ষার

আরম্ভ। গীতা এই সংসারের অশুভ স্বরূপ দর্শন করিয়াছে, অনিত্যং অসুখং লোকং, ইহা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ যন্ত্রণায় পূর্ণ; কিন্তু এই সব অশুভকে জয় করিতে হইবে, এই দুঃখময় মর্ত্ত্য জীবনকেই দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিতে হইবে, দিব্য ভাবে ভোগ করিতে হইবে, ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্, ইহাই গীতার শিক্ষা। অতএব এখানে 'অশুভ' অর্থে সংসার না বুঝিয়া সংসারে মানুষ যে অশেষ প্রকারে দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহাই বুঝিতে হইবে। কি উপায়ে এই সব অশুভকে জয় করা যাইবে, পৃথিবীর বক্ষেই কেমন করিয়া 'বিশালং স্বর্গসুখং' নামিয়া আসিবে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহারই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

অন্বয়—কর্ম্মণঃ (তত্ত্বং) অপি হি বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ (তত্ত্বং) চ বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণঃ (তত্ত্বং) চ বোদ্ধব্যং, কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা।

অনুবাদ—কর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, আবার অকর্ম্ম সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, কর্ম্মের গতি গহন।

ব্যাখ্যা

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং। কর্ম্ম হইতেছে দেহাদির চেষ্টা, যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম্ম এবং কিছু না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনই অকর্ম্ম—ইহাতে আবার বুঝিবার কি আছে? আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই বুঝাইতেছে এবং সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিবার ও বুঝিবার রহিয়াছে। শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ অকর্ম্ম এবং শাস্ত্রে যে-সব কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই বিকর্ম্ম। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই শঙ্করের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, আর কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ বা বিকর্ম্ম ইহা নির্ণয় করা অনেক সময়েই দুরূহ হইয়া উঠে। জীবহিংসা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবার শাস্ত্রই যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধান দিয়াছে। ভোজন করিবার জন্য পশুবধ করিলে উহা "বিকর্ম্ম" হইত, কিন্তু যজ্ঞ সঙ্কল্পে পশুবধ করিলে উহাকে আর "বিকর্ম্ম" বলা

যায় না। কিন্তু নিজের বা পরিবারবর্গের কল্যাণের জন্য অপর একটি জীবকে বলিদান দেওয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে? এমন হীন-প্রথা শাস্ত্র কেমন করিয়া সমর্থন করিল? ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেন। শ্রুতিতে যে পশু বলিদান বিহিত আছে সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—

জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে এই আছে আজ্ঞাবাণী।

শ্রীচৈতন্যের এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে এ-যুগে বলিদান প্রথা রহিত করিতেই হয়, কারণ বলিদানের পর পশুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অপরে ব্যাখ্যা করেন যে, বেদের বিধান সব রূপকাত্মক, বেদে যে পশু বলি দিবার বিধান আছে তাহা ছাগ মেষ বলি নহে, পরন্তু কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে বলি দেওয়া। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

কামে দিয়ে অজা বলি,
ক্রোধে দিয়ে মহিষ বলি,
জয় কালী জয় কালী বলে।

নিরীহ পশুগুলিকে বলি দিয়া যাহারা জগন্মাতার তৃপ্তি সাধন করিতে চায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

ত্রিভুবন যে মায়ের ছেলে
তাঁর কি আছে পর ভাবনা,
তুই কোন্ লাজে চাস্ দিতে বলি
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা?

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে—শাস্ত্র কতকদূর পর্য্যন্ত সাহায্য করিলেও ইহার দ্বারা কর্ম্মের চরম মীমাংসা হয় না।

বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। "বিকর্ম্ম" বলিতে শঙ্কর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বুঝিয়াছেন। কিন্তু গীতা এখানে বিশেষ ভাবে শাস্ত্রকে লক্ষ্য করে নাই। বিকর্ম্ম বলিতে যে-কোন মন্দ বা অন্যায় কর্ম্মই

বুঝাইতেছে। আমাদের মধ্যে যে পাপ পুণ্যের বোধ আছে, conscience বা বিবেক আছে, তাহাতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মও অন্যায় বা পাপ বলিয়া অনুভূত হয়। অর্জ্জুন জানিতেন যে যুদ্ধ করা তাঁহার শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, তথাপি সেটিকে তাঁহার পাপ বা বিকর্ম্ম বলিয়াই অনুভব হইয়াছিল, তাই তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার অনেক সময়ে যুক্তি তর্কের দ্বারা দেখা যায় যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দূষণীয়, এক্ষেত্রে অন্ধভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করিলে ধর্ম্ম হানি হয় ইহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেরই নির্দ্দেশ,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

অতএব "বিকর্ম্ম" নির্ণয় করাও সহজসাধ্য নহে। বস্তুতঃ গীতা প্রথমাবস্থায় বাসনা কামনার অনুসরণ না করিয়া কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র অনুসরণে কর্ম্ম করার উপযোগিতা স্বীকার করিলেও, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করাই গীতার চরম' শিক্ষা নহে। গীতার শিক্ষা হইতেছে চৈতন্যের এমন রূপান্তর সাধন যেন আমরা সকল সময়ে ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত থাকিতে পারি এবং ভাগবত চৈতন্যের আলোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারি।

অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং—অকর্ম্ম বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন। শ্রীধর প্রভৃতি বুঝিয়াছেন, যে-কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই তাহাই অকর্ম্ম। আবার কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম। মীমাংসকদের মতে এইরূপ অকর্ম্মের দ্বারা প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, অকর্ম্ম হইতেছে কর্ম্মের অভাব, কোন কিছুর অভাব বা অনস্তিত্বের দ্বারা কোনরূপ প্রত্যবায় হইতে পারে না, নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ। বস্তুতঃ মীমাংসকদের মতে কর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, অকর্ম্মের দ্বারা বন্ধন হয়, শঙ্করের মত ঠিক ইহার বিপরীত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অকর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক কিছু বুঝিবার রহিয়াছে।

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ—গীতা কর্ম্মকে গভীর অরণ্যের সহিত তুলনা করিয়াছে, মানুষকে ইহার ভিতর দিয়া হোঁচট খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতে

হয়। যুগোচিত ধ্যান ধারণা আদর্শসকলকেই সে দিশারী করিয়া লয়, কিন্তু সে সবের মধ্যে নানা যুগের নানা নীতি ও আদর্শ এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে সে-সবের বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। যে সব বিধান কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের উপযোগী সেইগুলিকেই লোকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া জোর গলায় প্রচার করে, সেই সব যুক্তিবিগর্হিত হইলেও, তর্ক যুক্তির দ্বারা সে-সবকে সমর্থন করিবার মিথ্যা প্রয়াস করা হয়, এই সবের মধ্যে সত্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করা অতি দুরূহ ; কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্মের, সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কর্ম্ম করা কার্য্যতঃ অসম্ভব দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরাও হতাশ হইয়া পড়েন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সব গোলমাল হইতে, এই গহন অরণ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র পন্থা হইতেছে সকল কর্ম্ম ত্যাগ, জীবন ও সংসার ত্যাগ। কিন্তু গীতা অন্য পন্থা দেখাইয়াছে।

সংসারে কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাতে অর্জ্জুনের মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জীবন ও কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তির কোন পথই তিনি দেখিতে পান নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে,—"কর্ম্ম ও জীবন যাত্রার দুইটি বিপরীত পন্থা আছে, একটি হইতেছে অহংয়ের অজ্ঞানে, এবং অপরটি হইতেছে দিব্য সত্তার স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। তিনি কর্ম্ম করিতে পারেন কামনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা চালিত 'অহং' রূপে, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া, কর্ম্মের ফল ও পরিণাম, জয় পরাজয়, শুভ অশুভ এই সবের চিন্তায় বিব্রত হইয়া, জগৎরূপ যন্ত্রে বদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম যে তাহাদের চিরপরিবর্ত্তনশীল ও বিরোধী রূপ ও দৃশ্যের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে তাহাদের ভীষণ জালে জড়িত হইয়া। কিন্তু অজ্ঞানের কর্ম্মেই তিনি সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ নহেন ; তিনি ইচ্ছা করিলে জ্ঞানের কর্ম্মও করিতে পারেন। এই সংসারে তিনি মহত্তর মনীষীরূপে, জ্ঞানীরূপে, যোগীরূপে, প্রথমে মুক্তিপ্রার্থীরূপে এবং পরে মুক্ত আত্মারূপে কর্ম্ম করিতে পারেন। ঐ মহান সম্ভাবনা উপলব্ধি করা, এবং যে-জ্ঞান ও আত্মদৃষ্টি উহাকে সিদ্ধ ও বাস্তবে পরিণত করিবে তাহার উপরেই তাঁহার সঙ্কল্প ও বুদ্ধিকে নিবিষ্ট রাখা, ইহাই হইতেছে তাঁহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানবজীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃত পন্থা"। —শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

অন্বয়। কর্ম্মণি যঃ অকর্ম্ম পশ্যেৎ, অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম [পশ্যেৎ], মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

অনুবাদ। কর্ম্মের মধ্যে যিনি কর্ম্মহীনতা দেখিতে পান, কর্ম্মহীনতার মধ্যেও যিনি দেখেন যে কর্ম্ম চলিতেছে, তিনিই মানুষের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান, তিনি যোগী এবং সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মকর্ত্তা।

ব্যাখ্যা

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম এই যে-সব বিভেদ ও বিচার, এ-সব হইতেছে অজ্ঞানের ক্ষেত্রে, মানুষ যতক্ষণ অহংভাব ও অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণই এই সবের জটিলতা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে, মানুষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া যেন গহন অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি এই সব বাহ্যিক ও লৌকিক প্রভেদের দ্বারা কিছুমাত্র বিভ্রান্ত হন না, কারণ তিনি কর্ম্মের মধ্যেই অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্ম দেখিতে পান।

কিন্তু কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন তাঁহার জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান, তিনি কেমন করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী হইলেন ? এই আপাতবিরুদ্ধ বাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্জ্জুন পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই আবার বলিলেন, "তুমি কর্ম্মত্যাগের কথাও বলিতেছ আবার কর্ম্মযোগের কথাও বলিতেছ, এই দুইটীর মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল।" গীতার ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যেও এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লইয়া অনেক গোলমাল হইয়াছে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে নিত্যকর্ম্ম তাহাতে বন্ধন হয় না, নরকাদি ফলভোগ করিতে হয় না, অতএব জ্ঞানীরা এইরূপ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়াই বোধ করেন, যেমন ধেনু গৌ হইলেও যদি দুগ্ধাদি ফল না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে "অগৌ" বলা যায়। সেইরূপ নিত্য-কর্ম্ম না করিলে যেহেতু নরকাদি প্রত্যবায়রূপ ফল হয়, সেই হেতু নিত্যকর্ম্মের অকরণরূপ অকর্ম্মে যে ব্যক্তি নরকাদি ফলদায়িত্ব আছে বলিয়া "উহা কর্ম্ম" এইরূপ

জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। বহু প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের ন্যায় লোকমান্য তিলকও মূলতঃ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তিনি অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের উপর ঝোঁক দেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক কর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্ম, কারণ তাহাতে বন্ধন হয় না। আচার্য্য শঙ্কর এই ব্যাখ্যার নিরসন করিয়াছেন। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বন্ধন নাই, তাহার দ্বারা অশুভ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও "নিত্যকর্ম্মের ফল নাই" এই প্রকার জ্ঞান মাত্রেই যে অশুভ হইতে মোক্ষ হইবে ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব এইপ্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, ভগবান যে পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে" এই প্রকার ভগবানের বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। শঙ্কর কিরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া পরমত খণ্ডন করেন, এইটি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ বা পরম গতি লাভ হয়, শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না; প্রথমাবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য এ-সবের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও জ্ঞান লাভ করিয়া এ-সব পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সংসাররূপ অশুভ হইতে মোক্ষ হইবে। শঙ্করের মত এই যে, ভগবান এখানে এমন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন যাহার দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। সে জ্ঞান কি? ব্রহ্মের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, অতএব এই শ্লোকে সেই জ্ঞানেরই কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া দর্শন করা হইতেছে মিথ্যা জ্ঞান, সেই মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা অশুভনিবৃত্তি হইবে ইহা সম্ভবপর নহে এবং এতাদৃশ মিথ্যা জ্ঞানের স্তুতিও সম্ভবপর নহে। সাধারণ লোকে ভুল করিয়া যেটাকে কর্ম্ম বলিয়া মনে করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সেইটিকে অকর্ম্ম বলিয়া জানেন, আর সাধারণ লোক ভুল করিয়া কর্ম্মকেই অকর্ম্ম মনে করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানেই কর্ম্ম দেখিতে পান। লোকে যে কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া ভুল করিতে পারে সে বিষয়ে শঙ্কর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, নৌকারূঢ় ব্যক্তি নৌকা চলিতে থাকিলে তটে স্থিত গতিহীন বৃক্ষসমূহেও প্রতিকূল গতি দর্শন করিয়া থাকে এবং অতি দূরবর্ত্তী চন্দ্র তারকার গতি থাকিলেও তাহা গতিহীন বলিয়া লোকে দেখিয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে এই জগতে

কুণ্ড মধ্যে যেমন বদর (কুল) ফল থাকে, সেইরূপ অকর্ম্মে কর্ম্ম থাকিবে ইহা সম্ভবপর নহে, এই প্রকার অকর্ম্মের আধারও কর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ অকর্ম্ম ত কর্ম্মের অভাব স্বরূপ। মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় এবং শুক্তিকাতে রজতের ন্যায় ভ্রান্ত জীবগণ কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই বিপরীত জ্ঞানকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ভগবান বলিয়াছেন যে, যে-ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শন করে ইত্যাদি।

গীতার এই কথাটি সাংখ্যকৃত পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত,—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, কর্ম্মের মধ্যেও চির শান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত; আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীলা, প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কর্ম্ম স্রোতের মধ্যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যেও তেমনই কর্ম্ম করিতেছে। বিচারশীল বুদ্ধির উচ্চতম চেষ্টার দ্বারা আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি। অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু,—যে বিমূঢ় ব্যক্তি নীচের বুদ্ধির বাহ্যিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদ সমূহের দ্বারা জীবন ও কর্ম্মের বিচার করে সে নহে।

স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের অকরণ বা বিরতিই পন্থা নহে; যে ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি বুঝেন যে, এরূপ কর্ম্মহীনতাই বস্তুতঃ পক্ষে অবিরাম কর্ম্ম, এ অবস্থা প্রকৃতি এবং তাহার গুণ-সকলের ক্রিয়ার অধীন। যে ব্যক্তি শারীরিক কর্ম্মহীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার এখনও এই ভ্রম রহিয়াছে যে, সে-ই কর্ম্ম করে, প্রকৃতি নহে; সে জড়তাকেই মুক্তি বলিয়া ভুল করে; সে দেখে না যে, যেখানে এমন সম্পূর্ণ জড়তা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় যাহা ইট পাথরের জড়তা অপেক্ষাও অধিক সেখানেও প্রকৃতির কর্ম্ম চলিতেছে, প্রকৃতি তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। অন্য পক্ষে পূর্ণ কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যেও আত্মা সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত, কর্ত্তা নহে, কোন কৃত কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ নহে, আর যে ব্যক্তি আত্মার মুক্তির মধ্যে বাস করেন, প্রকৃতির গুণ-সকলের বন্ধনের মধ্যে নহে, তিনিও কর্ম্ম হইতে মুক্ত।

মুক্ত পুরুষ কর্ম্মকে ভয় পান না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী মহাকর্ম্মী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীনতায় কর্ম্ম করেন না, পরন্তু

আত্মার নিথর নিস্তব্ধতায় ভগবানের সহিত শান্ত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

অন্বয়। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং তং পণ্ডিতমাহুঃ।

অনুবাদ। যাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাহার কর্ম্মসমূহ দগ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ। মুক্ত পুরুষ বাহ্যতঃ অন্যান্য লোকেরই ন্যায় সকল প্রকার কর্ম্ম করেন, বরং তাঁহার কর্ম্ম হয় বৃহৎ, তাহাতে থাকে অধিকতর প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও আবেগ, কারণ তাঁহার ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছার মহতী শক্তি কর্ম্ম করে। তিনি ব্যক্তিগত বাসনা-কামনার বশে কোন কর্ম্ম করেন না, নীচের প্রকতির কোন প্রেরণার দ্বারা তিনি চালিত হন না, তাঁহার কর্ম্ম বাসনা-কামনা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। ভগবানই আমাদের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, আমরা কেবল তাঁহার যন্ত্রমাত্র, এই জ্ঞান লইয়া, "আমি কর্ত্তা" এইরূপ সকল ব্যক্তিগত অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা—ইহাই হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ। তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে কামনা হইতে মুক্তি, কারণ যেখানে "আমিই কর্ত্তা" এইরূপ অহংভাব নাই সেখানে কামনা থাকিতে পারে না, তাহার উৎস শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা আর সমর্থন না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কর্ম্মের দ্বারা এই ফল লাভ করিব এইরূপ কামনা এবং সেই কামনার জন্য সেই কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প—এই দুই হইতেই দিব্যকর্ম্মী মুক্ত। তাঁহার কর্ম্মের প্রেরণা আসে ঊর্দ্ধ হইতে, ভগবানের ইচ্ছা হইতে।

আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মের এইরূপ উৎস স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে ঊর্দ্ধের যে সত্য সেখানে কর্ম্ম নাই, তাহা হইতেছে নীরব, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম

তাহা হইলে যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করিবেন কিসের প্রেরণায়? শঙ্কর ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যাঁহারা সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিবেন এবং যাঁহারা সন্ন্যাসী তাহারা শুধু জীবন রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু যাঁহারা কামনা ও সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা লোকসংগ্রহ বা জীবনরক্ষারই কামনা বা সঙ্কল্প করিবেন কেন? তাঁহাদের একমাত্র পরিণতি হইতেছে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন। কিন্তু গীতা এখানে কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত কর্ম্মের কথা বলিতেছে, অতএব শঙ্কর যে গীতার অর্থটি ধরিতে পারেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তিনি নিজে যে বিপুল কর্ম্ম করিয়াছেন, আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে নিজের মত প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজেরই আদর্শের বিরোধী। গীতার দিব্যকর্ম্মী লোকসংগ্রহ বা জীবনরক্ষা বা অন্য কোন কামনার বশে কর্ম্ম করেন না, তিনি নিজে কিছুই করেন না, তিনি কেবল যন্ত্রমাত্র হন, তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া ভাগবতী শক্তি জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, ইহার অর্থ এই নহে যে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা অহংভাব ও কামনা দূর হওয়ায় কর্ম্মের আর বন্ধন-শক্তি থাকে না। "মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে ভয় পান না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী মহাকর্ম্মী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন না, পরন্তু আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া প্রশান্তভাবে কর্ম্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐসব কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি নিজ অধীশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ পরিচালনায় ঐ সব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জ্ঞানের জলন্ত ও পূত অগ্নিশিখায় তাঁহার কর্ম্মসকল যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনের উপর কোন কলঙ্ক বা বিকৃতির দাগ রাখিয়া যায় না, সকল কর্ম্ম করিয়াও সে-মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে। কর্তৃত্বের অভিমান-শূন্য হইয়া এই মুক্তিপ্রদ জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্ম করা, ইহাই হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

অন্বয়—সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ [সন্] কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি।

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ সদা পরিতৃপ্ত থাকেন, নিজ সুখের নিমিত্ত জগতের অপর কাহারও অথবা অপর কিছুর উপর নির্ভর করেন না, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না।

ব্যাখ্যা

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং—মুক্ত পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্ত হন না। তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে সফলতার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহা দেখিতে হইবে না, তাহা নহে ; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা যেরূপ সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির পদে পদে স্খলনে, মানবীয় ইচ্ছার অস্থির আগ্রহে কর্ম্ম করিলে সেরূপ হইতেই পারে না। গীতা আর এক স্থানে বলিয়াছে, যোগই কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু এই সবই সম্পন্ন হয় নির্ব্যক্তিক ভাবে, এক বিরাট বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তি ব্যষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া উহা সম্পন্ন করে। কর্ম্মযোগী জানেন যে, তাঁহাকে যে শক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা ভগবদ্-নির্দ্দিষ্ট ফললাভের উপযোগী হইবে, তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই ইচ্ছা বাসনা ও কামনা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা ফললাভ ইহার লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে ভগবদ্-ইচ্ছা সম্পাদন করিবার জন্য চেতন শক্তির নির্ব্যক্তিক প্রেরণা। এরূপ কর্ম্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে ; কিন্তু কর্ম্মযোগীর নিকট তাহা সকল সময়েই সাফল্যমণ্ডিত, সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান যে সফলতা চান তাহাই হয়, তাঁহার নিজের অভিপ্রেত সফলতা নহে ; কারণ তিনি জয় চান না, তিনি চান শুধু ভাগবত ইচ্ছার সিদ্ধি, তাহা কখনও বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া সম্পন্ন হয়, আবার অনেক সময়ে বাহ্য পরাজয়ের ভিতর

দিয়া তাহা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন হয়। অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি জয়ী হইবেন, কিন্তু যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাঁহার সম্মুখে থাকে, তথাপি তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে, কারণ যে বিরাট শক্তি-সজ্ঘাতের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে উপস্থিত এই যুদ্ধ করার ভারই অর্জ্জুনের উপর দেওয়া হইয়াছে।

নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ—দিব্য কর্ম্মীর আর এক লক্ষণ হইতেছে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ আনন্দ ও শান্তি, ইহা দিব্য চৈতন্যেরই মূল তত্ত্ব, ইহার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না; ইহা অন্তর্নিহিত, ইহা হইতেছে আত্মার চৈতন্যের মূল উপাদান, ভাগবত সত্তার ইহাই হইতেছে প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানব তাহার সুখের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে, সেই জন্যই তাহার আছে কামনা; সেই জন্যই তাহার আছে ক্রোধ ও বিক্ষোভ, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক, সেই জন্যই সমস্ত জিনিষকে সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মানদণ্ড দিয়া পরিমাপ করে। ইহাদের কোনটিই দিব্য পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না; তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত থাকেন, নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ, কারণ তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দিব্য স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁহার সুখ, তাঁহার প্রসন্ন জ্যোতি হইতেছে অন্তরের মধ্যে চির-বিরাজমান, অনুস্যূত, আত্মরতিঃ, অন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি—শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, ব্রহ্মবিৎ তিনি সেই জ্ঞানের প্রসাদেই নিষ্ক্রিয় ও সন্ন্যাসী হন। পূর্ব্বে যদিও তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় তিনি জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু-প্রয়োজন তাহা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার কর্ম্ম বর্জ্জন করেন। তবে যদি লোকনিন্দা বা অন্য কোন কারণে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভবই হয়, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সেই কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। কিন্তু সে কর্ম্ম যদি কর্ম্মই নহে, তাহাতে যদি আর বন্ধনের কোন আশঙ্কা না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা কি, আর কেনই বা শঙ্কর কর্ম্মত্যাগের উপরেই এত জোর দিতেছেন? গীতা বরাবর কর্ম্মের উপরেই জোর দিয়াছে, বলিয়াছে অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়, ভগবানের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে যে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও

তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন—বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতেছে ভাগবত সত্তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ। অথচ শঙ্কর কর্ম্মত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া গীতার সুস্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করিয়াছেন, গীতা-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করিয়া দিয়াছেন।

নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ—ভগবান নিজেই কর্ম্মের কর্ত্তা, তিনি যে-শক্তির উপর কর্ম্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল কৃতিত্ব, ক্ষুদ্র মানবীয় ব্যক্তিত্বের তাহাতে কোন কৃতিত্বই নাই। মুক্ত পুরুষের মন ও অন্তরাত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিৎ করোতি ; যদিও তিনি তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, বস্তুতঃপক্ষে ভগবানের কার্য্য-নির্ব্বাহিকা শক্তি, পরমা চিৎশক্তিই হৃদ্দেশে অবস্থিত ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করে।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১

অন্বয়—নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (পুরুষঃ) কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি।

অনুবাদ—যাঁহার ব্যক্তিগত কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি আত্মসংযমশীল, কোন বস্তুকে আপন জ্ঞানে যিনি গ্রহণ করেন না, তিনি কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা

নিরাশীঃ—মুক্ত পুরুষ ব্যক্তিগত কোন আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। তিনি শুধু দেখেন কোন্ কর্ম্মটি তাঁহাকে করিতে হইবে, ভগবান তাঁহার নিকট কোন্ কর্ম্ম চান, তিনি তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সেই কর্ম্মের যন্ত্র বা নিমিত্ত হন, এবং সে কর্ম্মে বা কর্ম্মের ফলে তাঁহার কোন মমত্ববোধ বা আসক্তি থাকে না। তাঁহার এই নির্ব্যক্তিকভাবের জন্য কর্ম্মজনিত কোন পাপই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যতচিত্তাত্মা—চিত্ত ও আত্মা বলিতে এখানে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের যে সমগ্র প্রাকৃত আধার তাহাই বুঝাইতেছে। সাধারণ

মানুষের জীবনে এই আধার বাহ্য বস্তুর স্পর্শে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু মুক্ত পুরুষের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সংযত, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া শান্ত ভাবে বাহ্য জগতের সকল স্পর্শ গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয় আবেগে কম্পিত হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যায় অচলপ্রতিষ্ঠ (২।৭০)।

ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ—সন্ন্যাসিগণের মতে যিনি মুক্ত পুরুষ তিনি সকল পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগোপকরণ বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু গীতা এইরূপ বাহ্য বস্তু ত্যাগের শিক্ষা দেয় নাই। মুক্ত পুরুষ নিজের বলিয়া কোন জিনিষকে ধরিতে যান না, ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যাহা পান তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করেন, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ। তিনি কোন বস্তুতে লোভ করেন না, পরশ্রী দেখিয়াও কাতর হন না, কোন বস্তু আসিলে তাহাতে তাঁহার বিরাগও নাই, আসক্তিও নাই, আবার কোন বস্তু চলিয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ নাই, ক্ষতিবোধ নাই।

শারীরং কেবলং কর্ম্ম—মুক্ত ব্যক্তি কেবল শারীর কর্ম্ম করেন। এখানে শারীর শব্দের অর্থ কি? শরীরের দ্বারা যাহা সাধিত হয় তাহাই কি শারীর কর্ম্ম? কিম্বা শরীর রক্ষাই যাহার উদ্দেশ্য এইরূপ ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মই এই স্থলে "শারীর কর্ম্ম" এই শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ? আচার্য্য শঙ্কর দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, শরীরের দ্বারা যে-কোন কর্ম্মই করা যাউক না কেন তাহাতে পাপ হয় না এবং এই কথা নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার মতে "কেবল" শব্দের দ্বারা অভিমানবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করাই বুঝাইতেছে। 'আমি করিতেছি', এই অভিমান পরিহারপূর্ব্বক বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহাতে পাপ হয় না, ইহাই শঙ্করের ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি সকল পদার্থেরই অন্তঃস্থিত নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মতেই আত্মভাব দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না থাকা প্রযুক্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলের সাধন কর্ম্মে কোন প্রয়োজন না দেখিতে পাইয়া কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই বাহ্য চেষ্টা করেন, এবং এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ।

কিন্তু শঙ্করের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গীতা যে সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার উপরেই পুনঃ পুনঃ জোর দিয়াছে, গীতার সেই মূল শিক্ষাকেই অস্বীকার করিতে

হয়। শঙ্কর বলিতেছেন, মুক্ত পুরুষের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকাতে তিনি কর্ম্মের কোন প্রয়োজন দেখিতে পান না, কিন্তু গীতা বলিয়াছে, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া সকল প্রকার কর্ম্ম করাই সত্য নীতি,—

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ (৩।৩০)।

অতএব, নিরাশী বা আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইলেই যে ভিক্ষাদি কর্ম্মকেই সম্বল করিতে হইবে, অন্য সকল প্রকার কর্ম্ম বর্জ্জিত হইবে ইহা গীতার শিক্ষা নহে। শারীর কর্ম্মের সহজ অর্থ হইতেছে শরীরের দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। মুক্ত পুরুষ প্রাণের বাসনা কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করেন না, মন বুদ্ধির যুক্তি তর্কের দ্বারাও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না। শুধু তাঁহার দেহই কর্ম্ম করে, কর্ম্মের পরিচালনার জন্য আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আসে ঊর্দ্ধ হইতে; সে কর্ম্ম মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা ভগবান পুরুষোত্তমেরই সঙ্কল্প, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিচ্ছায়া।

কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্‌। সেই জন্যই তিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলের জন্য ব্যস্ত হইয়া হৃদয় ও মনে সেই সকল বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করেন না যে সবকে আমরা পাপ বলিয়া থাকি। কারণ বাহিরের কোন কর্ম্মই পাপ নহে, কিন্তু ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, হৃদয় ও মনে যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম্মের সঙ্গে থাকে অথবা যাহা হইতে ঐ কর্ম্ম উৎপন্ন হয় বস্তুতঃ সেই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াই পাপ; যাহা নির্ব্যক্তিক, যাহা আধ্যাত্মিক তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্‌; আর এই নির্ব্যক্তিক ও অধ্যাত্ম-ভাব লইয়া আমরা যে-সব কর্ম্ম করি সে-সবও হয় সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ ও নিষ্পাপ। এই যে আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতা (spiritual impersonality) ইহাই হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর তৃতীয় লক্ষণ। সকল উন্নত ও উদারচরিত্র মানবই অনুভব করেন যে, একটা নির্ব্যক্তিক শক্তি বা প্রেম বা সঙ্কল্প এবং জ্ঞান তাঁহাদের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মানবীয় ব্যক্তিত্বের অহংভাবমূলক প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত নহেন, অনেক সময় সেই অহংভাব খুবই উগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু গীতার যে মুক্তপুরুষ, দিব্য কর্ম্মী, তিনি এই মুক্তি লাভ করিয়াছেন, কারণ তিনি সমস্ত ব্যক্তিক ভাব বর্জ্জন করিয়াছেন, ভগবান তাঁহার ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকল সীমাবদ্ধ গুণকে অসীমভাবে, মুক্তভাবে ব্যবহার করিতেছেন। তিনি আর কেবল সত্ত্বাদি গুণসকলের

সমষ্টি মাত্র নহেন, তিনি অধ্যাত্ম-সত্তা হইয়া উঠিয়াছেন; প্রকৃতির কর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তিত্বভাবটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাও সকল-বন্ধনহীন, উদার, নমনীয়, বিশ্বগত, তাহা অনন্তেরই মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমেরই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

অন্বয়—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ, সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ [পুরুষঃ] কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে।

অনুবাদ—আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সকল দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, যিনি পরের শ্রী দেখিয়া কাতর হন না, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যাঁহার সমভাব, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েন না।

ব্যাখ্যা

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—মুক্ত পুরুষ কোন বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভগবানের ইচ্ছায় যাহা তাঁহার নিকটে আসে তাহার প্রতি তাঁহার বিরাগও নাই, আসক্তিও নাই। কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ না হইলেই অসন্তোষের উদ্ভব হয়, মুক্ত ব্যক্তির কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাই তিনি যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট হন।

দ্বন্দ্বাতীতঃ—মানুষের সাধারণ চেতনা দ্বন্দ্বে পূর্ণ, সফলতা বিফলতা, জয় পরাজয়, শুভ অশুভ, মান অপমান, পাপ পুণ্য, এই সকল বাহ্য ভেদের দ্বারাই জাগতিক ঘটনার প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব নির্ণীত হয়। মুক্ত পুরুষ এই সকল ভেদ যে দেখেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি এ সবের দ্বারা বিচলিত হন না, তিনি এ সবের উর্দ্ধে এক উদার দিব্য চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন এবং দ্বন্দ্বাতীত হন। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মানুষের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু নিষ্কাম দিব্য মানবের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়ই সমান আদরের, কারণ তাহাদের সংমিশ্রণের ভিতর দিয়াই চির-কল্যাণের রূপসকল গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির কুরুক্ষেত্রে দিব্য জয়ের অভিমুখে চলিয়াছে—এই যে কর্ম্ম-

ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের অধিনায়ক, কর্ম্মসমূহের অধীশ্বর, ধর্ম্মের গুরু ভগবানের সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানুষের সম্মান বা অসম্মান, প্রশংসা বা নিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, কারণ তাঁহার কর্ম্মের একজন মহত্তর দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকর্ত্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ডও আছে, সাংসারিক কোন পুরস্কারের আশায় তিনি কর্ম্ম করেন না। ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন স্বভাবতঃই যশ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষতার অপবাদকে মৃত্যু অপেক্ষাও খারাপ বলিয়া বর্জ্জন করাই তাঁহার পক্ষে সমুচিত, কারণ সম্মান রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অম্লান রাখাই তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ; কিন্তু মুক্ত পুরুষ অর্জ্জুনের পক্ষে এসব বিষয় গ্রাহ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু দেখিতে হইবে যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন্ কর্ম্ম দাবী করিতেছেন, তাঁহাকে সেই কর্ম্মই করিতে হইবে এবং তাহার ফলাফল তাঁহার কর্ম্মের অধীশ্বর ভগবানের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এমন কি তিনি পাপ পুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন ; যাহারা অহংভাবের পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা করিতেছে, রিপুগণের প্রবল ও দুর্দ্দান্ত বশ্যতার বোঝা লঘুতর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এই পাপ পুণ্যের প্রভেদ একান্ত প্রয়োজনীয়—কিন্তু যিনি মুক্ত তিনি এই সকল প্রচেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী সম্বুদ্ধ আত্মার শুচিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাঁহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি যে-চূড়ায় উঠিয়াছেন, যে-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা এমন কোন পুণ্য নহে যাহা সৎকর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং অসৎকর্ম্মের দ্বারা ক্ষুণ্ণ বা নষ্ট হয়, পরন্তু তাহা হইতেছে অহংভাবশূন্য দিব্য প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্রতা ; সেখানে আর পাপ-পুণ্য-বোধের কোন সার্থকতা বা প্রয়োজন নাই।

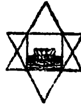
বিমৎসরঃ—মুক্ত পুরুষের এক লক্ষণ হইতেছে তিনি মাৎসর্য্যশূন্য অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে jealousy নাই, তিনি পরের শ্রী দেখিয়া কাতর হন না। এই পরশ্রীকাতরতা জগতের বহু দুঃখ ও অনিষ্টের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় গিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই খ্যাতিতে কাতর হইয়া তাঁহার দেশবাসীই নানারূপে তাঁহার বিপক্ষতা

করিয়াছিল। স্বামীজী বলিয়াছেন, এই পরশ্রীকাতরতাই হিন্দুদের অধঃপতনের এক প্রধান কারণ। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা দূর করিতেই হইবে এবং ইহার উপায় হইতেছে অহংভাব ও বাসনা বর্জ্জন করা, সর্ব্বভূতের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাকেই হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি অর্পণ করা।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ—মুক্তপুরুষ দ্বন্দ্বাতীত, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়াছেন, অতএব সাধারণ মানুষ যেরূপ সিদ্ধিতে উল্লসিত হইয়া উঠে, অসিদ্ধিতে ব্যথিত হয়, মুক্ত পুরুষের মধ্যে এরূপ কোন বিকারই হয় না, তিনি সিদ্ধি অসিদ্ধি, জয় পরাজয়কে সমান চক্ষুতে দেখেন। এই যে সমতা, ইহার দ্বারাই মুক্ত পুরুষের পরীক্ষা এবং ইহা দিব্য কর্ম্মীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ভগবান সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র, এই জ্ঞান হইতে অহংভাব দূর হয়। অহংভাব দূর হইলে বাসনা নিবৃত্ত হয়, আমরা নির্ব্যক্তিকভাবে কর্ম্ম করি, উপলব্ধি করি যে এক মহতী শক্তি আমাদের প্রকৃতিকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে; এই জ্ঞান, এই নিষ্কামতা এবং এই নির্ব্যক্তিক ভাবেরই ফল হয় আত্মায় ও প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ সমতা, আমরা তখন মুক্ত হই, শুভ অশুভ, জয় পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি সকল দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠি। যদি দেখা যায় যে, আমরা ভগবানের ইচ্ছায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই পূর্ণ সন্তোষ লাভ করি না, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে, পরের শ্রী দেখিয়া আমরা এতটুকুও কাতর হই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের মুক্তি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, এখনও আমরা দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মী হইবার যোগ্যতা লাভ করি নাই।

কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে—মীমাংসকেরা বলেন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না। এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বলিতে অনেকেই শ্রুতি ও স্মৃতিতে উল্লিখিত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ বুঝেন। গীতা এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করে নাই, কর্ম্মের কোন বাহ্য ভেদ করে নাই। ভিতরে নিষ্কাম ভাব লইয়া কর্ম্ম করিলে কোন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হয় না, গীতা তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। চাই জ্ঞান, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা এবং এই সবের ফলস্বরূপ সমতা। ভিতরকে এইভাবে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই করিতে হইবে। অহংভাব ও বাসন

1946



Works of Sri Aurobindo
and
The Mother

Including the Mother's
Original French Works and Translations

AMIYA LIBRARY
19, Bhupendra Basu Avenue
P. O. Shyam Bazar, Calcutta

PLEASE NOTE

To simplify our book-keeping please remit when ordering.

Books are also supplied against V. P. P. orders in India and Ceylon.

Any item not agreeing with the Catalogue description may be returned to us at our expense.

Please write your name and address legibly, preferably in block letters.

The affixed prices are net and do not include postage and packing charges.

Owing to present-day conditions prices are subject to alteration without notice.

All books are strongly packed to stand the handling of the Post, but are sent at the Purchaser's risk and we cannot be held responsible for loss or damage during transit.

Our friends overseas are requested to send their remittances by International Money Order or by British Postal Order at the current rate of exchange or through their Banker's draft payable in India including a little extra amount to cover postage and packing charges.

All remittances should be sent in the name of Amiya Library, 19, Bhupendra Basu Avenue, P. O. Shyam Bazar, Calcutta.

Works of Sri Aurobindo

THE LIFE DIVINE *Complete in two Volumes*

Vol. I. 8+348 pp. Cl. 2nd Ed. 1943 Rs. 6—12—0

Vol. II. 12+945 pp. Cl. 2nd Ed. 1944 Rs. 18—0—0

This book is the *magnum opus* of Sri Aurobindo's philosophy and integral Yoga. It is a message unique in its kind with an inspiring vision and a new promise to distracted humanity. It brings within the grasp of mankind the subtle link between man's heavenward aspirations and his earthly adventures with a philosophic background equally lofty and noble.

Sir Francis Younghusband wrote a few weeks before his death:

"I really do quite genuinely consider it the greatest book which has been produced in my time and I have learned some very valuable things from it which I would much like to have known of before.

"This war has been a terrible catastrophe. . . . And THE LIFE DIVINE could not have appeared at a more opportune moment. . . . . it will make its influence felt."

Asia, New York:

"He represents a new type of thinker in the history of Indian philosophy, a fore-runner and a first classic of a new age of freedom and cosmopolitan collaboration towards which the rapid evolution of India tends."

The Times Literary Supplement:

"In three volumes of closely reasoned exposition in a fine English prose he has so clearly expounded the fundamental truths of every religion that followers of each may draw enlightenment from him and become all the more ardent worshippers of God in their own way."

Prof. Khalifa A. Hakim of the Osmania University:

"I was overjoyed to find over again the corroboration of the great truths of higher Sufism in this profound message of Sri Aurobindo demonstrating once more the Unity and Universality of all real religions....I sincerely believe that all seekers of Truth and all lovers of universal religion will greatly benefit by it."

Dr. S. K. Maitra in the Prabuddha Bharata:

"No book in this century has shaken philosopical thought to its very foundations so much as this book has done . . . this book will live for all time as one of the world's greatest philosophical classics."

Mr. Heinz Kappes, a former German Evangelical Pastor who had been persecuted by the Nazis and a member of the Society of Friends (Quakers):

"I am sure it was Spiritual Guidance which offered me in Jerusalem a copy of Sri Aurobindo's Life Divine. To me this book has become the Summa of experience and wisdom I have found in Christian, Jewish, Moslem, Chinese and Indian Mysticism."

Mr. V. Chandrasekharam in The Triveni:

"It is evident that this is no mere abstract s
but a grand synthesis of our knowledge and experience in the light of psychological discoveries made at high altitudes of our being. The Veda and the Upanishad have been waiting

for centuries for the next forward and inevitable step. That step has now been taken. The result of that step is THE LIFE DIVINE."

Sanskrit Citations in "The Life Divine"

4+107 pp. Paper. 1943 Rs. 1—8—0

"A unique collection of fundamental passages from ancient Sanskrit scriptures with Sri Aurobindo's luminous English translation of them. As an epitome of India's spiritual heritage it will be valued by all."—*Hindusthan Standard.*

Essays on the Gita *Complete in two Series*

First Series 8+356 pp. Cl. 4th Ed. 1944 Rs. 7-8-0

Second Series 8+440 pp. Cl. 3rd Ed. 1945 Rs. 10-0-0

A new interpretation of the Gita, not as a philosophical doctrine but as a practical guide to life, to the highest spiritual life—which is not a turning away from the world and its actualities nor a pursuit of mere ethical or mentally motivated activities, which is rather a life here below of Actionless Action, of action held in God-consciousness.

The book is not merely an interpretation, but carries something of the power and light of the *mantra*, of the Gita's own *mantra-shakti*.

"It is philosophy touched by lyricism, and the book is written throughout in easy excellent English which carries to a new perfection the difficult art of expounding Hindu thought to the West."—*The Statesman.*

Isha Upanishad

6+121 pp. Paper. 4th Ed. 1945 Rs. 2—8—0

With text and translation and a detailed analysis and commentary.

The Isha Upanishad is the whole of the Upanishadic spiritual discipline summarised and concentrated in a few, almost cryptic, *slokas*. The translation is marvellously close to the original, echoing, as it were, the very sense of the ancient text and yet in a form clear and near to the modern mind.

The commentary contains an analysis of the thought-movement in its severely logical chain, thus giving the lie direct to the cheap European criticism that the Upanishads are generally a string of disconnected and disjointed thoughts.

Ideals and Progress

4+56 pp. Paper. 3rd Ed. 1946 Rs. 1—0—0

Essays contained in this book point out the need of harmonising the two divergent currents of culture obtaining in the East and the West.

The Superman

2+22 pp. Paper. 3rd Ed. 1944 Rs. 0—10—0

The nature and function of the Divine Man that the Earth is seeking to evolve out of the present humanity.

Evolution

8+44 pp. Paper. 4th Ed. 1944 Rs. 0—12—0

Three luminous essays on (1) the meaning and scope of the force of Evolution; (2) the nature of the Inconscient which forms the very basis of the evolutionary process; and (3) the real significance of the doctrine or rather the principle of materialism.

Thoughts and Glimpses

2+41 pp. Paper. 5th Ed. 1944 Rs. 1—0—0

Revelations about man's goal and purpose of life couched in the most beautiful aphoristic sentences.

The book gives in a nutshell the central ideas of Sri Aurobindo's philosophy of life.

Heraclitus

4+70 pp. Paper. 1944 Rs. 1—4—0

In giving a highly interesting account of the philosophy and mysticism of Heraclitus, Sri Aurobindo has pointed out in how many directions the deep divining eye of Heraclitus anticipated the largest and profoundest generalisations of Science and Philosophy, and shown how in his merits and his defects he has deeply influenced modern European thought and civilisation.

The Mother

9+85 pp. Cl. 4th Ed. 1944 Rs. 1—0—0

In this book Sri Aurobindo portrays with vividness and exactness of detail the four great aspects of the Mother,—Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati,—four of her leading Powers and Personalities which have stood in front in her guidance of this Universe and in her dealings with the terrestrial play.

"In the sublimity of its thought and conception, in the perfection of its expression and the loftiness of its language the book has been a creation worthy of the master mind behind it."—*The Amrita Bazar Patrika.*

The Riddle of This World

4+106 pp. Paper. 3rd Ed. 1946 Rs. 1—8—0

"Those who are attracted by the philosophy of the Superman and by the possibility of some widening of the supramental channels of knowledge, which even Western psycho-analysts and psychologists now seem to recognize, will find much to interest them in this book. It consists of a

series of letters or essays written to meet the difficulties of correspondents, and for that reason will be helpful to many. ....Intuitionist philosophers will find that some of it seems to go as far as thought, which depends on words, can reach." —Mr. W. A. Moore in *The Statesman.*

Lights on Yoga

4+58 pp. Paper, 3rd Ed. 1944 Rs. 1—8—0

The book consists of extracts from letters written by Sri Aurobindo to his disciples in answer to their queries. In it, Sri Aurobindo has laid bare the fundamental principles, metaphysical and psychological, informing the lay mind, of the nature of the *sadhana*, the goal and the path.

"......Certainly this is a book that is stimulative of increased effort towards self-understanding, self-dedication and joy in realisation."—*The Theosophist.*

Bases of Yoga

6+114 pp. Paper. 3rd Ed. 1944 Rs. 1—8—0

This book is a further instalment of extracts from letters from Sri Aurobindo to his disciples in answer to their queries. In it light is thrown on the method; and, what is still more important, detailed instructions are given as to how to meet difficulties.

"......In reading these letters the impression gained is that it is a thorough introduction to the subject of Yoga. It is not merely a handbook of *sutras* but a handbook of detailed instructions. Written in a supremely felicitous style it is at once clear, simple and profound. It is a book to be read, re-read and pondered over and finally brought into experience."—*The Hindu.*

The Yoga and Its Objects

4+60+viii pp. Paper. 4th Ed. 1946 Rs. 1—0—0

In a most clear and impressive manner the significance of Yoga and the methods of Yogic practice have been explained.

The Teaching and the Ashram of Sri Aurobindo

4+12 pp. Paper. 2nd Ed. 1945 Rs. 0—2—0

Sri Aurobindo's statement about his Ashram and the ideal that is being worked out there.

Bankim-Tilak-Dayananda

8+80 pp. Paper. 1940 Rs. 1—8—0

A penetrating appreciation of some of the great company of remarkable figures that have stood at the head of the Indian Renaissance giving an insight into the political, cultural and spiritual reawakening of India.

The book also contains the full text of the "Bandemataram" song with English renderings in prose and verse by Sri Aurobindo.

"The treatment of the subject is not biographical. Each of the three leaders, Bankim, Tilak, Dayananda, is placed in his true context in national history and the measure of his contributions to nationalism is indicated in true proportions. ...... There is no vain-glorious adulation, boisterous bombast or pointless drum-beating. With penetrating vision and illuminating analysis each of the leaders is assigned to his true place and we see how great they were and what a debt of gratitude we owe them."—*The Guardian.*

The Renaissance in India

6+82 pp. Paper. 3rd Ed. 1946 Rs. 1—8—0

In four luminous chapters the author has given the real meaning and trend of the present re-awakening of India and has clearly indicated the lines of work before her. Her success on these lines will be the measure of her help to the future of humanity.

"We do not know which to admire most, the purity and flowing style of English language or the deep, philosophic reflections on the past, the present and the future of India to which he has given expression."—*The United India & The Indian States.*

The Ideal of the Karmayogin

6+66 pp. Paper. 6th Ed. 1945 Rs. 1—8—0

Collection of articles giving a masterly exposition of the spiritual background of our national life.

A System of National Education

8+53 pp. Paper. 2nd Ed. 1944 Rs. 1—0—0

This book consists of a number of introductory essays insisting on certain general principles of a sound system of teaching applicable for the most part to national education in any country.

The National Value of Art

2+51 pp. Paper. 3rd Ed. 1946 Rs. 1—0—0

The aesthetic, intellectual and spiritual aspects of art, in relation to national life and its development, have been dealt with in beautiful language.

"This brochure, we hope, will dispel the superstitious ignorance of those who deprecate art as a fashionable or

luxurious and therefore a useless commodity of life."—*Prabuddha Bharata.*

The Brain of India

2+30 pp. Paper. 3rd Ed. 1944 Rs. 0—8—0

In this book the author has stated the main psychological principle on which the ancient Indians based their scheme of education.

Uttarpara Speech

2+20 pp. Paper. 4th Ed. 1943 Rs. 0—8—0

This speech delivered just after Sri Aurobindo's acquittal in the Alipore Bomb Case is remarkable for its revelation of the new faith and light that dawned on him as a result of the mystic spiritual experiences inside the jail.

On the War

12 pp. Paper. 1944 Rs. 0—2—0

A collection of 4 letters of the Mother and Sri Aurobindo, the first of which being written at the time of the collapse of France and the threatened collapse of Britain. The other letters were written for disciples. They reveal the inner truth of the great world struggle just over.

Kalidasa

8+51 pp. Paper. 1929 Rs. 1—4—0

Two essays on the characteristic build of Kalidasa's aesthetic genius and the place the great poet occupies in the evolution of India's cultural life—an exemplar of the most penetrating character-study and superb literary criticism.

"It brings a new historical outlook and insight into the field of literary estimation,....it surveys the post-vedic history of India, and infers the three successive phases of development—characterised respectively as moral, intellectual and material from the representative poets Valmiki, Vyasa and Kalidasa."—*Dr. R. Vaidyanathaswami.*

Views and Reviews

8+88 pp. Paper. 2nd Ed. 1946 Rs. 1—4—0

This book contains Sri Aurobindo's illuminating exposition of a variety of subjects of general interest, including the Synthesis needed at the present time, Indian Art, the Tantras and Astrology. In the section on Astrology Sri Aurobindo has cited several readings of his own horoscope which are exceedingly interesting.

Collected Poems and Plays *In 2 Vols.*

Vol. I, 14+306 pp.; Vol. II, 10+392 pp. Boards 1942

ORDINARY EDITION .. .. Rs. 15—0—0

DE LUXE EDITION, limited to 100 sets, each set numbered and autographed. Rs. 100—0—0

In two volumes are collected all the poetical works of Sri Aurobindo that have already been published in book form or as isolated pieces or serially in periodicals. All lovers of poetry will welcome this collection which reveals the poetic genius of Sri Aurobindo.

The appendix contains sixteen poems newly composed by Sri Aurobindo illustrating the possibilities of new English metres and rhythms.

The Statesman in a long appreciative review welcomes the publication of "this collected edition on the occasion of

the seventieth birthday of the Master"; and expresses a hope that "in the interest of the readers of English poetry all over the world" a third volume would be published "containing a significant selection from the great mass of poems lying unpublished."

The reviewer referring to certain lyrical pieces says that they "select themselves for inclusion in any representative anthology of English poetry." In *The Mother of Dreams* and *Ahana* composed later he finds "a greater philosophical depth and a more complete mastery of the verse-technique and rhythmic subtleties."

On Sri Aurobindo's experiment with quantitative measures through the English medium, the reviewer says: "His notes on these experiments are of absorbing interest and show what a keen insight he has into metrical craftsmanship."

Mr. William Saunders writes in the Edinburgh paper "Peeblesshire News" of April 24, 1945:

"Of the poems and plays, it were impossible to speak too highly. No native of India, so far as I have ever seen, has caught the English diction, atmosphere and outlook so completely as this great writer, and the early poems especially are as essentially English as are those of any University graduate of the land. Later he becomes the Poet of Yoga, and the verses become increasingly metaphysical as we continue to read through the tomes, but the wonder is that their aesthetic qualities never flag, and they never lose their complete intelligibility to the interested reader."

Poems

16 pp. Paper. 1934 Rs. 1—0—0

This is a brochure containing six of the latest poems of Sri Aurobindo: *Transformation, Nirvana, The Other Earths, Thought the Paraclete, Moon of Two Hemi-*

spheres and *Rose of God.* These are specimens of the highest and sublimest poetry, really *mantras* of the "outbreak of Godhead in man." They are included in the collected Poems.

Six Poems

8+32+vii pp. Paper. 1934 Rs. 1—4—0

Six Poems of Sri Aurobindo—*The Bird of Fire, Trance, Shiva, The Life Heavens, Jivanmukta* and *In Horis Æternum*—written in novel English metres. The appendix contains notes by the author on the metres of the poems. With Bengali translations. The originals are included in the Collected Poems.

"The originals are deep, beautiful and entrancing. 'Shiva', 'The Life Heavens' and 'Jivanmukta'—each has a peculiar charm of its own. What a deep chord of the heart does the Earth's appeal in 'The Life Heavens' touch and how true! The sublime height of the superconscious and the greatness of the petty fleeting things of the earth have been expressed in a language unsurpassed in its directness and simplicity."—*Prabuddha Bharata.*

Vikramorvasie or The Hero and the Nymph

A drama of Kalidasa translated into English verse.

6+118 pp. Paper. 2nd Ed. 1941 Rs. 3—0—0

Kalidasa, the great classical poet of India, is a mere name to many, as they have not the requisite knowledge of Sanskrit to appreciate his works. Sri Aurobindo's translation of Vikramorvasie in verse makes Kalidasa a living reality again. The poetical merits of the original have been wonderfully preserved giving the impression as if Kalidasa himself wrote this great drama in a modern language. It is included in the Collected Poems.

Works of the Mother

Words of the Mother

214 pp. Paper. 2nd Ed. 1946 Rs. 2—8—0

It contains luminous utterances of the Mother revealing the secret of Sri Aurobindo's Yoga and its 'sunlit path'. The book has been happily made available to the public in the form of a handy volume. The major portion of the book was originally published for private circulation under the title "Conversations with the Mother". The book contains among other things the Mother's illuminating replies to various questions on Yoga, Religion, Science, Art, etc.

Prayers and Meditations of the Mother

This booklet translated from the French by Sri Aurobindo contains selections of the Mother's Prayers and Meditations. It is not an ordinary book, but comes as a blessing to those who aspire for an utter consecration to the Divine. On the front page appears in the Mother's own handwriting (facsimile) illumined words about "the true children of the Divine".

2nd Ed. Revised and Enlarged (in preparation)

The Supreme Discovery

4+20 pp. Paper. 2nd Ed. 1946 Rs. 0—8—0

Translated from the French "La Découverte Suprême".

FRENCH WORKS OF THE MOTHER

Prières et Méditations de la Mère
2+339 pp. Paper. 1944 Rs. 6—0—0

Prières Annuelles 1935–1945
2+8 pp. Paper. 1945 Rs. 0—4—0

Paroles d'autrefois
4+103 pp. Paper. 1946 Rs. 1—8—0

Belles Histoires
4+112 pp. Paper. 1946 Rs. 1—8—0

Entretiens suivis de quelques paroles
4+279+1 pp. Paper. 1946 Rs. 4—0—0

Translations of the English Works of Sri Aurobindo

Aperçus et Pensées (Thoughts and Glimpses)
Les Bases du Yoga (Bases of Yoga)
L'Isha Upanishad (Isha Upanishad)
Lumières sur le Yoga (Lights on Yoga)
La Mère (The Mother)
La Synthèse des Yogas, Vol. I

In Preparation

La Vie Divine (The Life Divine)

Works of Sri Aurobindo

The Veda, the Upanishads and the Gita

	Rs.	As.
Hymns to the Mystic Fire	5	0
Isha Upanishad	2	8
Essays on the Gita First Series	7	8
Essays on the Gita Second Series	10	0

Philosophy

The Life Divine Vol. I	6	12
The Life Divine Vol. II	18	0
Ideals and Progress	1	0
The Superman	0	10
Evolution	0	12
Thoughts and Glimpses	1	0
Heraclitus	1	4

Yoga

The Mother	1	0
The Riddle of This World	1	8
Lights on Yoga	1	8
Bases of Yoga	1	8
The Yoga and Its Objects	1	0
The Teaching and the Ashram of Sri Aurobindo ...	0	2

Nationalism

Bankim-Tilak-Dayananda	1	8
The Renaissance in India	1	8
The Ideal of the Karmayogin	1	8
A System of National Education	1	0
The National Value of Art	1	0
The Brain of India	0	8
Uttarpara Speech	0	8
On The War	0	2

Literature

	Rs.	As.
Kalidasa	1	4
Views and Reviews	1	4

Poems and Plays

Collected Poems and Plays In 2 Vols.	15	0
Poems	1	0
Six Poems (with Bengali Translations)	1	4
Vikramorvasie or The Hero and the Nymph	3	0
Poems Past and Present (not included in the collected edition)	1	4

Imprimerie de
Sri Aurobindo Ashram
Pondichéry

W. D. No. 102—10-6-46.—10,000.

লইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলে সে সবও বন্ধনের কারণ হয়, কিন্তু এই সব হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধের ন্যায় রক্তাক্ত ভীষণ কর্ম্ম করিলেও তাহা বন্ধনের কারণ হয় না, মুক্ত পুরুষে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না, গীতা এই ভাবেই অর্জ্জুনের মূল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

অন্বয়—গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে।

অনুবাদ—আসক্তিশূন্য, আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, মুক্ত পুরুষ যখন যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করেন, তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্তির পর আর কর্ম্ম থাকে না। গীতার মতে, মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম করিতে কোন বাধাই নাই, কেবল তিনি জানেন যে, তিনি নিজেই সক্রিয় নহেন, বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃতির গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম্ম করে (গীতা ৫।৮,৯)। তিনি অক্ষর অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুণত্রয়ের কবল হইতে নিরাপদ থাকেন, ত্রিগুণাতীত হন; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, রাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন। তাঁহার কর্ম্মের মধ্যে সত্ত্বগুণের জ্ঞান ও সুখ, রজোগুণের সক্রিয়তা ও শক্তি, তমোগুণের বিশ্রাম ও জড়তার যে খেল ছন্দোবদ্ধভাবে চলে, সে সব তিনি সাক্ষীর ভাব লইয়া দর্শন করেন, তাঁহার আত্মায় সকল সময়েই থাকে নির্ম্মলতা ও শান্তি। শান্ত আত্মার এই উর্দ্ধস্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজের কর্ম্মকে নিরীক্ষণ করা অথচ ইহাতে আসক্ত বা বদ্ধ না হওয়া, এই ত্রৈগুণাতীত্য হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর একটি মহৎ লক্ষণ।

প্রকৃতিই সব করিতেছে, পুরুষ কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টা—এই জ্ঞানটুকু প্রয়োজন আমাদের ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। কিন্তু শুধু এইটিকেই

ধরিয়া থাকিলে এইরূপ মতের উদ্ভব হইতে পারে যে, প্রকৃতি অন্ধ নিয়মের বশে সংসারে সব কিছুই করিয়া চলিয়াছে, পুরুষের তাহাতে কোনও হাত নাই, কোনও দায়িত্ব নাই। কিন্তু এরূপ মত কেবল অসম্পূর্ণ চিন্তার ফল, গীতা পুরুষোত্তম-তত্ত্বের দ্বারা এই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছে। গীতা এই তত্ত্বের দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে যে, শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি নিজের কার্য্য নিজে অন্ধভাবে নির্ণয় করে না; পরম পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে প্রেরণা দেয়; যিনি ইতিপূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জ্জুন যাঁহার মানবীয় যন্ত্রমাত্র, সেই বিশ্বপুরুষ, সেই বিশ্বাতীত ভগবানই হইতেছেন প্রকৃতির সকল কর্ম্মের অধীশ্বর। "আমি কর্ত্তা" এই অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদিগকে সকল কর্ম্ম প্রথমে প্রকৃতির উপরেই আরোপ করিতে হয়, কিন্তু লক্ষ্য হইতেছে সর্ব্বভূতের যিনি অধীশ্বর তাঁহাকেই আমাদের সকল কর্ম্ম অর্পণ করা। ভগবান বলিয়াছেন,

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, "আমি", "আমার"—এই সব চিন্তা বর্জ্জন করিয়া, 'বিগতজ্বর' হইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম্ম কর, জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর। ভগবানই সমগ্র কর্ম্মটি উদ্ভাবন করেন, নির্দ্দেশ করেন, নিয়মন করেন; নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হয় তাঁহার শক্তির শুদ্ধ ও প্রশান্ত যন্ত্রস্বরূপ, প্রকৃতিতে ঐ শক্তি দিব্য কর্ম্মধারাটি সম্পন্ন করে। কেবল এই প্রকারের কর্ম্মই মুক্তপুরুষের কর্ম্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম, কারণ কোন বিষয়েই তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করেন না; সিদ্ধ কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম এই প্রকারেরই। সে-সব কর্ম্ম মুক্ত আত্মা হইতে উত্থিত হয়, এবং সেই আত্মার কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়াই গভীর সমুদ্রের উপর তরঙ্গের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়।

জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ—আত্মার বিকাশে জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরের সহায়। গীতার শিক্ষা হইতেছে, দিব্য কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যোগ। সে-কর্ম্ম করা হয় সকল প্রকার ফল কামনা শূন্য হইয়া, সকল বস্তু

সকল ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের সমভাব লইয়া, পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে। এই যে নিষ্কামতা, এই সমতা এবং যজ্ঞরূপে কর্ম্ম, ইহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে আত্মজ্ঞানে। কর্ম্ম যেমন অধিকতর নিষ্কাম, সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, যজ্ঞার্থ হয়, তেমনি জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, আবার যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তেমনিই মানুষ নিষ্কামতা, সমতা ও যজ্ঞভাবে অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে জ্ঞান-যজ্ঞ সকল প্রকার দ্রব্য-যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ (৪।৩৪)।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম—যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের মূল কথা। মানুষের জীবন ও কর্ম্ম তাহার ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্য, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নহে, বিশ্ব ব্যাপিয়া আদান প্রদানরূপ যে বিরাট জ্ঞ চলিতেছে আমাদের জীবন ও কর্ম্ম তাহারই অংশ মাত্র, আমরা সংসারে যে ফল, যে ভোগসুখ লাভ করি সে-সবই যজ্ঞের ফল, দেবতাদের দান—এই জ্ঞান লইয়া, সকল সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের আরম্ভ। এই জ্ঞানের পূর্ণতা হয় যখন আমরা সকল রকম ফল-কামনা বর্জ্জন করি, আমরা কর্ত্তা এই অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্রী বলিয়া উপলব্ধি করি, আমরা ভোক্তা এইভাব হইতে মুক্ত হইয়া, একমাত্র ভগবানকেই প্রকৃতির সকল যজ্ঞের, সকল কর্ম্মের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করি। তখন আর কোন ব্যক্তিগত ভোগে নহে পরন্তু ভগবানেই আমরা লাভ করি একমাত্র তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ, বিশুদ্ধ আনন্দ; তখন কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগের দ্বারা আর কিছু লাভ করিবার থাকে না, দেবতা বা মানব কাহারও উপর কোন কিছুর জন্যই নির্ভর করিতে হয় না, কাহারও নিকট হইতে কোন লাভের আশা করিতে হয় না, কারণ আত্মানন্দেই হয় পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তখন আমরা কর্ম্ম করি কেবল ভগবানের জন্য, যজ্ঞরূপে, সকল রকম বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া।

সমগ্রং প্রবিলীয়তে—মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম সম্পন্ন হইবামাত্র অদৃশ্য হইয়া যায়, ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মীর আত্মার উপর সে কর্ম্ম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানই সে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্ম্ম আর মানবীয় যন্ত্রের ব্যক্তিগত কর্ম্ম থাকে না। সে কর্ম্ম হয় ব্রহ্মসত্তারই শক্তি।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪

অন্বয়। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রহ্মাগ্নৌ হুতং, তেন ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।

অনুবাদ—অর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হইতেছে, ব্রহ্মকর্ম্মে সমাধি দ্বারা ব্রহ্মকেই লাভ করিতে হয়।

ব্যাখ্যা

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ। গীতা যেমন প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য-তত্ত্ব স্বীকার করিয়া কেবল তাহার বাহ্যিক রূপটিকেই গ্রহণ করে নাই পরন্তু তাহার পশ্চাতে যে গভীর আভ্যন্তরীণ, বিশ্বজনীন অধ্যাত্ম অর্থ আছে তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে, ঠিক তেমনই বৈদিক যজ্ঞের তত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াও বাহ্যিক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, পরন্তু যজ্ঞকে এক উদার, শাশ্বত, সার্ব্বজনীন অধ্যাত্ম অর্থ প্রদান করিয়াছে। যজ্ঞের এই ব্যাপক ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই গীতা বলিল যে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শক্তি ও দ্রব্য, অর্পণকর্ত্তা ও গৃহীতা ও লক্ষ্য সবই হইতেছে সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। গীতা এখানে যে-ভাষায় অতি বিস্তৃত ও পরিষ্কারভাবে যজ্ঞের ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না যে, গীতা অন্তরের যজ্ঞেরই শিক্ষা দিয়াছে, বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সেই আভ্যন্তরীণ যজ্ঞের রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্ব্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল, শারীরিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্য অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের নিগূঢ় অর্থ। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকদের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের মর্ম্ম লোকে বহু দিনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতাতে বেদান্ত এবং পরবর্ত্তী যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের আর এক উদার দার্শনিক সার্ব্বজনীন অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মাগ্নৌ—যজ্ঞের অগ্নি স্থূল (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি। আমাদের মধ্যে ভগবদ্মুখী অভীপ্সা বা আকাঙ্ক্ষার যে দিব্য আভ্যন্তরীণ অগ্নি রহিয়াছে, সেইটিকেই প্রজ্বলিত করিতে হইবে, সেই অগ্নিই আমাদের সকল

অর্পণ ব্রহ্মের নিকট বহিয়া লইয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে এই অগ্নি ব্রহ্মেরই শক্তি।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং—এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে কর্ম্ম করিতে হইবে। "সোঽহম্," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", এই সকল মহান বেদান্ত বাক্যে এই জ্ঞানই সূচিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান; একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তাই কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং কর্ম্মের লক্ষ্যরূপে আবির্ভূত, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপে অভিব্যক্ত। যে বিশ্বশক্তিতে কর্ম্ম অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান,অর্পণের ক্রিয়া ভগবান; যাহা অর্পণ করা হয় তাহাও ভগবানেরই কোন বিশেষ রূপ; যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান ভিন্ন আর কেহই নহেন; ক্রিয়া, কর্ম্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে কর্ম্মরূপে ভগবান; যজ্ঞের দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে তাহাও ভগবান। যে-মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবন যাপন করে, কর্ম্ম তাহার পক্ষে কোন বন্ধনই নহে, তাহার ব্যক্তিগত অহংভাবে কৃত কোন কর্ম্ম থাকিতে পারে না; শুধু ভাগবত পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা কর্ম্ম করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে সমস্ত অর্পণ করেন; আর ভগবদ্মুখা এই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সহিত যুক্ত জীবের জ্ঞান লাভ, ভাগবত জীবন, ভাগবত চৈতন্য লাভ। ইহা জানা এবং এই ঐক্যসাধক চৈতন্যে জীবন যাপন করা, কর্ম্ম করাই মুক্ত হওয়া।

ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা—আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্ম শব্দে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞই বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে যে-ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, নিষ্ক্রিয়, নীরব, নিশ্চল ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য; কিন্তু যদি কোন কারণে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান থাকা হেতু ঐ কর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে। তিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়া দেখেন, অর্পণ ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম। আবার যদি তিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তাহা হইলেও তাঁহার যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই হয় যজ্ঞস্বরূপ। এই ভাবে শঙ্কর যজ্ঞকে গৌণ করিয়া জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে লীন হওয়াকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা গীতার তাৎপর্য্য নহে। গীতা যজ্ঞ বলিতে কেবল শ্রৌত

বা স্মার্ত্ত যজ্ঞ বুঝে নাই, বিশ্বে যত কর্ম্ম চলিতেছে সবই যজ্ঞ, এবং এই কর্ম্মই ভগবান, গতিরূপে অভিব্যক্ত ভগবান, এই জ্ঞান লইয়া সকল কর্ম্ম করিয়াই মানুষ ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়, পরম মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করে।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

অন্বয়—অপরে যোগিনঃ দৈবং এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি।

অনুবাদ—কোন কোন যোগী দৈবযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেন।

ব্যাখ্যা

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং—একমাত্র ভগবানই নিজ ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা নিজের উদ্দেশে এই যজ্ঞ করিতেছেন, এই জ্ঞানে সমস্ত জীবন ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়াই পরম মুক্তি ও সিদ্ধি। কিন্তু যোগীদের মধ্যেও সকলেই এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, কেহ কেহ ভগবানকে নানা নাম ও রূপে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু আদি দেবতারূপে কল্পনা করেন এবং ঘৃত, অগ্নি, সমিধ, কুশাদি দ্রব্যময় উপকরণের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার তৃপ্তির জন্য দর্শ, পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন। এই সকল যজ্ঞই দৈবযজ্ঞ নামে অভিহিত। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়া বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের অনুসরণ করেন না, তাঁহারা সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞরূপে এক ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে—কোন কোন যোগী দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এখানে যোগী শব্দে অনেকেই কর্ম্মযোগী বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাঁহারা দেবতাদের উদ্দেশে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাহ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই কর্ম্মযোগী এবং যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ দর্শন করিয়া সকল কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞানযোগী। কিন্তু বস্তুতঃ গীতায় কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগে এরূপ ভেদ করা হয় নাই। গীতার মতে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগই

হয় জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগও হয় কর্ম্মযোগ, পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করাই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের চরম স্বরূপ।

ব্রহ্মাগ্নাবাপরে যজ্ঞং—যাঁহারা যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝেন তাঁহারা জানেন যে, যজ্ঞের অগ্নি স্থূল অগ্নি নহে, তাহা ব্রহ্মাগ্নি। ভগবানের যে পরমা চিৎশক্তি বিশ্বের সৃজন, স্থিতি, লয় করিতেছে, বাহ্যজগতে যাহা বিশ্বশক্তিরূপে বিশ্বকর্ম্মে প্রকট হইতেছে, আমাদের অন্তর্জগতে যাহা তপঃশক্তি রূপে প্রকট হইতেছে, যাহার দ্বারা সকল বিশ্বকর্ম্মধারা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পিত হইতেছে তাহাই ব্রহ্মাগ্নি। এই বিশ্বকর্ম্ম-স্রোতে আমাদের সকল কর্ম্ম আহুতি দেওয়াই ব্রহ্মাগ্নিতে হোম করা এবং ইহাই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ।

যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি—মূলে আছে,"যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেন।" এই কথাটির বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়। শঙ্কর বলিয়াছেন, যে-জীবাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির যোগে সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, সেই জীবাত্মাই এখানে যজ্ঞ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত। এই সংসার-ধর্ম্মস্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে নিরুপাধিক পরব্রহ্মস্বরূপে যে দর্শন, তাহাই হইতেছে পরমাত্মাতে হোম। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ দর্শনই এই হোম এবং ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ। কিন্তু এখানে যজ্ঞ অর্থে আত্মা বুঝিবার কোন সমর্থনই গীতা হইতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারকগণ অনেকেই মূলতঃ শঙ্করের এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, মহাকাশে ঘটাকাশের বিলয় সাধনের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে জীবের লয় সাধনই হইতেছে ব্রহ্মাগ্নিতে হোমের অর্থ। পরিব্রাজক বলেন, "তৎ" বা ব্রহ্মরূপ জ্বলন্ত অনলে ত্বংরূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তাহার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। স্বামী উত্তমানন্দ বলেন, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা (অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখী করতঃ) যজ্ঞকে (অর্থাৎ জীবাভিমানরূপ অহঙ্কারকে) আহুতি দেন (অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন করিয়া ফেলেন)। শ্রীধর স্বামী যজ্ঞ শব্দে বুঝিয়াছেন কর্ম্ম, যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম প্রবিলয় করা, ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ। মধ্বাচার্য্য এখানে যজ্ঞ শব্দে বুঝিয়াছেন বিষ্ণু বা ভগবান, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর উপাসনাই এই পদের অর্থ।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, এখানে যজ্ঞ শব্দে যজ্ঞ বুঝিলেই আর কোন গোলমাল হয় না। "যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞ করা" ইহার অর্থ এই যে কোন বিশেষ শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যজ্ঞে আবদ্ধ না থাকিয়া সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞরূপে এক ভগবানে অর্পণ করা। ভগবানে অর্পণ করা রূপ যে যজ্ঞ তাহার দ্বারাই সকল কর্ম্ম, সকল জীবন যজ্ঞে পরিণত হয়। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" ; দেবগণ যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞ করিলেন ; এইখান হইতেই গীতার ভাষা গৃহীত হইয়াছে।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমজু াগ্নিষহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানান্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অন্বয়—অন্যে সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি ; অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি। অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি।

অনুবাদ—কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে হোম করেন ; অন্য কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে অর্পণ করেন। কেহ কেহ জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও প্রাণ-কর্ম্ম হোম করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে—যজ্ঞ-সাধনের নানা পন্থা আছে, হোমও নানা প্রকারের হইতে পারে, অর্পিত বস্তুও নানা প্রকারের হইতে পারে। স্থুল বাহ্য দ্রব্য লইয়াও যজ্ঞ হয় ; আবার আমাদের প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সকল লইয়াও যজ্ঞ হয়। স্বর্গাদি বাহ্য ফল কামনা করিয়া যেমন স্থুল অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পণ করা হয়, তেমনিই উচ্চতর আত্মজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধিলাভের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম, আত্মসংযমের সাধনা করাও এক প্রকার যজ্ঞ। এখানে ইন্দ্রিয়গণই হয় হোমের ঘৃত এবং সংযমই হয় অগ্নিস্বরূপ।

সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি—অনেক ব্যাখ্যাকারই এখানে সংযম শব্দের ব্যাখ্যা করিতে পাতঞ্জল যোগসূত্রের সাহায্য লইয়াছেন, ত্রয়মেকত্র সংযমঃ পতঞ্জলি সংযম বলিতে বুঝিয়াছেন একমাত্র বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগে এই সকল প্রক্রিয়ার বিশেষ অর্থ আছে—সে-সব উল্লেখ করিয়া গীতার বক্তব্যকে জটিল করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ গীতার অধ্যাত্ম সাধনা পাতঞ্জলের যোগ নহে। পতঞ্জলির অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, এখানে সমাধির অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের লোপ-সাধনই গীতার লক্ষ্য। কিন্তু গীতা সংযম শব্দ এইরূপ বিশেষ অর্থে গ্রহণ করে নাই, ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে রোধ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের ভিতরে যে স্থির শান্ত আত্মা রহিয়াছে, মনের বহির্মুখী ক্রিয়ার দ্বারা যাহা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমরা সেই আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারিব। ইহাই ইন্দ্রিয়সংযমের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা কেবল নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে জয় কখনই সম্পূর্ণ হয় না, বলবান ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের মনকে যে-কোন সময়ে হরণ; করিয়া লইতে পারে (গীতা ২।৬০)। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্-ভক্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে (২।৬১)। অতএব ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, ভগবানের উদ্দেশে সংযমরূপ অনলে ইন্দ্রিয়গণের হোম করিতেছি—এইরূপ যজ্ঞভাব মনে রাখিয়া প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা।

এইরূপ সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিলোপ হইবে, অবিদ্যার ধ্বংস হইবে, সংসার শেষ হইবে, মানুষ ব্রহ্মে লীন হইবে—ইহা গীতার লক্ষ্য নহে। অবিদ্যার লোপ হইলেই গীতার মতে সংসারলীলার অবসান হয় না, কারণ এই লীলার মূলে রহিয়াছে বিদ্যামায়া বা পরা প্রকৃতি। অবিদ্যার উপরে উঠিয়া পরা-প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই পৃথিবীতেই দিব্য জীবনের বিকাশ করিতে হইবে, ইহাই গীতার সাধনার লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়গণও মূলতঃ ভগবানেরই শক্তি, তাহাদের দিব্যস্বরূপ প্রকট করাই জীবনের লক্ষ্য, তাহার জন্য প্রথমেই তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে। ভগবদ্কৃপায় ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত, তিনিই অধ্যাত্ম জীবনের অধিকারী,

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৬১

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকলের ত্যাগ যেমন যজ্ঞ, তাহাদের ভোগও তেমনিই যজ্ঞ হইতে পারে; অবস্থা-বিশেষে উভয় প্রকার যজ্ঞের দ্বারাই অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভে সহায়তা হয় এবং গীতা এই সকল-প্রকার যজ্ঞের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন ভোগের আকাঙ্ক্ষা খুবই প্রবল থাকে, তখন জোর করিয়া তাহা দমন করিয়া কোনও লাভ হয় না, বরং তাহাতে কুফলই ফলিয়া থাকে, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে অর্পণ করিয়া যদি ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া ভোগ্যদ্রব্য গ্রহণ করা যায়, তাহার দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয়, মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে, তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

ভোজন কর, মনে কর
আহুতি দিই শ্যামা মাকে।

ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ঠিকমত ভোগ গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণই হয় যজ্ঞের পবিত্র অগ্নি এবং ভোগ্য বিষয় হয় হোমের ঘৃত। এইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগই হয় যজ্ঞস্বরূপ এবং তাহার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে এমন বিষয় সমূহ যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তখনই তাহা হয় যজ্ঞস্বরূপ! কেহ কেহ বলিয়াছেন কর্ণের দ্বারা ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিলে তাহাই হয় যজ্ঞস্বরূপ। কিন্তু গীতার শিক্ষা এইরূপ স্থূল ও বাহ্যিক নহে। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে এমন বিষয়-সকলও বাসনা বা আসক্তির সহিত গ্রহণ করিলে তাহা যজ্ঞ হয় না। বস্তুতঃ বাহ্যিক বিধি-নিষেধের গতানুগতিক অনুসরণ নহে, পরন্তু ভিতরের বাসনা ও আসক্তি-ত্যাগই গীতার প্রকৃত শিক্ষা; যতক্ষণ আমরা আসক্তিশূন্য না হই ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলে মনে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাতে আত্মজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে মনকে শান্ত রাখা অভ্যাস করিতে হইবে, তখনই সেই ভোগ হইবে যজ্ঞ। এই ভাবে যে-কোন বিষয়ই ভোগ করা যাউক না কেন, তাহা ভগবানে অর্পিত হইয়া যজ্ঞস্বরূপ হয়, যদশ্নাসি তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে—ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়া মনকে শান্ত করিয়া অন্তরের মধ্যে যাঁহারা আত্মার দর্শন

পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সকল কর্ম্ম ঐ আত্মাতেই গ্রহণ করেন, সেই স্থির শান্ত আত্মায় গৃহীত হইয়া তাহারা কোনরূপ বিক্ষোভ, প্রতিক্রিয়া বা বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম হইতেছে শব্দাদি বিষয় গ্রহণ। প্রাণের কর্ম্ম হইতেছে শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, ইত্যাদি। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, এই পাঁচটি প্রধান বায়ু—পঞ্চপ্রাণ। প্রাণবায়ু দ্বারা রক্ত চালিত হয়। অপানবায়ু দ্বারা প্রাণবায়ুর সহায়তা ও আহার্য্য চালিত হয়। উদানবায়ু দ্বারা উদ্গার ও শ্বাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ব্যানের কর্ম্ম আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কর্ম্ম ভুক্তপদার্থের পরিপাক করণ,—এই সমস্ত প্রাণকর্ম্ম।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে—আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম হোম করেন, ইহার অর্থ অনেকেই এইরূপ করিয়াছেন যে, ধ্যানের দ্বারা আত্মাতে সমাধি লাভ করিয়া সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা গীতার সমগ্র শিক্ষার বিরুদ্ধ, গীতা কোথাও সমস্ত কর্ম্মের লোপসাধনের কথা বলে নাই। এই দুইটি শ্লোকে গীতা তিন প্রকার তপস্যার কথা বলিয়াছে। একপ্রকার সাধনা আছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ গ্রহণ করা হয় কিন্তু মনকে তাহার ইন্দ্রিয়কর্ম্মে বিচলিত বা বিকৃত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই হয় যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিস্বরূপ। আর এক রকমের সাধনা আছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করা হয় যেন মনের ক্রিয়ার অন্তরাল হইতে শান্ত, স্থির আত্মা তাহার বিশুদ্ধতায় আবির্ভূত হয়। আর তৃতীয় সাধনা হইতেছে, যখন আত্মাকে জানা যায়, জ্ঞানদীপিতে; সেই সাধনার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম্ম সেই এক স্থির শান্ত আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়; প্রকৃতির মধ্যে সকল কর্ম্ম চলিতে থাকে, আত্মা সে সমুদয় দর্শন করে, উপভোগ করে, কিন্তু সে-সবের দ্বারা বিচলিত, বিকৃত বা বদ্ধ হয় না।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮

অন্বয়—[কেচিৎ] সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ, [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ, তথা অপরে যোগযজ্ঞাঃ, [তথা কেচন] স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ [ভবন্তি]।

অনুবাদ—কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্য উৎসর্গ রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, অন্য কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, আবার কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দেবতার উদ্দেশে যাঁহারা দ্রব্য উৎসর্গ করেন, হোমের অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ঘৃত অর্পণ করেন, তাঁহাদিগকেই দ্রব্যযজ্ঞাঃ বলা যায়। এইরূপ যজ্ঞকেই ২৫ শ্লোকে দৈবযজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং যজ্ঞ শব্দের মূল অর্থই হইতেছে এইরূপ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রৌত গ্রন্থ সমূহে উক্ত হইয়াছে কালক্রমে তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। তখন "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার সাধনকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়। মনু-স্মৃতিতে গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় পাঁচটি কর্ম্মকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে—ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। গীতা তৎকালপ্রচলিত পাঁচ প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ এই শ্লোকে করিয়াছে। কিন্তু গীতার নিজস্ব মত এই যে, যে-কোন কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পিত হয় তাহাই যজ্ঞপদবাচ্য, বিশ্বের সমুদয় কর্ম্মধারাই এক বিরাট যজ্ঞ।

তপোযজ্ঞাঃ—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি উপবাস ব্রত, ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ সহিষ্ণুতা, এই সবকেই সাধারণতঃ তপস্যা বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তপস্যা হইতেছে ভিতরের জিনিষ, বাহ্যিক আচরণ কেবল সেই ভিতরের সাধনার উপলক্ষ্য মাত্র হইতে পারে। আমাদের চৈতন্যের মধ্যে যে দিব্য ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে তাহাই তপঃ, যখন কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ তপঃশক্তিকে একাগ্রভাবে প্রয়োগ করা হয় তখনই হয় তপস্যা। আত্মশক্তিকে নীচ ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে ফিরাইয়া উর্দ্ধমুখী করা, জ্ঞান, মুক্তি, অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করা—ইহাই তপস্যা, এবং যাঁহারা এইরূপ তপস্যায় রত তাঁহাদিগকেই তপোযজ্ঞাঃ বলা হয়। পূর্ব্বে ২৬ ও ২৭ শ্লোকে এইরূপ তপোযজ্ঞেরই কথা বলা হইয়াছে।

যোগযজ্ঞাঃ—যোগযজ্ঞ বলিতে কেহ বুঝিয়াছেন অষ্টাঙ্গ রাজযোগ, কেহ বুঝিয়াছেন সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, আবার কেহ

বুঝিয়াছেন তীর্থ ভ্রমণাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম। কিন্তু গীতা এখানে কেবল রাজযোগ বা কর্ম্মযোগকেই লক্ষ্য করে নাই পরন্তু সকল প্রকার যোগকেই লক্ষ্য করিয়াছে এবং যাহারা কোন এক প্রকার যোগ সাধনা করেন তাহাদিগকেই যোগযজ্ঞাঃ বলিয়াছে।

ভাগবত চৈতন্যের সহিত মানুষের ব্যষ্টিগত চৈতন্যের সংযোগই হইতেছে যোগের মূল কথা। মানুষ ভগবানের অংশ, অনন্ত ভগবান হইতেছেন মানুষের মূল সত্তা ও উৎপত্তিস্থল, বিশ্বলীলার জন্য মানুষ ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নিজেকে এক স্বতন্ত্র, সীমাবদ্ধ, জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির অধীন ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করিয়া অশেষ দুঃখ পাইতেছে। যোগ হইতেছে অনন্তের সহিত মানুষের, ভগবানের সহিত জীবের পুনর্মিলন। আমাদের বহুমুখী চৈতন্য ও ব্যক্তিত্বের যে কোন অংশে ভগবানের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটিতে পারে। এই সংযোগ দেহের ভিতর দিয়া হইতে পারে, প্রাণের ভিতর দিয়া হইতে পারে, মনের ভিতর দিয়া হইতে পারে, অথবা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের পশ্চাতে যে অন্তঃপুরুষ বা আত্মা রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের জ্যোতি, শক্তি, আনন্দের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারি। আমাদের সত্তার যে অংশের ভিতর দিয়া আমরা ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে চাই তদনুযায়ীই হয় বিভিন্ন প্রকারের যোগ।

প্রচলিত যোগগুলি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠিয়াছে। হঠযোগ ধরিয়াছে দেহ ও প্রাণের ক্রিয়াকে, এই স্থূল শরীরকে শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়াই তাহা সিদ্ধি লাভ করিতে চায়। বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের নিকট যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, হঠযোগের দ্বারা সেইরূপ শারীরিক শক্তিসকল লাভ করা যায়, মানুষ চিরযৌবন এবং অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। রাজযোগ ধরিয়াছে মনকে, ইহা চিত্তকে শান্ত ও শুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধতর দিব্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। হঠযোগ ধরিয়াছে স্থূল শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলকে, রাজযোগ ধরিয়াছে সূক্ষ্ম শরীর ও চিত্তকে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এই ত্রয়ী যোগ-মার্গ রাজযোগের ন্যায় সমগ্র মন বা চিত্তকে না ধরিয়া মনের কোন এক অংশকে ধরিয়াছে; ইচ্ছাশক্তি, হৃদয়বৃত্তি বা বুদ্ধি কোন একটির বিকাশ করিয়া ও রূপান্তর সাধন করিয়াই ভাগবত সত্য, জ্যোতি ও আনন্দের মধ্যে উঠিতে চাহিয়াছে।

এই সব যোগ পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন, এবং প্রত্যেকেরই এমন সব বিশিষ্ট ও বিস্তৃত পদ্ধতি আছে, এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া পরস্পরের সহিত এমন বিরোধ করিয়া আসিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সমন্বয় সাধন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কোন এক জন লোক যে ক্রমান্বয়ে সব যোগগুলি সাধন করিবে তাহা সম্ভব নহে, এক এক প্রকার যোগ লইয়াই একটা জন্ম কাটিয়া যাইতে পারে। আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল প্রকার যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছিলেন, সাধারণ মানবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাঁহার ছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য; পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারত তাহার অধ্যাত্ম সাধনায়, যোগ-প্রণালীতে আস্থা হারাইতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সকল যোগ প্রণালীর সত্যতা প্রমাণ করিয়া এই অশ্রদ্ধা ও সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মানব কোন্ মার্গ অবলম্বন করিবে? আজ মানুষকে শুধু দেহের, শুধু প্রাণের বা শুধু মনের সিদ্ধি লাভ করিলে চলিবে না—এখন এমন যুগ আসিয়াছে যখন মানুষকে তাহার সত্তার সকল অংশের পূর্ণত্ব সাধন করিয়া অতিমানবত্ব লাভ করিতে হইবে। এই পৃথিবীতেই দিব্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তিতে পূর্ণ দিব্য জীবন লাভ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার যোগের বাহ্য অঙ্গগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের মূল তত্ত্বগুলি লইয়া এক পূর্ণযোগের বিকাশ করা। গীতায় আমরা এইরূপই এক সমন্বয় দেখিতে পাই। গীতার যোগ শুধু কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তি-যোগ নহে, পরন্তু এই তিনেরই সমন্বয়, এবং গীতা রাজযোগ ও হঠযোগের পদ্ধতি বিশেষকেও সাধনার সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু গীতার এই সমন্বয় ভারতবাসী এখনও ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণের শিক্ষার প্রভাবে গীতার কর্ম্মযোগ অনাদৃত হইয়াছে, আবার জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যেও তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছে। এ-সব ছাড়া ভারতে আর এক প্রকার যোগের বিকাশ হইয়াছে, তন্ত্র; ইহা উল্লিখিত বৈদান্তিক যোগ সকল হইতে স্বতন্ত্র, ইহাতে পুরুষকে যোগের ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ না করিয়া প্রকৃতি বা শক্তিকেই যোগের ঈশ্বরী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কতকগুলি অনাচারের জন্য তন্ত্র নিন্দিত হইয়া পড়িলেও, ইহাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং মানুষকে সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে

ইহারও সাহায্য লইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক উভয় প্রকার যোগের সত্যতা ও শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন। এখন প্রয়োজন এমন এক পূর্ণাঙ্গ যোগের বিকাশ, যাহাতে এই সকল-প্রকার যোগেরই মূল তত্ত্বগুলি গৃহীত হইবে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণ মানুষ নিজের জীবনের দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ—শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথাবিধি অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায় যজ্ঞ; এবং গূঢ় যুক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ অবধারণই জ্ঞান যজ্ঞ।

যতয়ঃসংশিতব্রতাঃ—সকল যজ্ঞই করিতে হয় দৃঢ়ব্রত হইয়া একান্ত যত্নের সহিত। আজও ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা দেবতার পূজা করিতে বসিয়া দেখেন কোন উপকরণের অভাব আছে কিনা, কোথাও কোনরূপ অঙ্গহানি হইয়াছে কি না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বাহ্য পূজা কেবল একটা উপলক্ষ্য, একটা প্রতীক মাত্র। সকল যজ্ঞের মূল কথা হইতেছে অর্পণ, উৎসর্গ। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ যে কাজই করি না কেন সবই ভগবানকে অর্পণ করিলে তাহা যজ্ঞে পরিণত হয়, কিন্তু যে কাজে খুঁত থাকে. ত্রুটি থাকে তাহা ভগবানে অর্পণের যোগ্য হয় না। ভগবানের কাজ করিতেছি, এই ভাব মনে রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য নিখুঁত ভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে যখন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করি, তখনই তাহা ভগবানের গ্রহণের যোগ্য হয়, সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবানের সহিত আমাদের সংযোগ নিবিড়তর হইয়া উঠে।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥ ৩০

অন্বয়—তথা অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি, প্রাণে অপানং [জুহ্বতি] প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [ভবন্তি]।

অপরে নিয়তাহারাঃ [সন্তঃ] প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ [ভবন্তি]।

অনুবাদ—আবার অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি প্রদান করেন, প্রাণে অপানের আহুতি দেন এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হন।

অপর যোগিগণ আহার সংযত করিয়া প্রাণেতেই প্রাণকে আহুতি দেন। এই যজ্ঞবিদ্‌গণ সকলেই যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা

শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া প্রাণসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রাণায়াম। প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু এই দুইয়ের দুইটি গতি, শ্বাস ও প্রশ্বাস। শ্বাস অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর অভ্যন্তরে আকর্ষণ এবং প্রশ্বাস অর্থাৎ বায়ুর নিঃসারণ। বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণপূর্ব্বক (শ্বাসপূর্ব্বক) যে গতিরোধ হয়, তাহাই হইতেছে অপানে প্রাণের আহুতি, ইহাতে অন্তর বায়ুতে পূর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পূরক প্রাণায়াম বলে; এবং বায়ুকে নিঃসারণপূর্ব্ব (অর্থাৎ প্রশ্বাস পূর্ব্বক) যে গতিরোধ করা যায়, তাহাই হইতেছে প্রাণে অপানের আহুতি, ইহাতে অন্তর বায়ুশূন্য হয় বলিয়া ইহাকে রেচক প্রাণায়াম বলা হয়। আর কেবল স্তম্ভন দ্বারা (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া) যে গতিরোধ করা হয়, তাহাই কুম্ভক প্রাণায়াম। প্রশ্বাস ও শ্বাস স্তম্ভনপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যখন উভয় রুদ্ধ হইয়া প্রাণের গতিরোধ হয়, তখন তাহাকে চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম হইতেছে হঠযোগের একটি প্রধান প্রক্রিয়া এবং ইহা অষ্টাঙ্গ রাজযোগেও একটি অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে।

শরীর ও প্রাণের সংযোগে আমাদের অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ গঠিত; মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সমুদয় ক্রিয়ার ভিত্তি হইতেছে এই শরীর ও প্রাণের সমন্বয়। হঠযোগের লক্ষ্য হইতেছে এই দুইটিকে বশীভূত করা। জড় পৃথিবীতে যখন প্রাণশক্তির (vital force) প্রথম আবির্ভাব হয় তখন হইতেই জড়ের সহিত প্রাণের নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রাণ জড়কে ধরিয়া নানারূপে নিজেকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, এইভাবে অসংখ্য প্রকারের

জীবকোষ এবং তাহাদের সমবায়ে নানা উদ্ভিদ, জন্তু এবং শেষ পর্য্যন্ত মানবের বিকাশ হইয়াছে। অন্যদিকে জড় চাহিতেছে প্রাণের এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে, তাহার নিজস্ব নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিঃসাড় শান্তিতে ফিরিয়া যাইতে, যেখানেই প্রাণের উপর জড় জয়ী হইতেছে সেইখানেই মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। আবার প্রাণও অনবরত পৃথিবীতে নূতন জীবন সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছে। প্রকৃতির নিরন্তর চেষ্টা হইতেছে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করা, এবং এ বিষয়ে সে কতকদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে। বৃক্ষের মধ্যে এবং কোন কোন জন্তুর মধ্যে জড় ও প্রাণের মিলন বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে; আর মানুষের যে স্বল্প পরমায়ু, তাহার মধ্যেই প্রকৃতি অন্নময় কোষে মন ও আত্মার অনেক ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই মানবের অপূর্ব্ব সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির এই কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; মানুষ বয়সের সহিত ভিতরে যত বিকশিত হয়, যত জ্ঞানে বিজ্ঞানে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহার স্থূল শরীর তত ক্ষীণ হইয়া আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত আর প্রাণশক্তির কার্য্যকে ধরিয়া রাখিবার তাহার সামর্থ্য থাকে না, সে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহাই হইতেছে মৃত্যু। বর্ত্তমানে মানুষ সাধারণতঃ একশত বৎসরের বেশী পরমায়ু এবং স্থায়ী যৌবন আশা করিতে পারে না—এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই তাহার সমস্ত লীলা খেলা সমাপ্ত করিতে হয়। সাধারণ মানুষ প্রকৃতির এই বিধানেই সন্তুষ্ট, কিন্তু হঠযোগী ইহার উপরে উঠিতে চাহিয়াছে এবং অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইয়াছে।

পৃথিবীতে জড় ও প্রাণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, একদিন এই দ্বন্দ্বের শেষ হইবে, পৃথিবীতে অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই স্বপ্ন মানুষ অনেক দিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসঁ তাঁহার Creative Evolution পুস্তকে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমন একদিন আসিবে যখন প্রাণ সম্পূর্ণভাবে জড়ের উপর জয়ী হইবে, কিন্তু কি ভাবে ইহা হইবে তাহার কোন আভাস তিনি দিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা দেহ ও প্রাণের উচ্চতর সমন্বয় সাধন করিয়া জীবন ও যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার অনেক রকম প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীন হঠযোগীরা এই বিষয়ের মূল তত্ত্বটি ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, বিশ্বে প্রাণ-শক্তির সীমা নাই, অন্ত নাই। মানুষ এখন এই অসীম প্রাণ-শক্তির সামান্য মাত্রই

গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে পারে। হঠযোগীর উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের দেহকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা, যেন তাহা নিজেকে বিশ্বের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির দিকে খুলিয়া দিতে পারে এবং নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

হঠযোগীর প্রধান প্রক্রিয়া হইতেছে আসন ও প্রাণায়াম। আসনের সংখ্যা চৌষট্টি, তাহাদের মধ্যে পদ্মাসন, ভুজঙ্গাসন, ময়ূরাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতি কয়েকটি হইতেছে প্রধান ; সাধারণ মানুষের দেহ চঞ্চল ও অস্থির। বিশ্বপ্রাণস্রোত হইতে যে সব প্রাণ-শক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মানুষ যে সে-সবকে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিতেছে না, ফেলিয়া দিতেছে, শারীরিক অস্থিরতাই তাহার প্রমাণ। হঠযোগী আসন অভ্যাস করিয়া এই অস্থিরতা দূর করেন এবং দেহকে অসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করেন। এই অভ্যাসের দ্বারা মানুষ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেও অনেকখানি জয় করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা হঠযোগী শরীরকে সকল প্রকার ময়লা ও ক্লেদ হইতে মুক্ত করেন, যেন প্রাণায়াম অভ্যাসের সমস্ত বাধা দূরীভূত হয়। এইরূপ একটি প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে ধৌতি। প্রাতঃকালে যোগী ঈষদুষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে পান করেন, তাহার পর একটি কচি কঞ্চি বা বস্ত্রখণ্ড পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া সেই জল বমি করিয়া ফেলেন। হঠযোগী প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ বমন করেন, পাকস্থলীতে অজীর্ণ খাদ্য, পিত্ত প্রভৃতি কত ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকে এই বমন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া লইয়াও হঠযোগী অন্ত্র পরিষ্কার করেন। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা শরীর নির্ম্মল হইলে হঠযোগী প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং এইটিই হইতেছে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। দেহের মধ্যে প্রাণ-শক্তির প্রধান ক্রিয়া হইতেছে শ্বাসপ্রশ্বাস ; ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই যোগী প্রাণকে বশীভূত করেন।

প্রাণায়ামের দ্বারা হঠযোগী দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা দেহের সিদ্ধিলাভ হয়। সাধারণতঃ দেহরক্ষার জন্য প্রকৃতির যে সব প্রয়োজন, যোগী তাহাদের অনেকগুলি হইতেই মুক্ত হন ; অনবদ্য স্বাস্থ্য, স্থায়ী যৌবন এবং অসাধারণ দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। অন্যপক্ষে প্রাণময় কোষে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, প্রাণায়ামের দ্বারা তাহা জাগ্রত হয় এবং যোগীর

পক্ষে নূতন নূতন চৈতন্যের স্তর খুলিয়া যায়, যোগী অসাধারণ শক্তি-সকল লাভ করেন এবং সাধারণ শক্তি-সকলও তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

হঠযোগের সিদ্ধিগুলি খুবই চমকপ্রদ। কিন্তু ইহার দোষ হইতেছে, এই যোগসাধনায় এত শক্তি ও সময় দিতে হয় যে, মানুষকে তাহার সাধারণ জীবন-যাত্রা হইতে সরিয়া যাইতে হয়, আর দুই চারিজন লোক ঐরূপ শক্তি লাভ করিলেও সাধারণ মানবজাতির কোন লাভই হয় না। হঠযোগ কঠিন সাধনা দ্বারা কয়েকজন লোকের পক্ষে যাহা সম্ভব করিয়াছে, প্রকৃতি একদিন সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই তাহা সহজ ও সাধারণ জিনিষ করিয়া তুলিবে। প্রকৃতির সেই কার্য্যে যাহাতে আমরা ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা সাহায্য করিতে পারি তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে সকল প্রকার সাধনার জন্যই শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রয়োজন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য আমরা প্রয়োজনমত হঠযোগ হইতে সহজ প্রণালী কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বিশেষ করিয়া শরীরকে সকল রকম ময়লা ও ক্লেদ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য হঠযোগীর যে সাবধানতা, আমরা তাহা অনুসরণ করিতে পারি। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন আহার সম্বন্ধে সংযম-পালন, কারণ শরীরের অধিকাংশ বিষ ও রোগই আহারের অনিয়ম হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। কত অল্প আহারে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা অনেকেই জানেন না—অভ্যাসের বশে অনাবশ্যক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা দেহকে নানা রোগে বা অপ্রয়োজনীয় মেদে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন। প্রাণায়াম ঠিকমত করিতে পারিলে স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক সাহায্য হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাণায়াম ছাড়িয়া দিলেই শরীর সাংঘাতিকভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। অতএব যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু সন্ন্যাসী হইবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই সব অভ্যাস না করাই ভাল।

রাজযোগের উদ্দেশ্য উচ্চতর। শরীরের সিদ্ধি নহে, পরন্তু মনের মুক্তি ও সিদ্ধি, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন, চিন্তা ও চৈতন্যের সকল প্রক্রিয়াকে সংযত করা —ইহাই হইতেছে রাজযোগীর লক্ষ্য। তিনি প্রথমেই দৃষ্টি দেন চিত্ত বা মানস চৈতন্যের উপরে। হঠযোগী যেমন দেহকে স্থির ও শুদ্ধ করিতে চান, রাজযোগী তেমনিই প্রথমে চান চিত্তকে স্থির ও শুদ্ধ করিতে। মানুষের সাধারণ চৈতন্য

হইতেছে বিক্ষোভময়, দ্বন্দ্বপূর্ণ, কবির ভাষায়—

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
কি জানি কখন নিয়ে যাবে কোন্ গভীর গরল পাথারে !

মানুষের অন্তররাজ্যে শৃঙ্খলা নাই, মানুষ সেখানে রাজা হইয়াও তাহার কর্ম্মচারীদের বশ,প্রজাদের বশ, ইন্দ্রিয়ের অধীন, কাম, ক্রোধ, লোভের অধীন। এই যে বশ্যতা, অধীনতা, ইহা দূর করিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। তাই রাজযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হইতেছে যম ও নিয়ম,—প্রাণ মনের উচ্ছৃঙ্খল অভ্যাসগুলি দূর করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে সদ্ অভ্যাস দৃঢ়ীভূত করা *। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটিকে নিয়ম বলা হয়। সত্য-কথন অভ্যাস করিয়া, সকল প্রকার অহংমুখী বাসনা কামনা বর্জ্জন করিয়া, অপরের অনিষ্ট করা হইতে বিরত থাকিয়া, শুচিতা অবলম্বন করিয়া, মানসরাজ্যের যিনি প্রকৃত অধীশ্বর সেই ভাগবত পুরুষে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিয়া হৃদয় ও মনের শুদ্ধ, প্রসন্ন, শান্ত অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল প্রথম ধাপ। ইহার পর মন ও ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ প্রক্রিয়া-সকলকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে হইবে, যেন অন্তঃপুরুষ এই সব বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে পারে এবং পূর্ণতম সিদ্ধি ও আত্মজয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে। তবে রাজযোগী ভুলিয়া যান না যে, মনের সাধারণ ক্রটিসকলের মূল হইতেছে স্নায়ুমণ্ডল ও শরীরের প্রতিক্রিয়ার বশ্যতা। সেই জন্য তিনি হঠযোগ হইতে আসন ও প্রাণায়াম-পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তবে সে-সবকে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ও সরল করিয়া লন। এইভাবে তিনি হঠযোগের জটিলতা বর্জ্জন করিয়া তাহার মূল পদ্ধতির সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলেন। ইহা সিদ্ধ হইলে, রাজযোগী অস্থির মনকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে এবং ধ্যান ও ধারণা অভ্যাসের দ্বারা মনকে একাগ্র করিয়া সমাধি লাভ করিতে অগ্রসর হন।

---

* রাজ যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

সমাধির অবস্থায় মন তাহার সাধারণ সীমাবদ্ধ ক্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে; বাহিরের চৈতন্যের বিক্ষোভ-সকল আর তাহাকে স্পর্শ করে না, জীব তখন অতি-মানস স্তরে নিজ প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যোগী যে কেবল সমাধি অবস্থাতেই উচ্চতম লোকোত্তর জ্ঞানলাভ করেন তাহা নহে, জাগ্রত অবস্থাতেও তিনি যাহা জানিতে চান তাহা জানিতে পারেন এবং বাহ্য জগতেও অধ্যাত্ম-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। এইভাবে যোগী যে কেবল অন্তরকেই জয় করিয়া স্বরাজ্যলাভ করেন তাহা নহে, বাহ্য জগৎকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাম্রাজ্য লাভ করেন।

রাজযোগের দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে, ইহা অস্বাভাবিক সমাধির অবস্থার উপরে অত্যধিক ভাবে নির্ভর করে এবং মানুষকে সাধারণ জীবন হইতে সরাইয়া লয়। অন্য পক্ষে গীতা যে যোগের শিক্ষা দিয়াছে, তাহাতে মানুষ সাংসারিক জীবনে থাকিয়া কর্ম্মের ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম চেতনা লাভ করিতে পারে এবং ঐ চেতনার দ্বারা মানুষের সাধারণ জীবন ও কর্ম্মকেই দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে পারে। তবে গীতা রাজযোগের শক্তিকেও স্বীকার করিয়াছে এবং গীতার সাধনায় রাজযোগ কিরূপ সহায়স্বরূপ হইতে পারে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। গীতা বলিয়াছে সকল প্রকার যোগ ও যজ্ঞই হইতেছে পরম লক্ষ্যে পৌছিবার এক একটি পন্থা, সকলের দ্বারাই সত্তার শুদ্ধি-সাধনে সহায়তা হয়। তবে গীতা যে-পন্থা দেখাইয়াছে, তাহাতে সকল যোগের সমন্বয় হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্যান্য সকল যোগেরই ফল লাভ করা যায়, অথচ তাহা সাধন করিবার জন্য অন্যান্য যোগের ন্যায় সংসার ও কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে হয় না।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। [হে] কুরুসত্তম! অয়ং লোকঃ অযজ্ঞস্য ন অস্তি, অন্যঃ কুতঃ?

অনুবাদ। যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন

ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে-ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোকই নাই, অন্য লোক কেমন করিয়া থাকিবে?

ব্যাখ্যা

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—বৈদিক যজ্ঞ কেবল একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল না, তাহার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের রূপক স্বরূপ ছিল। সাধারণ লোকে বাহ্য অনুষ্ঠানই দেখিত, কিন্তু ভিতরের অর্থ অল্প সংখ্যক সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—বেদের গভীর কবিত্বময় ভাষায় এখনও তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে সেই নিগূঢ় অর্থ লোকে হারাইয়া ফেলে, বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই সব বলিয়া গ্রহণ করে, নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। গীতা বেদান্ত ও পরবর্ত্তী অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে যজ্ঞের আর এক উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। তবে গীতা যে বলিয়াছে, যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন অমৃত, এখানে আমরা সেই প্রাচীন বৈদিক রূপকেরই কিছু অবশেষ দেখিতে পাই। বৈদিক প্রতীকতন্ত্রে সোমরস ছিল অমৃতের স্থূল রূপক; যে দিব্য আনন্দ মানুষকে অমৃতত্ব বা দিব্য জীবন আনিয়া দেয়, তাহাই অমৃত শব্দের প্রতিপাদ্য এবং সোম-মদিরা তাহারই রূপক। এই মদিরা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞে দেবগণকে অর্পণ করা হয় এবং মানব সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করে।

যজ্ঞ করা মানুষের কর্ত্তব্য, যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করিয়া মানুষ দিব্যজীবন লাভ করিবে, ইহাই বেদের নির্দ্দেশ। গীতা এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছে কিন্তু দেখাইয়াছে যে, যজ্ঞ অনেক প্রকারের হইতে পারে, কেবল ঘৃতাদি হোম করিয়া যে দ্রব্যযজ্ঞ করা হয় তাহাই একমাত্র যজ্ঞ নহে, তবে এই দ্রব্যযজ্ঞ অন্যান্য সকল প্রকার যজ্ঞেরই স্থূল রূপক-স্বরূপ। যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নও তেমনিই বিশুদ্ধ ভোগের রূপক, ইহার দ্বারা মানুষের অধ্যাত্ম বিকাশ হয়, মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। অতএব ইহাও অমৃত-পদবাচ্য। মনুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে, "বিঘসং ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতং", অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহা বাকী থাকে তাহা বিঘস এবং যজ্ঞ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা 'অমৃত' উক্ত হয়; স্মৃতি-সকলের বিধান এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য বিঘসাশী

ও অমৃতাশী হওয়া উচিত। গীতায় এইরূপ কোন বাহ্য বিধান দেওয়া হয় নাই, কেবল সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে—যে-কোন যজ্ঞই করা হউক, অথবা যে-কোন কর্ম্মই যজ্ঞভাবে করা হউক তাহার দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয় এবং অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়। যজ্ঞ নানাপ্রকারের হইতে পারে কিন্তু সকলের মূলেই এই নীতি থাকে যে, আমাদের অহংমুখী ক্রিয়াসকলকে নীচে স্থান দিতে হইবে, বাসনা কামনার প্রভুত্ব খর্ব্ব করিতে হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে এক উচ্চতর প্রেরণা অনুসরণ করিতে হইবে। অহংকে কেন্দ্র করিয়া আমরা যে নিম্নতন সুখভোগ করি তাহা বর্জ্জন করিয়া ত্যাগের দ্বারা, আত্ম-নিবেদনের দ্বারা, আত্ম-জয়ের দ্বারা, কোন মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের নিম্নতন প্রবৃত্তি সকলকে বর্জ্জন করিয়া যে দিব্যতর আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই হইতেছে যজ্ঞশিষ্টামৃত, সেই আনন্দই আমাদিগকে ঊর্দ্ধতম জীবনের দিকে লইয়া যাইবে।

যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্—বৈদিক ঋষিগণ সোম-মদিরা পানের উপর অর্থাৎ জীবনের পবিত্র আনন্দধারা আস্বাদনের উপর এত ঝোঁক দিতেন, কারণ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, আনন্দই সৃষ্টির মূল, মানবজীবন এই আনন্দেই বিধৃত, এবং এই আনন্দকে অবলম্বন করিয়াই জীবনের পূর্ণ দিব্য বিকাশ সম্ভব। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যতদিন অশুদ্ধ, অসংস্কৃত, অপরিপক্ক রহিয়াছে, ততদিন মানুষ জগতে অনুস্যূত আনন্দ ধারা ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারে না, তীব্র আনন্দও তাহার মধ্যে বেদনা সৃষ্টি করে। কিন্তু যখন যজ্ঞের দ্বারা, উপযুক্ত অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা দেহ, প্রাণ, মন শুদ্ধ হইয়া উঠে, সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহারা জীবনের পূর্ণ আনন্দ ধারাকে অবাধে গ্রহণ করিতে পারে, সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত ইন্দ্রিয়োপলব্ধিকেই শুদ্ধ, দিব্য আনন্দে পরিণত করে। এই আনন্দের শক্তিতেই সাধক সাধনার পথে সকল বাধা অতিক্রম করে,

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনং।

—ঋগ্বেদ, ১।৪।৮

"এই সোমরস পান করিয়া, হে শত-কর্ম্মী ইন্দ্র! তুমি হইয়াছিলে বৃত্রদের হন্তা, সকল ঋদ্ধির মধ্যে উপচিত করিয়া ধরিয়াছিলে ঋদ্ধকে।"

আনন্দের ভিতর দিয়া মানুষ, কেমন করিয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয়, বৈদিক ঋষি দিব্য আনন্দের দেবতা সোমদেবকে আহ্বান করিয়া তাহাই ইঙ্গিত করিতেছেন,

রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ সহস্রভৃষ্টির্জয়সি
শ্রবো বৃহৎ।
—ঋগ্বেদ ৯।৮৩।৫

"রাজা তুমি, পবিত্র রথে আরোহণ করিয়া সমৃদ্ধির দিকে উঠিয়া চলিয়াছ; তোমার সহস্র জলন্ত প্রভার দ্বারা তুমি বৃহৎ জ্ঞানের রাজ্য জয় করিতেছ।"

যজ্ঞের ভিতর দিয়া আনন্দময় সোমদেব হন আমাদের সকল কর্ম্মের, আমাদের দিব্যভাবাপন্ন প্রকৃতির রাজা এবং শুদ্ধ-চিত্তরূপ-রথে আরোহণ করিয়া তিনি অনন্ত অমৃতত্ব পদের সমৃদ্ধির মধ্যে উঠিয়া যান, অর্থাৎ তিনিই মানুষের জন্য অমৃতত্ব জয় করিয়া দেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

অন্বয়—এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে বিততাঃ; তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

অনুবাদ—এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত হইয়াছে; সে সমস্তই কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিও, এইরূপ জানিলে তুমি মুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা

এবং বহুবিধাযজ্ঞাঃ—যজ্ঞই সৃষ্টির নীতি, যজ্ঞ ভিন্ন ইহলোকে জয়লাভ করা যায় না, স্বর্গসুখও লাভ করা যায় না, এবং যাহা সকল লাভের পরম লাভ তাহাও লাভ করা যায় না। এই জন্যই বহুবিধ যজ্ঞ রহিয়াছে। গীতা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করিয়াছে। বেদে জ্যোতিষ্টোমাদি যে যজ্ঞ বিহিত ছিল তাহা কালক্রমে লুপ্ত হয়, পরে স্মৃতিতে পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গীতা দেবোদ্দেশে কৃত মীমাংসকদিগের শ্রৌত যজ্ঞের সম্প্রসারণ করিয়া ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম-মাত্রকেই যজ্ঞ বলিয়াছে।

সমস্ত বিশ্বব্যাপারই ভগবানের উদ্দেশে এক বিরাট যজ্ঞ। যে-কোন রূপে মানুষ নিজের কর্ম্মকে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করে, গীতার মতে তাহাই এক প্রকার যজ্ঞ, অতএব যজ্ঞ বহুবিধ।

বিততা ব্রহ্মণো মুখে—"বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত হইয়াছে।" আচার্য্য শঙ্করের অনুসরণ করিয়া অনেকেই এখানে "ব্রহ্ম" শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন। বহুবিধ যজ্ঞ বেদের মুখে বিস্তৃত আছে, অর্থাৎ বেদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্থূল অগ্নিতে জ্যোতিষ্টোমাদি যে-সব যজ্ঞ করা হয়, কেবল সেই গুলিই বেদে বিহিত হইয়াছে। গীতা যে যোগযজ্ঞ তপোযজ্ঞাদি লাক্ষণিক যজ্ঞের কথা বলিয়াছে, সে-সব বেদে প্রকটিত হয় নাই। বস্তুতঃ গীতা কেবল বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের শিক্ষা দেয় নাই; এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শঙ্কর গীতার মহান্ কর্ম্মযোগের শিক্ষাকে বিকৃত করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, অগ্নি দেবতাদের মুখ; অতএব অগ্নিতে হবন করিয়া যে-সব যজ্ঞ করা হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে সে-সব যজ্ঞ দেবতাদের মুখে বিস্তৃত। "ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত" এই কথা হইতে বুঝা যায় যে গীতা কেবল স্থূল অগ্নিতে হবনের কথাই বলে নাই, সকল যজ্ঞই ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অর্পিত হয়, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। অন্যত্র, ভগবান বলিয়াছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"; "ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাম্"। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী বিরাট কর্ম্মে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, সকল যজ্ঞ সেই বিশ্বকর্ম্মেরই বিভিন্ন রূপ। মানুষ তাহার অন্তরতম সত্তায় এই ব্রহ্মের সহিত এক এবং তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম্ম এই মহান্ বিশ্বজীবন ও কর্ম্মেরই অংশ, নানাবিধ যজ্ঞের ভিতর দিয়া মানুষ তাহার কর্ম্মকে তাহার জীবনের পরম সত্য ব্রহ্মে অর্পণ করিতে পারে।

কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্—সকল যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। তৃতীয় অধ্যায়েও বলা হইয়াছে, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ভগবানের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্ম্মে আবির্ভূত এবং সকল বিশ্বকর্ম্মকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে, এই শক্তিই সকল যজ্ঞের মূল উৎস; মানুষের পক্ষে এই যজ্ঞের চরম পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং ভাগবত চৈতন্যে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। "ইহা জানিয়া তুমি মুক্তি লাভ করিবে।"

এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে—সকল যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, শুধু ইহা জানিলেই কি মুক্তিলাভ হয়? শুধু মন বুদ্ধি দিয়া জানিলেই চলিবে না, সেরূপ জানা প্রকৃত জ্ঞান নহে, অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই অধ্যাত্ম জ্ঞান বা উপলব্ধির জন্যই সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে করা প্রয়োজন। কর্ম্ম চাই, নতুবা গীতা যে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে, কুরু কর্ম্ম ত্বম্, ইহা ব্যর্থ হয়। যজ্ঞরূপ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই গীতার শিক্ষা,

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

কর্ম্ম ব্রহ্মেরই শক্তি, কর্ম্ম ভিন্ন যজ্ঞ নাই এবং যজ্ঞ ভিন্ন সিদ্ধি নাই ইহা জানিয়া যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম কর—তবেই মুক্ত হইবে।

কিন্তু এইভাবে কর্ম্মের উপর ঝোঁক দেওয়া শঙ্করের অভিমত নহে, তাই তিনি এইখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই—যজ্ঞ কর্ম্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারাই সকল যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল যজ্ঞ আত্মা হইতে উদ্ভূত নহে, কারণ আত্মা নিষ্ক্রিয়। এই প্রকার জানিয়া সকল যজ্ঞ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়তা লাভই মুক্তি। এইভাবে শঙ্কর পদে পদে গীতার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া কর্ম্মত্যাগ ও সংসার-ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন প্রথমে মোহের বশে এই আদর্শের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন, শ্রেয়ঃ ও মুক্তি লাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান তাহাকে বলিলেন যে, তাহার সে চেষ্টা বৃথা, কেননা কর্ম্ম না করিয়া কেহ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। (৩।৫) অতএব কর্ম্মত্যাগ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে ভগবানকে অর্পণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এইভাবে আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিব যে, সমস্ত বিশ্বকর্ম্মই ভগবানের উদ্দেশে এক বিরাট যজ্ঞ, ভগবানই ইহার ভোক্তা, আমাদের সকল কর্ম্ম এই বিশ্বকর্ম্ম, বিশ্বযজ্ঞেরই অংশ, আর আমরা আমাদের মূল সত্তায় সেই ভগবানের সহিত এক। আমাদের মধ্যে এই উপলব্ধি ও জ্ঞান যতই পূর্ণ হইয়া উঠিবে ততই আমরা দিব্য জীবনের চির মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইব—"এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে"।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩

অন্বয়—হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। হে পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

অনুবাদ। হে পরন্তপ! দ্রব্যের দ্বারা কৃত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্ম সমগ্রভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ—গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ বহুবিধ এবং সকল প্রকার যজ্ঞের দ্বারাই সত্তার শুদ্ধি সাধনে সহায়তা হয়, সকল যজ্ঞই মানুষকে পরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যায়। তথাপি বিভিন্ন যজ্ঞের মধ্যে স্তরভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা নীচে হইতেছে দ্রব্যযজ্ঞ, অর্থাৎ কোন বিশেষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে স্থূল দ্রব্য নিবেদন করা; আর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইতেছে জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানলাভের সাধনা করা।

দ্রব্যময় যজ্ঞ বলিতে এখানে অনেকেই কর্ম্ম-যজ্ঞ বা কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন; তাঁহাদের মতে এই শ্লোকে জ্ঞানকে কর্ম্ম অপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে; কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, জ্ঞান ফল উৎপাদন করে না, অতএব জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধিলাভ করা যায়, সেইজন্যই কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান বড়। কিন্তু এখানে গীতার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে তুলনা করা নহে। গীতা বলিয়াছে, সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান বড় (২।৪৯), কিন্তু আবার কর্ম্ম না করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪)। গীতার মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ; গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছে, তাহা জ্ঞানের বিরোধী নহে, জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়াই কর্ম্ম নিষ্কাম হয়, আবার নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়াই জ্ঞান পূর্ণ হইয়া উঠে, এইভাবে যুগপৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যেই মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করে। গীতা বৈদান্তিক গ্রন্থ। তৎকালে বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, গীতা এখানে তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, অগ্নিহোত্রাদি বাহ্য যজ্ঞ

অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, ভগবদ্জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের সকল জীবন ও কর্ম্মই পরমতমের উদ্দেশে যজ্ঞে পরিণত হয়। বেদে কর্ম্ম বলিতে এই সব বাহ্য আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝাইত, এবং গীতার বহু ভাষ্যকার 'কর্ম্ম' শব্দকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই হিসাবে দ্রব্য-যজ্ঞকে কর্ম্ম-যজ্ঞ বলা যাইতে পারে; কিন্তু গীতা কর্ম্ম শব্দের উদার অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা শুধু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মেই সীমাবদ্ধ নহে; মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত সকল ক্রিয়াই কর্ম্ম, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং, আর গীতার যে কর্ম্মযোগ তাহা বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ মাত্র নহে, যে কোন কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করিলে তাহা হয় কর্ম্মযোগ, এবং তাহা জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে, পূর্ণ জ্ঞানেই কর্ম্মযোগের পূর্ণ পরিণতি, এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ—জ্ঞানযোগীরা যে বলেন কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে, অর্জ্জুনের কর্ম্মত্যাগ প্রবৃত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা সেই মতেরই প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিয়াছে, গীতা কর্ম্মেরই শিক্ষা দিয়াছে। যেমন তেমন ভাবে কর্ম্ম করিলে চলিবে না, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম হওয়া চাই, আবার যজ্ঞার্থে কর্ম্মের মধ্যেও স্তরভেদ রহিয়াছে; জ্ঞানের সহিত যে-যজ্ঞ করা যায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই এখানে গীতার বক্তব্য। সাধারণতঃ মানুষ অজ্ঞানের মধ্যেই বহুকাল বাস করে, কর্ম্ম করে। সে নিজের অহংকেই বড় করিয়া দেখে, তাহার সমস্ত জীবনই অহংকে লইয়া, ভগবানের সেখানে কোন স্থান নাই। সে নিজেকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং মনে করে এই জগৎ তাহারই জন্য রহিয়াছে, প্রকৃতি তাহারই ইচ্ছার অনুসরণ করিবে, তাহারই বাসনা কামনা সকল পূর্ণ করিবে। সংসার হইতে সে নিজের ইচ্ছামত ভোগ সুখ আদায় করিয়া লইতে চায়, নিজেরই স্বার্থের অনুসরণ করে। গীতা এই শ্রেণীর লোককে চোরের সহিত তুলনা করিয়াছে, জাগতিক শক্তিসকল তাহার জন্য যাহা কিছু আনিয়া দিতেছে সে-সব সে স্বীকার করে না, সে-সবের প্রতিদানে কিছু দিতে চায় না, যাহা পায় নিজের ভোগের জন্যই রাখিতে চায়। মানুষ যখন এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার উপরে উঠে, তাহার নিজের দাবীর ও প্রয়োজনের ন্যায়ই অপরের দাবী ও প্রয়োজন স্বীকার করে, বুঝিতে পারে যে, তাহার কর্ম্ম-সকলের পশ্চাতে এক বিশ্বশক্তি কার্য্য করিতেছে

এবং সকলের উপর এক ভগবান রহিয়াছেন, তখন সে উপলব্ধি করে যে শুধু নিজের বাসনা কামনা অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করা উচিত নহে; সে পরার্থে কর্ম্ম করে, দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থকে ক্রমশঃ বেশী নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দেয়। দেবতাগণের সাহায্যেই সে সব কিছু পাইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া দেবতাদের ভক্তি করে, তাহাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে। এই ভাবে সে ধার্ম্মিক ও নৈতিক মানুষ হইয়া উঠে, এবং তাহার কর্ম্ম হয় যজ্ঞার্থে কর্ম্ম। কিন্তু ইহাও কেবল একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, কারণ এখানেও জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে, এখানেও অহং এবং অহং-এর বাসনা কামনাই জীবনের কেন্দ্র ও নীতি থাকে, তবে সে অহং হয় প্রসারিত ও উদার এবং বাসনা কামনাও হয় সংযত, নিয়ন্ত্রিত, উচ্চ আদর্শের অনুগত। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্ম্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও অতীত, কারণ জ্ঞানের সহিত যে-যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম্ম সিদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। এই অবস্থা কেবল তখনই আসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা একই সত্তা, এই আত্মা অহং অপেক্ষা বড় জিনিষ, ইহা এক অনন্ত, নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বব্যাপী সত্তা, ইহার মধ্যেই সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে, যে-সকল বিশ্বদেবতার উদ্দেশে সে যজ্ঞ করে সে-সকলকে এক অদ্বিতীয় অনন্ত ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই এক ভগবান সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করিয়া উপলব্ধি করে যে, তিনিই শ্রেষ্ঠতম অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর, তিনি একই সঙ্গে সসীম ও অসীম, এক এবং বহু, তিনি প্রকৃতির অতীত অথচ প্রকৃতির ভিতর দিয়া নিজকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, তিনি গুণাতীত অথচ অনন্তগুণের ভিতর দিয়া নিজ সত্তার শক্তিকে রূপায়িত করিতেছেন। ইনিই পুরুষোত্তম, ইঁহাকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোনও অনিত্য ব্যক্তিগত কর্ম্ম-ফলের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য এবং ভগবানের সহিত যোগ ও সামঞ্জস্যে জীবন যাপন করিবার জন্য।

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ—অখিলং কর্ম্ম বলিতে কেহ বুঝিয়াছেন ফল সহিত সমস্ত কর্ম্ম, আবার কেহ বুঝিয়াছেন উপাসনা আদি সমস্ত অঙ্গ সহ কর্ম্ম। কিন্তু গীতা কর্ম্ম বলিতে বৈদিক-যজ্ঞ মাত্র বুঝে নাই, সংসারে মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে সে-সবেরই পূর্ণতা হয় জ্ঞানে—"অখিলং" শব্দের দ্বারা

ইহাই বুঝাইতেছে—"all works in their totality।" গীতা এইভাবেই বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে। মীমাংসকগণের বেদবাদ অনুসারে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানই মোক্ষলাভের উপায়, উহা ব্যতীত মোক্ষ-লাভ সম্ভব নহে ; বেদান্তবাদ উপনিষদের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে, যজ্ঞ-কর্ম্ম অজ্ঞান অবস্থায় উপযোগী, উহা মোক্ষলাভের পরিপন্থী, অতএব শেষ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতেই হইবে। গীতা বলিয়াছে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে কেবল ইহকালে ও পরকালে অনিত্য ভোগসুখ লাভ করা যায় ; কিন্তু জ্ঞানের সহিত সকল কর্ম্মকে যখন সকল দেবের আদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, তখন তাহার দ্বারাই পরম সিদ্ধি ও মোক্ষলাভ করা যায়। কর্ম্ম জ্ঞানের পরিপন্থী নহে, কর্ম্মের ভিতর দিয়াই পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—সকল কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, জ্ঞান লাভ হইলেই সকল কর্ম্মের শেষ হইয়া যায়—এই-রূপ অর্থ গীতার সমগ্র শিক্ষার বিরুদ্ধ, কারণ গীতা জ্ঞানী মুক্ত ব্যক্তিরই কর্ম্মের কথা বলিয়াছে, গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। ইহার অর্থ এই যে, সকল কর্ম্মের পরিণতি ও সম্পূর্ণতা হয় জ্ঞানে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম্ম দিব্য কর্ম্মে পরিণত হয়, তখন আর তাহা বন্ধনের কারণ হয় না ; যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি (৪।৪১)। শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "যেমন দ্যূতক্রীড়াতে চৌওয়ানামক দান যাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহার তিয়া, দুয়া প্রভৃতি ফল-সকলও আয়ত্ত হয়, সেই প্রকার লোকে যাহা কিছু সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সেই সকল কর্ম্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়।" ইহাই বেদান্তবাদ ; এই মত অনুসারে কর্ম্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ—অতএব বর্জ্জনীয়, কর্ম্মের দ্বারা যে ফল লাভ হয় সে সবই জ্ঞানের অনন্ত ফলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গীতা এইভাবে কর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে নাই, গীতার মতে কর্ম্ম জ্ঞানে পৌছায় এবং সেখানে গিয়া নিজে রূপান্তরিত হইয়া দিব্য কর্ম্মে পরিণত হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান এক হইয়া যায়। গীতার মতে কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ বিরোধী নহে, একের পূর্ণতাতেই অন্যের পূর্ণতা, গীতার যে পূর্ণ-যোগ তাহা একাধারে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তবে ভক্তির তত্ত্ব এখনও পরিস্ফুট করা হয় নাই, প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা অর্জ্জুনের প্রশ্নকে উপলক্ষ্য

করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মেরই সমন্বয় করিয়াছে। এইভাবে বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪

অন্বয়—প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া (চ) তৎ বিদ্ধি; তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।

অনুবাদ—গুরুর চরণে প্রণাম দ্বারা, প্রশ্ন দ্বারা এবং সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান শিক্ষা কর; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

ব্যাখ্যা

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন—যে-জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করে,তাহা সাধারণ নিম্নস্তরের জ্ঞান নহে, তাহা হইতেছে উচ্চতম জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ভগবদ্-জ্ঞান। সে-জ্ঞান নিজ বুদ্ধি বিচারের দ্বারা বা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের দ্বারা লাভ করা যায় না, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকটে সে-জ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সে-জ্ঞান শুধু মন বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেই হয় না, সমস্ত প্রকৃতিকে, জীবনকে, কর্ম্মকে সেই জ্ঞান অনুসারে গঠিত ও বিকশিত করিয়াই আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি, আমাদের সমগ্র সত্তা সেই জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া উঠে, আমরা জ্ঞানময় হই। এই ভাবে জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়া, হৃদয়, মন, বুদ্ধি সমস্ত দিয়া গ্রহণ করিতে হয়—সেই জন্য চাই শ্রদ্ধা, চাই ভক্তি ও বিনয়। যে গুরু তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা আমাদের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিবেন, হৃদয়কে আকৃষ্ট করিবেন কেবল তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা যেমন তাঁহাকে পূজা করিব, সেবা করিব, তেমনই আমাদের হৃদয় মন তাঁহার দিকে উন্মুক্ত হইবে। তখনই তিনি তাঁহাব অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চার করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া দিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।২।১২।"

পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—বাহির হইতে জোর করিয়া কাহাকেও জ্ঞান দেওয়া যায় না, ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠা চাই।

সাধারণ শিক্ষার পক্ষেও এই কথা খাটে, অধ্যাত্ম জ্ঞানের ত কথাই নাই। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা শিখিতে যতটা না ব্যস্ত, শিক্ষকেরা শিখাইতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যস্ত, তাহারা যেন কোনরকমে কতকগুলা জিনিষ গুলিয়া ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়া দিতে চান। শিক্ষার এইরূপ কুপদ্ধতির জন্য আমাদের দেশের বহু বালক বালিকার স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জনী শক্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার একটি প্রধান নীতি হইতেছে এই যে, কোন জিনিষ শিখান যায় না, সব জিনিষই নিজে নিজে শিখিয়া লইতে হয়। শিক্ষক নিজের আদর্শ ও প্রভাবের দ্বারা ছাত্রগণের মধ্যে প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিবেন, তাহাদের প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিবেন, তাহারা যাহাতে নিজের চেষ্টাতেই সব কিছু শিখিতে পারে সেই বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন—ইহাই হইতেছে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসু হইয়া উপযুক্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইত, পূজা ও সেবার দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া নিজেদের জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত করিত। অর্জ্জুনও এই ভাবেই দিব্য গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠভাবে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মনের সমস্ত সংশয় মিটাইয়া লইয়াছিলেন।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং—ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রে জ্ঞান শব্দটি সর্ব্বদাই পরমতম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যে-জ্যোতির দ্বারা আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তায় বিকাশ লাভ করি তাহাই এই জ্ঞান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা নানা বিষয় জানিতে পারি, নানাদিক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের বুদ্ধির ভাণ্ডার পূর্ণ করি, এ-জ্ঞান তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু—এ জ্ঞান জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিতর্কমূলক দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কলাবিজ্ঞান, সাংসারিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞান নহে। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আমাদের বিকাশে সহায়তা হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে এ-সব জীবনের বিবর্ত্তনেই সাহায্য করিতে পারে, আত্মস্বরূপলাভে নহে। যৌগিক জ্ঞানের মধ্যে এইসকল জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন পরমাত্মাকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবার জন্য আমরা ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করি। যখন জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জগতের বাহ্যদৃশ্য ও ঘটনাবলীর রহস্য ভেদ করিয়া উহাদের পশ্চাতে উহাদের কারণ-স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সব কিছুরই ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহার সন্ধান পাই; যখন

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নিজেদিগকে জানিতে পারি, আমাদের মধ্যে নীচের খেলা ও উপরের খেলা প্রভেদ করিতে পারি এবং একটিকে বর্জ্জন করিয়া অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি; যখন দর্শন শাস্ত্রের আলোকে জগতের মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সৎ, যাহা নিত্য, শাশ্বত তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি; যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পাপপুণ্যের প্রভেদ বুঝিয়া পাপকে বর্জ্জন করি এবং পুণ্যেরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভাগবত প্রকৃতির বিশুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে পারি; যখন কলাবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভাগবত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই; যখন সাংসারিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান তাঁহার জীবগণকে কি ভাবে পরিচালিত করিতেছেন, এবং মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই সেবায় সেই জ্ঞান লাগাইতে পারি—কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তখনও এই সকল জ্ঞান কেবল মাত্র সহায়তাই করিতে পারে; প্রকৃত যে জ্ঞান তাহা মনের অগোচর, মন কেবল তাহার ছায়া মাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানের স্থান হইতেছে আত্মায়। কিরূপে এই জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি, সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে—এই জ্ঞানের প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট; কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃতভাবে লাভ করা যায় নিজেদের ভিতর হইতেই—"তৎ স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" (৪।৩৮)—"যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথাসময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ংই লাভ করেন।"

জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ—যাঁহারা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া বুদ্ধি দ্বারাই জ্ঞানলাভ করেন নাই, পরন্তু সাক্ষাৎভাবে সত্যকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী, এইরূপ জ্ঞানিব্যক্তিগণের নিকট হইতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শী, তাঁহারা যে জ্ঞানের উপদেশ দেন, তাহাই কার্য্যক্ষম হয়, তৎবিপরীত ব্যক্তির নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞান কার্য্যক্ষম হয় না, ইহাই ভগবানের মত।" আজকাল যিনি দুই কথা গুছাইয়া বলিতে পারেন, লিখিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন, বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেছেন, —ইহাতেই ধর্ম্মের গ্লানি ও অজ্ঞান ও বুদ্ধিভেদ বাড়িয়াই চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য

প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়াছেন সন্ন্যাস—জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণং। সাধারণ মানুষ যে-ভাবে সাংসারিক জীবন যাপন করিতেছে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কখনই নিজেকে তাহাতে বদ্ধ করিয়া রাখেন না। এইজন্যই হিন্দীতে একটি প্রবাদে বলা হইয়াছে যে, গৃহী হইয়া যাহারা জ্ঞান শিক্ষা দেয় তাহারা প্রতারক। অবশ্য যাঁহারা জনক রাজার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া গৃহী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হয় নাই; তবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, "ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না, জনক রাজা নির্জ্জনে বহু তপস্যা করেছিলেন।"

অর্জ্জুন জ্ঞানী ছিলেন, সেই যুগের আদর্শ মানব ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সুবিকশিত ছিল এবং প্রচলিত শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান ছিল—তথাপি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তিনি মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তিনি আত্মার আলোকে সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেন নাই। তাই তিনি পণ্ডিতের মত নানা শাস্ত্রকথা বলিয়া নিজের তামসিকতা ও ক্লৈব্যকেই সমর্থন করিতেছিলেন। বর্ত্তমানেও আমরা দেখিতে পাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যে সব গ্লানি জমিয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিকেই অনেকে মোহের বশে শাস্ত্রবচনের দ্বারা সমর্থন করিতে প্রয়াস করিতেছেন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে যে জ্ঞান আমাদের সত্য দিশারী হইতে পারে, তাহা আমরা এই সব শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণের নিকট হইতে পাইব না, তপস্যা ও যোগ সাধনার দ্বারা যাঁহারা দিব্য অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চরণতলে বসিয়াই আমাদিগকে সেই জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়—হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন অশেষেণ ভূতানি আত্মনি, অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর এইরূপ মোহে পতিত হইবে না; কারণ তাহা দ্বারা তুমি নিঃশেষে সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে দেখিবে, পরে আমার মধ্যে দেখিবে।

ব্যাখ্যা

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহং—সংসারে যে মানুষ নানাবিধ দুঃখ ও শোকে অভিভূত হয় তাহার মূল কারণ হইতেছে তাহার মনের অজ্ঞানতা। ইন্দ্রিয়গণ যে জ্ঞান আনিয়া দেয় তাহার অধিক মন কিছু দেখিতে পায় না, ইন্দ্রিয়গণ যে ভোগ আনিয়া দেয় তাহাতেই সে আসক্ত হইয়া পড়ে, এবং এই ভোগে বাধা পড়িলেই তাহার অন্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—এইভাবে সাধারণ মানুষ মোহে পতিত হইয়া সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করে, শোক, তাপ, ভয়ে জর্জ্জরিত হয়। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুন যে গভীর শোক ও অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার কারণ এই মানসিক মোহ ও অজ্ঞান। তত্ত্বদর্শি-গণের নিকট হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে সকল শোক দুঃখের মূল এই মোহ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়।

যেন ভূতানি—যে জ্ঞান লাভ করিলে আমাদিগকে আর মানসিক প্রকৃতির মোহের মধ্যে পতিত হইতে হয় না, তাহার দ্বারা আমরা সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে দেখি, পরে ভগবানের মধ্যে দেখি। আমাদের মানসিক সত্তার পিছনে আত্মা লুক্কায়িত রহিয়াছে; অহংভাবের বশে আমরা বাহিরের দেহ, প্রাণ, মনের ক্ষুদ্র জীবনকেই আমাদের সমগ্র সত্তা বলিয়া মনে করি, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র "আমি"কেই আমাদের জীবনের কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্ব ও মোহে পতিত হই। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা এই অহংভাব দূর হইয়া যায়, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা এই সঙ্কীর্ণ দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহি, মূল সত্তায় আমরা অনাদি অনন্ত—আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব কেবল সেই অনন্ত সত্তার একটি সাময়িক আধার, যন্ত্র মাত্র। আমাদের সেই মূল সত্তাই আত্মা, ব্রহ্ম, তাহা একমেবাদ্বিতীয়ম্—একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু; আমরা তখন দেখিতে পাই যে, সকল জীবই হইতেছে ঐ এক আত্মারই বিভিন্ন রূপ, আত্মার মধ্যেই অবস্থিত।

ভূত শব্দ ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ "হওয়া"; অতএব এই শব্দের দ্বারা বুঝায় যে, আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে; এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া নহে, ইহা হইতেছে আত্মারই বিবর্ত্তন, ইংরাজীতে being এবং becomings-এর যে প্রভেদ করা হয়, বেদান্ত শাস্ত্রে "আত্মা" এবং "ভূতানি" এতদুভয়ের প্রভেদও

তাহাই, আত্মাই এই সব জীব ও জগৎ, এই সর্ব্বভূত হইয়াছে। ইহা উপনিষদেরই প্রাচীন জ্ঞান। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৭) —ইদংপদবাচ্য সমস্ত আত্মরূপেই পূর্ব্বে ছিল। "তদৈক্ষত, তদসৃজত, তৎ সর্ব্বমভবৎ" (তৈত্তিরীয় ২।৬),—তিনি দর্শন করিলেন বা বোধ করিলেন অর্থাৎ স্বসম্বেদনময় হইলেন এবং সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, আপনিই সমস্ত হইলেন। "তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)—পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি আপনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহা হইতে সমস্ত হইলেন। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"— (তৈত্তিরীয়, ২।৭), তিনি আপনিই আপনাকে (সর্ব্বরূপে উৎপাদন) করিলেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈত্তিরীয় ৩।১)—যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম। "তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুণ্ডক ১।১৬)—যাঁহাকে ভূতযোনি বলিয়া মুক্ত পুরুষেরা দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" (মুণ্ডক ১।১।৩)—যাহাকে জানিলে ইদংপদবাচ্য সমস্তই জানা যায়। আর এই অদ্বৈত জ্ঞানের ফলে যে মোহ ও শোকের চির অবসান হয় তাহাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত॥

—ঈশা।৭

—পূর্ণ জ্ঞান লাভের ফলে যাঁহার অনুভূতি হয় যে, আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তাঁহার আর মোহ কেমন করিয়া হইবে, শোকই বা কোথা হইতে আসিবে?

অশেষেণ—জ্ঞানী দেখেন যে, তাঁহার আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা, তাঁহার আত্মার মধ্যেই সর্ব্বভূত রহিয়াছে, তাই সকলের প্রতিই তাঁহার পরমতম সহানুভূতি থাকে। "অশেষেণ"—কিছুই বাদ যায় না; কেবল যাহা শুভ, সুন্দর, সুখদায়ক তাহাই নহে, যাহা কিছু ও যে কেহ নীচ, পতিত, পাপী, কুৎসিৎ আছে, সবেরই সহিত জ্ঞানী নিজের একত্ব অনুভব করেন, সকলের প্রতিই তাঁহার পূর্ণতম আন্তরিকতম সহানুভূতি থাকে।

দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি—ভগবান বলিলেন, জ্ঞানের দ্বারা ভূতসকলকে আত্মাতে এবং পরে আমাতে দেখিবে। শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, পিতা পুত্র ইত্যাদি ভেদ মিথ্যা মায়া, বস্তুতঃ এক আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই এবং সেই আত্মাই ভগবান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা; জীব এবং ঈশ্বর এক। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা ভেদকে, বহুত্বকে, সর্ব্বভূতকে কোথাও মিথ্যা বা মায়া বলে নাই এবং জীবকেও ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলে নাই। গীতার মতে এই জগৎ সত্য, পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং বহু জীব সেই ব্রহ্মেরই এক একটি অংশ, এক একটি রূপ। উপরে উপনিষদ্ হইতে যে-সব বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও গীতার এই মতই সমর্থিত হয়। জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—ইহাই যদি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহা হইলে ভগবান সোজাসুজি তাহা না বলিয়া কেন বলিলেন, "সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে, পরে আমার মধ্যে দেখিবে?" এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন।

আমরা যখন অহং ভাব হইতে মুক্ত হই তখন আমাদের চেতনা প্রসারিত হয়, আমরা নিজেদিগকে এক, অদ্বিতীয়, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা বলিয়া অনুভব করি এবং ইহাই আত্মা। আমরা যদি এই একত্বের উপরই একান্তভাবে জোর দিই, আত্মার নীরব, নিশ্চল, অক্ষর ভাবটির উপরই জোর দিই, তাহা হইলে মনে হয়, এই যে পরিবর্ত্তনশীল জগতে বহুর খেলা চলিতেছে এ-সব মায়া, মিথ্যা—এ-সব স্বপ্ন-সৃষ্টির মত, ইহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই। উপনিষদও এইরূপ অনুভূতির সমর্থন করিয়াছে, "ন ইদং যদ্ উপাসতে", এই যে জগৎ আমরা দেখিতেছি ইহা শাশ্বত সত্তা নহে। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, সর্ব্বম্ খলু ইদং ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা ও সর্ব্বভূত, ব্রহ্ম ও জগৎ—ইহারা একই শাশ্বত সত্তার দুইটি দিক। নীরব নিশ্চল অক্ষর আত্মা এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ হইতে ভিন্ন, "ন ইদং যদ্ উপাসতে", কিন্তু তাই বলিয়া এই জগৎ মিথ্যা নহে, ইহা ঐ আত্মা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, আত্মার মধ্যেই বিধৃত রহিয়াছে, "আত্মা অভূৎ সর্ব্বভূতানি"। এই দুইটি আপাত বিরোধী সত্তা যাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে গীতা তাঁহাকেই পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরুষোত্তমই অচল, অক্ষর আত্মারূপে এই জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন, আবার তিনিই ক্ষররূপে

সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব হইয়াছেন। মূল সত্তায় সকল জীবই এক; এক আত্মার মধ্যে রহিয়াছে বহু জীবের একত্বের তত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃতিতে জীব পরস্পর হইতে ভিন্ন, প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব ভাব, "স্বভাব", এবং ইহা পুরুষোত্তমের পরা প্রকৃতিরই অংশ এবং জীবের এই জীবত্ব, ব্যষ্টিত্ব, বহুত্ব, মিথ্যা মায়া নহে, ইহাও সনাতন। যখন আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি তখন প্রথমে সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে দেখি, তাহার পর দেখি যে, সেই আত্মা পুরুষোত্তমেরই সত্তা, তাঁহার অক্ষর সত্তা, অতএব তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনিই আমাদের মূল; ক্ষর, অক্ষর, আত্মা ও ভূত যাহা কিছু সে-সব তাঁহারই আত্ম-অভিব্যক্তি। তিনিই ঈশ্বর, ভগবান, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পণ করি; তাঁহারই সত্তায় আমরা চলাফেরা করি, জীবন ধারণ করি; তাঁহার হস্তেই আমাদের কর্ম্ম সমর্পণ করি। আমাদের প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত যুক্ত হই এবং তাঁহার মধ্যে অবস্থিত সর্ব্বভূতের সহিত যুক্ত হই; এবং আমাদের আত্মসত্তায় তাঁহার পরমতম সত্তার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করি। বাসনা বর্জ্জন করিয়া এবং যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করি, জীব তাহার প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায়, আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়; আর এই আত্মজ্ঞানে, ভগবদ্জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া আমরা ভাগবত সত্তার ঐক্য, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করি, দিব্য জীবন লাভ করি।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭

অন্বয়—চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ অসি, জ্ঞানপ্লবেনৈব সর্ব্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

অনুবাদ—যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপাচারী হও, তথাপি তুমি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা সকল অশুভ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে অর্জ্জুন! সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মে পরিণত করে।

ব্যাখ্যা

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ—অর্জ্জুন পাপাচারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পাপের ভয় খুবই ছিল, এবং মহাপাপ হইবার ভয়েই তিনি তাঁহার মহান্ কর্ত্তব্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য এখনও নীচের স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি খুব প্রবল, তাহাদের পক্ষে পাপের ভয় খুবই ভাল; নতুবা তাহারা অত্যাচারী হইয়া অপরের এবং নিজেদেরও অশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে। পাপ করিলে ইহকালে ও পরকালে কষ্টভোগ, শাস্তিভোগ করিতে হইবে এই ভয়ে তাহারা পাপ হইতে বিরত থাকে। কিন্তু যাঁহাদের চরিত্রের উচ্চবিকাশ হইয়াছে, অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহারা সাত্ত্বিক, সচ্চরিত্র, পুণ্যবান—তাঁহাদের পক্ষে ঐ পাপের ভয়ই তাঁহাদের আত্মবিকাশের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের নিম্নতন প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিবার জন্য বহু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, দেশাচার, কালাচার প্রত্যেক সভ্য সমাজেই বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু সেই সব দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, কোন কর্ম্মই একেবারে দোষশূন্য নহে; কোন একটা কর্ম্ম করিলে বেশী দোষ হইবে, না, না করিলেই বেশী দোষ হইবে—ইহা ঠিক করা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে—এইভাবে দ্বন্দ্বে পড়িয়া মানুষের কর্ম্মশক্তি অবসন্ন হইয়া যায়। মানুষ সকল বৃহৎ ও মহান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন রকমে সঙ্কীর্ণ জীবনে দিনগত পাপক্ষয় করাকেই নিরাপদ বলিয়া মনে করে। যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমনই সমাজের পক্ষেও। হিন্দু সমাজের ন্যায় যে-সব সমাজের সভ্যতা বহুদিনের, তাহারা প্রতি পদে পাপ হইবার ভয়ে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও বিরত হয়। এইভাবে সমাজ কোন রকমে টিকিয়া থাকিলেও তাহার বিকাশ ও উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। আর শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকাও সম্ভব হয় না—কারণ জীবনের লক্ষণই হইতেছে বিকাশ ও উন্নতি। সমাজের পক্ষে অচলায়তন হইয়া পড়াব অর্থই হইতেছে মৃত্যুকে আহ্বান করা।

মানুষের এই যে চিরন্তন পাপের ভয়, যাহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে, গীতা অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহার চরম সমাধান দিয়াছে। গীতা পাপপুণ্যের প্রভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচারী হইতে বলে নাই, পাপপুণ্যের উর্দ্ধে উঠিতে বলিয়াছে ; গীতা এমন এক দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধান দিয়াছে, পাপে যাহার ক্ষয় নাই, পুণ্যে যাহার বৃদ্ধি নাই। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে যেমন কর্ম্মের প্রয়োজন তেমনিই জ্ঞানেরও প্রয়োজন। সকল কর্ম্মেই দোষ আছে, এই যুক্তি দিয়া যাহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে বলেন, গীতা সেই সঙ্কীর্ণ জ্ঞানযোগের শিক্ষা দেয় নাই। যে জ্ঞানলাভ করিলে কর্ম্মের দোষ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ম্মের বন্ধনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেই জ্ঞান লইয়া সংসারের সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্ম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে ইহাই গীতার শিক্ষা। মানুষ পাপের ভয় করে, ইহকাল ও পরকালে দুঃখকে ভয় করে, তাহার কারণ তাহার জ্ঞান নাই, সে জানে না এ জগৎ কি, ভগবান কি, জগতে মানুষ কেন আসিয়াছে, তাহার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি। যখন সে এই সব সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান লাভ করে, তখন সে সকল পাপ ও পাপের ভয় হইতে চিরতরে মুক্ত হয়।

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব—এখানে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারাই পাপের পরিণাম স্বরূপ সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যত্র গীতা বলিয়াছে, অপি চেৎ সুদুরাচারঃ, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে ভগবানের ভজনা করে, সে অচিরাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সাধু হইয়া উঠে। অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মের দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়। বস্তুতঃ গীতার সাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনটি স্বতন্ত্র সাধনা নহে। যে কোনটিকে পূর্ণতম ভাবে বিকাশ করা হউক তাহার মধ্যে অপর দুইটিরও পূর্ণতম বিকাশ হইবে— এই সমন্বয়-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই গীতা কখনও কর্ম্মের উপর, কখনও জ্ঞানের উপর, কখনও ভক্তির উপর জোর দিয়াছে। মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে যে পথ দিয়াই আরম্ভ করুক, শেষ পর্য্যন্ত তিনটি পথ এক হইয়া পরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইবে। গীতার এই অংশে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া বৈদিক যজ্ঞের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝান হইতেছে। জ্ঞানের সহিত সকল

কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করা রূপ যে জ্ঞানযজ্ঞ, গীতা ইহাকেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়াছে।

গীতা যে বলিয়াছে জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা সকল পাপ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই জ্ঞান মনের যুক্তিতর্কসম্ভূত জ্ঞান নহে, ইহা হইতেছে সত্য-সূর্য্যের আলোকে এক উচ্চতম দিব্য জীবনে গড়িয়া উঠা। পাপ পুণ্য, শুভ অশুভ, সুখ দুঃখ এসব হইতেছে নীচের প্রকৃতির বিক্ষোভ। আমরা যতক্ষণ অজ্ঞান অহংভাবের বশে এই নীচের প্রকৃতির জীবনের সহিতই নিজদিগকে এক করিয়া দেখি, ইহাতে আসক্ত থাকি—ততক্ষণ আমাদের অহংয়ের সকল কর্ম্মের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে অক্ষর সনাতন আত্মা রহিয়াছে তাহা এইসব দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে শান্ত, তেজস্বান, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; নীচের প্রকৃতির কোন কলুষই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই আত্মার সন্ধান পাই, এই আত্মাই হইয়া উঠি, আমাদের অহংয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকল কর্ম্মফলের উর্দ্ধে উঠি। যতক্ষণ আমরা সমুদ্রের জলের মধ্যে রহিয়াছি, ততক্ষণ আমাদিগকে ঢেউয়ের আঘাত খাইতেই হইবে। একবার তীরে উঠিতে পারিলে আর ঐ ঢেউ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিয়া এইভাবেই আমরা সকল দ্বন্দ্ব ও অশুভকে জয় করি।

যথৈধাংসি—কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহা অজ্ঞানের কর্ম্ম; যোগীর কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত সম্পাদিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ কয়িয়া দেয় তেমনি জ্ঞান সকল কর্ম্মের বন্ধন-শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতএব, বেদবাদীরা যে বলে বাহ্যিক যজ্ঞ বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিলেই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়, গীতা সে মত গ্রহণ করে নাই। শ্রদ্ধার সহিত যে কোন যজ্ঞ করা যায় তাহারই ফল আছে, তাহার দ্বারাই শুদ্ধি হয়; কিন্তু সকল পাপ হইতে, বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে কেবল সেই কর্ম্ম যাহা জ্ঞানের সহিত সম্পাদিত হয়। অতএব আধুনিক যুগের যে কর্ম্মবাদ—দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানবজাতির জন্য অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করা—ইহাও গীতার আদর্শ নহে, কারণ এই কর্ম্মের পিছনে আত্মজ্ঞান নাই, ভগবদ্-জ্ঞান নাই। সর্ব্বভূতের সহিত আত্মায় এক হইয়া, ভগবানকেই সকল যজ্ঞ ও

তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিয়া, তাঁহার উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই গীতার শিক্ষা এবং এইরূপ কর্ম্মেরই সকল বন্ধন-শক্তি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়। আবার সঙ্কীর্ণতর জ্ঞানযোগ যে বলে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের পর সমস্ত কর্ম্মের শেষ হয়—ইহাও গীতার মত নহে। গীতার অর্থটি এই অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যোগ-সংন্যস্তকর্ম্মাণং আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি, যোগী তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা কেবল কর্ম্মের বন্ধন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। গীতার একজন প্রবীণ টীকাকারের ভাষায়—ভস্মরূপাণ্যগ্রেহস্য' ফলভোগজননাসমর্থানি কুরুতে।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি—গীতা বলিয়াছে জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্মাণি, ভস্মে পরিণত করে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহা ভস্মীভূত হয় না; অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা এই শরীর আরব্ধ হইয়াছে, তাহার ফল প্রবৃত্তই হইয়াছে; সুতরাং ফলের উপভোগ হইলেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হয় নাই, জ্ঞানরূপ অগ্নি সেই সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। শঙ্করের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানলাভের পর আর কোন কর্ম্মই থাকে না, জ্ঞানী কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু ইহাতে গীতার অর্থকে সঙ্কীর্ণ করা হয়। গীতা 'সর্ব্ব' শব্দে কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মফল বাদ দেয় নাই। বস্তুতঃ এই শ্লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই, জ্ঞানলাভের সহিত কৃত কর্ম্মের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

ছান্দগ্যোপনিষদে উক্ত আছে, পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, অথচ জল পদ্মপত্রে সংলগ্ন থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্ম করিলেও কোন পাপ তাঁহাতে লিপ্ত হয় না, পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে (৪।১৪।৩)। গীতাও অন্যত্র ঠিক এই কথাই বলিয়াছে (৫।১০)। পূর্ব্বের শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বে যত কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহাদের ফলভোগ নিবৃত্ত হয়, আর এই শ্লোকে বলা হইল যে জ্ঞান লাভের পর যে কর্ম্ম করা হয় তাহারাও বন্ধন সৃষ্টি করে না। ব্রহ্মসূত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে, তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ

(৪।১।১৩), ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অতীত কর্ম্মের বিনাশ এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মের অশ্লেষ অর্থাৎ স্পর্শাভাব হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানীর শরীর পাত হওয়া উচিত, কারণ শরীর কর্ম্মভোগের নিমিত্তই সৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিলেই শরীর পাত হয় না— অতএব, স্বীকার করিতেই হয়, যে-সকল কর্ম্ম ভোগ করিবার নিমিত্ত এই দেহ সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলির ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা লুপ্ত হয় না। ইহাই বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা, এবং শঙ্কর তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গীতার শিক্ষা ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। গীতা অতি স্পষ্ট-ভাবেই বলিয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা সকল পাপ, সকল কর্ম্মের ফল অতিক্রম করা যায়, জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে (২।৫০), আর ইহা শ্রুতিরই কথা, ক্ষীয়তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে (মুণ্ডক ২।১৮)। তাহা হইলে জ্ঞান হইলেই দেহের পতন হয় না কেন? এই দেহ যে কেবল পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই—ইহা গীতার মত নহে। এই দেহে, মৃত্যুর পূর্ব্বে, প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ, দিব্য জীবন লাভ করিতে হইবে, ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে—এই জন্যই জীবের নরদেহ গ্রহণ; অতএব জ্ঞান লাভ হইলেই দেহের পতন হয় না। কেবল এই মর্ত্ত্য দেহকে দিব্য শরীরে পরিণত করিবার বাধা সকল দূর হইয়া যায়। এইটিই হইতেছে মানবজীবনের লক্ষ্য, জন্মে জন্মে মানুষ এই দিব্যজীবন লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যতক্ষণ না সে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের শেষ নাই—কারণ সে নিজেই এই লক্ষ্য লইয়া সংসার-লীলায় আবির্ভূত হইয়াছে। সে ভগবানের যে ভাব প্রকট করিবার জন্য সংসারে আসিয়াছে, তাহাই তাহার স্বভাব, সেই স্বভাবই জন্মে জন্মে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বিকাশ করে,—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে (৫।১৪)। সকল ভুল ভ্রান্তি, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষের মূল স্বভাব নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের যে পাপ-তাপ-দুঃখ-দ্বন্দ্বময় বর্ত্তমান জীবন—ইহা এই স্বভাবেরই নিম্নতন ক্রিয়া। কিন্তু আমাদের মূল প্রকৃতিতে আমরা পরা প্রকৃতির অংশ। আমরা যখন ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে আমাদের মূল সত্তা ও মূল দিব্য প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইব—তখনই হইবে দিব্য জীবন এবং এই স্থূল শরীর রূপান্তরিত হইয়া সেই দিব্য জীবনের আধার হইবে। আর যাহা কিছু, সে

সবই হইতেছে এই পরম সিদ্ধিলাভের আয়োজন ও উপায়-স্বরূপ। এই যে ইহসংসারে স্থূল দেহেই দিব্য জীবন লাভের আদর্শ—ইহাই বৈদান্তিক গ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

অন্বয়। ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে। যোগসংসিদ্ধঃ কালেন স্বয়ম্ আত্মনি তৎ বিন্দতি।

শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ, ন সুখম্।

অনুবাদ—এই জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই; যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি কালক্রমে নিজেই ইহা আত্মার মধ্যে লাভ করেন।

যিনি শ্রদ্ধাবান্, যিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছেন, যিনি তাঁহার সমগ্র চেতনসত্তাকে পরম পুরুষে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান লাভ করেন; এবং জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি শীঘ্র পরম শান্তি লাভ করেন।

যে অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়পূর্ণ, সে বিনষ্ট হয়; সংশয়পূর্ণ ব্যক্তির ইহকালও নাই, পরকালও নাই, কোন সুখও নাই।

ব্যাখ্যা

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং—গীতা সকল সময়েই অন্তরের সাধনার উপর জোর দিয়াছে। বাহ্যিক যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান

শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিলে চিত্তশুদ্ধিতে সহায়তা হয় বটে, কিন্তু পাপের মূল একেবারে নষ্ট হয় না। সে মূল কি? বাসনা কামনাই পাপের মূল, জ্ঞানের দ্বারা বাসনা এবং তাহার প্রথমজাত সন্তান পাপ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানের দ্বারা আমরা পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করি, বুঝি যে প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কেবল দ্রষ্টা। যখন আমরা এই পুরুষের সহিত একত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমরা সকল বাসনা হইতে মুক্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হই, আত্মার পরম পবিত্রতায় চিরপ্রতিষ্ঠিত হই, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় পাপ আর আমাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারে না।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ—গীতা এখানে জ্ঞানকে যেরূপ উচ্চতম স্থান দিয়াছে তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, গীতা প্রচলিত সাংখ্য মত অনুযায়ী জ্ঞানযোগেরই শিক্ষা দিতেছে। সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল, এই যে জ্ঞান সংসারের আর সব কিছু অপেক্ষা পবিত্র এবং পবিত্রতা-কারক, ইহা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের সাধনা আবশ্যক। বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করাই এখানে গীতার লক্ষ্য—প্রচলিত মতে যোগ বলিতে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেও, গীতা যে যোগ শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ এবং যোগীদের কর্ম্মযোগ এই দুইটিরই সমন্বয় হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পরকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবে। নিষ্কামভাবে, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল মানবের প্রতি আত্মার সমভাব লইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে যে দিব্যকর্ম্ম করা হয় তাহার ভিতর দিয়া মিলনই হইতেছে "যোগ" শব্দের অর্থ, অতএব এই যোগ হইতেছে প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির দ্বারা যে জ্ঞান লাভের প্রয়াস তাহা গীতার অনুমোদিত নহে। কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই সমগ্র সত্তার যে বিকাশ ও পূর্ণতা হইবে, তাহাতেই সাধক নিজেই নিজের মধ্যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। কর্ম্ম যেমন উত্তরোত্তর নিষ্কাম, সমতাপূর্ণ, যজ্ঞভাবাপন্ন হইবে, তেমনই জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, আবার যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে তেমনই সাধক নিষ্কামতা, সমতা ও যজ্ঞভাবে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা বড়, এ-সংসারে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।

কালেনাত্মনি বিন্দতি—গীতা জ্ঞান বলিতে কেবল মন বুদ্ধি দিয়া জানা বুঝে নাই, পরন্তু অধ্যাত্মভাবে এক নূতন চৈতন্যে গড়িয়া উঠা বুঝিয়াছে; সে চৈতন্যের লক্ষণ সমতা, নিষ্কামতা, ভগবানে একান্ত ভক্তি। এই রূপান্তর এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে আসে না, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা করিলে কালক্রমে ইহা লাভ করা যায়। তখন অন্তরের মধ্যেই জ্ঞানসূর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, বাহির হইতে চেষ্টা করিয়া কিছু জানিতে হয় না। বস্তুতঃ সকল অধ্যাত্ম সাধনাতেই এই চারিটি জিনিষ প্রয়োজন—গুরু, শাস্ত্র, উৎসাহ ও কাল। গুরু যে শাস্ত্র উপদেশ দিবেন অটল উৎসাহের সহিত তাহা অভ্যাস ও অনুশীলন করিতে থাকিলে যথাকালে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। অনুশীলনের দ্বারা সাধক যেমন নিষ্কামতা, সমতা ও ভগবদ্ভক্তিতে বর্দ্ধিত হন তেমনই তাঁহার মধ্যে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানে ও অধ্যাত্ম-চৈতন্যে গড়িয়া উঠেন। কেবল পরম জ্ঞান সম্বন্ধেই ইহা বলা চলে। মানুষের বুদ্ধি যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও যুক্তি-সহকারে কষ্ট করিয়া বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আর ঐ যে পরম জ্ঞান আপনা হইতেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়, যাহা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, আবৃত রহিয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলে চাই ইন্দ্রিয়-সংযম, পরম সত্যের প্রতি একনিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা। এইগুলিই জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন, আর গুরুসেবা, প্রণিপাত, প্রশ্ন প্রভৃতি হইতেছে বহিরঙ্গ সাধন।

তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ—জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে হইবে, সংযত করিতে হইবে, কারণ সাধারণ জীবনে ইহারা আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতারণা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত জড়বিজ্ঞান নানাপ্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রণালী অবলম্বন করে। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার মধ্যে কত বেশী পরিমাণ ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছিল, এই শতাব্দীতে আইনষ্টাইন, হাইসেনবার্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন, তাঁহাদের যে বাহ্য জ্ঞানলাভের পদ্ধতি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপরে নির্ভর করিতেই হয় এবং এই জন্য এই জ্ঞানে কখনই সম্পূর্ণতা আসে না, বিজ্ঞান আজ যাহা সত্য বলিয়া

ঘোষণা করিতেছে, কিছুদিন পরে সেইটিকে বর্জ্জন করিয়া অন্য কিছুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। অধ্যাত্ম জ্ঞান এইরূপ নহে, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা অভ্যাস করিলে তাহারাই নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ হয়, তখন সেই দর্পণে আত্মজ্ঞান ভিতর হইতেই প্রতিফলিত হয়—অতএব ইহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহাতে সংশয় বা অনিশ্চয়তা বিন্দুমাত্র থাকিতে পারে না।

এই অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে "তৎপর" হইতে হইবে, অর্থাৎ যে পরম সত্য বস্তুর মধ্যে সব-কিছু রহিয়াছে, তাহার সত্যে আমাদের সমগ্র চৈতন্যময় সত্তাকে নিবিষ্ট করিতে হইবে, যেন তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার জ্যোতির্ম্ময় স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিতে পারে। আর চাই শ্রদ্ধা, এমন শ্রদ্ধা যেটিকে তর্কবুদ্ধির কোনরূপ সংশয়েই বিচলিত হইতে দেওয়া হইবে না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

পরাং শান্তিং—জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরেই পরম শান্তি লাভ করা যায়। এখানে পরা শান্তি বলিতে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া সকলেই বুঝিয়াছেন মোক্ষ, নির্ব্বাণ, সংসারের নিবৃত্তি। শান্তি বলিতে কেমন করিয়া মোক্ষ বুঝাইতে পারে, পাছে কেহ এইরূপ সন্দেহ উত্থাপন করে, সেই জন্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সম্যক জ্ঞানলাভের পরে শীঘ্রই মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-ন্যায়াদিতে প্রসিদ্ধ সুনিশ্চিত অর্থ। কিন্তু গীতা নির্ব্বাণ, মোক্ষ, মুক্তি বলিতে কি বুঝিয়াছে তাহা সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গীতা কোথাও মোক্ষ বলিতে শঙ্করের ন্যায় সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের মধ্যে জীবের আত্মসত্তার সম্পূর্ণ লয় বুঝে নাই। গীতার মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণের অর্থ হইতেছে, বাসনা ও অজ্ঞান অহংভাবের নির্ব্বাণ। ইহার দ্বারা যে শান্তি লাভ করা যায় তাহার সহিত সংসার বা কর্ম্মের বিরোধ নাই—বরং এই শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সংসারে দিব্য জীবন লাভ করা যায়, দিব্য ভাবে কর্ম্ম করা যায়। গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যোগী যে নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করে, আমিই অর্থাৎ পুরুষোত্তমই তাহার ভিত্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং। ব্রহ্মের মধ্যে অহংভাবের লয় করিয়া এই শান্তি লাভ করিতে হয়, কিন্তু ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্। পুরুষোত্তম শুধু বিশ্বের অতীতে নীরব, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় নহেন, তিনি সমগ্র জগতে, সংসারে

ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, অতন্দ্রভাবে কর্ম্ম করিয়া এই জগৎ পরিচালন করিতেছেন। জ্ঞানের দ্বারা আমরা সকল জিনিষকেই পুরুষোত্তম বলিয়া দেখি, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, তখন আর সংসার ছাড়িয়া যাইবার সার্থকতা কোথায়? তখন সংসারের মধ্যে সকল কর্ম্ম, সকলের সহিত সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমরা নিরন্তর ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিব এবং ইহাই হইতেছে যোগ সাধনার শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধি। সন্ন্যাসমার্গে সাধক জ্ঞানলাভের দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্মের মধ্যে ব্যষ্টি-সত্তার বিলয়ের জন্য প্রস্তুত হয়, এবং ইহার জন্য সাংসারিক জীবন ও কর্ম্মত্যাগ অপরিহার্য্য। গীতার যে ত্যাগ-পন্থা, তাহাতে জ্ঞান হইতেছে আমাদের সমস্ত জীবন ও সত্তাকে এবং সমস্ত কর্ম্মকে ভগবানের শান্ততম ও অপরিমেয় সত্তা, চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সর্ব্বতোমুখী ঐক্যে পরিণত করার উপায় এবং ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জীবের অহং হইতে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, পরা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও সিদ্ধির মধ্যে প্রশস্ত ও সমগ্রভাবে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি—যে অজ্ঞান ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই, সে বিনষ্ট হয়। "বস্তুতঃ ইহা সত্য যে, বিশ্বাস ভিন্ন ইহজগতে কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য কিংবা ঊর্দ্ধ লোকের নিমিত্তও নিশ্চিতভাবে কিছুই সম্পাদন করা যায় না। কোন নিশ্চিত ভিত্তি, দৃঢ় অবলম্বনকে ধরিতে না পারিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায় না, কোন তৃপ্তি বা সুখলাভ করা যায় না; যে-মন কেবল সংশয়ে পূর্ণ তাহা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে নষ্ট করে। তবু কিন্তু নিম্নস্তরের জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। উপরের জ্ঞানে এ-সব হইতেছে বিষম বাধা, কারণ সেখানকার গূঢ় তত্ত্ব এই যে, সেখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয় না, পরন্তু স্বতঃ-প্রকাশমান সত্যকে ক্রমশঃ বেশী প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির স্তরে যে-জ্ঞান তাহার সহিত সকল সময়েই অসম্পূর্ণতা বা মিথ্যা মিশিয়া রহিয়াছে, অতএব সংশয়দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া মিথ্যার ভাগ বর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না, এবং কোন একটা মতের প্রতি আসক্তির বশে বুদ্ধি যে সংশয় উৎপাদন করে তাহা কেবল বিচারের দ্বারা দূর করা

যায় না, অনুভূতি উপলব্ধিতে অধ্যবসায়ের দ্বারা সে-সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানে যে-কোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহা দূর করিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাতে সংশয় করা চলিবে না, পরন্তু আত্মার মধ্যে গভীরতর, উচ্চতর ভাবে বাস করিয়া, পূর্ণতর অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা সে অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যেটুকু এখনও অনুভূত হয় নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচারের দ্বারা নহে, কারণ এই জ্ঞান দান করা বিচার বিতর্কের সাধ্যাতীত। বাস্তবিক বিচার বিতর্কের দ্বারা মন যে-সকল ধারণার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, অনেক সময়েই সে-সব হয় উচ্চস্তরের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত,—এই সত্য বিচারের দ্বারা প্রমাণের বিষয় নহে, এই সত্যের অনুসরণে আভ্যন্তরীণ ভাবে জীবনকে গঠন করিতে হয়, আমাদিগকে যে উচ্চতর সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠিতে হইবে, ইহা সেই সত্য।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অন্বয়—হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

হে ভারত! তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগং আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগের দ্বারা সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় বিনষ্ট করিয়াছেন এবং আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ হন না।

অতএব, হে ভারত! অজ্ঞান হইতে জাত, হৃদয়ে অবস্থিত এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন করিয়া তুমি যোগ অবলম্বন কর, যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হও।

ব্যাখ্যা

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং—যোগের দ্বারা সকল কর্ম্ম সংন্যাস করিতে হইবে এবং জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় নাশ করিতে হইবে। এখানে যোগ ও জ্ঞানের মধ্যে একটা স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে যোগ বলিতে কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছে, এবং জ্ঞান বলিতে জ্ঞানযোগ বুঝাইতেছে, এবং এইভাবেই গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "তবেই চাই (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদের বিবাদ মিটিল, ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্ম-প্রণেতৃ-শ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন।" তিলক বলিয়াছেন, "এই দুই শ্লোকে জ্ঞান ও যোগের (অর্থাৎ কর্ম্মযোগের) পৃথক উপযোগিতা দেখাইয়া উহাদের অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের সমুচ্চয়েই কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই দুইয়ের পৃথক পৃথক উপযোগিতা এই যে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম করিলে উহাদের বন্ধন টুটিয়া যায় এবং উহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের সন্দেহ দূর হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। অতএব শেষ উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার করিও না, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ কর।"

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ অনুসারে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সমুচ্চয় বা মিলনের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। শঙ্করের মতে মোক্ষের জন্য জ্ঞানই প্রয়োজন, কর্ম্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, কর্ম্ম মোক্ষের কারণ নহে, বন্ধনের কারণ। শঙ্কর প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন শুকদেবের অনুশাসন, "প্রাণী কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ করে। এই কারণে পারদর্শী সংন্যাসীগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।" তাহা ছাড়া, মোক্ষ জীবের নিত্যসিদ্ধ, জীব বস্তুতঃ কখনও বদ্ধ হয় না, সে চির-মুক্ত, বন্ধন কেবল একটা ভ্রম মাত্র। জ্ঞানের দ্বারা এই ভ্রম নিরসন হইলেই জীব নিজ মুক্ত-স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং তাহাই নিঃশ্রেয়স্। গীতা এই শ্লোকে 'জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্' বলিতে এই আত্মবিষয়ক ভ্রমের নিরসন বুঝিয়াছে এবং

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং বলিতে এই জ্ঞানযোগের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বুঝিয়াছে। অতএব শঙ্করের মতে এই শ্লোকে যোগ শব্দের অর্থ জ্ঞানযোগ, এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোন পৃথক উপযোগিতা দেখান হয় নাই। জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, মোক্ষ জীবের নিত্য সিদ্ধ, তাহা ঘটপটাদির ন্যায় সৃষ্ট নহে ; সুতরাং মোক্ষের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্ম নিষ্ফল।

কিন্তু পরের শ্লোকেই অর্জ্জুনকে যোগ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, সেখানে যোগ শব্দে স্পষ্টতঃই কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, ঐ কর্ম্মযোগ হইতে মোক্ষ লাভ করা যায় না, কিন্তু উহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভে সহায়তা হয়, সেইজন্যই অর্জ্জুনকে জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের সার ও মূল কথা, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমন্বয় হয় না, মোক্ষের জন্য জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তবে ঐ সম্যক জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ প্রথমাবস্থায় কর্ম্মযোগের উপযোগিতা আছে। অর্জ্জুন জ্ঞানলাভের অধিকারী নহেন, তাই তাঁহাকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কর্ম্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু শঙ্করের এই ব্যাখ্যা গীতার সমগ্র শিক্ষার বিরুদ্ধ। গীতায় অর্জ্জুনকে যেমন কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে. তেমনিই জ্ঞানেরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়েই তাঁহাকে জ্ঞানলাভের উপায় দেখান হইয়াছে, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ইত্যাদি। আর এখানেও শেষ শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া যোগ অবলম্বন কর। জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর, এরূপ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? গীতার শাঙ্কর ভাষ্য এইরূপ অসঙ্গতিতে পূর্ণ, অথচ ইহা আজও সমগ্র হিন্দু-সমাজে সুপ্রচলিত রহিয়াছে, হিন্দুকে সংসারে আস্থাহীন এবং কর্ম্মে বিমুখ করিয়া তুলিতেছে।

গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয় অতি সূক্ষ্ম ও গভীর। অর্জ্জুন ইহা বুঝিতে না পারিয়া বার বার এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং শেষ অধ্যায়ে এইটিই হইতেছে গীতায় অর্জ্জুনের শেষ প্রশ্ন। অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন জাগাইবার জন্য গুরু যেন ইচ্ছা করিয়াই এখানে যোগ ও সংন্যাস শব্দ অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই যুগে যোগ শব্দ কর্ম্মযোগ অর্থেই ব্যবহার করা হইত,

গীতাও তাহা উল্লেখ করিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। আর সংন্যাস শব্দের অর্থ কর্ম্মত্যাগ। তাহা হইলে যোগসংন্যস্তকর্ম্মানং কেমন করিয়া হইতে পারে, কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কেমন কথা? অর্জ্জুন ঠিক ইহার পরে—পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে এই প্রশ্নটিই তুলিয়াছেন, "তুমি কর্ম্ম-সকলের সংন্যাসের কথা বলিতেছ, আবার যোগেরও কথা বলিতেছ, এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতর সেই একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।" গুরু যে উত্তর দিবেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, কেবল অজ্ঞানীরাই কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ এইরূপ পৃথক করিয়া থাকে, যোগ একই,

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে ভগবানের সহিত সংস্পর্শ ও মিলন—আমরা কর্ম্মের ভিতর দিয়া, জ্ঞানের ভিতর দিয়া, অথবা ভক্তির ভিতর দিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু ভগবানের সহিত যে পূর্ণতম মিলন, পূর্ণ যোগ, তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সব মিলিয়া এক হইয়া যায়। গীতায় গুরু ক্রমশঃ শিষ্যকে এই পূর্ণ-যোগের তত্ত্ব বুঝাইতেছেন, এবং গীতার এই অংশে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপর সমান ভাবে জোর দিয়া উভয়ের সমন্বয় সাধন করিতেছেন। গীতা কর্ম্মেরই শিক্ষা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণ কর্ম্ম নহে, দিব্য কর্ম্ম, এই দিব্য কর্ম্মীর লক্ষণ হইতেছে—নিষ্কামতা, সমতা, নির্ব্যক্তিকতা, ত্রিগুণাতীততা, আনন্দ এবং এ সবেরই মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম্ম দিব্য কর্ম্মে পরিণত হয়, জ্ঞানযোগের দ্বারাই কর্ম্মযোগের পূর্ণ পরিণতি, জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম পূর্ণ হয় না, কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান পূর্ণ হয় না, ইহাই গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়।

সকল কর্ম্ম ভগবানে সংন্যাস বা অর্পণ করা, কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া—ইহাই কর্ম্মযোগ এবং ইহার আছে বিভিন্ন স্তর। আমরা যেমন পূজার সময় ভগবানের উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করি, তেমনই আমাদের সকল কর্ম্মকে, যৎ করোষি যদশ্নাসি, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে, এবং সমস্ত ফল-কামনা বর্জ্জন করিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম এইরূপ নিষ্কাম ও যজ্ঞ-ভাবাপন্ন হয় না। ভগবানই আমাদের সকল সত্তার, সকল কর্ম্মের মূল; যাহা হইতে আমরা আমাদের সব-কিছু পাইয়াছি—তাঁহাকেই আমরা আমাদের সব অর্পণ করি। জ্ঞান আরও পুষ্ট হইলে আমরা উপলব্ধি করি, এই যে অর্পণ, এই কর্ম্ম-যজ্ঞ, ইহা আমরা করিতেছি না, আমরা

কেবল দ্রষ্টা, প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে। যজমান যেমন শুধু দেখে, পুরোহিত সমস্ত যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করে, আমরা তেমনিই কেবল সায় দিই, প্রকৃতিই আমাদের মধ্য দিয়া সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে সম্পন্ন করে। গীতার মতে ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম-সংন্যাস—বাহ্যভাবে কর্ম্ম-ত্যাগ নহে, আভ্যন্তরীণ ভাবে সকল কর্তৃত্বভাব বর্জ্জন করা। শেষে উপলব্ধি হয় যে, প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি এবং আমরা মূল সত্তায় ভগবানের অংশ, আমাদের দেহ প্রাণ মনকে নিমিত্ত রূপে, যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া ভগবান নিজ শক্তির দ্বারা আমাদের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন—ইহাই হইতেছে কর্ম্মসংন্যাস বা ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণের নিগূঢ় অর্থ ও চরম পরিণতি। যে ব্যক্তি এই ভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্ম-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আত্মবস্তং, ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করেন, কোন কর্ম্মই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না, তিনিই মুক্ত পুরুষ, তাঁহার কর্ম্ম হয় গীতার ভাষায়, মুক্তস্য কর্ম্ম (৪।২৩)।

ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি—সংন্যাস শব্দে যদি বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বুঝা যায় তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ করিতে হয়, যিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্ম্ম-সকল আর তাঁহাকে বদ্ধ করে না এবং এ কথার কোনই মানে হয় না। অতএব সংন্যাস বলিতে যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করিয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বুঝিতে হইবে, এইভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা আর বন্ধনের কারণ হয় না। গীতা যে অন্যত্র বলিয়াছে, সকল কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪।৩৩), মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম সমগ্রভাবে লয় প্রাপ্ত হয় (৪।২৩), জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া দেয় (৪।১৯, ৩৭), ইহার অর্থ নহে যে জ্ঞান পূর্ণ হইলেই কর্ম্মের শেষ হয়, ইহার প্রকৃত অর্থটি গীতা এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছে,—যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, কর্ম্ম-সকল আর তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, যাঁহার আত্মা সর্ব্ব-ভূতের আত্মা হইয়াছে, যিনি ভগবানের সহিত যোগে যুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে।

আপত্তি উঠিতে পারে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি সকল-কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তবে যতদিন দেহের পতন না হয় ততদিন প্রকৃতির গুণসকলের ক্রিয়া যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে এবং সে-সব কর্ম্ম জ্ঞানীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না—ইহা বলাই

এখানে গীতার উদ্দেশ্য। কিন্তু গীতা এইরূপ যন্ত্রবৎ কর্ম্মের কথা বলে নাই, চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করিবার কথা বলিয়াছে। ভগবান নিজে কেমন অতন্দ্রভাবে সকল কর্ম্ম করেন, সেই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়—ইহাই চরম জ্ঞান নহে, এই উপলব্ধির দ্বারা আমরা কেবল ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে, "আমি কর্ত্তা" এইভাব হইতে মুক্ত হই। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান হইতেছে পুরুষোত্তমের জ্ঞান, তিনিই বিশ্বের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, সর্ব্বভূতমহেশ্বর, আমাদের সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হইবে (৩।৩০)।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্—আমাদের সাধারণ জীবন হইতেছে অজ্ঞানের জীবন, আমরা যে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছি, ইহার কুহক-সকল আমাদের অন্তরস্থ স্বতঃসিদ্ধ স্ব-প্রকাশ জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আমাদের হৃদয় ও মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিমূঢ় হয়, নানা মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এই জন্যই হৃদয়ে নানা সংশয়ের উদয় হয়, আমরা সত্য জ্ঞানকে স্বীকার করিতে পারি না, জীবনে অনুসরণ করিতে পারি না। ভগবানের উপাসনা করিয়া, সর্ব্বদা ভগবানের সহিত যোগ অভ্যাস করিয়া আমরা যে অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করি, তাহার দ্বারা, সেই উপলব্ধ জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ঐ সকল সংশয় ছিন্ন করিতে হইবে, ভগবানের সহিত যোগকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, এইভাবে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইলে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকিবে না—

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি; এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ তৎ একং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি। শ্রীভগবান্ উবাচ—সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ; তু তয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে কর্ম্ম সংন্যাসের কথা বলিতেছ, আবার কর্ম্মযোগের কথাও বলিতেছ; এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতর সেই একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।

শ্রীভগবান বলিলেন, সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা

সংন্যাসং কর্ম্মণাং—সেই যুগে মোক্ষলাভের দুইটি পন্থার প্রভেদের উপর খুবই জোর দেওয়া হইত,—সাংখ্য জ্ঞানের পন্থা এবং যোগ কর্ম্মের পন্থা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের লক্ষ্য হইতেছে এই দুইয়ের সমন্বয় করা। সেই জন্য গীতা প্রথমেই সাংখ্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী কর্ম্মযোগের উপরও জোর দিয়াছে। অর্জ্জুনের মনের মধ্যে তৎকাল প্রচলিত সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের প্রভেদটি বদ্ধমূল থাকায় তিনি এই সমন্বয় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ এই

বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানই যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বড়, তাহা হইলে আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আমি বলিয়াছি যে, অজ্ঞান ও বাসনার বশে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ বড়। আমি এমন কথা বলি নাই যে কর্ম্ম অপেক্ষা অকর্ম্ম বা কর্ম্মহীনতা বড়, বরং উহার বিপরীতটাই সত্য, কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। বাসনা ত্যাগ করিয়া, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই কর্ম্মযোগ— তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কর্ম্মযোগেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এমন কথাও বলা হইয়াছে যাহা হইতে মনে হইতে পারে, সাংখ্য যে কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা দিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি তাহারই প্রশংসা করিতেছেন। তাই অর্জ্জুন নিশ্চিত ভাবে জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, এই দুইটি বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর। শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর বুঝাইয়া দিবেন যে, এই দুইটি পন্থা বস্তুতঃ বিভিন্ন দুইটি সাধনা নহে, একই সাধনার দুইটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম দেখিতে হইবে, অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিতে হইবে, এইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় অর্জ্জুন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; তাঁহার প্রকৃতি জ্ঞানীর প্রকৃতি নহে, কর্ম্মীর প্রকৃতি, তাই তিনি স্পষ্টভাবে এমন একটি পন্থা, একটি সাধনা জানিতে চাহিলেন, যেটি শ্রেষ্ঠতর; সেইটি জানিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে পারেন, তাঁহার সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, সাধারণতঃ সাংখ্য বা জ্ঞান যোগ বলিতে যাহা বুঝায়,—কর্ম্মের সংন্যাস বা ত্যাগ,—তাহা অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি শ্লোকে সংন্যাস বলিতে বাস্তবিকই কি বুঝাইতেছে, তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, এখানে সংন্যাস বলিতে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগই বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা বড়, এবং ইহা গীতার শিক্ষার বিরুদ্ধ। গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড়, সকল কর্ম্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এই ছয় অধ্যায়ে গীতা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের উপরেই সমান জোর দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে, উভয়ের দ্বারাই উভয়ে পূর্ণ হইয়া

উঠে, ইহাই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়। তাহা হইলে এখানে সংন্যাস বলিতে কি বুঝাইতেছে? গীতায় সংন্যাস শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে বলা হইয়াছে (৩।৩০, ১২।৬, ১৮।৫৭) এবং গীতার মতে এইরূপ আভ্যন্তরীণভাবে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করাই দেখাইয়াছে। যথা, কিন্তু সংন্যাস শব্দ যে অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়, গীতা তাহাও প্রকৃত সংন্যাস। কাম্যকর্ম্মের বাহ্যতঃ ত্যাগই সংন্যাস (১৮।২)। এখানে সংন্যাস বলিতে অর্জ্জুন বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগই বুঝিয়াছেন, "কর্ম্মসংন্যাস" কথাটির দ্বারাই তাহা প্রকট হইয়াছে; আভ্যন্তরীণ ভাবে সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ-রূপ যে প্রকৃত সংন্যাস, তাহার মর্ম্ম এখনও অর্জ্জুন উপলব্ধি করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে সংন্যাস বলিতে বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগই বুঝিতে হইবে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বাহ্যভাবে কর্ম্মত্যাগ করিবার উপদেশ দেন নাই, তিনি পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিবার উপর জোর দিয়াছেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি কথা (যথা ৩।১৭, ৪।৩৪) হইতে অর্জ্জুনের মনে হইয়াছে যে, তিনি বাহ্যভাবে কর্ম্মত্যাগেরও উপদেশ দিতেছেন। আর তাঁহার এইরূপ মনে হইবার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য ও জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং সাংখ্যের লক্ষণই ছিল বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান এক সঙ্গে চলিতে পারে না, তাই অর্জ্জুন সহজ বুদ্ধিতে এই দুইটির মধ্যে কোনটি শ্রেয় তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে চাহিলেন।

নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ—শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে, দুইটির দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। এইখানেই গীতার উদারতার পরিচয়। কর্ম্মের শিক্ষা দেওয়াই গীতার লক্ষ্য, কর্ম্মযোগই গীতার বিশিষ্ট পন্থা, তথাপি গীতা কর্ম্মত্যাগেরও উপযোগিতা অস্বীকার করে নাই, ঐটিকেও শ্রেয়ঃ লাভের একটি পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য শুধু কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহা নহে (৩।৪), তবে অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য যদি কাহারও কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন হয়, ভিতর হইতে কর্ম্মত্যাগের প্রেরণা আসে, তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবে না। বুদ্ধ, চৈতন্য এইরূপ প্রেরণা পাইয়াই সংসার ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজকাল পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে আমাদের দেশে অনেক লোকই সন্ন্যাসীদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করা হইবে এইরূপ প্রস্তাবও শুনা যাইতেছে।

কিন্তু তাহা হইলে ভারতে আর বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ আপন ভাবে সাধনা করিবার সুযোগ পাইবেন না। বুদ্ধকে রাজনৈতিক কর্ম্ম করিতে, চৈতন্যকে অধ্যাপনা করিতে, রামকৃষ্ণ ত ঐসব কিছুই পারিতেন না,—হয়ত তাঁহাকে ভূতির খালে গরু চরাইতে বাধ্য করা হইবে! ইহার ফলাফল যাহাই হউক, ইহাতে অন্ততঃ গীতার শিক্ষা অনুসরণ করা হইবে না। সমাজের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করা যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া আজকাল বিবেচিত হয়, ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতার মতে মানবজীবনের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানকে লাভ করা, অধ্যাত্ম চৈতন্য, অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা। গীতা কর্ম্মের উপরে জোর দিলেও, কর্ম্মত্যাগকেও ভগবান লাভের একটি পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। যদি সে-জন্য কর্ম্মত্যাগ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং সে জন্য ভিতর হইতে প্রবল ডাক আসে, তখন সকল কর্ত্তব্য, সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেই হয়। ভগবানের ডাক আর সকল ডাকের উপরে, সেখানে আর অন্য কোন বিবেচনার স্থান নাই।

কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে—তবে অন্যপক্ষে সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগকেই ভগবান লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা বা একমাত্র পন্থা বলিয়া যে এখনও আমাদের দেশে বিশ্বাস রহিয়াছে, এইটিও গীতার শিক্ষা নহে। গীতা অতি স্পষ্ট ভাষায় কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই শ্রেয়ঃ লাভের, ভগবান লাভের উৎকৃষ্টতর উপায় বলিয়াছে। গীতার এই শিক্ষা সন্ন্যাসীদের মতের বিরোধী, তাই তাঁহারা নানাভাবে গীতার এই সুস্পষ্ট শিক্ষাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগ হইতেছে মিথ্যাজ্ঞানমূলক, জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, অতএব কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ প্রশস্ত—একথা কেবল অজ্ঞানীদের পক্ষেই প্রযুজ্য। শঙ্কর তাঁহার গীতা-ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যে-ব্যক্তি আত্মবিৎ অর্থাৎ যাহার মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞানমূলক কর্ম্মযোগ অসম্ভব হইয়া থাকে। আত্মা নিষ্ক্রিয়, জন্ম প্রভৃতি বিকার আত্মার নহে,—এইভাবে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব যে-ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে, সেই আত্মবিদের সম্যগ্‌দর্শনের প্রভাবে সকল প্রকার মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত হইয়াছে, শাস্ত্রে সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেই অবস্থানরূপ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে।" কিন্তু ইহা গীতার কর্ম্মযোগের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা—কারণ গীতার মতে কর্ম্মযোগ মিথ্যাজ্ঞান-

মূলক নহে, সত্য জ্ঞানের উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। গীতার দিব্য কর্ম্মের যে-সব লক্ষণ—সমতা, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা,—এ-সব অজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নহে। আত্মা নিষ্ক্রিয়—ইহাই যদি চরম জ্ঞান হইত, তাহা হইলে চরম জ্ঞানের সহিত আর কর্ম্মযোগের সমন্বয় হইত না, কিন্তু গীতার মতে শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র জ্ঞান হইতেছে পুরুষোত্তমের জ্ঞান এবং তাঁহার মধ্যে একই কালে নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা দুই-ই রহিয়াছে—ভিতরে আত্মার নৈঃশব্দ্য, অচলতা, নিষ্ক্রিয়তা, বাহিরে প্রকৃতিতে অতন্দ্রভাবে কর্ম্ম। অতএব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। অজ্ঞান অবস্থায় কর্ম্ম জ্ঞানলাভের সহায়, জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মের আর প্রয়োজন না থাকিলেও জ্ঞানী লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন, কারণ তিনি ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করেন, আর ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি নিজ লীলার বশে সকল সময়েই কর্ম্ম করিতেছেন, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।

যাঁহারা মনে করেন, গীতা এখানে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের তুলনা করিয়াছে, তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, অর্জ্জুন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না তাই তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই ভাল বলা হইয়াছে। কিন্তু গীতায় কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেমন বিশালতম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, তেমনিই পরমতম গুহ্যতম জ্ঞানেরও উপদেশ দিয়াছেন। আর বস্তুতঃ এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মের তুলনা করা হয় নাই, বাহ্য কর্ম্মত্যাগের সহিত কর্ম্মযোগের তুলনা করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও পক্ষে কর্ম্মত্যাগ উপযোগী হইলেও সাধনা হিসাবে সাধারণ ভাবে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর—ইহাই এখানে ভগবানের বক্তব্য।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩

অন্বয়—যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ ; হে মহাবাহো ! নির্দ্বন্দ্বঃ হি সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁহাকে চির (কর্ম্মকালেও) সংন্যাসী বলিয়া জানিবে ; কারণ তিনি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে এবং সহজেই মুক্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী—কর্ম্মত্যাগ ও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা, না সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা—অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন তুলিয়া গীতা উহার যে সূক্ষ্ম ও গভীর সমাধান করিয়া দিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মোক্ষ ও নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগ অপরিহার্য্য, এই ধারণাই তাহাদের চির-বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থনে গীতার বিকৃত ব্যাখ্যা। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, পরে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে—ইহাই বেদানুমোদিত আশ্রম ধর্ম্ম। কিন্তু এইটি কেবল আদর্শ মাত্রই ছিল, কার্য্যতঃ খুব কম লোকই পর পর এই চারি আশ্রম অবলম্বন করিয়াছে। তবে এই আদর্শের মূলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহা ভারতীয় জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সংসারের জীবনই মানুষের চরম সম্ভাবনা নহে, একটা উচ্চতর দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে উঠিবার পক্ষে এইটি কেবল একটি সহায়, একটি সাধন-ক্ষেত্র মাত্র—সেই অধ্যাত্ম জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের ভোগ, আমাদের কর্ম্ম সব-কিছুই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ সেই পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহাই আশ্রম-ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব।

প্রাচীন কালে গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর খুবই জোর দেওয়া হইত, মুনিঋষিরাও সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন, ফলে সাংসারিক জীবনে ভারতবাসী এককালে খুবই উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কালক্রমে এই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয় এবং গার্হস্থ্য আশ্রম অবহেলিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি (৪।৪।২২), ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হয়। আর এই ইচ্ছা বা তীব্র বৈরাগ্য যখনই উদয় হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ (জাবালোপনিষৎ)। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। "যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু। তদৈব সংন্যসেদ্

বিদ্বানন্তথা পতিতো ভবেৎ (মৈত্রেয়্যুপনিষৎ, ২।১৯)। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে যেমন পিত্তাদিদোষে শরীর নষ্ট হয়, বৈরাগ্যের সময় সংন্যাস গ্রহণ না করিলে সেইরূপ পতিত হইতে হয়। এইভাবে বেদানুমোদিত আশ্রমধর্ম্ম ও ক্রমসন্ন্যাসের বিপর্য্যয় ঘটে। গীতা সেই প্রাচীন সামঞ্জস্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে এবং যেমন যজ্ঞ, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রথার বাহ্যিক রূপের উপর জোর না দিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বৈদিক আশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধতা না করিয়া তাহার মূল সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছে। বেদে যে সংসার-আশ্রমের পর সংসার-ত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা আছে, গীতা তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করে নাই। তবে গীতা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছে যে, প্রকৃত যে সন্ন্যাস তাহা ভিতরের জিনিষ, সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়াও মানুষ সন্ন্যাসী হইতে পারে—আর সন্ন্যাসের যে প্রকৃত লক্ষ্য মোক্ষলাভ, তাহা বাহ্য সন্ন্যাস অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারাই সুখে ও সহজে লব্ধ হয়, কারণ দেহধারী মানবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কষ্টকর, দুঃখমাপ্তুম্।

যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া মানুষ অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা সংসারের বস্তু-সকলে আসক্ত হইয়া পড়ে; এই আসক্তি হইতে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয়, তাহাতে মানুষের চৈতন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বাসনা, আসক্তি, রাগ ও দ্বেষ ছাড়িতে না পারিলে ঊর্দ্ধের জীবন লাভ করা দুরাশা। সাময়িক বৈরাগ্যের বশে সংসার ছাড়িয়া গেলেই মানুষ যে রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা নহে। সংসারের কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ অভ্যাস করা যায়, এবং এইটিই উৎকৃষ্টতর পন্থা; আর যাঁহারা এই ভাবে রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন—তাঁহারা নিত্য সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইবার জন্য তাঁহাদিগকে আর সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় না, তাঁহারা সংসারের মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও চির-সন্ন্যাসী—এবং গীতার মতে এইটিই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো—ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে জীবন যাপন করিতেছি, ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই প্রকৃত মোক্ষ—এই মোক্ষলাভের জন্যই সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা। গীতা বলিতেছে,

নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারিলেই এই নীচের প্রকৃতির বন্ধন হইতে সহজে মুক্তিলাভ করা যায়। অতএব যে ব্যক্তি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী। নির্দ্বন্দ্ব হইতে না পারিলে রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কারণ সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-বোধই আমাদের মনে একটির প্রতি রাগ এবং তাহার বিপরীতটির প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। নিম্নতম দ্বন্দ্ব হইতেছে যে গুলি শরীরের ভিতর দিয়া আমাদের মনকে বিচলিত করে, যথা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, শীত ও উষ্ণ, শারীরিক সুখ বা বেদনা; মধ্যস্তরের দ্বন্দ্ব হইতেছে যেগুলি আমাদের বাসনা কামনা ও প্রাণিক অনুভূতির ভিতর দিয়া মনকে বিক্ষুব্ধ করে, যথা সফলতা ও বিফলতা, জয় ও পরাজয়, শুভ ও অশুভ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, প্রেম ও ঘৃণা, শোক ও আনন্দ, সুখ ও দুঃখ; উচ্চতম স্তরের দ্বন্দ্ব বিচারবুদ্ধির ভিতর দিয়া আমাদের মনের মধ্যে উত্থিত হয়, যথা পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়। সাধারণ জীবনে এই সকল দ্বন্দ্বের স্থান আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু ঊর্দ্ধতর অধ্যাত্ম জীবনে উঠিবার সময় এই সবই বাধা ও বন্ধনস্বরূপ হয়—এমন কি সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের বিচারও অতি বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, সত্ত্বগুণও বন্ধন করে। আমি যাহা করিতেছি তাহা সত্য, তাহা পুণ্য, তাহা ধর্ম্ম, তাহা কর্ত্তব্য—এইরূপ অহঙ্কার সাত্ত্বিক হইলেও ইহা বন্ধন, এবং এই বন্ধন ছাড়াইয়া উঠা কঠিন, অনেক সময় অতিশয় কঠিন। অবশ্য সত্যে ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, কিন্তু সাধারণ মন বুদ্ধি দ্বারা আমরা যে সত্য ও অসত্য, পাপ ও পুণ্যের বিচার করি তাহা আংশিক জ্ঞান এবং অজ্ঞানেরই নামান্তর, ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে মন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে যে অতি-মানস সত্যের পূর্ণ জ্যোতি তাহাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই আমাদিগকে পাপ ও পুণ্য উভয়ের প্রতি আসক্তি হইতেই মুক্ত হইতে হইবে, উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যোগ সাধনা করিয়া আমরা নিশ্চয়ই সকল প্রকার দ্বন্দ্ব হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে এবং এইভাবে ভগবানের এই বিশ্বব্যাপারে বস্তুসকলের পরস্পরের সহিত সত্য সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। ভক্তির দ্বারা সব কিছুই

প্রেমময়ের দান বলিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে,

"আমি সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।"

এই ভাবে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। কর্ম্মযোগের দ্বারা সকল কর্ম্মকে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতে হইবে; সাফল্য অসাফল্য, মান অপমান প্রভৃতি যে-সব দ্বন্দ্ব সকল কর্ম্মের পিছনেই রহিয়াছে সে-সবে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে হইবে। এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম আসিবে ভগবানের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প ও অভ্যাসের দ্বারা। এই সাধনার জন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই, বরং সংসারে সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই ইহা প্রকৃষ্টভাবে অভ্যাস করা যাইতে পারে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ৫

অন্বয়—বালাঃ সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ প্রবদন্তি, পণ্ডিতাঃ ন; একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে।

সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে যোগৈঃ অপি তৎ গম্যতে; যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

অনুবাদ—বালকেরাই (অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণই) সাংখ্য ও যোগকে পরস্পর হইতে পৃথক বলিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলেন না; কোন ব্যক্তি সম্যকভাবে একটি অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল লাভ করিয়া থাকে।

সাংখ্যগণ (অর্থাৎ জ্ঞানযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) যে পদ লাভ করেন, যোগিগণও (অর্থাৎ কর্ম্মযোগিগণও) সেই পদ প্রাপ্ত হন; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।

ব্যাখ্যা

গীতা এখানে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, যাহারা সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক করে তাহারা বালক, অজ্ঞ। অথচ গীতার ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের

ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাংখ্য ও যোগ হইতেছে দুইটি বিভিন্ন পন্থা, একই সঙ্গে একই মনুষ্যের দ্বারা-এই দুইটি কখনই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না! শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এখানে "পৃথক" শব্দের দ্বারা কেবল ফলের পার্থক্যই বুঝাইতেছে, যাহারা বলে যে, সাংখ্য ও যোগের ফল বিভিন্ন তাহারাই বালক বা মূর্খ। কিন্তু এই ভাবে নিজেদের কথা গীতার মধ্যে বসাইয়া দিলে গীতা হইতে যে-কোন অর্থই বাহির করা যায়, এবং এই ভাবেই সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকারেরা গীতার ব্যাখ্যা দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। গীতা শুধু ফলের একত্বের কথাই বলে নাই, অতি স্পষ্ট ভাষায় এখানে বলিয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগকে যাহারা এক বলিয়া দেখে তাহারাই যথার্থদর্শী। এতএব সাধনা হিসাবেও যে সাংখ্য ও যোগ একই—গীতা এইখানে তাহাই বলিতেছে।

সাংখ্য ও যোগকে সাধনা হিসাবে পৃথক করাই ছিল প্রচলিত রীতি, গীতা তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়েও গীতা ইহার পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছে—

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

অবশ্য সাংখ্য শব্দে যদি কর্ম্মত্যাগ এবং যোগ শব্দে কর্ম্মযোগ বুঝায় তাহা হইলে এই দুইটি কখনই এক সাধনা হইতে পারে না—কিন্তু গীতা সাংখ্য শব্দ যে-অর্থে প্রয়োগ করিয়াছে তাহাতে উহার দ্বারা বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না। অর্জ্জুন প্রচলিত ধারণা অনুসারে সাংখ্য বলিতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের প্রভেদ করিয়া বলিয়াছেন, একটি অপেক্ষা আর একটি শ্রেয়ঃ (৫।২)। কিন্তু তাহার পরেই তিনি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, সাংখ্য বলিতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস-আশ্রম বুঝায় না। প্রকৃত যে সাংখ্য তাহার সহিত কর্ম্মযোগের বিরোধ নাই—উভয়ে মিলিয়াই একটি সমগ্র সাধন প্রণালী, সেইজন্য উভয়ের ফলও এক।

গীতা নিজেই অন্যত্র সাংখ্য ও যোগের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে (৩।৩; ১৩।২৪); কিন্তু এই প্রভেদ হইতেছে আরম্ভে ও পদ্ধতিতে, মূল নীতি ও লক্ষ্যে নহে। অজ্ঞ লোকে উভয়ের এই বাহ্য পার্থক্যটিই দেখে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ইহাদের মূল ঐক্যটি দেখিতে পান। বস্তুতঃ সাংখ্যও হইতেছে এক প্রকার

যোগ, ইহাকে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ বলা হয়। গীতা সাংখ্য বা সন্ন্যাস বলিতে যেমন বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস-আশ্রম বুঝে নাই (৬।১), তেমনই যোগ বলিতেও কেবল রাজযোগ বুঝে নাই। প্রধানতঃ আন্তঃকরণিক অভ্যাস ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা বা ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া—গীতার মতে ইহাই হইতেছে প্রকৃত যোগ। সাংখ্যও এক প্রকারের যোগ—ইহা জ্ঞানের পথ ধরিয়া আরম্ভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিগত বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করে; আর কর্ম্মযোগ কর্ম্মের পথ ধরিয়া আরম্ভ করে—নিষ্কাম ভাবে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং ভগবানের সহিত যুক্ত হয় (১৩।২৪); কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুইটি পথ মিলিয়া এক হয় এবং পরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যায়, যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। যোগ প্রথমতঃ হইতেছে কর্ম্মযোগ, কিন্তু গীতা শেষে কর্ম্মশব্দকে যে উদার অর্থ দিয়াছে, তাহাতে আমাদের ভিতরের ও বাহিরের সকল প্রকার ক্রিয়াকেই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ, তাহা হইলে জ্ঞানযোগও হয় এক প্রকারের কর্ম্মযোগ। জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে সত্য দর্শন করি, জীবনে তাহার অভ্যাস করাই যোগ—আর জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে পরমতমকে জানিতে পারি, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হইতেই এই অভ্যাসের প্রেরণা আইসে। এই যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ যোগ—ইহা গীতার নিজস্ব। প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাহায্যে বা প্রতিপোষনার্থ ইহার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাতেই গীতার ব্যাখ্যায় "নানা মুনির নানা মতের" সৃষ্টি হইয়াছে।

শঙ্করের মতে প্রচলিত জ্ঞানযোগই হইতেছে গীতার শিক্ষা। কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানযোগেরঅধিকার জন্মে, জ্ঞানযোগের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়—এই জন্য গীতা এখানে বলিয়াছে যে উভয়েরই ফল এক। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা অতিশয় কষ্টকল্পনা কারণ ইহাতে বুঝায় যে কর্ম্মযোগের ফল জ্ঞান, এবং জ্ঞানযোগের ফল মোক্ষ—অতএব উভয়ের ফল বিভিন্ন দাঁড়ায়; যাহারা এইরূপ উভয়ের ফলের পার্থক্য করে, গীতা তাহাদিগকেই বালক বা অজ্ঞান বলিয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন, কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগমেব সাধয়তি জ্ঞানযোগস্বাত্মাবলোকনং সাধয়তীতি তয়োঃ ফলভেদেন পৃথকত্বং বদন্তো ন পণ্ডিতাঃ। গীতার বক্তব্য এই যে, আত্মজ্ঞানরূপ

যে-ফল তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাও লাভ করা যায়; জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ যে-কোনটি সম্যক ভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহার মধ্যে অপরটিও আসিয়া পড়ে। এই জন্যই উভয়ের ফল এক হয় এবং উভয়ে জ্ঞান ও আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের দ্বারা একই দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের দিকে লইয়া যায়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দুইটি হইতেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সাধন-প্রণালী—ইহাদের সমন্বয় হইতে পারে না, একই পুরুষের দ্বারা একই সময়ে এই দুইটি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহারা গীতা হইতেই প্রমাণ দেখাইয়া এইরূপ পার্থক্য করেন—কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিবার সময় নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী সেরূপ মনে করেন না (৫।৮,৯)। কর্ম্মযোগী নিজ কর্ম্মকে ভগবানে অর্পণ করেন (৯।২৭, ২৮), সাংখ্যযোগী মন আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করেন না (১৮।১৭)। কর্ম্মযোগী ফলকামনা ত্যাগ করিয়া সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন (৩।৩০), সাংখ্য-যোগী গুণসকল গুণসকলের উপর কর্ম্ম করিতেছে, ইহা মনে করিয়া সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তৃত্বের অভিমান-শূন্য হইয়া পরমাত্মায় সমাহিত থাকেন (৩।২৮)। কর্ম্মযোগী পরমাত্মার সহিত নিজকে ভিন্ন মনে করেন (১২।৬, ৭), সাংখ্যযোগী সর্ব্বদা অভেদ মনে করেন (১৮।২০)। এইভাবে সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ হইতেছে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ন্যায় পরস্পর হইতে পৃথক ও ভিন্ন। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা উল্লিখিতভাবে কোথাও সাংখ্যযোগী এবং কর্ম্মযোগীর পার্থক্য করে নাই, বরং যাহারা এইরূপ পার্থক্য করিয়া থাকে, গীতা এখানে স্পষ্টতঃই তাহাদিগকে বালক বা অজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ৮, ৯ শ্লোকে সাংখ্যযোগীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ১১ শ্লোকে কর্ম্মযোগীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ পার্থক্য কেবল বালকেই করিতে পারে, বস্তুতঃ এই সব শ্লোকে একই যোগীর বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অহং-ভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও জানেন যে তাঁহার মধ্যে প্রকৃতিই ঐ সকল কর্ম্ম করিতেছে—মনে মনে তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াছেন, বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ নহে—তিনি একাধারে সাংখ্যযোগী এবং কর্ম্মযোগী। কর্ম্মযোগের প্রথম অবস্থায় "আমি কর্ত্তা" এইরূপ বোধ থাকে; ক্রমে যেমন জ্ঞানের বিকাশ হয় তেমনই যোগী প্রকৃতিকে সকল কর্ম্মের কর্ত্রী বলিয়া উপলব্ধি করেন, নিজে কেবল দ্রষ্টা থাকিয়া তাঁহার মধ্যে যে-সব কর্ম্ম চলিতেছে

সে-সবই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ বলিয়া উপলব্ধি করেন। কর্ম্মযোগের শেষ পরিণতি, যখন যোগী উপলব্ধি করেন যে প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি এবং তিনি নিজে ভগবানেরই অংশ, মূল সত্তায় তিনি ভগবানের সহিত এক, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিশ্বশক্তি জগৎ মাঝে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। তখন ভগবানের প্রতি প্রেম, সর্ব্বভূতে একত্ব দৃষ্টি, সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা পূরণ—ইহাই হয় তাঁহার সমগ্র জীবন। গীতার যে কর্ম্মযোগ তাহা পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার মধ্যেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগেরও পূর্ণ পরিণতি হয়। এই জন্যই গীতা নিজ যোগ বুঝাইতে কর্ম্মযোগ শব্দ বেশী ব্যবহার করে নাই—আর কর্ম্মযোগী শব্দ কোথাও প্রয়োগ করে নাই, সাধারণভাবে যোগ এবং যোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। কর্ম্মযোগী হইলেই তাহার অহংভাব থাকিবে, পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান থাকিবে না তাহা নহে—কারণ কর্ম্মযোগীর যে বিশিষ্ট লক্ষণ নিষ্কামতা এবং সমতা তাহা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কখনই পূর্ণ হইতে পারে না, অতএব জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম পূর্ণ হয় না, জ্ঞানেই কর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মের উপদেশ দিতে পুনঃ পুনঃ অহংভাব বর্জ্জন এবং জ্ঞানেরও উপদেশ দিয়াছেন (৩।৩০, ৪।৩৫, ৪।৪৩, ১৮।১৭ ইত্যাদি)।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭

অন্বয়—হে মহাবাহো! অযোগতঃ সংন্যাসঃ তু আপ্তুম্ দুঃখং; যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।

যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে।

অনুবাদ—কিন্তু, হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাসপ্রাপ্তি কঠিন; যে-মুনি যোগ (কর্ম্মযোগ) অবলম্বন করেন, তিনি অচিরে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন।

যোগযুক্ত মুনি বিশুদ্ধচিত্ত, আত্মজয়ী, ইন্দ্রিয়জয়ী হন, তাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা হয়, তিনি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না।

ব্যাখ্যা

সংন্যাসস্তু মহাবাহো—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই শ্রেয়ঃ লাভ করা যায়; কিন্তু এই দুইটির মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ (৫।২)। কেন শ্রেষ্ঠ, এখন তাহাই বলিতেছেন।

সংসারত্যাগ করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আত্মচিন্তায়, ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট থাকিয়া পরম গতি লাভ করা যায়, এবং সংসারের দুঃখ দ্বন্দ্বে বিরক্ত হইয়া অনেকেই এইরূপ সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হন, শাস্ত্রেও এইরূপ সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, দেহধারী মানুষের পক্ষে এইরূপ কর্ম্মত্যাগ কষ্টকর, যতদিন দেহ আছে ততদিন কর্ম্ম করিতেই হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে কোন কর্ম্মই পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয় না, অথচ ইহার দ্বারাই শীঘ্র ব্রহ্ম লাভ করা যায়। অতএব বাহ্য কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগেরও পরিণতি হইতেছে সন্ন্যাস, কিন্তু তাহা বাহ্য সন্ন্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাস (৫।৩,১০)।

দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। কর্ম্মযোগের সাধনা দ্বারা যখন রাজসিক প্রবৃত্তি শান্ত হয়, রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত হয়, কেবল তখনই বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ সম্ভব, নতুবা প্রকৃতি জোর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ইহার প্রমাণ, আজকাল অনেকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াও নানারূপ জনহিতকর সমাজহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইহাতে আর সন্ন্যাসের আদর্শ বজায় থাকে না। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "সর্ব্ব-বেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ" গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

> সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।
> বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতঃ॥

—"বিষয়ের সাধন বলিয়া সমস্ত কর্ম্মেরই বিধিপূর্ব্বক যে ত্যাগ তাহাই

সন্ন্যাস ; এইরূপ সাধুগণের অভিমত।" সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,

ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
এতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥

—"আত্মধ্যান, শরীর ও মনের শুচিতা সাধন, ভিক্ষান্নভোজন এবং নির্জ্জন বাস, এই চারিটি ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে আর পঞ্চম (অতিরিক্ত) কোনও কার্য্য নাই।" অতএব যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া জনসেবাব্রত অবলম্বন করিতেছেন তাঁহারা খ্রীষ্টান মিশনারীগণের আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন, হিন্দু আদর্শ নহে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মও বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই আদর্শ পাইয়াছিল।

এইরূপ সেবাব্রতী সন্ন্যাসী সম্বন্ধে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর গীতায় বলা হইয়াছে—"অধুনা অনেকে অসময়ে সন্ন্যাস ধারণ পূর্ব্বক আবার কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে সন্ন্যাসাশ্রমের অমর্য্যাদা মাত্র হয়, এবং সন্ন্যাস গ্রহণের শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য—আত্মজ্ঞান লাভও হয় না। লোকের দেহসেবারূপ ব্রত সন্ন্যাসি-জীবনের কর্ম্ম নহে, উহা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবনের বিশেষ লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশসহ তদনুরূপ আদর্শ দ্বারা উপকারই সন্ন্যাসিগণ করিতে পারেন। সুতরাং প্রথমে সমাজে থাকিয়া সদাচার ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হয়েন, তিনিই সত্বর ব্রহ্মলাভ করেন।"

কিন্তু চিত্তশুদ্ধির পর সন্ন্যাসী হইতেই হইবে, তাহার পর ব্রহ্মলাভ হইবে, এমন কথা গীতায় নাই—ইহা গীতার সন্ন্যাসী ব্যাখ্যাকারগণের স্বকপোল-কল্পিত। কর্ম্মযোগের দ্বারা যদি চিত্তশুদ্ধি হইল, তাহা হইলে আর সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি ? গীতা সন্ন্যাসের উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছে—সংসার ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিয়া মানুষ ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্মযোগের দ্বারা পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জয় না হইলে এইরূপ সন্ন্যাস কষ্টকর হয়, নিজের প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে অনেক দুঃখ পাইতে হয়, অনেক সময় লাগে। কিন্তু কর্ম্মযোগ অনুসরণ করিলে এইরূপ দ্বন্দ্বে পতিত হইতে হয় না, শীঘ্রই চিত্ত নির্ম্মল হয়, ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত হয়, তখন আর বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই থাকে না ; প্রকৃত যে সন্ন্যাস—আভ্যন্তরীণ শান্তি, নীরবতা, নৈষ্কর্ম্মের ভাব,—তাহা সিদ্ধ হয় এবং

সহজে ও শীঘ্র ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। অতএব কোন কোন লোকের পক্ষে বাহ্য সন্ন্যাস উপযোগী হইলেও, কর্ম্মযোগই হইতেছে ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম—কর্ম্মযোগের দ্বারা শীঘ্র ব্রহ্ম লাভ করা যায়, এ-কথা শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিতে পারেন না—তাই তিনি এখানে, "ব্রহ্ম" শব্দে সন্ন্যাস বুঝিয়াছেন, কর্ম্মযোগের দ্বারা শীঘ্র সন্ন্যাস লাভ হয়, এবং সন্ন্যাসের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে সন্ন্যাস বুঝা অতিশয় কষ্টকল্পনা—আর গীতা কোথাও বাহ্য সন্ন্যাসের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। অতএব এই শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে—বাহ্য সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া কর্ম্মযোগের দ্বারাই সহজে ও শীঘ্র ব্রহ্মকে লাভ করা যায় ইহাই এখানে গীতার সুস্পষ্ট অর্থ। কর্ম্মযোগের দ্বারা কেমন করিয়া ব্রহ্ম লাভ করা যায়, গীতা পরের শ্লোকেই তাহা উল্লেখ করিয়াছে।

কর্ম্মযোগ বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন বৈদিক কর্ম্ম, বৈদিক যজ্ঞ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, সন্ন্যাসে যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু গীতা কর্ম্মকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে নাই, এবং যজ্ঞ বলিতে কেবল বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বুঝে নাই। বস্তুতঃ বৈদিক যজ্ঞ-সকল সকাম বলিয়া গীতায় স্পষ্টভাবে নিন্দিত হইয়াছে (২।৪২-৪৪)। পুত্রলাভের জন্য, স্বর্গ-লাভের জন্য বেদে যে সব কর্ম্ম বিহিত আছে, সে-সব নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইবে কেমন করিয়া? আবার পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দেশসেবা জন-সেবা প্রভৃতি কর্ম্মকেই কর্ম্মযোগ বলিয়া থাকেন, কিন্তু গীতা এ-সব কর্ম্মের উপরেও জোর দেয় নাই। বস্তুতঃ গীতা কর্ম্মের কোন বাহ্য লক্ষণ দেয় নাই, কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বাঁধিয়া দেয় নাই। সংসারে মানুষ যে-কোন কর্ম্ম করে সে-সবই কর্ম্মযোগ হইতে পারে, যদি ভিতরে ঠিক ঠিক ভাব লইয়া সেই কর্ম্ম করা যায়। লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্মই করা যাউক তাহাই কর্ম্মযোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)। যোগীরা কর্ম্ম করেন বাহিরের কোন ফললাভের আশায় নহে, পরন্তু ভিতরের শুদ্ধি ও রূপান্তরের জন্য, আত্মশুদ্ধয়ে।

আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ—এ-সবই হইতেছে দেহধারী মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এ-সব একেবারে বর্জ্জন করিবার দুষ্কর প্রয়াস না

করিয়া যুক্তভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা হইলেই অধ্যাত্ম সাধনা সহজ ও সুগম হইবে (৬।১৭)। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহা নহে (৩.৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ ॥ ১।৪

অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দুশ্চরিত্র, খল, কলহ-পরায়ণ ব্যক্তি দেখা যায়। অতএব আত্মশুদ্ধির জন্য যখন আগে কর্ম্মযোগ প্রয়োজন এবং কর্ম্মযোগের দ্বারাই যখন শীঘ্র ব্রহ্মলাভ করা যায়, তখন বাহ্য সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রকৃষ্টতর পন্থা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মলাভের জন্য সন্ন্যাস চাই-ই, গীতা কেবল কলির দুর্ব্বলচিত্ত মানবের জন্যই প্রথমে কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা দিয়াছে। কিন্তু এরূপ মত যে ভ্রান্ত, গীতায় এখানে "মুনি" শব্দের ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত হয়। মুনি শব্দের অর্থ মননশীল জ্ঞানী পুরুষ। স্মৃতিতে আছে, "স হি লোকে মুনির্নাম যঃ কামক্রোধবর্জ্জিতঃ।" অতএব, কর্ম্মযোগ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক সাধনা নহে, জ্ঞানী, সংযমী ব্যক্তিদেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা। দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সকাম কর্ম্মের ব্যবস্থা (৩।২৬)।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা—ফলের কামনা লইয়া কর্ম্ম করাই হইতেছে আমাদের স্বভাব। যখন আমরা এই কামনা বর্জ্জন করিয়া ফলাফলে বিচলিত না হইয়া কর্ত্তব্য হিসাবে কর্ম্ম করি, তখনই আমাদের প্রকৃতির শুদ্ধি ও রূপান্তর আরম্ভ হয়। বাসনা কামনাই হইতেছে আমাদের প্রকৃতির মূল অশুদ্ধি, ইহা হইতেই অন্য সকল প্রকার মলিনতা ও গ্লানির উদ্ভব হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসের দ্বারা আমাদের প্রকৃতি ক্রমশঃ বাসনাশূন্য হয়, আমরা বিশুদ্ধাত্মা হই। বাসনা বর্জ্জন করিলে আমরা আর অবশভাবে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হই না, প্রকৃতি আমাদের বশ হয়, আমরা হই বিজিতাত্মা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণও বশ হয়, আমরা জিতেন্দ্রিয় হই। এই ভাবে মন, প্রাণ, চিত্তের সমস্ত মলিনতা ও বিক্ষোভ দূর হইলে আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে, সর্ব্বভূতের যাহা এক আত্মা, আমরা তাহার দর্শন লাভ করি, তাহাই হইয়া উঠি। ঐ আত্মাই ব্রহ্ম, এইভাবে আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি, ব্রহ্ম হই, ব্রহ্মভূতঃ। আমরা দেখি যে, সর্ব্বভূত হইতেছে এই স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তারই এক একটি রূপ, প্রকটন। আমরা দেখি যে আমাদের কর্ম্ম বাস্তবিক পক্ষে

আমাদের নহে, তাহা প্রকৃতির কর্ম্ম এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা মুক্ত হই। আমরা বুঝি সর্ব্বভূতের কর্ম্ম এক বিশ্বপ্রকৃতিরই কর্ম্ম, আমাদের কর্ম্মও সেই বিশ্বকর্ম্মধারারই একটি অংশ।

"এই আত্মাই হইতেছে আমাদের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা। ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্ব্বভূতের মধ্যে এক, সর্ব্বব্যাপী, সকল বস্তুর প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তার দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ইহা কোন সসীম বস্তুর দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নহে, প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন-সকলের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। যখন এই আত্মা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, যখন আমরা ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব করি, তখন আমরা এই আত্মা হইয়া উঠিতে পারি। আমরা আমাদের অন্তঃপুরুষকে প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিম্নতন নিমজ্জিত অবস্থা হইতে উত্তোলিত করিয়া আত্মার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমরা ইহা করিতে পারি আমরা যে-সকল জিনিষ লাভ করিয়াছি—শান্তি, সমতা, বিক্ষোভহীন নির্ব্যক্তিকতা—এই সকলের শক্তি দ্বারা। কারণ যতই আমরা এই সকল জিনিষে বর্দ্ধিত হই, ইহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলি, আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে ইহাদের অধীন করিয়া দিই, ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নির্ব্যক্তিক, সর্ব্বব্যাপী আত্মা হইয়া উঠি। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ঐ স্থির নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং আমাদের উপর বাহ্যজগতের স্পর্শসকলকে পরম শান্তির সহিত গ্রহণ করে। আমাদের মন নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং শান্ত, বিশ্বমুখীন সাক্ষী হইয়া উঠে। আমাদের অহং এই নির্ব্যক্তিক সত্তায় লয় হইয়া যায়। আমরা নিজ সত্তায় যে আত্মা হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যেই আমরা সকল বস্তুকে দেখি, এবং সকল বস্তুর মধ্যে আমরা এই আত্মাকে দেখি, আমরা মূল অধ্যাত্ম সত্তায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হইয়া উঠি, সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা। এই অহংভাবশূন্য শান্তি ও নির্ব্যক্তিকতায় কর্ম্ম করিয়া আমাদের কর্ম্ম আর আমাদের থাকে না, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আর আমাদিগকে বদ্ধ করে না, বিক্ষুব্ধ করে না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। প্রকৃতি এবং তাহার গুণসমূহ তাহার কর্ম্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখলেশশূন্য স্ব-প্রতিষ্ঠ শান্তির কোন হানি করে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্ব্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।" —শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ [পুরুষঃ] পশ্যন্, শৃণ্বন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্ণন্, উন্মিষন্ নিমিষন্, অপি, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ "[অহং] কিঞ্চিৎ এব ন করোমি" ইতি মন্যেত।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞ যোগীপুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ করিয়াও মনে করেন— "আমি কিছুই করিতেছি না"; তিনি ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গণই ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহের উপর ক্রিয়া করিতেছে।

ব্যাখ্যা

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি—কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ করিয়া জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা করিলে পাপ হইবে। অর্জ্জুনের এই মতকে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায়; এমন কি সকল অবস্থাতেই হিংসা, নরহত্যা, রক্তপাত পাপ—এইরূপ নীতি ও আদর্শ যদি কেহ অনুসরণ করেন তাহাকে সমুন্নত চরিত্রের লোক বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী এই আদর্শের প্রচার করিয়া জগৎবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। অন্য পক্ষে এইরূপ তর্ক করা যাইতে পারে যে, অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ না করাই পাপ, তাহাতে অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং অত্যাচারী জয়লাভ করিলে লোককে যে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় সে-সবের জন্য দায়ী হইতে হয়। বস্তুতঃ তর্কের দ্বারা এই কর্ম্মসমস্যার চরম মীমাংসা হয় না—এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, গীতা সে বিচারে প্রবৃত্ত হয় নাই। গীতা অহিংসারও প্রশংসা করিয়াছে, আবার অর্জ্জুনকে ভীষণ রক্তপাত করিতেও প্রবৃত্তি দিয়াছে। গীতার সমাধান হইতেছে এই যে, মানুষ সাধারণতঃ অজ্ঞানের

বশে, যুক্তি তর্কের অস্পষ্ট আলোকে যে ভাবে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিচার করে, তাহা না করিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে-কোন কর্ম্মই করা যাউক না কেন, তাহাতে কোন পাপ বা বন্ধন হইবে না। যিনি জ্ঞানী, তাঁহার অহংভাব নাই, তাঁহার অন্তরে কাহারও প্রতি হিংসা বা দ্বেষের ভাব নাই, তাই তিনি জগতে ভগবদিচ্ছা পূরণের জন্য হত্যাকাণ্ড করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার হিংসা করা হয় না, তাঁহার কোন পাপই হয় না,

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

এই জন্যই গীতা কর্ম্মসমস্যার মীমাংসা করিতে প্রথমেই আত্ম-জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে।

নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য, ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য কর্ম্ম না করিয়া, সমাজের, দেশের, মানবজাতির জন্য কর্ম্ম করাই বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ ইহা খুবই উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই, এবং মানুষকে এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু গীতা যে-দিব্য কর্ম্মের আদর্শ দিয়াছে, তাহা এইরূপ জনহিত-সাধক আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর। কারণ আমরা পরের সেবা, দেশের সেবার জন্য যে কর্ম্ম করি, তাহাতে অহংভাব থাকিতে পারে—এবং যেখানে অহংভাব সেইখানেই অজ্ঞান ও দ্বন্দ্ব এবং তাহার ফল দুঃখ। আজ জগতে সভ্যতার দোহাই দিয়া যে-সব অত্যাচার সাধিত হইতেছে—তাহা হইতেই গীতার কথার সার্থকতা প্রমাণিত হয়। নিজের জন্য যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা দেশের জন্য, সমাজের জন্য কর্ম্ম করে, তাহাদের অহংভাব অনেক সময় প্রবলতর, তীব্রতর হয় এবং তাহার ফল বিষময় হয়। এইজন্যই গীতা ঐরূপ কর্ম্মের উপর জোর না দিয়া যাহাতে সকল কর্ম্মই নিষ্কামভাবে, নিরহঙ্কার ভাবে করিতে পারা যায়, আগে তাহাই অভ্যাস করিতে বলিয়াছে। গীতার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমালোচনা করিয়া থাকেন যে, গীতা যথেষ্টভাবে নৈতিক শিক্ষা দেয় নাই। বস্তুতঃ গীতা নীতিশাস্ত্র নহে, গীতা অধ্যাত্ম শাস্ত্র। গীতায় নীতিশিক্ষা আছে, তাহা খুবই উদার ও মহৎ—কিন্তু সেইটিই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নহে। গীতার শিক্ষা হইতেছে

সকল নৈতিকতা, সকল ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উঠিয়া অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সেই চৈতন্য হইতে দিব্য ভাবে দিব্য কর্ম্ম করা। দিব্য কর্ম্ম কি, গীতা তাহার কোন বাহ্য নীতি দেয় নাই, কেবল দিব্য কর্ম্মীর আভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলিই পরিস্ফুট করিয়াছে। জ্ঞান, নিষ্কামতা, সমতা, নির্ব্যক্তিকতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ—এই সব হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর লক্ষণ। দিব্য কর্ম্মীর আর একটি মহান লক্ষণ হইতেছে ত্রৈগুণাতীত্য—গীতা এই দুইটি শ্লোকে সেই লক্ষণটিই পরিস্ফুট করিয়াছে।

যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ—প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মা অকর্ত্তা,—এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই তত্ত্ববিৎ। জ্ঞান তাঁহার মধ্যে তাঁহার প্রকৃত আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেয় (৫।১৬); তিনি নিজেকে প্রকৃতির গুণসকলের, যন্ত্রসকলের উর্দ্ধে অবস্থিত পুরুষ বলিয়া জানিতে পারেন। সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্যক্তিক আত্মা—তাহার সহিত যোগে যুক্ত হইয়া, তাহার সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রকৃতির সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন, প্রকৃতির কর্ম্মে তাঁহার শুদ্ধ, অনন্ত, অক্ষর আত্মার কোন বিকার বা পরিবর্ত্তনই হয় না। অথচ এই মুক্তি তাঁহাকে কর্ম্মে বিরত করে না, কেবল তিনি জানেন যে তিনি কর্ম্ম করিতেছেন না, পরন্তু প্রকৃতির গুণত্রয়ই কর্ম্ম করিতেছে। শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি এইরূপ তত্ত্ববিৎ হইবেন, তিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে-ব্যক্তি মরীচিকায় জল পাইবার আশায় ছুটিয়াছে, সে যখন জানিতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নাই, তখন আর তাহার সে-দিকে ধাবিত হওয়া সম্ভব হয় না।" তেমনিই যে-ব্যক্তি দেখেন যে প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, তখন আর কেন তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন? কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা গীতার সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধ, কারণ গীতা কোথাও বলে নাই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে অগ্রসর হইবেন। এই শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে, তিনি দর্শনাদি সকল কর্ম্মই করেন, কেবল তিনি জানেন যে এ-সব কর্ম্ম তাঁহার আত্মার নহে, প্রকৃতির এবং এই জ্ঞানের জন্যই তিনি সকল বন্ধনের অতীত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সকল কর্ম্মকে মরীচিকায় জলের ন্যায় মিথ্যা, ভ্রান্তি বা মায়া বলিয়া দেখেন না—তিনি দেখেন যে কর্ম্ম বাস্তবিকই চলিতেছে, তবে সে-কর্ম্ম আত্মার নহে, প্রকৃতির। মরীচিকাতে যে

জল দেখা যায় তাহাও একেবারে ভ্রান্তি নহে, কেবল মরুভূমিতে যেখানে বস্তুতঃ জল থাকে, উত্তপ্ত বায়ুর refraction ক্রিয়ার জন্য সেখানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্যস্থানে সে জল রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়—এইটিই মরীচিকার ভ্রম। তেমনিই অহংভাবের বশে আমরা যে মনে করি আমরাই কর্ম্ম করিতেছি—এইটিই ভ্রম, মিথ্যা, মায়া। জ্ঞানের দ্বারা এই ভ্রম দূর হইয়া যায়, তখনও কর্ম্ম চলিতে থাকে, কিন্তু সে কর্ম্ম আর আমাদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া বা বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু—দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি হইতেছে চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। গমন ইত্যাদি হইতেছে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। শ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ—ইহা প্রাণাদির কর্ম্ম এবং স্বপ্ন অন্তঃকরণের কর্ম্ম। সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্মই লক্ষ্য করা হইতেছে। এই সকল কর্ম্ম করিলেও অনভিমানবশতঃ অর্থাৎ উক্ত কর্ম্ম-সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, "আমি আত্মস্বরূপ, সকলের দ্রষ্টা, আমি কখনও কোন কর্ম্ম করি না"—এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য বলিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে, গুণসকল গুণসকলের উপর ক্রিয়া করে; ত্রয়োদশ অধ্যায় ২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রকৃতিই সমুদয় কর্ম্ম করে, আর এখানে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়ের উপর ক্রিয়া করে। এ-সবের দ্বারা একই কথা বুঝাইতেছে, কারণ ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া সত্ত্বাদি গুণেরই ক্রিয়া, আর তিনগুণ প্রকৃতিরই তিনটি শক্তি।

কিন্তু প্রকৃতিই যদি সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা কর্ম্ম করে, আত্মা কেবল সাক্ষী, তাহা হইলে মানুষের দায়িত্ব কোথায়? পাপ পুণ্য সে-সব ত গুণত্রয়েরই ক্রিয়া—সে-সব ত আত্মাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। বস্তুতঃ যতক্ষণ অহংবোধ আছে, ততক্ষণই পাপপুণ্যের ফলভোগী হইতে হয়—অহংভাব হইতে মুক্ত হইলে মানুষ পাপপুণ্যের উর্দ্ধে ওঠে, তাহার মধ্যে প্রকৃতি যে-কোন কর্ম্মই করুক না, তাহাতে তাহার আর কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইল কেন? প্রকৃতি তমোগুণের বশে যুদ্ধ হইতে বিরতই হউক, অথবা রজোগুণের বশে যুদ্ধে প্রবৃত্তই হউক,—তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির কি আইসে যায়? বস্তুতঃ পুরুষ কেবল সাক্ষী এবং প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, এই সাংখ্য জ্ঞানেই যদি গীতা থামিয়া যাইত তাহা হইলে

অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলার কোন সার্থকতাই থাকিত না। আমরা সাধারণ জীবনে যে অহংভাব লইয়া কর্ম্ম করি, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই গীতা সাক্ষী, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্যক্তিক আত্মার সহিত যুক্ত হইতে বলিয়াছে। কিন্তু ঐ আত্মাই চরম তত্ত্ব নহে, আর প্রকৃতিও অন্ধভাবে কাজ করে না। চরম তত্ত্ব হইতেছে পুরুষোত্তম—প্রকৃতি তাঁহারই কার্য্যকরী শক্তি, জগতে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে, গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতেছে প্রকৃতির কেবল নিম্নতন যন্ত্রবৎ ক্রিয়া। যিনি পূর্ব্ব হইতেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে মারিয়া রাখিয়াছেন, সেই বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত পরম পুরুষই হইতেছেন প্রকৃতির সকল কর্ম্মের প্রভু, অধীশ্বর। নির্ব্যক্তিক সর্ব্বব্যাপী আত্মায় অহংভাবের লয় করিয়া আমাদিগকে সেই পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইতে হইবে, তখন আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমেরই ইচ্ছা অবাধে কর্ম্ম করিবে,আমরা জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হইব ; অর্জ্জুনকে তাহাই হইতে বলা হইয়াছে—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

অন্বয়—যঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণি কর্ম্মাণি আধায় করোতি সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে।

যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিং আপ্নোতি, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে।

অনুবাদ—যিনি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া তাঁহার কর্ম্ম-সকল ব্রহ্মে স্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তিনি পাপের দ্বারা কলঙ্কিত হন না, যেমন জল পদ্ম-পত্রে লিপ্ত হয় না।

[অতএব] যোগিগণ আসক্তি বর্জ্জন করিয়া আত্ম-শুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

যোগী কর্ম্মফলে আসক্তি বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ শান্তি লাভ করেন, কিন্তু যোগহীন ব্যক্তি ফলে আসক্ত হয় এবং বাসনার ক্রিয়ায় বদ্ধ হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি—বাহ্যতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে স্থাপনপূর্ব্বক করিতে হইবে, তাহা হইলে আর কর্ম্মের জন্য কোন পাপই হইবে না। প্রথমে সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করিতে হইবে। নিজের কোন ব্যক্তিগত ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া এই কর্ম্ম ভগবানের অভিপ্রেত, এই কর্ম্মের দ্বারাই আমি ভগবানের সেবা করিতেছি এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ক্রমে উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্ম—কিন্তু প্রকৃতিও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহে, তাহা ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতির সকল কর্ম্মই ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইতেছে, ব্রহ্মের দ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা ব্রহ্মের স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দের কোন হানিই করে না। আরও উপলব্ধি হয় যে, আমাদের যে মূল সত্তা, আত্মা, তাহা ব্রহ্মের সহিত এক, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আমরা যখন এইভাবে আমাদের সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মের মধ্যে দেখিতে পাই, তখনই হয় প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস,—ব্রহ্মের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে সকল কর্ম্মের স্থাপন, ময়ি সংন্যস্য। এইভাবে যে সমতা, নির্ব্যক্তিকতা, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি লাভ করা যায়, বাহ্যতঃ কর্ম্ম করা না করার উপর তাহা আদৌ নির্ভর করে না। গীতা পুনঃ পুনঃ এই আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের উপর জোর দিয়াছে।

শঙ্কর বলিয়াছেন, যাহারা অজ্ঞানী অতত্ত্ববিৎ, তাহারাই ব্রহ্মে কর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্ম করে জ্ঞানীরা নহে। কিন্তু গীতা এই শ্লোকেই বলিয়াছে যে, যাহারা এই ভাবে কর্ম্ম করে তাহাদের পাপ হয় না, একথা জ্ঞানীর পক্ষেই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া অজ্ঞানীর পক্ষে ব্রহ্মে কর্ম্ম স্থাপন সম্ভব নহে; যে ব্রহ্মকে জানিল না, সে ব্রহ্মে কর্ম্ম স্থাপন করিবে কিরূপে? গীতা পূর্ব্ব শ্লোকেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কথা বলিয়া এই শ্লোকে অতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কথা বলিতেছে,

ইহা কষ্টকল্পনা। বস্তুতঃ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি যে-কর্ম্ম করেন, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠাটি কি হয় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ—আমি আমার কোন ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য এই কর্ম্ম করিতেছি—এইরূপ ধারণা লইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মে আসক্তি জন্মে এবং এই আসক্তিই সকল পাপের মূল। যিনি বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, কর্ম্ম তাঁহার নহে, প্রকৃতির, তিনি আসক্তি ও অহংভাব হইতে মুক্ত হন এবং সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে স্থাপন করিয়া করিতে পারেন, তাই আর কোন কর্ম্মেই পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সঙ্গং ত্যক্ত্বা, অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন "কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া"; কিন্তু শুধু কর্ম্ম-ফলে নহে, কর্ম্মেও আসক্তি থাকে এবং তাহাও বর্জ্জন করিতে হইবে। অনেকের কর্ম্মের একটা নেশা থাকে, কোন-না-কোন কর্ম্ম না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না—এইটি হইতেছে রজোগুণের ক্রিয়া। দিব্য কর্ম্মীকে কর্ম্মের প্রতি এই রাজসিক আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি ভিতরে আত্মায় যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবেন, বাহিরে কর্ম্ম করা না করায় তাহা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

লিপ্যতে ন স পাপেন—আত্মজ্ঞান লইয়া অহংভাব ও আসক্তি বর্জ্জন করিয়া যে-কর্ম্ম করা যায় তাহাতে পাপ হয় না। ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ—তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ৪।১।১৩ "সেই ব্রহ্মকে জানিলে জ্ঞানোৎপত্তির পর যে-পাপ তাহা ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না, আর জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যে পাপ তাহা জ্ঞানোৎপত্তি মাত্রই বিনষ্ট হয়।" কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ত পাপ করেনই না, তাহা হইলে পাপ আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না এ-কথার অর্থ কি? যে-কোন কর্ম্মই করা যাক না কেন, তাহাতেই দোষ হয়, পাপ হয়, কর্ম্মমাত্রই দোষ সংযুক্ত—এই জন্য অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সকল কর্ম্মই পরিত্যাজ্য, সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ (১৮।৪৮), ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিনঃ (১৮।৩)। কিন্তু সকল কর্ম্মের সহিতই পাপ যুক্ত রহিয়াছে, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে—গীতা এই মতেরই প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করিলেও তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না এবং পদ্ম-পত্র ও জলের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ সংসারের কোন বস্তু বা কোন কর্ম্মই পাপ

নহে। আমাদের অহংভাব ও আসক্তি থাকার জন্যেই এ-সকল আমাদের পক্ষে বন্ধন সৃষ্টি করে, তাই ইহারা পাপ হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞান দূর হইলে সংসারের সকল পাপও লুপ্ত হইয়া যায়—তখন আর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার কোন সার্থকতাই থাকে না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা—সেইজন্য যোগিগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; কায়, মন, বুদ্ধি দিয়া সংসারের সকল কর্ম্মই তাঁহারা করেন—কিন্তু আসক্তি বর্জ্জন করিয়া সে-সব কর্ম্ম করেন, এইভাবে কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহারা আত্মশুদ্ধি লাভ করেন। ভিতরে তাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহারা কর্ম্ম করেন, কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। অনেকে এখানে "কেবল" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "মমতাশূন্য", আমি ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করিতেছি, নিজের ফলের জন্য নহে, এই ভাব লইয়া কর্ম্ম করা। শঙ্কর বলিয়াছেন, 'কেবল' শব্দ শুধু ইন্দ্রিয়ের বিশেষণ নহে,কায়, মন, বুদ্ধি প্রত্যেকেরই বিশেষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু এখানে 'কেবল' শব্দ বহুবচন এবং ইহার সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ শুধু ইন্দ্রিয়গণেরই সহিত। চতুর্থ অধ্যায় ২১ শ্লোকে 'শারীরং কেবলং কর্ম্ম' বলিতে যাহা বুঝাইয়াছে, এখানেও তাহাই বুঝাইতেছে। আমরা সাধারণতঃ যে-সব কর্ম্ম করি, তাহার পিছনে থাকে মন, বুদ্ধির ক্রিয়া। আমরা পাপ পুণ্য, শুভ অশুভ, লাভ অলাভ বিচার করি—এবং এই জন্যই আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমাদের অন্তরে বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যোগীর লক্ষ্য হইতেছে এমনভাবে কর্ম্ম করা যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মন বুদ্ধির কোন ক্রিয়াই থাকিবে না। তিনি শুধু সাক্ষীভাবে দর্শন করিবেন কেমন করিয়া এক উর্দ্ধের শক্তি তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া জগতে ভগবদ্ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—এই শ্লোকগুলিতে 'যোগী' ও 'যুক্ত' শব্দের দ্বারা অনেকেই কেবল কর্ম্মযোগী বুঝিয়াছেন। কিন্তু গীতায় কোথাও 'কর্ম্মযোগী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। গীতার যিনি যোগী তিনি একাধারেই কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিযোগী; সেই জন্যই গীতা সাধারণভাবে 'যোগী' এবং 'যুক্ত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। ভগবানের সহিত যোগই সাধনার লক্ষ্য, কেহ কর্ম্মের ভিতর দিয়া, কেহ জ্ঞানের ভিতর দিয়া, কেহ ভক্তির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে পারেন; কোন অবস্থায় কর্ম্মের উপর, কোন অবস্থায় জ্ঞানের

উপর, কোন অবস্থায় ভক্তির উপরে জোর দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইবে—ইহাই পূর্ণযোগ, এবং ইহাই গীতার শিক্ষা। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই গীতা প্রথম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছে, বলিয়াছে যে, যাহারা সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ পৃথক বলিয়া দেখে তাহারা বালক বা অজ্ঞান। অতএব পদে পদে কর্ম্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী এইরূপ প্রভেদ করিতে থাকিলে গীতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়। গীতায় 'কর্ম্মযোগ' শব্দ মোট চার বার,'জ্ঞানযোগ' দুইবার এবং 'ভক্তিযোগ' শব্দ মাত্র একবারই ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতা নিজস্ব পূর্ণযোগ বুঝাইতে সাধারণতঃ যোগ, যোগী, যুক্ত এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করিয়াছে।

এখানে গীতা বলিতেছে যে, যোগী প্রথম আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপরেই জোর দেন। তবে তিনি এমনভাবে কর্ম্ম করেন যে তিনি কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী, কারণ ব্রহ্মে কর্ম্মস্থাপন করিয়া, আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি কর্ম্ম করেন এবং ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। মধ্বাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, সংন্যাসযোগযুক্ত এব চ কর্ম্মণা ন লিপ্যতে।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা—গীতা এখানে "যুক্ত" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত যোগই বুঝিয়াছে—ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। গীতার পরবর্ত্তী অংশ হইতে বুঝা যায় যে, গীতার মতে এই ব্রহ্ম হইতেছে অক্ষর পুরুষ ; আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধির উর্দ্ধে আমরা যে অচল, অটল, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, কূটস্থ অধ্যাত্ম-সত্তার সন্ধান পাই তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অক্ষর—তাহার মধ্যেই আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের লয় করিতে হইবে, তাহাতেই আমাদের সকল কর্ম্ম স্থাপন করিতে হইবে। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ ক্ষতিতে সমভাব অভ্যাস করিয়াই আমরা ক্রমশঃ এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আত্যন্তিক শান্তি লাভ করি—কারণ এই ব্রহ্মই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্ম শান্তির প্রতিষ্ঠাভূমি, শান্তিম্ নৈষ্ঠিকীম্।

কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে হইবে, ইহার অর্থ নহে যে আমাদের কর্ম্মের যে ফল হইবে তাহা আমরা গ্রহণ করিব না, অর্জ্জুনকে ভগবান যুদ্ধ জয় করিয়া তাহার ফলস্বরূপ সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতেই বলিয়াছেন। ফল ত্যাগের প্রকৃত অর্থ হইতেছে ফলে আসক্তি ত্যাগ। অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে হইবে

রাজ্যভোগের জন্য নহে, পরন্তু ঐ যুদ্ধ তাঁহার প্রতি ভগবানের আদেশ বলিয়া —আর যুদ্ধের ফল রাজ্যও তিনি ভোগ করিবেন ভগবানের দান বলিয়া। এইরূপে অহংভাব-শূন্য হইয়া ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া তাঁহারাই কর্ম্ম করিতে পারেন যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকল কর্ম্ম করিয়াও কখনও আসক্তি ও কামনায় জড়িত হইয়া পড়েন না—এবং সকল অশান্তির মূল বাসনা দূর হওয়ায় তাঁহারা পরম শান্তি লাভ করেন। অন্য পক্ষে যাহারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত নহে, তাহারা ফলে আসক্ত হয় এবং বাসনায় বদ্ধ হয়। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা, আত্মশুদ্ধি ও শান্তি—এই তিনটি লাভ করিয়া সকল কর্ম্ম করাই গীতার আদর্শ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

অন্বয়—বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য নবদ্বারে পুরে ন এব কুর্ব্বন্ ন এব কারয়ন্ সুখং আস্তে।

অনুবাদ—দেহধারী জীব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া, মনের দ্বারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বারযুক্ত দেহে কিছুই না করিয়া এবং কিছু না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা—আসক্তি ও অহংভাব বর্জ্জন করিয়া আত্মায় ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া সমতা ও শান্তির সহিত কর্ম্ম করা অভ্যাস করিতে হইবে। একবার এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ও শান্তি লব্ধ হইলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সকল কর্ম্ম মনের দ্বারা সংন্যাস করিয়া এই দেহেই সুখে বাস করেন। বাহ্যতঃ তাঁহাকে কোন কর্ম্মই ত্যাগ করিতে হয় না; দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের সকল কর্ম্মই চলিতে থাকে, তিনি কেবল জানেন যে সে-সব কর্ম্ম আত্মার নহে, প্রকৃতির— এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি প্রকৃতির সকল বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া হইতে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। "মনসা" শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে

যে, বাহ্যতঃ তিনি কোন কর্ম্ম ত্যাগ করেন না। কিন্তু শঙ্কর বাহ্যত্যাগের উপরেই এখানে জোর দিয়াছেন। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই শ্রেয়ঃ—পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছিল, এখন বলা হইতেছে যে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের সম্যকরূপে ত্যাগই প্রশস্ত। "মনসা" অর্থাৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, সেই অকর্ত্তা আত্মার স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সংন্যস্য, সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অবস্থান করেন—ইহাই শঙ্করের ব্যাখ্যা। কর্ম্মযোগী আত্মা অকর্ত্তা এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে যে বাহ্যতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না, মনের দ্বারাই করিতে হয়—তাহা বুঝাইবার জন্যই গীতা এখানে "মনসা সংন্যস্য" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। মনের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া সকল কর্ম্ম বাহ্যতঃ পরিত্যাগ—শঙ্করের এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা। এই অধ্যায়ের প্রথমেই গীতা কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা যে কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে (৫।১,২), এই শ্লোক-গুলিতে সেই কর্ম্মযোগেরই স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। কর্ম্মযোগের মধ্যে আছে আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম-সন্ন্যাস, ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, ইহা বাহ্য কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই গীতা এখানে বলিতেছে যে, আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে, যাহা আমাদেরই শ্রেষ্ঠ সত্তা, তাহা প্রকৃতির সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ঊর্দ্ধে—তাহা কিছু করেও না, করায়ও না, তাহা প্রকৃতির কর্ম্মের সাক্ষী; আমাদিগকে ভিতরে এই আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সাক্ষীভাবে অবস্থান করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, অথচ এই মুক্তিতে আমাদের বাহ্যতঃ কর্ম্ম করার কোন বাধাই হইবে না। গীতা ইতিপূর্ব্বে এই অধ্যায়ে ৭, ৮, ৯ শ্লোকে তাহাই বলিয়াছে।

সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী—এইরূপ মুক্ত পুরুষ এই দেহের মধ্যে সুখে বাস করেন। শঙ্কব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি সুখে অর্থাৎ অনায়াসে (বিনা ক্লেশে) অবস্থান করেন; কারণ আয়াসের হেতু যে কায়, বাক্ এবং মনের ব্যাপার তাহা তাঁহাতে নাই; কায়, বাক্ ও মনের ক্রিয়ার জন্যই ক্লেশ হইয়া থাকে; তাঁহার ঐগুলির কোনটিরই ব্যাপার না থাকায় তিনি সুখে অবস্থিতি করেন। কিন্তু যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ এই ভাবে সকল কর্ম্ম

বদ্ধ হইতে পারে না, একথা গীতা অন্যত্র জোরের সহিতই বলিয়াছে। এমন কি এই শ্লোকেই বলা হইয়াছে, "মনসা সংন্যস্য", অতএব মুক্ত জ্ঞানী পুরুষেরও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে—তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া "অনায়াসে" বা সুখে থাকেন? বস্তুতঃ সকলের নিকটেই কর্ম্ম অসুখের কারণ নহে, কেবল তামসিক ব্যক্তিরাই দেহ, মন, বাক্যের কর্ম্মকে দুঃখকর বলিয়া মনে করে; রাজসিক ব্যক্তি এই সব কর্ম্ম ও আয়াসের মধ্যেই তীব্র সুখ উপলব্ধি করে। কিন্তু মুক্ত কর্ম্মযোগীর যে সুখ, তাহা এই রাজসিক সুখ নহে, অথবা সকল আয়াসের অভাবরূপ তামসিক সুখও নহে—তাহা হইতেছে আত্মার চৈতন্যের অন্তর্নিহিত আনন্দ, এই আনন্দই আত্মার সত্তা, আত্মা সচ্চিদানন্দ। এই আনন্দ বাহিরের কোন কর্ম্ম করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া আত্মার চৈতন্যে বাস করিয়াই এই দিব্য আনন্দের চির অধিকারী হওয়া যায়, এই আত্মানন্দ হইতেছে দিব্যকর্ম্মী কর্ম্মযোগীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। এই অধ্যাত্ম আনন্দের অধিকারী হইতে হইলে আমাদিগকে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয় করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে, প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিতে হইবে।

নবদ্বারে পুরে দেহী—"দেহে বিদ্যমান থাকেন" এইভাবে বিশেষ করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন? সন্ন্যাসী অসন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকল দেহীইত দেহে অবস্থান করেন! এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি অজ্ঞ অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বলিয়া যাহার ধারণা, সাধারণতঃ সে বিবেচনা করিয়া থাকে যে, আমি ভূমিতে বা আসনে আছি। যাহার দেহেতে আত্মত্ব জ্ঞান আছে, সে যেমন গৃহে আছি ইহা ভাবিয়া থাকে, সেইরূপ আমি দেহে আছি এই প্রকার ভাবিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারই "আমি দেহেতে আছি" এই প্রকার প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করের মতে জ্ঞানী ব্যক্তি এই দেহকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উপলব্ধি করিবেন—বস্তুতঃ দেহের কোন অস্তিত্বই নাই, উহা ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় আত্মায় দেহের ভ্রম হয়—ইহাই শঙ্করের মায়াবাদ। তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি "আমি দেহেতে আছি" ইহা কেমন করিয়া বোধ করিবেন? তাঁহার উপলব্ধি হইবে যে, দেহ বলিয়া কিছুরই

অস্তিত্ব নাই, একমাত্র আত্মাই রহিয়াছে। কিন্তু গীতা এখানে স্পষ্টই বলিতেছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি দেহে বাস করেন। অতএব শঙ্করের মায়াবাদের সহিত গীতার সামঞ্জস্য হয় না, অথচ শঙ্কর এই মায়াবাদের অনুসরণ করিয়াই সমগ্র গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। যেখানে মায়াবাদের সহিত গীতার সামঞ্জস্য হয় না, সেখানে তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন, অথবা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আত্মা কর্ম্ম করে এইটিই অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া—জ্ঞানের দ্বারা এই মায়া দূরীভূত হয়, তখন জীব এই শরীরেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখে বাস করে। "দেহী" কথাটির দ্বারাই বুঝায় যে, এই দেহ হইতেছে আত্মার আধার, আবাসস্থল—ইহা মিথ্যা বা মায়া নহে, ইহা আত্মারই আত্ম-প্রকাশের যন্ত্র, এই দেহকে ধরিয়াই ভগবান বহুরূপে নিজেই নিজকে আস্বাদন করেন। সেই জন্যই গীতা এখানে দেহের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছে—"নবদ্বারে পুরে"—দুইটি কর্ণ, দুইটি চক্ষু, দুইটি নাসিকা এবং একটি বাগিন্দ্রিয় (মুখ) এইরূপে মস্তকে সাতটি এবং নিম্নভাগে পায়ু ও উপস্থ এই মোট নয়টি দ্বার-বিশিষ্ট শরীরকে পুর বলা হইয়াছে, কারণ ইহা পুরের ন্যায় একমাত্র প্রভুস্থানীয় আত্মার ভোগের সাধন।

অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনায় দেহকে আত্মার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হয়, দেহ আত্মার কারাগার স্বরূপ, বন্ধন স্বরূপ, এই দেহের জন্যই আত্মাকে জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই দেহের বন্ধন হইতে চির মুক্তি পাওয়াই জীবের প্রকৃত মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স্। দেহাতীত আত্মার জ্ঞান হইতেই জীব মুক্তি লাভ করে, তাহার পরও প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে যত দিন দেহ থাকে, ততদিন জীবকে এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন দেহের মধ্যেই থাকিতে হয়, কর্ম্মক্ষয়ে দেহের পতন হইলে জীব পূর্ণ মুক্তি লাভ করে এবং তাহাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "প্রবাসী ব্যক্তি যেমন পরের গৃহে থাকিয়া সেই গৃহস্বামী যদি পূজিত হয় তাহা হইলে হৃষ্ট হয় না, আবার সে যদি পরাভূত হয় তাহা হইলেও বিষণ্ণ হয় না, সেইরূপ হৃষ্ট অথবা বিষণ্ণ না হইয়া এই দেহের উপর অহঙ্কার মমকার বিহীন হইয়া অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি অবস্থান করেন।" কিন্তু আত্মার সহিত দেহের যে এইরূপ বিরোধ বা

শক্রতা আছে—ইহার কোনরূপ আভাস গীতার মধ্যে আমরা কোথাও পাই না। "দেহী" শব্দের ব্যবহার হইতেই বুঝায় যে, আত্মারই দেহ, আত্মাই এই দেহ গ্রহণ করিয়াছে, ধারণ করিয়াছে, ইহা প্রবাসী ব্যক্তির পরগৃহের ন্যায় নহে, আত্মার নিজেরই গৃহ, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে, ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, ভগবান এই মানব তনুকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন (৯।১১), যাহারা দেহকে পীড়া দেয় তাহারা দেহের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকেই পীড়া দেয় (১৬।১৮), (১৭।৬)। আর এই যে দেহের মধ্যে ভগবান বাস করেন, ইহা তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, মূলতঃ ইহা তাঁহারই সত্তায় গঠিত (১৪।৪), অতএব আত্মার সহিত দেহের মূলতঃ কোন ভেদ বা বিরোধ নাই। আত্মা চিৎ এবং দেহ জড় অচিৎ—এইরূপ ভেদ অসম্যক্ জ্ঞানের ফল, বস্তুতঃ জগতে জড় বা অচিৎ বলিয়া কিছুই নাই। একমাত্র সত্য বস্তু হইতেছেন আত্মা, ব্রহ্ম এবং তিনি সচ্চিদানন্দময়, অতএব জগতে যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, অতএব এই দেহও ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ। তবে ব্রহ্ম সব হইলেও সর্ব্বত্র তাহার প্রকাশ সমান নহে, জড়ের মধ্যে ব্রহ্ম নিজকে এমনভাবে লুকাইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেখানে আবিষ্কার করা কঠিন। এই মানব-দেহ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন, তাহার কারণ ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা নিহিত রহিয়াছে, এখনও তাহার প্রকাশ হয় নাই—সেই প্রকাশকে সিদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য দেহকেই দিব্য দেহে পরিণত করা, ইহাই মানবজন্মের প্রকৃত লক্ষ্য। তাই গীতা কোথাও বলে নাই যে, এই দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র মুক্তি বা সিদ্ধির সন্ধান করিতে হইবে। প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবেই যদি দেহ থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের পতন হইত, কারণ—গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, জ্ঞান সমস্ত কর্ম্মের বন্ধন ধ্বংস করিয়া দেয় (৪।৩৭)।

এই দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করা অজ্ঞান; দেহাতীত যে আত্মা এই দেহের প্রভু, দেহী, তাহাকে জানিতে হইবে—তাহাকে জানিয়া, তাহার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জড়দেহের অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তখন এই দেহই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজীবনের আধার হইবে এবং তাহাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। ইহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন কাম ক্রোধাদি রিপুকে জয় করা; যাহারা এইরূপ আত্মজয়ী হইয়াছে তাহারা এই দেহেই ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া পরম

সুখ ভোগ করে (৫।২৩)। এই ভাবে দেহকেও যে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া দিব্য আনন্দের আধার করা যায় গীতা তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

আমাদের যে বর্ত্তমান মানবদেহ, ইহা হইতেছে নিম্নতন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ক্রিয়া, অপরা প্রকৃতি। ইহা হইতে উঠিয়া পরাপ্রকৃতির মধ্যে নব জন্ম লাভ করিয়াই আমরা পুরুষোত্তমের সাধর্ম্য, মদ্ভাবং, লাভ করিব। কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই প্রকৃতির ও দেহের এই রূপান্তর সম্ভব হইবে। গীতা তাই কর্ম্মের উপর এত জোর দিয়াছে।

নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্—আত্মা নিজে কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া অথবা দেহ বা ইন্দ্রিয়নিচয়কে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত না করিয়া এই দেহে সুখে অবস্থিতি করে। ইহার অর্থ নহে যে, আত্মা পূর্ব্বে কর্ম্ম করিত, কর্ম্ম-সন্ন্যাসের পর নিষ্ক্রিয় হইল। আত্মা কোনদিনই কর্ম্ম করে না। "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" (১৩।৩২)। অজ্ঞানের বশে জীব মনে করে আত্মা কর্ম্ম করিতেছে,—কর্ম্ম-সন্ন্যাসের দ্বারা এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। কর্ম্ম করে প্রকৃতি, কিন্তু তাহা হইলে মুক্ত পুরুষকে কেমন করিয়া কর্ম্মযোগী বলা হয়? যিনি নিজে কোন কর্ম্মই করেন না, তিনি কেমন করিয়া কর্ম্মযোগী হইলেন? কর্ম্মযোগের এই নিগূঢ় রহস্যটিই গীতা এই কয়টি শ্লোকে বিবৃত করিতেছে। "আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, আমার কর্ম্মের দ্বারা আমি এই ফল লাভ করিব" এইরূপ ধারণা লইয়া কর্ম্ম করাই হইতেছে সকল বন্ধন ও দুঃখের মূল—এই ধারণা অজ্ঞানপ্রসূত এবং এই অজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া কর্ম্ম করাই হইতেছে কর্ম্মযোগ। এই যোগ সাধনায় বিভিন্ন স্তর বা অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা অভ্যাস করিতে হয়। এ-অবস্থাতে "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহংভাব থাকে, কিন্তু নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি লক্ষ্য না করিয়া এই কর্ম্ম ভগবানের অভিপ্রেত এই ভাব লইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু অহংভাব থাকায় এ-কর্ম্ম দিব্য কর্ম্ম হয় না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না—যে বিশ্বশক্তি আমাদের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে আমাদের অহং তাহাতে বাধাস্বরূপ হয়, এইভাবে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু যজ্ঞভাবে কামনাশূন্য হইয়া

কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন আমরা পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ বুঝিতে পারি। আমাদের অহংয়ের উর্দ্ধে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাই—সেই আত্মজ্ঞানে অহংভাব লুপ্ত হইয়া যায়, তখন শুধু কর্ম্মফল-সন্ন্যাস নহে, কর্ম্ম-সন্ন্যাস হয়, উপলব্ধি হয় যে আত্মা নীরব, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়—প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে। এই আত্মজ্ঞান হইতে আসে আভ্যন্তরীণ নীরবতা এবং অবিচল শান্তি—এবং ইহাই দিব্য কর্ম্মের ভিত্তি। আমাদের অন্তর যখন অহংভাব শূন্য হয়, শান্তিময় হয়—তখন আমাদের মধ্যে ভাগবত-শক্তির ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, তখন আমাদের কর্ম্ম হয় দিব্য কর্ম্ম। এই আত্মার জ্ঞান যাহাতে পুষ্ট হয়, সেইজন্য গীতা এখানে কয়েকটি শ্লোকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

অন্বয়—প্রভুঃ লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ন সৃজতি, কর্ম্মফলসংযোগং ন; স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ—প্রভু জগতের কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, কর্ত্তৃভাবও সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগও সৃষ্টি করেন না; প্রকৃতিই এই সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি—গীতা বলিয়াছে, কর্ম্মযোগী বাহ্য কর্ম্ম-সন্ন্যাস করেন না, মনের দ্বারা আভ্যন্তরীণ ভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। এইরূপ আভ্যন্তরীণভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, আত্মা কর্ম্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে—এই জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস হয়। মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে মনে করে "আমি কর্ম্ম করিতেছি"—ততক্ষণ তাহাকে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। আত্মা কর্ম্ম করে না অতএব কর্ম্মের বন্ধনও ভোগ করে না। আমরা

যখন অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত হই, আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া আত্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হই—তখন আমরাও কর্ম্ম-বন্ধনের অতীত হই, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব কর্ম্ম চলিতে থাকে, আমাদিগকে আর সে-সবের বন্ধন ভোগ করিতে হয় না। আমাদের যে অহংভাব, "আমি কর্ম্ম করি" এইভাব, ইহাই 'কর্ত্তৃত্ব'—আত্মা আমাদের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করে না, এই অহংভাব প্রকৃতিরই সৃষ্টি, প্রকৃতিরই একটি কৌশল। আত্মাই আমাদের নিগূঢ়তম মূল সত্তা—ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা প্রকৃতির কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত হই, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব কর্ম্ম চলে, সাক্ষীভাবে আমরা সে-সব দর্শন করি, শুভ অশুভ, প্রিয় অপ্রিয় সকল অবস্থাতেই আমরা সমভাব অবলম্বন করিয়া আত্মায় যে অক্ষয় সুখ আছে তাহাই ভোগ করি (৫।২১)।

লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ—গীতা বলিতেছে, জগতের কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা কার্য্যকারণশৃঙ্খল কিছুই প্রভু সৃষ্টি করেন না। প্রভু শব্দের অর্থ ঈশ্বর। গীতায় অন্যত্র ভগবান বলিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করেন (৩।২২), সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, অসাধুগণকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই মারিয়া রাখিয়াছেন; দেবতাদের আরাধনা করিয়া লোকে যে-সকল কামনার দ্রব্য পায়, সে-সব ফল ভগবানের দ্বারাই বিহিত (৭।২২); দ্বেষপরবশ ক্রূর ব্যক্তিগণকে তিনি আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন (১৬।১৯)। তাহা হইলে এখানে কেন বলা হইল যে, প্রভু এইসব কিছুই করেন না? ভগবানের লীলা বিচিত্র, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তা হইলেও তাঁহার নানা পদ, নানা ভাব; মানুষকে ভগবদ্ ভাব, মদ্ভাব, লাভ করিতে হইলে ভগবানের এই সকল ভাবকেই জানিতে হইবে, সকল ভাবেই ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। ভগবানের যে সর্ব্বোচ্চ ভাব তাহাতে তিনি বিশ্বের অতীত; আর এক ভাবে তিনি অক্ষর আত্মারূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া এই বিশ্ব প্রপঞ্চকে ধরিয়া রহিয়াছেন। আর একভাবে তিনি প্রকৃতির সহিত এক হইয়া এই বিশ্বলীলা করিতেছেন। এই সব ভাবেই তিনি প্রভু, ঈশ্বর—কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রভুত্বের, ঈশ্বরত্বের প্রকাশ এক রকম নহে। যখন বলা হয়, ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন, তখন শেষোক্ত ভাবটিকেই লক্ষ্য করা হয়—গীতায় ইহাকেই বলা হইয়াছে ক্ষর পুরুষ। ইহাই সগুণ ব্রহ্ম। আবার সকলের

এক নীরব, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর আত্মারূপে তিনি হইতেছেন অকর্ত্তা, প্রকৃতিই কর্ত্তা—এই নীরব আত্মাই গীতার অক্ষর পুরুষ, নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, প্রকৃতি আমাদের স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, তিনি সাক্ষীভাবে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির এই কর্ম্ম-পরম্পরা লক্ষ্য করিতেছেন। এই অবস্থাতেও তিনি প্রভু, ঈশ্বর—কারণ প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি, তিনি প্রকৃতির সমস্ত কর্ম্মকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার নীরব অনুমতির জন্যই প্রকৃতির পক্ষে কর্ম্ম করা সম্ভব হইতেছে। দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মী, কর্ম্মযোগী হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে এই নীরব, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী, অক্ষর আত্মার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এইভাবেই আমরা ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্ত হইব। তাহার পর আমরা ভগবানের সর্ব্বোচ্চ ভাবের সহিত যুক্ত হইতে পারিব, তাহাতে অক্ষর ও ক্ষর, নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা যুগপৎ রহিয়াছে, তাহাই পুরুষোত্তম। গীতা এখনও সে তত্ত্বের অবতারণা করে নাই, শিষ্যকে ক্রমশঃ সেই পরম ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে। তাই এখানে প্রথমে ঈশ্বরের নীরব, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী ভাবের উপর জোর দিয়াছে—কারণ ইহা দ্বারাই আভ্যন্তরীণ কর্ম্মসন্ন্যাস সিদ্ধ হয়।

ন কর্ম্মফলসংযোগং—কর্ম্মফলে বিশ্বাস হিন্দুর মজ্জাগত। কিন্তু কর্ম্ম কিভাবে ফল প্রসব করে সে-তত্ত্ব অতিশয় জটিল, গীতা বলিয়াছে গহনা কর্ম্মণো গতিঃ। সাধারণতঃ ইহা যেভাবে ধারণা করা হয় তাহা হইতেছে ঘোর অদৃষ্টবাদ, fatalism,

হরিণাপি হরেণাপি ব্রহ্মণাপি কথং চ ন।
ললাটলিখিতা রেখা পরিমার্ষ্টুং ন শক্যতে॥

অধিকাংশ পুরাণে কর্ম্মবাদের এইরূপ বর্ণনাই দেখা যায়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ললাটে যাহা লিখিত হইয়াছে, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। ভোগের দ্বারা যখন সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইবে, কেবল তখনই আমাদের দুঃখের অবসান হইবে। এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সকল দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনা ও সহন শক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জাতির দুর্ব্বলতার যুগে ইহা হইতে ঘোর জড়তা, তামসিকতা ও নিষ্ক্রিয়তার উদ্ভব হয়। এইভাবে অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ যে হিন্দুর অনেক ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ইহা হইতেছে হিন্দুর কর্ম্মবাদের বিকৃতি—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই এই বিকৃতি ঘটিয়াছিল। উপনিষদ্ ও বৈদান্তিক দর্শন সমূহে আমরা যে কর্ম্মবাদের পরিচয় পাই, তাহা এইরূপ নৈরাশ্যময় অদৃষ্টবাদ (fatalism) নহে, সেখানে অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের সমন্বয় আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মা বা পুরুষ কিছুই নহে, আর হিন্দুধর্ম্মের মতে আত্মাই সব, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; এই সমগ্র জগৎ আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, আত্মার দ্বারাই রহিয়াছে, আত্মার জন্যই রহিয়াছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, কর্ম্ম করি, অনুভব করি, সে-সবই আত্মার জন্য। প্রকৃতি আত্মার উপর নির্ভর করে, ইহার সমস্ত গতি, খেলা, ক্রিয়া আত্মারই জন্য।

কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ভিন্ন অদৃষ্ট বলিয়া আর কিছুই নাই, এই শৃঙ্খলা হইতেছে নিয়মেরই (Law) আর এক নাম। আর নিয়ম হইতেছে পুরুষের তৃপ্তির জন্য, ভোগের জন্য প্রকৃতির কর্ম্মের ধারা। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাকে Law বলা হয়, আমাদের দর্শনে ইহাকে বলা হয় ধর্ম্ম, ইহাই বিশ্বের ক্রিয়াকে ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিষেরই ধর্ম্ম আছে, এবং তাহার কর্ম্ম ঐ ধর্ম্ম অনুসারেই পরিচালিত হয়—যেমন আগুনের ধর্ম্ম দগ্ধ করা, জলের ধর্ম্ম শৈত্য। প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম আছে, তেমনিই প্রত্যেক শ্রেণী বা জাতির ধর্ম্ম আছে, তেমনই বিশ্বেরও ধর্ম্ম আছে এবং আপন আপন ধর্ম্ম অনুসারেই সকলে কর্ম্ম করে। বিশ্বের ধর্ম্ম অনুসারেই এক-এক প্রকার কর্ম্ম এক-এক প্রকার বিশিষ্ট ফল প্রদান করে : ইহাই সমগ্র কার্য্য-কারণ-নিয়ম।

হিন্দু মত হইতেছে এই যে, আমাদের শুধু বাহ্য কর্ম্ম ও বাক্য নহে, আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাব—এ-সবই হইতেছে কর্ম্মের অঙ্গ এবং এই সব কর্ম্মই ফল উৎপাদন করে। আর কৃতকর্ম্মের ফলও হয় নানা প্রকারের। এক প্রকারের ফল হইতেছে, আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম্মধারার দ্বারা এজীবনে আমাদের এমন কতকগুলি অভ্যাস ও সংস্কার সৃষ্ট হয়, যেগুলি পরজন্মে আমাদের সুখ বা দুঃখের কারণ হয়। মানুষের মৃত্যুতে তাহার দেহ ও প্রাণই বিশ্ব দেহ ও প্রাণে মিলাইয়া যায়, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম দেহ তাহার শক্তি ও সংস্কারগুলিকে বহন করিয়া লইয়া যায়—এবং তদনুসারে পরজন্মে তাহার জীবন নির্দ্ধারিত হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের টীকায় সুরেশ্বর বলিয়াছেন:

জন্মান্তরারম্ভহেতুঃ কিং স্যাদিতি তদুচ্যতে।
বিদ্যা সম্পাদিতা তেন পুরা কর্ম্ম চ যৎকৃতম্।
যা বাসনা চ তৎ সর্ব্বং জন্মভোগ্যাদি কারণম্॥

আর এক প্রকারের ফল হইতেছে, আমরা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা যখন অপরের শুভ বা অশুভ করি, তাহার ফলস্বরূপ আমাদিগকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আবার, এক প্রকারের কর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিপরীত প্রকারের কর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং তদনুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহাই হইতেছে কর্ম্মের শৃঙ্খল, কর্ম্মের বন্ধন—ইহাকেই হিন্দু অদৃষ্ট বলে এবং ইহা হইতে মুক্তির জন্য সাধনা করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রকৃতির এই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাই বিশ্বের চরম নিয়ম. ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই—অতএব কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ভোগের দ্বারা পূর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া এবং নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় না করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করা, শূন্যে বিলীন হওয়া, ইহাই হইতেছে দুঃখ নিবারণের প্রকৃত পন্থা এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু হিন্দু মতে প্রকৃতিই সব নহে, আমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যাহা প্রকৃতির উর্দ্ধে—ঈশ্বর, প্রভু, বিভু। তাহা চির-মুক্ত ও আনন্দময়; আমাদের এই আত্মা মূলতঃ বিশ্বের পরম আত্মার সহিত এক। আত্মা কর্ম্ম করে না, তাই কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধও হয় না। প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, বস্তু-সকলের স্বভাব নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, প্রকৃতি হইতেই নিয়ম বা ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। আত্মা বা পুরুষ স্বভাবকে ধরিয়া থাকে, কর্ম্ম ও তাহার ফল লক্ষ্য করে, ভোগ করে, নিয়ম বা ধর্ম্মে অনুমতি দেয়। আত্মাই রাজা, প্রভু, ঈশ্বর,—তাহার অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু রাজা ঐ নিয়মের উর্দ্ধে এবং মুক্ত।

এই যে পুরুষের অনুমতি দিবার ক্ষমতা, এইখানেই রহিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা। পুরুষ অনুমতি দেয় তাহার জীবন, তাহার ভোগ দেশ কাল ও নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে, স্বভাব ও ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে—প্রকৃতি তদনুসারে জীবন লীলা প্রকট করে, বিকশিত করে। পাপ পুণ্য, শুভ অশুভ, রোগ স্বাস্থ্য, সুখ দুঃখ—এই সবে পুরুষ সায় দেয় বা অসম্মত হয়; পুরুষের আসক্তি অনুযায়ী পুরুষ যাহা চায়, প্রকৃতি তাহাই অবিরত সৃষ্টি করিয়া চলে।

পুরুষ যাহাতে বিরত হয়, উদাসীন হয় প্রকৃতি তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতি একবার যে গতি আরম্ভ করিয়াছে, পুরুষ অনুমতি প্রত্যাহার করিলেও প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিতে পারে না; ঠিক যেমন চাকাকে একবার ঘুরাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা আপনা হইতেই ঘুরিতে থাকে। তবে পুরুষ দৃঢ়তার সহিত যাহা ইচ্ছা করিবে, সঙ্কল্প করিবে, প্রকৃতি ক্রমশঃ তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইবেই। পুরুষের ইচ্ছাতেই জগৎ চলিতেছে, অদৃষ্ট (Fate) কেবল ঐ ইচ্ছা পূরণের একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু আমরা যে প্রকৃতির প্রভু, ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে, তাহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে—আমাদের ইচ্ছাকে বিশ্বপুরুষের ইচ্ছার সহিত এক করিতে হইবে। মূলতঃ আমরা ঐ বিশ্বপুরুষের সহিত এক; ব্যষ্টিগত বৈচিত্র্যবিকাশের জন্য মানুষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, মানুষ যখন অজ্ঞানের বশে তাহা ব্যবহার করে তখনই সে নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। সজ্ঞানে যখন আমরা ঐ স্বাধীনতার ব্যবহার করি, তখন তাহাই হয় বিশ্বপুরুষের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। আমাদেরই যাহা শ্রেষ্ঠ সত্তা তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা পরম মুক্তি ও ঈশ্বরত্ব লাভ করি।

ভগবান বিশ্বের অধীশ্বর, কিন্তু ব্যষ্টিগত জীবও হইতেছে তাঁহারই প্রতিনিধি, তাহার যে ব্যষ্টিগত প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির উপরে সেও ঈশ্বর, প্রভু। প্রত্যেক জীবেরই বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম ঐ ধর্ম্মের দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাহা হইলে মানুষ কি সম্পূর্ণভাবে তাহার প্রকৃতির বশ, তাহার কি কোন দায়িত্ব নাই? কিন্তু তাহার প্রকৃতি তাহার নিজেরই সৃষ্টি, তাহার প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, আর সে নিজে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে সে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। মানুষের প্রকৃতি ও কর্ম্ম কি হইবে তাহা বিশ্বপ্রকৃতি কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইহা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মেরই একটি অংশ যে, আমাদের অন্তরাত্মা পুনঃ পুনঃ যাহা চাহিবে তদনুসারে সে আমাদের জীবনের বিকাশ করিবে। নানাবিধ অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার প্রকৃতির বিকাশ করিবার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে; মানুষ যখন ঐ স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার করে, তখন তাহার প্রকৃতির মধ্যে নানা বাধা ও শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষ যদি একাগ্র সঙ্কল্পের সহিত ঐ সকল বাধাকে দূর করিতে চায়,

তাহা হইলে প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে মানুষ তাহার শক্তির যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তদনুযায়ী বিশ্বপ্রকৃতিও তাহার সহিত ব্যবহার করিয়াছে ; আর এখন সে যেরূপ ব্যবহার করিবে, সেইরূপ বিশ্বপ্রকৃতিও তাহার প্রতিদান দিবে—ইহাই হইতেছে কর্ম্মবাদের মূল কথা।

বিশ্ব-প্রকৃতি কি ভাবে আমাদের কর্ম্মের ফল দেয় তাহা বুঝা অতিশয় কঠিন, কারণ প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে নানা স্তর—দেহ, প্রাণ, মন ; বিভিন্ন স্তরের আছে বিভিন্ন নিয়ম, বিভিন্ন ধর্ম্ম, সেই সবের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কর্ম্মের গতি ও ধারা নির্ণীত হয়। যখন আমরা বিশ্বপুরুষের চৈতন্তের মধ্যে প্রবেশ করিব, তখনই আমরা কর্ম্মের সমগ্র অর্থ বুঝিবার আশা করিতে পারি। আমাদের অজ্ঞান মানবীয় মন বুদ্ধির দ্বারা কেবল তাহার ক্ষীণ আংশিক আভাস মাত্র পাইতে পারি। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায়—আমরা যেমন কর্ম্ম করি, তদনুরূপ ফল পাই ; কিন্তু ঐ ফল ঠিক কি রকম ও কতখানি হইবে তাহা সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া বলা সম্ভব নহে, কারণ বহু জটিল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া উহা নির্দ্ধারিত হয়। এই জন্যই কর্ম্মের ফলকে অদৃষ্টের ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। কর্ম্মের কতকগুলি ধারা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই রহিয়াছে জড় জগতের নিয়ম—the physical law, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই। যেখানে প্রকৃতির নিয়মে ভূমিকম্প হইতেছে, সেখানে যাহারা থাকিবে তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই। কে বাঁচিবে বা মরিবে হিসাব করিয়া সাবধান হইয়া যদি প্রকৃতিকে পদে পদে তাহার কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়মানুগত জড় জগৎই থাকিতে পারে না, আর জড়জগৎ না থাকিলে কোথায় থাকিবে মানুষ, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহার সুখ-দুঃখ? অতএব জড়জগতে যাহারা বাস করিতে চায়, জীবনের বিকাশ করিতে চায় তাহাদিগকে জড়জগতের নিয়মগুলি জানিয়া লইয়া সাবধান হইয়া চলিতে হইবেই—নতুবা অসাবধানতার ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। জড়জগতে প্রাণের বিকাশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া চৈতন্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশ—ইহাই পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের লক্ষ্য এবং বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছা বলিয়া মনে হয় ; ইহা ছাড়া বিবর্ত্তনের অন্য কোন যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা নাই। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় যে-সকল জীব ধ্বংস হইতেছে, প্রকৃতি অফুরন্ত ভাবে জীবনের সৃষ্টি করিয়া তাহার ক্ষতিরণপূ

করিতেছে এবং এইভাবে জীবনের ধারাকে বজায় রাখিয়া বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মফল বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা হইতে মনে হয়, জগতে একটা নৈতিক নিয়মের রাজ্য আছে, ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্যের বিচার আছে এবং তদনুসারে মানুষকে আপন কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ ন্যায় বা পুণ্যের সহিত সাংসারিক সুখ দুঃখের কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নাই—ন্যায় ও পুণ্যের একটা আদর্শ ও নীতি আছে, অনেক সময়ে তাহা অনুসরণ করিতে হইলে অনেক ত্যাগ স্বীকার, কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং ঐ আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা যে ফল লাভ করি তাহা হইতেছে আমাদের মনের, চরিত্রের, আত্মার উন্নতি, বাহ্য কোন সাফল্য বা বিজয় নহে। তথাপি সাধারণ মানুষ বাহ্য সুখভোগেই অতিশয় আসক্ত, সেইজন্য তাহাকে এই সুখের লোভ দেখাইয়াই পুণ্যবান, নীতিবান করিবার চেষ্টা করা হয়—এবং সেই জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মশিক্ষার ভিতর দিয়া বলা হয় যে, নৈতিক আদর্শ, ন্যায়, পুণ্য,—এ-সব নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে অবশ্যপালনীয়, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসাব করিলেও দেখা যায় যে, এই আদর্শ অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত, শেষ পর্য্যন্ত ন্যায়ের পথ, ধর্ম্মের পথই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, কারণ এ জগতে একজন ন্যায়বান বিচারকর্ত্তা আছেন। মানুষকে বলা হয় যে, পাপীরা ধ্বংস হইবে, ধার্ম্মিকেরাই সৌভাগ্যশালী হইবে, ধর্ম্মের পথই প্রকৃত সুখের পথ। কিন্তু যেহেতু বাস্তবজীবনে দেখা যায় যে, ইহা সত্য নহে, আর মানুষও সকল সময়ে নিজেকে প্রতারিত করিতে পারে না—সেইজন্য বলা হয় যে, পাপ-পুণ্যের ফল এখানে না পাইলেও, স্বর্গে ও নরকে এবং পরজন্মে ভোগ করিতে হয়।

এই সাধারণ মতের মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহার জন্য পরকালের হিসাব লইতে হয় না—এই পৃথিবীতেই ইহার যথার্থতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা কেবল আংশিকভাবেই সত্য —কর্ম্মের ফল সৃষ্টি করিতে নৈতিক নিয়ম ব্যতীত আরও অনেক রকম শক্তি কাজ করে, এবং পাপ পুণ্যের ফলে ঠিক পরিমাণ মত বাহ্য দুঃখ বা সুখ মিলিবে—এই স্থূল নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। অতএব এইটিই এই বিষয়ের সমগ্র সত্য নহে। জগতে যদি বাস্তবিক নৈতিক নিয়মেরই প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলে অনেক সময়ে শুভ ফললাভ করিবার জন্য অশুভ

উপায় অবলম্বন করিতে হয় কেন? অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা অন্যায় ও পাপের পথ অনুসরণ করে তাহারা অবিলম্বে কৃতকার্য্যতা ও সাফল্য লাভ করে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—ঐ নিয়মও বাস্তব জীবনে খাটে না। শেষ পর্য্যন্ত যদি ধর্ম্মের জয় হয়, সে শুধু ধর্ম্মের জোরেই নহে, তাহার সহিত শক্তিরও যোগ থাকে। মহাভারতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপক্ষ যুধিষ্ঠিরেরই জয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুধু ধর্ম্মের জোরেই হয় নাই, অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধরেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা জাতিগত সাফল্যলাভে যে-সকল শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নৈতিকতারও একটা স্থান আছে—এবং যাহারা তাহার বিরুদ্ধে যায় তাহাদিগকে কোন না কোন সময়ে তাহার অশুভ ফল ভোগ করিতেই হয়। ভারতের যে-সকল নেতা ও রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া এই সোনার দেশকে মুষ্টিমেয় বণিকের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, দুই শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জাতি তাহাদের সেই কর্ম্মের অশুভ ফল ভোগ করিতেছে। ইংরাজ ও ফরাসীর সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়া পরম্পরা আজ তাহাদের উপর জার্ম্মানির সাম্রাজ্যবাদের ভীষণ বিপদ টানিয়া আনিয়াছে।

কর্ম্মের ফল আছেই, কিন্তু ঠিক কি নিয়মের বশে এই ফল আসে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অতীত যদিও এ সম্বন্ধে একটা স্থূল নিয়ম দাঁড় করাইয়া মানুষকে পাপ হইতে নিবৃত্ত ও পুণ্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ কর্ম্মবাদ হইতে এই শিক্ষাটুকু আমরা নিশ্চিতভাবে লাভ করিতে পারি যে, শুধু প্রাকৃতিক প্রেরণায়, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুর প্রেরণায় অন্ধভাবে চালিত না হইয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই সকল কর্ম্ম করা উচিত। তবে ইহা হইতে অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নহে, কারণ আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ যদি আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ফল হয়, আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারা আমরা সে অশুভকে জয় করিতে পারি—হিন্দু শাস্ত্রে সেজন্য পুরুষকারের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগবাশিষ্টে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

অথ চেদশুভো ভাবঃ ত্বাং যোজয়তি সাম্প্রতে।
প্রাক্তনস্তদ্ আশু যত্নাজ্ জেতব্যো ভবতা বলাৎ॥

কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে দেখিলেই সে তাহার পাপের ফল ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতিকারে অগ্রসর না হওয়া হইতেছে

কর্ম্মবাদের জঘন্য অপব্যবহার। কারণ আমরা দেখিয়াছি, সকল দুঃখ যে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্যই হয় তাহা নহে, নানা শক্তি নানা কারণের সমবায়ে মানুষ সুখ-দুঃখ-ফল প্রাপ্ত হয়; তাহা ছাড়া অনেক সময় এমনও হয় যে, একজনার কর্ম্মের ফল আর একজনকে ভোগ করিতে হয়। আর পাপের ফলেই যদি কেহ দুঃখ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ দুঃখ ভোগের দ্বারাই যে তাহার কর্ম্মের ভোগ শেষ হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? অতএব কর্ম্মবাদের দোহাই দিয়া কাহারও দুঃখ নিবারণে নিবৃত্ত হওয়া অথবা দুঃখের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। অন্য পক্ষে ইহা যদি ঠিক হয় যে, জগতের শাশ্বত নিয়মের বশে সকলে আপন আপন কর্ম্মের ফল পাইবে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে, সমাজের পক্ষে কাহাকেও কোন পাপ বা অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহারা মানুষকে যে কোন অজুহাতে শাস্তি দেয়, তাহাদিগকে সেই শাস্তি-দেওয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। উৎপীড়নকারী সমাজ নিজেই নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। সমাজের কর্ত্তব্য পাপীকে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নহে; যাহাতে সে নিজেকে সংশোধন করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করাই সমাজের কর্ত্তব্য।

লৌকিক ধর্ম্মসকলের যে-শিক্ষা, ভগবান ন্যায়ের অবতার, পাপীকে তিনি পাপের জন্য শাস্তি দেন, পুণ্যবানকে তিনি পুরস্কৃত করেন—ইহা হইতেছে মানবীয় রাজার আদর্শ বিশ্বরাজার উপর আরোপ করা; এই ভাবে সাধারণ লোককে ভয় দেখাইয়া বা লোভ দেখাইয়া সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়তা হইতে পারে (এ যুগে আর তাহাও সম্ভব নহে)। কিন্তু এই ভাবে মানুষকে পুণ্যাত্মা করা যায় না। দুঃখের ভয়ে, সুখের লোভে যে পুণ্যাচরণ তাহা পুণ্যই নহে; যাহা ন্যায়, যাহা সৎ, ন্যায় বা সৎ বলিয়াই তাহা করা, ফলের দিকে লক্ষ্য না করা—ইহাই প্রকৃত পুণ্যাচরণ। এইরূপ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানুষের আত্মার উন্নতি, প্রকৃতির শুদ্ধি ও রূপান্তর হয়—ইহা বিশ্বের শাশ্বত নিয়মের বশেই হয়, ইহার জন্য কোন অপার্থিব রাজাকে পাপপুণ্যের বিচার করিয়া শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয় না। বিশ্ব-নিয়মের বশে শুধু পাপীই যে শাস্তি পায় তাহা নহে; ভুলের জন্য, অজ্ঞানের জন্য, বোকামির জন্য, দুর্ব্বলতার জন্য, সঙ্কল্প ও তপস্যার-ত্রুটির জন্যও মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই নিয়মের মর্ম্ম

এই যে, আমাদের মধ্যে যে-সব ত্রুটি, ভুল, বা দুর্ব্বলতা আছে তাহাদের ফল ভোগ আমাদিগকে করিতে হইবে, কখনও কখনও সে-ফল সাংঘাতিক হইতে পারে; আমাদের কর্ম্মের, ব্যবহারের ত্রুটি আমরা সংশোধন করিতে পারি, উপশমিত করিতে পারি; কিন্তু যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে, এমন কি আমাদের ত্রুটির তুলনায় অনেক বেশী দুঃখই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতে পারে; সামান্য ভুলে আমাদের সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই নিয়ম চায়, মানুষকে যে-স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া সে নিজেকে পূর্ণ, নিখুঁত করিয়া তুলুক, তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তাকে বিকশিত করুক; যতক্ষণ সে তাহা না করিতেছে ততক্ষণ তাহাকে আঘাতের পর আঘাত পাইতেই হইবে।

কর্ম্ম আর এক ধারায় কাজ করে। তাহাকে বলা যাইতে পারে প্রতিশোধ নীতি, the law of talion. কাহারও বিরুদ্ধে আমি পাথর ছুঁড়িলাম, কোন গুপ্ত শক্তির ক্রিয়ায় সে পাথর ঘুরিয়া আসিয়া আমার মাথায় লাগিল। আমি একজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিলাম, কিছুকাল পরে আমাকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। সংসারে এইরূপ ভাবে কর্ম্মফল সাধারণতঃ দেখা না যাইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা ঘটে এবং ইহার দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত হয়। তবে এর কোন বাঁধা ধরা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কর্ম্মের আর একটি ধারা হইতেছে শুভ শুভের সৃষ্টি করে, অশুভ অশুভের সৃষ্টি করে। এই নীতিটিও কতক পরিমাণে সত্য, এবং মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি ইহার হিসাব করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইহার উপরেও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না— কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের শুভ কর্ম্মের ফল অশুভ হয়, আবার অশুভ কর্ম্মের ফল শুভ হয়। যীশুখ্রীষ্ট শান্তি ও প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিলেন, তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ হইতে হইল—অন্য পক্ষে আটিলা (Attila), চেঙ্গিজ খাঁ (Jenghiz) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, কর্ম্মের ফল ঠিক কোন নিয়মে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন—কারণ তাহার মধ্যে নানা ধারা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর এই নিয়ম হইতেছে ঈশ্বরেরই নিয়ম, এই নিয়মের ভিতর দিয়াই তিনি জগতে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি

এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন—তাই ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া মানুষ সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফল হইতে অবিলম্বে মুক্ত হয়। সকল নিয়মের চরম লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সহিত মিলন—একান্ত শরণাগতির দ্বারা যে-মানুষ ভগবানের সহিত যুক্ত হয়, সে সকল নিয়ম, সকল কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের উর্দ্ধে চলিয়া যায়।

স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে—কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগ সাধিত হয় কাহার দ্বারা? এ বিষয়ে গীতার কথায় কোনই অস্পষ্টতা নাই, গীতায় স্বভাবকেই কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে গীতা বলিয়াছে, অহঙ্কার, কাম, দর্প প্রভৃতি দোষযুক্ত মানুষকে ভগবান আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন। এখানেও দেখা যাইতেছে, মানুষ তাহার মন্দ স্বভাবের জন্যই আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বভাব হইতেছে প্রকৃতির ক্রিয়া; প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি, সেই হিসাবে ভগবান এখানে প্রকৃতির কর্ম্মকেই নিজের কর্ম্ম বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবান নিজে কিছুই করেন না, তাঁহার প্রকৃতিই সব করে; তিনি দ্রষ্টারূপে প্রকৃতির কর্ম্ম দর্শন করেন, তাই তিনি অকর্ত্তা; আবার প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার ভোগের জন্য তাঁহারই শক্তিরূপে কর্ম্ম করে তাই তিনি কর্ত্তা। সেই জন্যই ভগবান নিজেকে 'কর্ত্তারমপি অকর্ত্তারম্' বলিয়াছেন (৪।১৩)।

অতএব ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতিই আমাদিগকে নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং তাহাদের ফলভোগ করায়। কিন্তু এই প্রকৃতি কি? শঙ্কর বলিয়াছেন, স্বভাবস্তু স্বো ভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতির্মায়া প্রবর্ত্ততে, স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতি—মায়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে এই অবিদ্যা বা মায়াই সংসারের মূল, ইহা ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের প্রতি আসক্তির বশেই মানুষ জন্মে জন্মে সুখ দুঃখ ভোগ করে। আমাদের বর্ত্তমান মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহা সত্য ও সঠিক বর্ণনা, কিন্তু ইহাই মানব-জীবনের সমগ্র তত্ত্ব নহে। এই প্রকৃতি ছাড়াও ভগবানের আর এক প্রকৃতি আছে, প্রকৃতিম্ বিদ্ধি মে পরাং (৭।৫), তাহা অবিদ্যা বা ত্রিগুণাত্মিকা নহে, তাহা বিদ্যা গুণাতীতা, তাহার স্বরূপ ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দ, ভগবান নিজেকে এই প্রকৃতির সহিত এক বলিয়াছেন, স্বাম্ প্রকৃতিম্ (৪।৬)। বস্তুতঃ এই অধ্যাত্ম পরা প্রকৃতিই জগতের মূল, ইহাই বহু

জীব হইয়াছে, পরাং প্রকৃতিং জীবভূতাং ; এই পরা প্রকৃতিই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল উপাদান ; আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি হইতেছে ইহারই নীচের বাহিরের রূপ, অপরা প্রকৃতি। এই অপরা প্রকৃতির ত্রুটি ও অপূর্ণতা-সকল দূর করিয়া ইহাকে পরা প্রকৃতির দিব্য স্বরূপে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য ; গীতা 'মদ্ভাবমাগতাঃ', 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' বলিতে এই দিব্য জীবনই বুঝাইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষ সংসারে আসিয়াছে আত্মপ্রকাশের একটি বিশিষ্ট নীতি ও সঙ্কল্প লইয়া, প্রত্যেক জীবই হইতেছে ভগবানের চৈতন্য-শক্তি, সে ভগবানের একটি বিশেষ ভাব বিকাশ করিবার জন্য সংসার-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাই তাহার স্বভাব। সকল ভুল ভ্রান্তি, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষের এই মূল স্বভাবই নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। জীবের এই মূল স্বভাবকেই সাধারণতঃ অনাদি কর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা হইয়া থাকে, অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবং জীবলোকম্ (শ্রীধর)। কিন্তু এই যে কামাদির অধীন স্বভাব, ইহা হইতেছে স্বভাবের নীচের রূপ, ত্রিগুণাত্মিকা নীচের প্রকৃতিতে স্বভাব পূর্ণ জ্ঞান ও চৈতন্য হইতে স্খলিত, এখানে যেন অর্দ্ধ আলো, অর্দ্ধ অন্ধকারে ইহা নিজের স্বরূপকে খুঁজিতেছে, এবং সে জন্য ইহাকে নানা মিথ্যা ও বিকৃত রূপ, অসংখ্য ত্রুটি, বিচ্যুতি, আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়া পথের, আদর্শের সন্ধান করিয়া চলিতে হইতেছে। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায় ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতির, পাপ ও পুণ্যের মিশ্রিত রচনা। এই সবের ভিতর দিয়া স্বভাবই আত্মপ্রকাশ, আত্ম-প্রাপ্তির সন্ধান করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে,—এই সত্য হইতে আমাদের সর্ব্বতোমুখী ঔদার্য্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, সকল বিপথগামী, অপরাধী, পাপীকেই ক্ষমার চক্ষুতে দেখা উচিত, সকলকেই সহানুভূতি ও সাহায্য করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন।

এই সব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি ঊর্দ্ধ হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবকে তাহার সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অক্ষর আত্মা এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে ক্ষর

প্রকৃতিকে ইহার সকল বিপর্য্যয়ের মধ্যে দর্শন করে, ধরিয়া থাকে। আর ব্যষ্টিগত জীবের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের মধ্যে যাহা মূল সত্তা, তাহা প্রকৃতিতে তাহার বাহ্য বিবর্ত্তনে এই সবকেই স্বীকার করিয়া লয়। যখন আমরা আমাদের এই অন্তরাত্মার সন্ধান পাই, যে অক্ষর অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বব্যাপী আত্মা আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাকে লাভ করি, এবং যে পুরুষোত্তম—আমাদের যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয় কর্ম্মের উপর অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেছেন, সব কিছু পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাকে লাভ করি, তখনই আমরা আমাদের জীবনের নীতির সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কারণ যে জগদীশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার অনন্ত গুণে সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই, আর শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫

অন্বয়—বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে সুকৃতং চ এব ন; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং, তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি।

অনুবাদ—বিভু কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং—ভগবান সর্ব্বব্যাপী বিভু, এক আত্মা রূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন, ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতকে পরিচালিত করিতেছেন—অথচ জীবগণের পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি সচ্চিদানন্দ—তাঁহার স্বরূপই হইতেছে শুভ, আনন্দ; সর্ব্ব জীবের মধ্যে সংসারে সকল ঘটনার মধ্যে থাকিয়াও তিনি তাঁহার এই চিদ্‌ঘন আনন্দময় স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। জীব যখন ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করে তখন সেও হয় সচ্চিদানন্দ—সংসারের মধ্যে, সকল কর্ম্মের মধ্যেও সে থাকে

অপাপবিদ্ধ, আনন্দময়। এইরূপ ভগবদ্ভাব লাভই গীতার শিক্ষা, গীতার আদর্শ। জীব কেন ভগবদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে রহিয়াছে, এই শ্লোকে গীতা তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।

ভগবানই যখন সকলের হৃদ্দেশে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে যন্ত্রবৎ চালিত করিতেছেন তখন মানুষের সকল কর্ম্মের জন্য প্রকৃত পক্ষে ত তিনিই দায়ী—তাহা হইলে কেন তিনি মানুষের পাপ-পুণ্যের ফলভোগী হন না? কেন সে-সব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না? শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদীর নিকট এ-প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ—বস্তুতঃ পক্ষে ভগবান কিছুই করেন না, তিনি অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, তবে তিনি যে জীবকে, জগৎকে পরিচালন করিতেছেন বলিয়া মনে হয় এটা ভ্রম, মিথ্যা, মায়া। এই মায়া বা অজ্ঞানের বশেই মানুষ মনে করে যে ভগবান কর্ম্ম করিতেছেন বা করাইতেছেন। কিন্তু গীতায় কোথাও এইরূপ মায়াবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনিই পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম, তাঁহার উর্দ্ধে আর কেহই নাই—তিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করেন, পাপীকে নরকে নিক্ষেপ করেন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তিনিই মারিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইলে পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করে না কেন? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গীতা এই দুই শ্লোকে সাংখ্য মত ব্যক্ত করিয়াছে—সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষী, তিনি কিছুই করেন না, প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করে—গীতা এখানে প্রভু ও বিভু বলিতে সেই নিষ্ক্রিয় পুরুষকেই বুঝাইয়াছে। কিন্তু গীতা কোথাও সাংখ্যমত অনুসরণ করিয়াছে, আবার কোথাও বেদান্ত মত অনুসরণ করিয়া ভগবানকে সক্রিয় বলিয়াছে, এরূপ অসঙ্গতি গীতার মধ্যে থাকিতে পারে না। গীতা সর্ব্বত্র একই মত অনুসরণ করিয়াছে, তাহা তাহার নিজস্ব, তাহাতে বেদান্তের কাঠামোর মধ্যে সাংখ্য ও যোগের সমন্বয় হইয়াছে। তাই মনে হয় গীতা কখনও সাংখ্যের কথা বলিতেছে, কখনও বেদান্তের কথা বলিতেছে। বস্তুতঃ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ, ক্ষর ও অক্ষর—দুইই হইতেছে ভগবানের দুইটি বিভাব, ক্ষররূপে তিনি প্রকৃতির সহিত এক হইয়া এই বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছেন, সমুদয় কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন জগতে কোথাও কিছু ঘটিতে পারে না, আবার অক্ষররূপে তিনি প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে সরিয়া রহিয়াছেন, উদাসীনবৎ সব কিছু দেখিতেছেন, আধাররূপে প্রকৃতির সব কিছুকে ধরিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু নিজে কিছু করিতেছেন না।

গীতা এখানে প্রভু ও বিভু বলিতে এই অক্ষর পুরুষই বুঝিয়াছে। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা। ভগবানের মধ্যে এই অক্ষরভাব রহিয়াছে বলিয়াই কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। পাপ কি? ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণভাব লইয়া বাসনা কামনার বশে আমরা যে কর্ম্ম করি তাহাই পাপ, এবং যখন এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া কোন উচ্চতর আদর্শ অনুসরণ করি, যাহার ফলে আমাদের প্রকৃতির বিকাশ হয়, উন্নতি হয়, প্রকৃতি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া উঠে তাহাই পুণ্য। কিন্তু ভগবানের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ অহংভাব নাই—তিনি নিজেকে সংসারের অন্য সব কিছু হইতে পৃথক করিয়া দেখেন না, ক্ষরভাবে তিনি বহুরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অক্ষরভাবে তিনি সর্ব্বভূতের এক আত্মা; সংসারের বহু জীব বহু রূপ, ঐ এক আত্মারই বহু রূপ—এই জ্ঞান হইতে ভগবান কখনও বিচ্যুত হন না। জগতের সব কিছু ঐ এক আত্মারই মধ্যে রহিয়াছে, অতএব তাহার কোন কিছু পাইবার জন্য বাসনা কামনা নাই—এইজন্য কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আত্মা নিজে নিজেই পূর্ণ, কোন পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা তাহার কিছু উন্নতি হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু...সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কণীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বরঃ—অর্থাৎ সেই বা এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণের মধ্যে অবস্থিত বিজ্ঞানময় তিনি সর্ব্বেশ্বর বশী, সর্ব্বাধিপতি, তিনি সাধু কর্ম্ম দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা লঘুতা প্রাপ্ত হন না, ইনিই সর্ব্বেশ্বর (বৃ ৪।৪।২২)।

অক্ষর পুরুষরূপে ভগবান সকল ক্ষুদ্র অহংভাবের অতীত, তাঁহার মধ্যে আপন-পর দ্বন্দ্ব নাই, বাসনা কামনা নাই, ক্ষররূপে তিনি যখন কর্ম্ম করেন অক্ষররূপে তখনও তাঁহার মধ্যে এই নিরহং নির্ব্যক্তিক ভাব থাকে, কোন ব্যক্তিগত বাসনা কামনা অভাব পূরণের জন্য তিনি কর্ম্ম করেন না; কিন্তু পুরুষোত্তমের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে দিব্য ইচ্ছা, ক্ষরপুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া তাহাই অনুসরণ করেন—এই জন্য অজ্ঞান, অহংভাবময়, বাসনা-কামনাময় জীবের ন্যায় পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জীবকেও এইরূপ অক্ষরভাব লাভ করিয়া, অহং ও বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া জগতে পুরুষোত্তমের সজ্ঞান যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে হইবে—তখন তাহার যে

দিব্য ভাব, দিব্য প্রকৃতি, দিব্য জীবন লাভ হইবে, কোন কর্ম্মেই তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না, সেও ভগবানের ন্যায় পাপ পুণ্যের অতীত হইবে—ইহাই গীতার সমাধান।

ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ—ভগবান অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়াও তিনি পাপের অতীত থাকেন—কারণ তাঁহার বাসনা নাই, আসক্তি নাই, ক্ষুদ্র অহংভাবের বশে তিনি আপন-পর ভেদ করেন না। কিন্তু তিনি পুণ্যেরও অতীত, কাহারও শুভ-কর্ম্ম, পুণ্য-কর্ম্ম গ্রহণ করেন না—এ-কথার অর্থ কি? এই অধ্যায়েরই শেষ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনি সকল যজ্ঞ ও কর্ম্মের ভোক্তা। ভগবানের স্বরূপই হইতেছে, শিব শুভ—তাঁহার মধ্যে অশিব বা অশুভের স্থান নাই। তবে যে এখানে বলা হইয়াছে যে, তিনি কাহারও পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না—ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব আছে ভগবানের মধ্যে সে দ্বন্দ্ব নাই। মানুষ যে পাপ-পুণ্যের প্রভেদ করে তাহা পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাই দেখা যায় এক সময় এক স্থানে যাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইতেছে অন্যত্র তাহাই পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, আবার দেখা যায় পাপের ফল কখনও শুভ হইতেছে, পুণ্যের ফল অশুভ হইতেছে—ইহার কারণ মানুষ যে সব নীতি বা আদর্শের দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার করে তাহা অপূর্ণ—মানুষ যাহাকে পুণ্য বলে তাহা খাঁটি শুভ নহে—ভগবানের মধ্যেই প্রকৃত শুভ চিরবিরাজমান, এইজন্যই বলা হইয়াছে, মানুষ যে পাপ-পুণ্যের বিচার করে ভগবান তাঁহার অতীত—নিজ সত্তায় তিনি পূর্ণতম, শুদ্ধতম শিব। যেখানে জ্ঞানের অভাব বা ত্রুটি আছে সেইখানেই পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব আছে, ভগবানে সেরূপ ত্রুটি নাই, তাই সেখানে সবই পূর্ণতমভাবে সত্য, শিব, সুন্দর। মানুষকেও এই ভাগবত চৈতন্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল মানবীয় পাপ-পুণ্য, শুভাশুভের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে হইবে।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং। পাপ পুণ্যের সমস্যা মানুষের চিরন্তন সমস্যা। মানুষ পাপকে ভয় করে, কারণ পাপের ফলে ইহকালে ও পরকালে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সে পুণ্যকে চায় কারণ পুণ্য-কর্ম্ম সুখের কারণ হয়—কিন্তু কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য ইহা নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় কঠিন

হইয়া পড়ে, আবার কোন্‌টা পাপ জানিতে পারিলেও কে যেন আমাদিগকে জোর করিয়া পাপে প্রবৃত্ত করায়, অনিচ্ছন্নপি—অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে এই সমস্যাতেই পতিত হইয়া দিব্য গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার সহজ সাধারণ সমাধান হইতেছে এই যে, কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য তাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্র বিধান অবগত হইয়া কাজ করিতে হইবে। গীতা এই সমাধানও দিয়াছে (১৬.২৪), কিন্তু ইহা চরম সমাধান নহে—গীতা যদি এইখানেই থামিত তাহা হইলে গীতা গভীরতম, গুহ্যতম জ্ঞানের শাস্ত্র, অধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে পারিত না। গীতা এই সমস্যার মূল কোথায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে এবং চরম প্রতিবিধানের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

গীতা বলিয়াছে, কাম এবং ইহার সহচর ক্রোধাদি রিপুই হইতেছে পাপের কারণ—এবং এইগুলি মানব প্রকৃতিতে বদ্ধমূল। শাস্ত্র বিধান অনুসরণ করিয়া ইহাদিগকে কতকটা সংযত নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল করা যায় না—আর যতক্ষণ না ইহারা প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল হইতেছে ততক্ষণ কাহারও মুক্তি নাই, জ্ঞানী, সাধু, চরিত্রবান, সাত্ত্বিক, পুণ্যবান ব্যক্তিও ইহাদের দ্বারা যে-কোন মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হইয়া পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারেন (২।৬০)।

মানব প্রকৃতিতে কাম কোথা হইতে আসিল? সঙ্কীর্ণ অহংবোধই হইতেছে কাম অর্থাৎ বাসনা-কামনার মূল, এবং বাসনা-কামনা হইতেই অন্যান্য রিপু সকলের উৎপত্তি। অহংভাবের বশে আমরা নিজদিগকে সংসারের আর সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক বলিয়া মনে করি, আমাদের অন্তরাত্মায় আনন্দের যে চির-প্রেরণা রহিয়াছে তাহাই এই অহংভাবের দ্বারা বিকৃত হইয়া বাসনা-কামনারূপে দেখা দেয়, আমরা সব কিছুকেই নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগ, প্রতিষ্ঠা, পরিতৃপ্তির জন্য ধরিতে যাই, ইহাতে বাধা পাইলে আমাদের মধ্যে ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির উদ্রেক হয় এবং এই সমস্তই পাপ, এই সবের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সংসারে সকল পাপ ও দুঃখের মূল হইতেছে অজ্ঞান —আর অহংভাবই হইতেছে এই অজ্ঞানের গ্রন্থি। প্রকৃত সত্য এই যে, আমরা সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তি হইতে পৃথক নই—মূল সত্তায় আমরা সকলের সহিত এক, এক ভগবানই বহু জীব ও জগৎ নিজের মধ্য হইতে

বিকাশ করিয়াছেন, সকলের ভিতর তিনিই অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিয়া নিজেই নিজেকে অনন্তভাবে দেখিতেছেন, ভোগ করিতেছেন, আপনার স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দকে অনন্তরূপ, অনন্ত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বিচিত্রভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন—ইহাই তাঁহার জীব-লীলা। তাঁহার এই লীলায় কোথাও দুঃখ, পাপ, নিরানন্দের লেশ নাই, তিনি সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় সকল কর্ম্মে সচ্চিদানন্দ —আমরাও মূলতঃ সেইরূপ সচ্চিদানন্দ, কিন্তু অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি—তাই দুঃখ পাইতেছি,

তোমারই বিশ্ব আনন্দময় শোভা-সুখ-পূর্ণ,
(আমি) আপন দোষে দুঃখ পাই হে বাসনা অনুগামী।

প্রশ্ন উঠে যে, জীব যদি ভগবানের অংশ, মূল সত্তায় সচ্চিদানন্দ তাহা হইলে এই অজ্ঞানের মধ্যে সে কেমন করিয়া পতিত হইল, কেন পতিত হইল, আর এই অজ্ঞান হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? এইগুলি হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কি সাধনা করিতে হয়—গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে, কিন্তু এই প্রশ্নের বিশদ দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই বিষয়টি সকল দিক হইতে আলোচনা করিয়া সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। শঙ্করের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর সহজ, মায়াদ্বারাই জীব বিমূঢ় হয়, আর সেই মায়া অনির্ব্বচনীয়া। মায়া কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, ব্রহ্মের শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে অজ্ঞানের ছায়া কেমন করিয়া ফেলিল—সে সব প্রশ্নের কোন উত্তর মায়াবাদী দিতে পারেন না, তিনি শুধু বলেন যে, এইরূপই হয়। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা বা সমাধান নহে এবং ইহাতে মানুষের জাগ্রত বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না। আর গীতা কোথাও মায়ার এইরূপ শক্তি বা ক্রিয়া স্বীকার করে নাই। গীতার মতে জীব জগৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, ভগবানের নিজ পরা প্রকৃতি স্বাম্ প্রকৃতিং হইতেই জগৎ উদ্ভূত এবং তাহার দ্বারাই জীব ভগবানের মধ্য হইতে জগতে প্রকট হইয়াছে, জীবভূতাং যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। জীব ভগবানের অংশ, পরাপ্রকৃতিই জীবের মূল প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়াছে—তাহা হইলে তাহার মধ্যে অজ্ঞান কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা সাক্ষাৎ ভাবে এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই, কেবল এই অজ্ঞান হইতে কেমন করিয়া মুক্তি পাওয়া যায় তাহারই পন্থা

দেখাইয়াছে, কারণ সেই যুগে মানুষের সম্মুখে এইটিই ছিল প্রধান প্রশ্ন, কেমন করিয়া এই পাপতাপময়, জরা-ব্যাধি, মৃত্যু-দুঃখে পূর্ণ জীবন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে জীব আদৌ আসিল কেন? যদি জগৎ ছাড়িয়া জীবন ছাড়িয়া জীবকে চলিয়াই যাইতে হয়, তাহা হইলে এ-সবের আদৌ সৃষ্টি হইল কেন? বস্তুতঃ ভগবানের যাহা নিজ প্রকৃতি তাহা কখনই অজ্ঞান বা অচিৎ হইতে পারে না—তাহা ভগবানেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময়ী, বস্তুতঃ সে প্রকৃতি ভগবানেরই একটি দিক, কর্ম্মের দিক, লীলার দিক। ভগবান এক, তিনি নিজের আনন্দকে বিচিত্র ভাবে আস্বাদন করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ··· তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য ৬।২।১,৩)—হে সৌম্য, এই সমস্ত একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ-রূপই অগ্রে ছিল · তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন, এবং বহু হইলেন, তৎ সর্ব্বমভবৎ (তৈত্তিরীয়, ২।৬)। তাহা হইলে এই যে আমরা জড়-জগৎ দেখিতেছি, ইহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রতি জড় অণু পরমাণু ব্রহ্ম—কিন্তু ব্রহ্ম সেখানে নিজেকে এমন ভাবে লুকাইয়াছেন যে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও অচিৎরূপে অজ্ঞান জড়রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন—নিজেকে বহু রূপে প্রকট করিবার জন্য, তিনি অসংখ্য জড় পরমাণু হইয়াছেন। কিন্তু পরমাণুতে যে ব্রহ্মচৈতন্য রহিয়াছে তাহা গভীরভাবে লুক্কায়িত, বাহ্যতঃ তাহার কোন প্রকাশ নাই। প্রকাশ নাই, তাহার কারণ চৈতন্যের প্রকাশ হইতে পারে এমন কোন উপযুক্ত সংগঠন সেখানে নাই। আমাদের ভিতরে চৈতন্য থাকিলেও আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যদি নষ্ট হইয়া যায় সে-চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। ঠিক সেই ভাবে জড়ের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য আবৃত রহিয়াছে—এই ভাবেই হইয়াছে অজ্ঞানের উদ্ভব। অজ্ঞান কোন স্বতন্ত্র শক্তি নহে, অবিদ্যা বা মায়া নামে কোন শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করিতেছে—এরূপ কল্পনা করিলে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য এক শক্তি কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে আর ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ থাকেন না। বস্তুতঃ অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব মাত্র; যেমন অন্ধকার হইতেছে আলোর অভাব। বহু হইবার জন্য ব্রহ্ম নিজের জ্ঞানকে ভিতর দিকে টানিয়া লইয়া লুক্কায়িত করিয়া জড় হইয়াছেন। কিন্তু জড়ের মধ্যেই ব্রহ্মচৈতন্যের যখন প্রকাশ হইবে তখনই ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইবে—পৃথিবীর evolution বা ক্রমবিবর্ত্তনে আমরা

এই ক্রিয়াই দেখিতেছি—জড় হইতে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছে, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাণী, প্রাণী হইতে মানব। মানুষ হইতেছে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ—মানুষের মধ্যে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে অভিবিকাশ হইয়াছে তাহাতে জড়ের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মচৈতন্য নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট করিতে পারে—কিন্তু এখনও সে বিকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই, মানুষের দেহ, প্রাণ, মনে এখনও অনেক ত্রুটি ও অপূর্ণতা রহিয়াছে; পাপ, দুঃখ, ভ্রান্তি এই সব হইতেছে ঐ অপূর্ণতারই পরিণাম। যখন ঐ সব অপূর্ণতা দূর হইবে, মানুষের দেহ, প্রাণ, মন বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকট করিতে পারিবে, তখন মানুষই হইবে জড়দেহে দেবতা—তখনই ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, এক ব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্ম হইয়া পরস্পরের সহিত মিলনের, আদান-প্রদানের, প্রেমের আনন্দ আস্বাদন করিবেন—ইহাই মানুষের দিব্যজীবন, মানবজন্মের প্রকৃত লক্ষ্য।

মানুষকে দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে সে যে স্বতন্ত্র অহং নহে, সে যে মূল সত্তায় সকলের সহিত এক, ভগবানের সহিত এক, এই জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে, আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের অন্তরালে, আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে, তাহার সহিত যুক্ত হওয়া—সে আত্মা বাহিরের সকল দ্বন্দ্বের অতীত, প্রকৃতির সকল ক্রিয়া দর্শন করিতেছে, ধরিয়া রহিয়াছে, অনুমতি দিতেছে, কিন্তু তাহাতে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে না। গীতা এখানে বিভু ও প্রভু বলিতে এই আত্মাকেই বুঝিয়াছে, এবং মানুষ যাহাতে অজ্ঞান মানব-চৈতন্য হইতে উঠিয়া দিব্য আত্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে।

পাপপুণ্য আত্মাকে স্পর্শ করে না. ইহার অর্থ নহে যে মানুষের মধ্যে যে পাপপুণ্যের বোধ আছে, তাহার কোন মূল্য নাই, কোন সার্থকতা নাই। মানুষকে তাহার উর্দ্ধমুখী বিকাশে কতক জিনিষ ছাড়িয়া উঠিতে হইবে, অন্য নূতন জিনিষ লাভ করিতে হইবে, সেইজন্যই প্রকৃতি তাহার মধ্যে পাপপুণ্যের বোধ দিয়াছে। এ-বোধকে অবহেলা করিলে মানুষ নিজের বিকাশকেই ক্ষুণ্ণ করিবে। কিন্তু মানুষ যে-ভাবে পাপপুণ্যের বিচার করে তাহা হইতেছে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ, তাহার মধ্যে চরম সমাধান নাই—বাহ্য কোন বিধিনিষেধ অনুসরণ না করিয়া আমরা যখন সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের অন্তর্দেবতার প্রেরণা

অনুসরণ করিতে পারি, তখনই আমরা প্রকৃত ভাবে সকল পাপপুণ্যের অতীত হই, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (২।৫০)।

যতক্ষণ আমরা আত্মার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত হইতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমাদিগকে তাহার উপায় স্বরূপই সামাজিক, ধার্ম্মিক, নৈতিক আদর্শ ও বিধিবিধান সকল মানিয়া চলিতে হইবে।

তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ—নিশ্চেতন জড় হইতে ক্রমশঃ চেতনা ও জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে, জড়জগতে ব্রহ্মের, ভগবানের প্রকাশের উপযোগী দেহ প্রাণ মনের বিকাশ হইতেছে—ইহাই প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা এবং এই ধারাতেই ভ্রান্তি, মোহ, মিথ্যা ও পাপের উদ্ভব হইয়াছে। নিশ্চেতন জড়ের মধ্যে কোনরূপ জ্ঞানের প্রকাশ নাই—অতএব সেখানে ভুলও নাই, পাপও নাই। জড় নিজের চেষ্টায় কিছু করে না—প্রাকৃত শক্তি তাহাকে যেমন ভাবে চালিত করে সে সেইরূপই চলে। জন্তুর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহা পূর্ণ নহে, জ্ঞান সেখানে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত, তাই সেখানে ভুল হয়, প্রমাদ হয়—আর এই অবস্থাতেই ক্রমে অহংবোধের বিকাশ হয়, অহং-ভাবের বশে মানুষ নিজেকে আর সব কিছু হইতে পৃথক বলিয়া দেখে, অপরের সহিত বিরোধ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, এই ভাবেই পাপের উদ্ভব হয়। এই অহংবোধেরও সার্থকতা আছে—প্রত্যেক মানুষকে হইতে হইবে ব্যষ্টিগত ব্রহ্ম, ব্যষ্টি-নারায়ণ—তবেই ভগবানের বহু রূপ গ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে। অজ্ঞান অবস্থায় এই যে ব্যষ্টিভাবের বিকাশ তাহাই মানুষের অহং—কিন্তু এইটি হইতেছে মিথ্যা অহং, কাঁচা "আমি"—আমাদের যে প্রকৃত অহং, পাকা "আমি", তাহাতে আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানেরই এক-একটি ব্যষ্টি রূপ। অজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায় যখন আমরা আমাদের এই সত্য অহংকে পাইব, তখনই আমরা ভগবানের সহিত, সর্ব্বভূতের সহিত নিজেদের মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করিব—তখন সকলের সহিত হইবে দিব্য প্রেমের সম্বন্ধ, অবাধ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ, তখন আমাদের শুদ্ধ রূপান্তরিত দেহ, প্রাণ, মনের ভিতর দিয়া একমাত্র ভগবানেরই ইচ্ছা অব্যর্থভাবে পূর্ণ হইবে—তখন আর আমাদিগকে পাপপুণ্য সমস্যা লইয়া বিব্রত হইতে হইবে না।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে

আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ—তৈত্তিরীয় ২।৯।

যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন তিনি আর এ-সব চিন্তাদ্বারা ব্যথিত হন না—কেন আমি পুণ্য করি নাই? কেন আমি পাপ করিলাম? যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনি এই দুইটি হইতেই মুক্ত হইয়াছেন।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ১৬

অন্বয়—যেষাং তু তৎ অজ্ঞানং আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতং, তেষাং জ্ঞানং আদিত্যবৎ তৎ পরং প্রকাশয়তি।

অনুবাদ—যাহাদের মধ্যে সেই অজ্ঞান আত্ম-জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান সূর্য্যবৎ সেই পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং—যে-অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে জীব পাপপুণ্য, সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে পতিত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই সেই অজ্ঞানের নাশ হয়। কিন্তু অজ্ঞানের যদি এমন শক্তি থাকে যাহার দ্বারা সে জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ এখানে "আবরণ" কথাটি উপমা মাত্র। কোন কঠিন অস্বচ্ছ পদার্থের দ্বারা আলোক যেমন আবৃত হয়, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান ঠিক সে-ভাবে আবৃত হয় না। অজ্ঞান অর্থ ভ্রান্ত জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান; যতক্ষণ আমরা এই ভ্রান্তির মধ্যে থাকি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে সত্য জ্ঞান প্রকাশ পায় না, এই জন্যই বলা হইয়াছে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। এক অদ্বিতীয় ভগবান বহু হইয়াছেন, নিজেকে যেন বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি অখণ্ড সত্তা, তিনি কখনই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হন না। জগতে আমরা যে বহু জীব, বহু পদার্থ দেখি—সে-সব বাহ্যতঃ বহু কিন্তু মূলতঃ একই সত্তা। আমরা যে বহুকেই সত্য বলিয়া দেখি, মূলগত ঐক্যটি দেখিতে পাই না—এইটিই অজ্ঞান, ইহারই ফলে অহংবোধ, আর

আমরা এই অহংবোধের অধীন বলিয়া আমাদের প্রকৃত আত্মাকে দেখিতে পাই না, আমাদের অহং আমাদের মধ্যে ভগবানের অংশ জীবাত্মাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়—ইহাই অজ্ঞানের আবরণ। এই অজ্ঞান রহিয়াছে আমাদের মনে—পার্থিব ক্রমবিকাশে মানবদেহের মধ্যে যে মন বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে তাহা সকল বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে—তাহাদের ভিতরের ঐক্যটিকে দেখিতে পারে না, কোন জিনিষকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পারে না। আমাদের মনের যে জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, অপূর্ণ জ্ঞান। এই অজ্ঞান মনের মধ্যে থাকিলে আমরা কেমন করিয়া সত্য জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব? জ্ঞান স্ব-প্রকাশ, তাহা সূর্য্যের ন্যায় আপনি প্রকাশিত হইবে, মনের দ্বারা, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। তবে আমাদের অজ্ঞানের স্বরূপ কি, আমাদের অহংয়ের স্বরূপ কি—এ-সব সম্বন্ধে মনের দ্বারা যে বিবেক ও বিচার, যে তত্ত্বানুসন্ধান, তাহার ফলেই অজ্ঞান বা ভ্রান্তির আবরণ ক্ষীণ হইয়া আসে—তখন আমাদের ভিতর হইতে সত্য জ্ঞান আপনি প্রকাশিত হয়। গীতা আত্মার যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা দেহ, প্রাণ, মনের সকল ক্রিয়া ও বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে—এই আত্মার উপর একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করিলে আমাদের অজ্ঞান আবরণ দূর হইয়া যাইবে, আমরা সেই আত্মার সহিত একাত্মতা লাভ করিব। (৫।১৭)

আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যায় যে অজ্ঞান বলিয়া কোন সত্তা বা শক্তি নাই—উহা জ্ঞানেরই অন্য দিক উহা ভ্রান্ত জ্ঞান, অপূর্ণ জ্ঞান, জ্ঞানের অভাব। নৈয়ায়িকগণের ইহাই মত, কিন্তু বৈদান্তিক মায়াবাদী ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে অজ্ঞান একটি পৃথক শক্তি, তাহাই মায়া-শক্তি। জগৎ এই মায়ারই সৃষ্টি—ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, অথচ ইহা রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়—ইহাই অজ্ঞান; আত্মজ্ঞানের দ্বারা যখন এই মায়া বা অজ্ঞান দূর হয়, তখন ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয়, জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে ইহার বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয় সেই সর্প সৎ বা সত্য নহে, যে-হেতু রজ্জুজ্ঞান হইলেই তাহার নাশ হইয়া থাকে। আবার তাহা যে অসৎ তাহাও নহে কারণ তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের প্রতীতি হয় না। এই কারণে ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে—অতএব অনির্ব্বচনীয়।

এইরূপ মায়াও অনির্ব্বচনীয়, জ্ঞানের দ্বারা ইহার বিনাশ হয় অতএব ইহা সৎ নহে, কিন্তু ইহার কার্য্যে জগতের প্রতীতি হয়, অতএব ইহা অসৎও নহে— ইহাই মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব।

কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব বস্তুতঃ প্রমাণিত হয় না। কারণ সর্পের যদি অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে কখনই রজ্জুতে সর্পভ্রম সম্ভব হইত না। এখানে ভ্রমটি কেবল এই যে, যেখানে বস্তুতঃ সর্প নাই, মন সেখানে একটি সর্পের রূপ সৃষ্টি করে। মন যে একটি সত্য বস্তুকেই দেখে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটিকে স্বরূপে না দেখিয়া বিকৃতভাবে দেখে। ইহাই আমাদের অজ্ঞান। আমরা যে-ভাবে জগৎকে দেখিতেছি—জগৎ বহু বস্তুতে, বহু জীবে বিভক্ত, ইহার মূলে এক বস্তু নাই, ঐক্য নাই—এইটিই আমাদের মনের ভ্রান্তি। যখন এই ভ্রান্তি দূর হইবে, তখন জগৎ লুপ্ত হইবে না, কেবল জগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে—আমরা দেখিব এক ব্রহ্মই এই সমুদয় জগৎ হইয়াছেন, উপনিষদের ভাষায় সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।

মায়া শক্তি, কিন্তু তাহা পৃথক শক্তি নহে, ভগবানেরই শক্তি—এই শক্তির দ্বারাই এক ভগবান নিজেকে বহুরূপে প্রকট করিয়াছেন, অসীমের মধ্যে সসীম রূপের বিকাশ করিয়াছেন—ইহাই জগৎ, ইহা মিথ্যা নহে। কিন্তু এককে বহু হইবার জন্য দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিতে হইয়াছে—এবং এই বিকাশ-ক্রিয়ার সহায়রূপে মানুষের মধ্যে অহংভাবের উদ্ভব হইয়াছে—ইহা মায়ারই একটি খেলা, ইহার বশে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে ভগবান হইতে, অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে—ভগবানের সহিত পুনর্মিলনের গভীর আনন্দের জন্যই এই ভেদ জ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের সকল ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্ত আনন্দ। এ জগৎ মিথ্যা নহে, ভগবানের আনন্দলীলা—আর মায়া হইতেছে ভগবানকে আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহারই চিন্ময়ী শক্তি—ইহা অসৎ নহে সৎ। যদি বলা যায়, জগতের নাশ হয় তাহা হইলে ইহা কেমন করিয়া সৎ হয়, ইহার উত্তর এই যে, জগতের রূপেরই নাশ হয়, কিন্তু তাহা আবার নূতন রূপে আবির্ভূত হয়— জগতের এই পুনরাবর্ত্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, চলিবে, অতএব তাহা অসৎ নহে।

মন ভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে—কিন্তু জগৎ মনের এই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি নহে। মন রজ্জুও সৃষ্টি করে না, সর্পও সৃষ্টি করে না—এই দুই বস্তুই বর্ত্তমান আছে বলিয়া মন একটিকে অপরটি বলিয়া দেখে, একটিকে দেখিয়াই অপরটির মানসরূপ সৃষ্টি করে। জগৎ এক অতিমানস শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভগবানের পরাপ্রকৃতি, দিব্য মায়া—অতএব ইহা ভ্রম নহে, ইহা সত্য ; মনের অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইলে আমরা জগতের প্রকৃত স্বরূপটি দেখিতে পাইব।

প্রকাশয়তি তৎ পরম্—যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ হয় তাহা মানসিক যুক্তিতর্কমূলক জ্ঞান নহে—তাহা সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ, অজ্ঞান-মেঘ দূরীভূত হইয়া তাহা যখন আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাহার দিব্য আলোকে আমাদের সত্তার, আমাদের চৈতন্যের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আমরা উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠি। এই সত্য-সূর্য্য আমাদের মধ্যে অজ্ঞানের দ্বারা লুক্কায়িত রহিয়াছে, ঋগ্বেদের ভাষায়, তৎ সত্যম্ সূর্য্যম্ তমসি ক্ষীয়ন্তম্। "দুঃখ-দ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচের প্রকৃতি হইতে বহু উর্দ্ধে নির্ম্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত, এখানকার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের পাপের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না, পুণ্যের অভিমানও তিনি গ্রহণ করেন না ; নীচের প্রকৃতির সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, জয়েতে আমরা যে সুখ পাই তাহাতেও তিনি উদাসীন, পরাজয়ে আমরা যে দুঃখ পাই তাহাতেও তিনি উদাসীন ; তিনি সকলের ঈশ্বর, পরমতম, সর্ব্বব্যাপী, প্রভু, বিভু, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সর্ব্ব বস্তুতে সমান, প্রকৃতির মূল উৎস,—তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, পরন্তু প্রকৃতি এবং তাহার কর্ম্মের দ্রষ্টা ; কর্ত্তা বলিয়া আমাদের যে-ভ্রম এই ভ্রমও তাঁহার দেওয়া নহে, এই নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু এই মুক্ত অবস্থা, এই ঈশ্বরত্ব, এই শুদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই না ; প্রকৃতিগত অজ্ঞানের দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, আমাদের সত্তার মধ্যে ব্রহ্মের যে চিরন্তন আত্ম-জ্ঞান নিগূঢ় ভাবে রহিয়াছে, ঐ অজ্ঞান তাহাকে আমাদের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখে। কিন্তু যাঁহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের প্রাকৃত অজ্ঞান দূর করিয়া দেয় ; বহুকাল লুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায় এই জ্ঞান প্রকাশিত

হয় এবং নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্বসকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত পরম স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেয়, আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি তৎ পরম্।"

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা স্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

অন্বয়—তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মনঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি।

অনুবাদ—যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে তাহাতেই নিবিষ্ট, তাহাতেই যাহাদের আত্মভাব, তাহাতেই যাহাদের নিষ্ঠা, তাহাই যাহাদের পরম লক্ষ্য, জ্ঞান-সলিল দ্বারা যাহাদের সর্ব্বপাপ ধৌত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ আর জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য থাকেন না।

ব্যাখ্যা

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ—বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও অন্ধকারে যেমন তাহার সত্তার উপলব্ধি হয় না, তেমনই আমাদের মধ্যে আত্মা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, জ্ঞানের দ্বারা এই অন্ধকার দূর হইলে তাহা আপনিই প্রকাশিত হয়। কি উপায়ে এইরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় এবং তাহার ফল কি হয় এই শ্লোকে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আত্মাতেই আমাদের সমগ্র বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু যখন আত্মার সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই তখন কিরূপে তাহাতে মন ও বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করা যায়? জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে প্রথমে আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে হয়, তাহার পর সেই পরোক্ষজ্ঞানলব্ধ বস্তুটিতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে লাগিয়া বা মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। সাধক যাহাতে আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে পারে সে-জন্য গীতা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে, আত্মা কাহারও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্বভাব সৃষ্টি করে না, কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করে না, এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে আত্মা, দেহ প্রাণ মনের সকল ক্রিয়া, সকল বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে শান্ত, অচল, অক্ষররূপে বিরাজ করিতেছে—এই অক্ষর আত্মায় সর্ব্বদা মন ও বুদ্ধিকে লাগাইয়া রাখিলে, সর্ব্বদা তাহারই ধ্যান

করিলে, ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (১৮।৫২) এবং এইভাবে শুধু নিজেদের মধ্যেই নহে সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে ঐ এক আত্মাকে দর্শন করিলে আমরা মনে, বুদ্ধিতে ও অন্তরতম অধ্যাত্ম সত্তায় ঐ এক শান্ত, অচল, অক্ষর আত্মার সহিত এক হইয়া উঠি, তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মনঃ ; নিম্নপ্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত মন যে অন্ধকার ও দুঃখের অধীন রহিয়াছে জ্ঞান-সলিলের দ্বারা আমাদের সে-সব কল্মষ ধৌত হইয়া যায়।

তদাত্মনঃ—আমরা যখন কোন বিষয়ে একান্তভাবে মন ও বুদ্ধিকে নিবেশ করি, আমরা ক্রমশঃ তন্ময় হই, তাহার সহিত এক হই, তাদাত্ম্য লাভ করি। শুদ্ধ আত্মায় মনোনিবেশ করিয়া আমরা তাহার সহিত এক হই, আত্মাই হইয়া উঠি। শ্রুতিও বলিয়াছে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯) ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়। ব্রহ্মবিৎ শব্দ দ্বারা জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্ম ও জীবে প্রভেদ করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এইরূপ কোন ভেদ স্বীকার করেন না, তিনি বলেন, জীব ব্রহ্মই—অন্য কিছু নহে। ব্রহ্ম যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক মাত্র সত্য বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না—তথাপি ব্রহ্ম ও জীবে অবস্থাগত ভেদ আছে ইহা শ্রুতিতে অতি স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ভেদ না থাকিলে সাধনা, উপাসনা, মোক্ষ এ-সব কথার কোন অর্থই থাকে না। শ্রুতি বলিতেছে, "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ", ধ্যাতা পুরুষ তৎপর সেই নিষ্কল পরব্রহ্মকে দর্শন করেন। এই স্থলে ধ্যানকর্ত্তা জীবের এবং ধ্যাতব্য ব্রহ্মের মধ্যে ধ্যাতা ধ্যাতব্য এবং দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যভাবে ভেদ দেখান হইয়াছে। 'পরাৎপরম্ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্'—"সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে উপাসক প্রাপ্ত হয়েন"—এই বাক্যে ব্রহ্ম গন্তব্য এবং জীব গমনকর্ত্তা এইরূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি"—"যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালন করিতেছেন"—এই বাক্যে ব্রহ্ম নিয়ন্তা এবং জীব নিয়ন্তব্য এইরূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতাও এই শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে—তৎ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া জীব ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শঙ্কর ভেদ-সমর্থক এই সকল শ্রুতিকে মিথ্যা বলেন না, তিনি বলেন ভেদ পারমার্থিক সত্য নহে, ইহা অবিদ্যা-কল্পিত—এই অবিদ্যা দূর হইলেই ভেদও দূর হয়। কিন্তু ভেদ যদি সত্য না হয়, তবে তাহা দূর করিবার জন্য সাধনা কেন?

আর সে সাধনা কে করিবে? শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য সত্যই জীব হন নাই, তিনি আপনাকে জীববৎ মনে করিতেছেন; আবার তিনি যখন মনে করিবেন, "আমি জীব নহি", তখন আর জীবভ্রম তাঁহার ঘটিবে না। কিন্তু ইহা আদৌ গীতার মত নহে, গীতায় কোথাও জীবকে অবিদ্যা-কল্পিত বলা হয় নাই। বরং স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মেরই অংশ জীব হইয়াছে, মমৈবাংশো সনাতনঃ, সুতরাং জীবের কর্ত্তব্য আছে, সাধনা আছে, ব্রহ্মসূত্র ও গীতায় এই কথাই বলা হইয়াছে; শঙ্করের মায়াবাদ-মূলক ব্যাখ্যা ইহার বিরোধী। এক ব্রহ্মই নিজ মায়াশক্তি বলে বহু হইয়াছেন—এই মূল মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান নহে, ইহা ভগবানেরই পরা প্রকৃতি, স্বাং প্রকৃতিম্, ইহা কখনও মিথ্যা বা ভ্রমের সৃষ্টি করে না। মানুষের মন এই পরাপ্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহা অজ্ঞানের অধীন, এবং ইহাই অবিদ্যা মায়া—কিন্তু জীব ও জগৎ এই অবিদ্যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বিদ্যা মায়া বা পরা প্রকৃতির দ্বারা। এই দিব্য মায়ার দ্বারাই এক ব্রহ্ম বহু হইয়াছেন, ব্রহ্মের একত্ব যেমন সত্য, তাহার বহুত্বও তেমনই সত্য, কোনটিই ভ্রম নহে। মানুষ যে একত্বের দৃষ্টি হারায়, বহুকে বহু বলিয়াই দেখে, তাহাদের অন্তর্নিহিত একত্ব দেখিতে পায় না—এইটিই অবিদ্যা, অজ্ঞান; ইহারও সার্থকতা আছে, এই অবিদ্যার ভিতর দিয়াই এক ব্রহ্ম চূড়ান্ত ভাবে বহু হইয়াছেন; যখন এই অজ্ঞান দূর হইবে তখন বহুত্বের লোপ হইবে না, বহুত্বের মধ্যেই একত্বের উপলব্ধি হইবে, তখনই মানুষ এই জড়দেহেই অমৃতত্ব লাভ করিবে,—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা
বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ঈশা—১১

গীতা এখানে তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মনঃ বলিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের এ একত্ববোধের কথাই বলিয়াছে ইহাতে জীবের জীবত্ব লোপ হয় না, কেবল তাহার অজ্ঞান অহংভাব দূর হইয়া যায়, সে যে ব্রহ্মের অংশ, মূল সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক তাহাই উপলব্ধি করে।

তন্নিষ্ঠাঃ—শঙ্কর ও মধুসূদন সরস্বতী 'তন্নিষ্ঠা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপ নিবৃত্ত করিয়া সেই একমাত্র ব্রহ্মে যাঁহাদের নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি তাঁহারাই "তন্নিষ্ঠ" অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ। কিন্তু নিষ্ঠা শব্দের ব্যাখ্যায় কর্ম্মত্যাগের কথা কেমন করিয়া আইসে? ব্রহ্মে

যাহাদের স্থির মতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্যই যাহাদের সকল প্রয়াস ও সাধনা তাহাদিগকে তন্নিষ্ঠ বলা যায়—কর্ম্মযোগও এইরূপ সাধনা। গীতা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছে, কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বড়। সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে, আত্মজয়ী যোগী পুরুষ কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত হন না। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠার উল্লেখ করা হইয়াছে—জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সমগ্র গীতারই শিক্ষা হইতেছে উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞানের, ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত সকল প্রকার কর্ম্মের সমন্বয় করা। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য চাহিয়াছিলেন, সন্ন্যাসবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সেই জন্যই কর্ম্মকে খণ্ডন করিতে। কিন্তু গীতা হইতে এই বাদের সমর্থন করিতে হইলে গীতার সুস্পষ্ট কথাগুলির কিরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে হয়, শঙ্করের গীতা-ভাষ্যে তাহার এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শঙ্করের অনুসরণে মধুসূদন সরস্বতী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিচারেই তৎপর তাঁহারা তন্নিষ্ঠাঃ।" "ইহার দ্বারা সকল প্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণ ও মননের পরিপাক স্বরূপ বেদান্ত-বিচার কথিত হইয়াছে ; এই বেদান্তবিচারের ফলে প্রমাণ ও প্রমেয়ের উপর যে অসম্ভাবনা তাহার নিবৃত্তি হয়।"* এই যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিয়া সংসারের কোলাহল হইতে বহু দূরে সুরম্য প্রকৃতির ক্রোড়ে অবস্থিত নির্জ্জন আশ্রমে বসিয়া উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের সহায়ে পরমতত্ত্ববিচারে নিমগ্ন থাকা—এই আদর্শের দিকে ভারতবাসী প্রাচীন কাল হইতেই অতিশয় আকৃষ্ট, শঙ্করের মধ্যে এই সন্ন্যাসবাদ চরমে উঠিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা এইরূপ বাহ্য সন্ন্যাসের অনুকূল নহে। ব্রহ্মে ও আত্মায় মন ও বুদ্ধিকে স্থির নিবিষ্ট করিবার শিক্ষা গীতা পুনঃ পুনঃ দিয়াছে, এবং সেজন্য আত্মার স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে—কিন্তু গীতা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে, সংসার ত্যাগ করিতে বলে নাই, ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত বলিয়াছে। গীতার শিক্ষার এই মুখ্য দিকটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়াই শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ গীতা হইতে সন্ন্যাস-

---

* "বেদান্ত বিচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না" এই প্রকার যে জ্ঞান তাহা প্রমাণগত অসম্ভাবনা। আর ব্রহ্ম আছে বা নাই, না থাকাই সম্ভব—এই প্রকার যে জ্ঞান ইহাই প্রমেয়গত অসম্ভাবনা।

বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গীতার শিক্ষা কোন নির্জ্জন আশ্রমে গুরু-শিষ্য সংবাদ নহে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রণক্ষেত্রে রথী ও সারথির এই সংবাদ হইতে কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা বাহির করিলে গীতাকে সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যর্থ করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তন্নিষ্ঠাঃ শব্দের ব্যাখ্যায় গীতার অন্যান্য বিখ্যাত প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ কর্ম্মত্যাগের কোন কথাই বলেন নাই। রামানুজ বলিয়াছেন, তন্নিষ্ঠাস্তদভ্যাসনিরতাঃ। তদাত্মনঃ শব্দে রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বিষয়মনসঃ, সেই ব্রহ্মজ্ঞানে মন নিবেশ করা। আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, মূল সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক হওয়া, যে ব্যাখ্যা শঙ্করেরও অনুযায়ী, রামানুজ তাহা গ্রহণ করেন না, কারণ তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীব মূলতঃ চিরভিন্ন, ব্রহ্মের সহিত জীবের কখনই তাদাত্ম্য হইতে পারে না; তাই তদাত্মনঃ বলিতে তাহাতে মন নিবেশ করা—রামানুজ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আর তন্নিষ্ঠাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, ঐ জ্ঞান অভ্যাস করা। ব্রহ্ম হইতেছেন জীব ও জগৎ, চিৎ ও অচিৎ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন, এই সব তাঁহার শরীর, তিনি ইহাদের অন্তর্য্যামী আত্মা, নিয়ন্তা, প্রভু, ঈশ্বর—কেবলমাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয় ইহাই রামানুজের মত। এই জ্ঞান লাভের জন্য তিনি শঙ্করের ন্যায় কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, তিনি বলেন, শাস্ত্রানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সম্পাদন করিলে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং কৃপা করিয়া ভক্তকে জ্ঞানের দিব্য জ্যোতি আনিয়া দিয়া তাহার সকল অজ্ঞান, অন্ধকার, পাপ, বন্ধন দূর করিয়া দেন। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত ইহারই অনুরূপ।

তৎপরায়ণাঃ—আমাদের এই সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল নিম্নতন প্রাকৃতিক জীবনের উর্দ্ধে যে শান্ত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মা প্রভু ও বিভু রূপে আমাদের সকল কর্ম্মের নিশ্চল সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকেই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য ও গতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শঙ্কর বলিয়াছেন, তদেব পরং অয়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ। এখানে ব্রহ্মকে যে জীবের পরম গতি বলা হইয়াছে, ইহাতেই ব্রহ্ম ও জীবের স্পষ্ট ভেদ স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু শঙ্কর বলেন, এই ভেদ বস্তুতঃ নাই, ইহা অবিদ্যা-কল্পিত ভ্রান্তি মাত্র। যে সকল শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ সূচিত হইয়াছে, শঙ্কর কেবল সেইগুলির উপরেই জোর দিয়াছেন, যথা, তত্ত্বমসি,

সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—কিন্তু এই সকল বাক্যের মধ্যেও তৎ এবং ত্বম্, সঃ এবং অহং, অহং এবং ব্রহ্ম, এইরূপ ভেদ রহিয়াছে, নতুবা এই সকল বাক্যের কোন অর্থই থাকে না। এই ভেদ ও অভেদের সমন্বয় করিলে বলিতে হয়, জীব ব্রহ্মের অংশ, অর্থাৎ জীব মূল সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক, কিন্তু প্রকৃতিতে জীব ব্রহ্মের অংশ, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ অসত্য, অভেদই সত্য; রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য বলেন, ভেদই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ও গীতার মতে ভেদের মধ্যে অভেদ, অভেদের মধ্যে ভেদ—ইহাই হইতেছে ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ অভিব্যক্তির নিগূঢ় রহস্য, বেদান্তের অন্যান্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

গীতার এই শ্লোকে "তৎ" শব্দের দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম বুঝা হইয়াছে—ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে যে "তৎ পরম্" জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, কিং তদ্‌ব্রহ্ম? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উত্তরে বলিলেন, অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং। কিন্তু এই অক্ষর ব্রহ্মই পরমতম তত্ত্ব নহে, ইহা প্রকৃতির সকল দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের উর্দ্ধে, তাই ইহাকে পরমং বা পরং বলা হইয়াছে। পরমতম তত্ত্ব হইতেছেন পুরুষোত্তম, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতেই আমাদের মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করিতে হইবে, ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (১২।৮)। এই পঞ্চম অধ্যায়েরই শেষে বলা হইয়াছে, জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। অক্ষর ব্রহ্মও পুরুষোত্তম হইতে কোন ভিন্ন সত্তা নহে, উহা তাঁহারই একটি ভাব, aspect, ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ (১৪।২৭)। এখানে অক্ষর ভাবের উপরই মনোনিবেশ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ এইরূপেই আমরা নিম্নতন প্রকৃতির অজ্ঞান ও অহং ভাব হইতে, ইচ্ছা দ্বেষ দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি।

এই শ্লোকে তদ্‌বুদ্ধয়ঃ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সাধনার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে না সিদ্ধির অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে? শেষেরটিই শঙ্করের মত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, (পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত) যে পরম তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাকেই যাঁহাদের বুদ্ধি অবলম্বন করে, তাঁহারাই "তদ্‌বুদ্ধি"। মধুসূদন সরস্বতী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানেন পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশে সতি, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে পর। তিনি বলিয়াছেন, "তদ্‌বুদ্ধয়ঃ" এই শব্দটির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সূচিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী

শব্দগুলিতে এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের সাধনার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শঙ্করের মতে কিন্তু এই সমগ্র শ্লোকটিই হইতেছে আত্মজ্ঞানী যতিগণের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই শ্লোকটিতে আত্মজ্ঞান লাভের সাধনাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা, মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, অপরোক্ষজ্ঞানাব্যবহিতসাধনমাহ—তদ্‌বুদ্ধয় ইতি। রামানুজও তদ্‌বুদ্ধয়ঃ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তথাবিধ আত্মজ্ঞানলাভে যাহারা অধ্যবসায়শীল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখানে তদ্‌বুদ্ধয়ঃ ইত্যাদি চারিটি শব্দের দ্বারা সাধনা ও সিদ্ধি দুই-ই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে আত্মা সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় তাহাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলে ক্রমশঃ আমরা তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মনঃ হইয়া উঠি—বুদ্ধিতে ও অন্তরতম চেতন সত্তায় সেই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত এক হই। তাহাই অপরোক্ষানুভূতি।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং—জ্ঞানের দ্বারা অন্তরের মধ্যে আত্মা প্রকাশিত হইলে জীব উপলব্ধি করে যে, সে দেহ, প্রাণ, মনে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অহং নহে, প্রকৃতির সকল করণ ও ক্রিয়ার উর্দ্ধে অবস্থিত আত্মা বলিয়া, শুদ্ধ, অনন্ত, অপাপবিদ্ধ, অক্ষর আত্মা বলিয়া নিজেকে জানিতে পারে—তখন সে সকল ব্যথা ও বিক্ষোভের অতীত হয়। অক্ষর ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতির ক্রিয়ায় বদ্ধ নহেন, প্রকৃতির বশে জন্ম মৃত্যুর অধীন হন না, মুক্তজীবও অক্ষরের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করিয়া পুনর্জন্মের দ্বারা প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে ফিরিবার বাধ্যতা হইতে মুক্ত হয়।

এই যে অপুনরাবৃত্তি, এই দুঃখতাপময় সংসারে যেন আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এইটিই ছিল সেই যুগের সাধনার পরম লক্ষ্য। গীতা এখানে বলিতেছে যে, গীতোক্ত সাধনার দ্বারাও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। অক্ষরের সহিত এক হইতে পারিলেই প্রকৃতির সকল বন্ধন ও বশ্যতা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, মুক্ত পুরুষ আর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। ভগবানের সহিত তিনি যুক্ত হন, এক হন, ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের কার্য্যের জন্য ভগবানেরই ন্যায় পুনঃ পুনঃ তিনি এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সে জন্ম আর কর্ম্মফলের দ্বারা বাধ্য হইয়া প্রকৃতির অধীনে জন্ম নহে, তাহা হইবে প্রকৃতির প্রভুরূপে ভগবৎকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জন্মগ্রহণ।

শঙ্কর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না, কারণ তাঁহার মতে মুক্তি অর্থে ব্রহ্মের মধ্যে জীবত্বের লয়, তাহার পর আর কে এই সংসারে ভগবানের কর্ম্ম করিতে ফিরিয়া আসিবে? কিন্তু তাঁহারই মত হইতেছে মায়া ব্রহ্মের মধ্যে জীবের সৃষ্টি করে, জীব জ্ঞানলাভে ব্রহ্মের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইলেও তাহার পর মায়া যে আবার তাহাকে সংসারে টানিয়া আনিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? যাহাই হউক গীতার মতে জীব অজ্ঞান বা অবিদ্যা মায়ার সৃষ্টি নহে, পরাপ্রকৃতি বা বিদ্যা মায়াই রহিয়াছে জীবপ্রকটনের মূলে, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা। আর এই জীব কখনই সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় না, কারণ গীতা স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মের অংশরূপী জীবকে সনাতন বলিয়াছে, মমৈবাংশো সনাতনঃ; এবং বলিয়াছে জ্ঞান ও মুক্তি লাভের পর জীব ভগবানের ভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, মদ্‌ভাবমাগতা, ভগবানের মধ্যে বাস করে, ময্যেব নিবসিষ্যসি—জীবত্বের সম্পূর্ণ বিলোপের কথা গীতা কোথাও বলে নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জীব সনাতন হইলেও, সে একবার ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইলে, ভাগবত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার এই অজ্ঞান দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিবে কেন? আসিবে সে যেমন জ্ঞানলাভ করিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছে অন্যকেও সেই পদলাভে সাহায্য করিতে, লোকসংগ্রহায়। আর এই ভাবে সংসারে আসিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইলেও অমৃত অবস্থা হইতে তাহার কখনও পতন হইবে না, কারণ ভগবানের মধ্যে, ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করাই অমৃতত্ব, যিনি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র এক ভগবানকেই দেখিতেছেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন—তাহার আর অমৃতত্ব হইতে পতন হয় না।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৬।৩১

ইহাই প্রকৃত অপুনরাবৃত্তি। গীতা অন্যত্র এই কথাই বলিয়াছে, মামুপেত্য চ কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে, যে আমাকে লাভ করিয়াছে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থাৎ তাহাকে আর কর্ম্মের বশে বাধ্য হইয়া সংসারের দুঃখদ্বন্দ্বময় চৈতন্যের মধ্যে পতিত হইতে হয় না। তিনি এই সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও সচ্চিদানন্দের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, এবং অমৃতত্ব লাভ বলিতে প্রকৃতপক্ষে সংসারের মধ্যে থাকিয়া অমৃতত্বলাভই বুঝায়,

কারণ মূল সত্তায় জীব ত সকল সময়েই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ, তাহারই ন্যায় সচ্চিদানন্দ অমৃত। সেখানে ফিরিয়া গিয়াই যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় তাহা হইলে জীবের এই জীবন লীলায়, এই সংসার লীলায় আবির্ভূত হওয়ার সার্থকতা কি? মায়া ব্রহ্মকে জীবরূপে দুঃখময় সংসার ভোগ করিতে বাধ্য করে—এমন কথা বলিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়, ব্রহ্ম আর শুদ্ধ অদ্বৈত থাকেন না। মায়া ব্রহ্মেরই চিন্ময়ী শক্তি; ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগৎকে প্রকট করিয়াছে, যেন এই জগতের মধ্যেই জীব অমৃতত্বলাভ করিতে পারে—ইহাই গীতার অদ্বৈত, প্রকৃত বিশুদ্ধ অদ্বৈত।

সংসারে জন্ম পরিত্যাগ করিয়া নহে, এই জন্মের মধ্যেই অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে, ইহা উপনিষদেরও বাণী—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ঈশা ১২
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ঈশা ১৪

যাঁহারা অসম্ভূতির অনুসরণ করেন তাঁহারা অন্ধ তমসের মধ্যে প্রবেশ করেন; যাঁহারা কেবল সম্ভূতিতে (সম্ভূতি = জন্ম) রত হন তাঁহারা যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন॥ ১২

যিনি জানেন যে ব্রহ্ম (তৎ) সম্ভূতি (জন্ম) ও বিনাশ (অসম্ভূতি) উভয়ই, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সম্ভূতির দ্বারা অমৃতত্ব উপভোগ করেন॥ ১৪

মানুষের যে বর্ত্তমান জীবন দুঃখ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ—ইহাই সম্ভূতি বা জন্ম (Birth) নামে অভিহিত, এবং এই জীবন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ যে শান্ত চৈতন্যময় অবস্থা লাভ করে তাহাই অসম্ভূতি বা অ-জন্ম (Non-Birth)। অহংবোধই হইতেছে জন্মের গ্রন্থি; এই বোধের নাশ হইলে, অহংয়ের বিলয় হইলেই আমরা অসম্ভূতি অবস্থা লাভ করি। সেই জন্যই অসম্ভূতি বা অজন্মকে এখানে বিনাশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই যে জন্ম এবং অ-জন্ম, ইহা মূলতঃ দৈহিক ব্যাপার নহে, ইহা হইতেছে অন্তরের চৈতন্যের পরিবর্ত্তন। মানুষ অহংবোধের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়াও এই স্থূল দেহের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু যদি সে একান্তভাবে অহংনাশের উপরেই জোর দেয়, তাহা হইলে আর

তাহাকে দেহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হইলেই সে জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। অন্য পক্ষে সে যদি জন্মে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে অহংবোধ তাহাকে পুনঃ পুনঃ নূতন জন্ম ও দেহের মধ্যে লইয়া আসে।

জন্মের প্রতি আসক্তি কিম্বা অ-জন্মের প্রতি আসক্তি কোনটিই পূর্ণ পন্থা নহে—কারণ আসক্তি মাত্রই হইতেছে অজ্ঞানের ক্রিয়া এবং সত্যের উপর অত্যাচার—ইহার ফলও হয় অজ্ঞান, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। জন্ম ও অ-জন্ম দুইয়েরই শুভ ফলও আছে, অশুভ ফলও আছে—উভয়ের সমন্বয়েই মানুষের পরম শুভ বা নিঃশ্রেয়স্। ব্রহ্ম হইতেছেন বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই, জন্ম ও অ-জন্ম দুই-ই। আত্মার জন্ম ও মরণ নাই ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে, ন জায়তে ম্রিয়তে বা; জন্ম ও মৃত্যুর অতীত অনন্ত ও বিশ্বাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ভিতরে সেই প্রতিষ্ঠা লইয়া বাহিরের যে জীবন-লীলা তাহাই মুক্ত ও দিব্য জীবন লীলা। একটির জন্য অপরটির প্রয়োজন। নিশ্চল নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্মের বিশুদ্ধ ঐক্যের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াই জীব অহংভাবের নাশ করে, জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এইভাবে মুক্ত হইয়া সে পুরুষোত্তমের সহিত এক হয় (সম্ভূতি ও অসম্ভূতি হইতেছে তাঁহার দুইটি বিভাব—তাঁহার মধ্যে একই সঙ্গে রহিয়াছে) এবং জন্ম ও জীবনের মধ্যে থাকিয়াই অমৃতত্ব উপভোগ করে, তাহাকে আর প্রকৃতির মোহ-চক্রে বদ্ধ হইতে হয় না। তখন আর জন্মের বাধ্যতা থাকে না, তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটিয়া যায়; কিন্তু জন্মগ্রহণের স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকে। কারণ ভগবান তাঁহার নিত্য শাশ্বত অবস্থা এবং বিশ্ব-লীলা দুই-ই এক সঙ্গে স্বাধীন মুক্তভাবে উপভোগ করেন।

অতএব জীব অহংভাবের বিনাশ করিয়া এবং জন্মের প্রতি আসক্তি নাশ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে; সে সকল প্রকার দ্বন্দ্বের ও বন্ধনের অতীত হয়। এই মুক্তি লাভ করিয়া সে জীবনকে গ্রহণ করে প্রকৃতিকে বশ করিয়া, তাহার অধীনে অবশ হইয়া নহে, এবং এই মুক্ত ও দিব্য জীবনলীলার ভিতর দিয়া অমৃতত্ব আস্বাদন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাক্‌তে পারে—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাক্‌তে পারে। এর দুটি

উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা হয়, তারপর রসাস্বাদনের জন্য। এই বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি—এতে দোষ নাই। বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়।"

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—বুদ্ধি ও আত্মায় আমরা যখন অক্ষর ব্রহ্মের সহিত এক হই, তখন জ্ঞানরূপ সলিলের দ্বারা নীচের জীবনের সকল কলুষ, সকল দুঃখ ও অন্ধকার ধৌত হইয়া যায়। এখানে জ্ঞানকে জলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু বেদে জলকে জ্ঞানের প্রতীক (symbol) রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা—ঋতস্য ধারাঃ, আপো বিচেতসঃ, সর্ব্বতীর আপঃ। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে জ্ঞানীর যে-সব লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে এ-সব কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভব, অন্য আশ্রমে নহে, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষা যতয় ইত্যর্থ।" কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, গীতা কোথাও সন্ন্যাস আশ্রমকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। এই অধ্যায়ের সারমর্ম পরের অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে, কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী, সংসার-ত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাসী বা যোগীর প্রকৃত লক্ষণ নহে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া কি ভাবে সংসারে বাস করেন, এই অধ্যায়েই পরের কয়েকটি শ্লোকে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

অন্বয়—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, শ্বপাকে, গবি হস্তিনি শুনি চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

অনুবাদ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুকুরে জ্ঞানিগণ সমদর্শী।

ব্যাখ্যা

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা গীতা জ্ঞানী ও মুক্ত পুরুষের যে-সব লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছে, শঙ্করের মতে তাহা সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভব, গার্হস্থ্য প্রভৃতি অন্য আশ্রমে নহে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা গীতার সুস্পষ্ট মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। গীতা সন্ন্যাস আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা

আদৌ স্বীকার করে নাই, সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় হওয়া সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে, নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ (৬।১)। জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ করেন, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্য ২-২৩-১); গীতা এই শ্রুতি-বাক্যই এখানে অনুসরণ করিয়াছে, এবং এই অধ্যায়ের ১-১২ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, এই অবস্থাতেও কর্ম্ম দূর হয় না। "শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে জানা যাইবে যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' হইবার পরেও তিন আশ্রমের কর্ম্ম-কর্ত্তার বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়া থাকিবে এবং এই উপনিষদের শেষে এই অর্থই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে, (ছা—৮।১৫।১)। ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া গেলে এই অবস্থা জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বলে। অধ্যাত্মবিদ্যার ইহাই পরাকাষ্ঠা।" (গীতারহস্য)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বাহ্য-রূপকে সনাতন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কোন যুগে কোন অবস্থায় উহা হয়ত উপযোগী ছিল কিন্তু চিরকালই যে উহার উপযোগিতা থাকিবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ মহাভারত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সে-যুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই জন্যই গীতা বর্ণাশ্রমের বাহ্য রূপের উপর জোর না দিয়া উহার পশ্চাতে যে শাশ্বত সনাতন সত্য ছিল, যুগে যুগে কাল-ধর্ম্ম অনুসারে যাহা বিভিন্ন বাহ্য রূপ গ্রহণ করিতে পারে ও করে, সেই অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম সত্যটিই দেখাইয়া দিয়াছে, এবং ইহাই গীতার পদ্ধতি।

বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম প্রথা বিশুদ্ধ ভাবে আদৌ কখনও প্রচলিত ছিল কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের স্থান আছে। পূর্ব্বমীমাংসা-কর্ত্তা জৈমিনি আচার্য্য বলেন শাস্ত্রে গার্হস্থ্য আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমের বিধি নাই, তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন (ব্রহ্মসূত্র—৩।৪।১৮)। কিন্তু উত্তরমীমাংসাকর্ত্তা বাদ-রায়ণের মতে গার্হস্থ্য আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমও অবশ্যই অনুষ্ঠেয় (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৯-২০)। গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া বলিয়াছে, সন্ন্যাস অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কিন্তু তাহা বাহ্য সন্ন্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাস, তাহা গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই সম্ভব এবং অনুষ্ঠেয়। গীতার এই তত্ত্ব যোগবাশিষ্ঠেও স্বীকৃত হইয়াছে।

ইমং বিশ্বপরিস্পন্দং করোমীত্যন্তবাসনম্।
প্রবর্ত্ততে যঃ কার্য্যেষু স মুক্ত ইতি মে মতিঃ॥ ৫।৬।১
অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমম্।
আগতানাং চ সম্ভোগঃ ইতি পণ্ডিতলক্ষণম্॥ ৪।৪৬।৮
হেয়োপাদেয়কলনে মমেত্যহমিহেতি চ।
যস্যান্তঃ সংপরীক্ষণে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৫।১৬।২০
মৌনবহ্নিরহংভাবো নির্ম্মলো মুক্তমৎসরঃ।
যঃ করোতি গতোদ্বেগং মহাকর্ত্তা স উচ্যতে॥ ৬।১১৫।১৩

অর্থাৎ "মুক্ত পুরুষ নিজকর্ম্মকে বিশ্বকর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া মনে করেন এবং নিষ্কাম ভাবে সে সব সম্পন্ন করেন। অনাগত ভোগে তাঁহার লালসা নাই, আগত ভোগ গ্রহণ করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন না। অহং ও মম ভাবের নিঃশেষ করিয়া তিনি হন জীবন্মুক্ত ও মহাকর্ত্তা" গীতার মতেও এইরূপ সন্ন্যাস অনুষ্ঠেয়, কিন্তু তাহা বাহ্য সন্ন্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাস—গীতায় ইহা ত্যাগ নামে অভিহিত হইয়াছে—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। ৫।৩

এই শ্লোকে (৫।১৮) গীতা বলিতেছে যে, জ্ঞানলাভের ফল হয় সমদৃষ্টি, সাধারণ মানুষ যেখানে বৈষম্য দর্শন করে, জ্ঞানী ও মুক্তপুরুষ সেখানে দেখেন সাম্য। গীতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছে, জ্ঞানী-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে, কুকুর ও গাভীকে সমান বলিয়া দেখেন। এই সব দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝা যায় যে, জ্ঞানীব্যক্তি সংসারে সমাজের মধ্যেই থাকিবেন—কারণ সেইখানেই বৈষম্য আছে, অতএব সমদর্শনের ক্ষেত্র আছে। যে যোগীপুরুষ নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছেন—তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণও নাই, চণ্ডালও নাই। জ্ঞানীব্যক্তি সংসারে থাকিয়াই সাংসারিক মানুষ সাধারণতঃ যে-সব ভেদ করিয়া থাকে তাহাদের উপরে উঠিবেন, সকল বাহ্য ভেদের মধ্যে মূল ঐক্য আবিষ্কার করিবেন, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মকে দেখিবেন—ইহাই গীতার বক্তব্য।

গীতা যেমন আশ্রম বিভাগের বাহ্য রূপটি স্বীকার করে নাই, তেমনিই বর্ণ বিভাগেরও বাহ্য সামাজিক রূপটি স্বীকার করে নাই। বাহ্যতঃ জন্ম দেখিয়াই বর্ণ ও জাতি নির্ণয় করা হয়, ইহাতে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া গীতা গুণ ও কর্ম্মের উপরেই জোর দিয়াছে, গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (৪।১৩),

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ম্মের যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহা তাহাদের স্বভাবজাত গুণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নহে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ ক্ষত্রিয়ের স্বভাব ও গুণ পায় তাহাকে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মই করিতে হইবে, ক্ষত্রিয় কুলে কেহ ব্রাহ্মণের স্বভাব পাইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের বৃত্তিই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সমাজের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী-বিভাগ, বর্ণ-বিভাগ কেমন করিয়া থাকিবে, আর গুণ অনুসারে মানুষের বর্ণ-বিভাগই বা কে করিয়া দিবে? কিন্তু এইরূপ বিভাগ করা যায় না বলিয়া যে একটা মিথ্যা বা কৃত্রিম বিভাগ দাঁড় করিয়া রাখিলেই সমাজের কল্যাণ হইবে তাহা নহে। গুণ ও কর্ম্ম অনুসার সমাজে স্বভাবতঃ যে বিভাগ আসিয়া পড়ে তাহাই কল্যাণকর—জাতি ভেদের কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া রাখিলে সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে পঙ্গুই করিয়া দেওয়া হয়। বাস্তবিক হিন্দুসমাজে তাহাই হইয়াছে—এবং এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই গীতা বহু পূর্ব্বে গুণ অনুসারে কর্ম্মের শিক্ষা প্রচার করিয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য—ভারত আজ পর্য্যন্ত গীতার সেই গভীর অধ্যাত্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই, গতানুগতিক ভাবে কৃত্রিম সামাজিক মিথ্যা আচার ও ভেদ-সকলকে ধরিয়া আছে, এবং সেজন্য তাহার অবনতিরও চরম হইয়াছে—এখনও যদি হিন্দু গীতার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার ধর্ম্মের ও সমাজের গ্লানি দূর না করে তাহা হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

এই শ্লোকে গীতা ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে ভেদ করিয়াছে গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা, জন্মের দ্বারা নহে,—ব্রাহ্মণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, আর চণ্ডাল কুক্কুর-মাংসভোজী। গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই যে সামাজিক বিভাগ নিরূপিত হওয়া উচিত ইহা শুধু গীতায় নহে, মহাভারতের অন্যান্য বহু স্থানে আছে। বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ও অজগররূপী নহুষের সংবাদে ইহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—

সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপস্যা ও দয়া যাহাতে দৃশ্যমান হয় তিনিই ব্রাহ্মণ—ইহাই স্মৃতির বিধান, ইতি স্মৃতঃ।

সর্প বলিলেন—

সত্য প্রভৃতি গুণ শূদ্রেতেও থাকিতে পারে।

যুধিষ্ঠির—হে সর্প! যে শূদ্রে ঐ সকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নহে, এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। হে সর্প! যে ব্যক্তিতে এই সকল চরিত্র লক্ষ্য হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, আর যে ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সর্প—হে আয়ুষ্মন্! যদি এই সকল বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল বৃত্তির কার্য্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া অভিমান বৃথা।

যুধিষ্ঠির—হে মহামতি মহাসর্প! মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতি অবধারণ করা কঠিন; কারণ সকল বর্ণের মধ্যেই সঙ্কর আছে। কারণ সকল প্রকার মনুষ্যই সকল প্রকার স্ত্রীতে অপত্যোৎপাদন করে, এবং জন্ম, মরণ, বাক্য ও মৈথুন ইহা সকল মনুষ্যেই সমান ভাবে আছে। তদ্বিষয়ে আর্ষপ্রমাণও "যে যজামহ" ইত্যাদি মন্ত্রে আছে (আমরা ব্রাহ্মণ হই অথবা অব্রাহ্মণই হই যজন করিতেছি)। অতএব শীল অর্থাৎ চরিত্র ও আচারকেই যাঁহারা প্রধান ও ইষ্ট বলিয়া জানেন, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী।

মহাভারতের উল্লিখিত অংশ হইতে বুঝা যায় যে, সেই যুগে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা জাতিভেদে পরিণত হইয়াছিল—মনুসংহিতাতে আমরা এই জাতিভেদের বর্ণনা পাই—জন্ম অনুসারেই জাতি ও বৃত্তি নির্ণয়ের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এইরূপ জাতিভেদে যে দোষ হয়, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, মহাভারতে ও গীতায় তাহাই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাই গীতার স্বভাব ও স্বধর্ম্মের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি।...আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন (বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা ২১ অঃ, মহাভারত বনপর্ব্ব—২১৫ ও ১৯০ অঃ ইত্যাদি)।" বিষয়টি গুরুতর সেজন্য আমরা এখানে মহাভারত হইতে আরও কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥

অনুশাসনপর্ব্ব—১৪৩।৫১

কর্ম্মভিঃ স্বচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মাবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥

অনুশাসন পর্ব্ব—১৪৩।৪৮

ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি—এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে বিদ্যা ও বিনয়, তিনি শিক্ষিত এবং নিরহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যশূন্য—ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায়, learned and cultured. এই শ্লোকে গীতা যে ভেদের উল্লেখ করিয়াছে, শঙ্কর তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন উত্তম, গাভী রজঃগুণসম্পন্ন মধ্যম এবং হস্তী প্রভৃতি তমঃগুণ-সম্পন্ন অধম। কিন্তু গীতায় সত্ত্বাদি গুণের যে লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। সত্ত্ব ও রজঃগুণের বিকাশ মানুষের মধ্যেই পরিস্ফুট, আর সকল বস্তুই তামসিক সর্গের অন্তর্গত। তবে সকলের মধ্যেই সব গুণ কিছু না কিছু আছে—গুণের তারতম্য অনুসারেই বস্তুতে বস্তুতে ভেদ হয়। সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া বুদ্ধি, চিন্তা—পশুদের মধ্যে ইহারও কিছু স্ফুরণ হইয়াছে। কিন্তু সেদিক দিয়া বিচার করিলে কুকুরকে গাভীর উপরে স্থান দিতে হয়—কারণ বুদ্ধি, প্রভুভক্তি, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ে কুকুরের মধ্যে গাভী অপেক্ষাও সত্ত্ব-রজঃগুণের বিকাশ অধিক। মহাভারতেও আমরা দেখিতে পাই যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সময় একটি কুকুরই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

হিন্দু যে গো জাতিকে সম্মান করে, ইহা তাহার হৃদয়ের উদারতার পরিচয়—সর্ব্বজীবে দয়া হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ, আর গরুর ন্যায় যে জীব মানুষের এত উপকারী তাহাকে সম্মান করা ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষেরই পরিচয়। কিন্তু কোন জিনিষেরই অতি মাত্রা ভাল নহে, তাহাতে শুভ সংস্কারও কুসংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, আচারও অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়—হিন্দুর অনেক সদাচারের এইরূপ দশাই হইয়াছে।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ—শঙ্কর যে এক শ্রেণীর মানুষকে গরুর নীচে স্থান দিয়াছেন, কুকুরের সামিল বলিয়া ধরিয়াছেন—ইহা হইতেই আমাদের কথা প্রমাণিত হয়। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও সামাজিক সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। সামাজিক প্রথায় কতকগুলি হীন আচারসম্পন্ন ব্যক্তি অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দুর শুচিতার অতিমাত্রাই ইহার জন্য দায়ী, শঙ্কর

ইহাকে দর্শন ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিয়া হিন্দুসমাজে ইহার স্থান এমন সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ সেই মারাত্মক প্রথাকে বর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। অস্পৃশ্যতাদোষ হিন্দুর জীবন মরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হিন্দু যদি নির্ম্মমভাবে সম্পূর্ণভাবে এই পরম অশুভ প্রথাকে বর্জ্জন করিতে না পারে তাহা হইলে হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। অথচ হিন্দু ধর্ম্মহানির ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাহাদের এইরূপ ভয় যে অমূলক, এখানে তাহা দেখাইয়া দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমতঃ, গীতা কোথাও অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে নাই, বরং সমাজে কোন শ্রেণীর মানুষকে যাহাতে চিরকালের জন্য অবনত রাখা না হয় তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশই দিয়াছে। এই শ্লোকে গীতা দুই প্রকার ভেদ দেখাইয়াছে, এক হইতেছে জাতিগত ভেদ, আর এক হইতেছে গুণ ও কর্ম্মগত ভেদ। * মনুষ্য-জাতি, গোজাতি, হস্তিজাতি, কুকুরজাতি—এইরূপ ভেদই জাতিগত ভেদ, আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহই এক জাতি (species) হইতে অন্য জাতিতে যাইতে পারে না। কিন্তু একই জাতির জীব-সকলের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের ভেদে যে শ্রেণী বিভাগ হয়, সে বিভাগ এই জন্মেই অতিক্রম করা যায়। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভেদ এই রূপই। গুণে ও আচরণে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ, আর যে অধম সেই চণ্ডাল। শঙ্কর যে চণ্ডালকে জঙ্গম শ্মশান বলিয়াছেন, চলমান শ্মশান—ইহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় নাই। আজও দক্ষিণদেশের পারিয়াজাতির আচার ব্যবহার এত কদর্য্য ও নোংরা রহিয়াছে যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ হয়। কিন্তু তাহারাও ত মানুষ, তাহাদের মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তাহারাও ভগবানেরই এক একটি রূপ, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, তাহা হইলে তাহারা সহস্রাধিক বৎসরের পরও নিজেদিগকে সংশোধন করিতে পারিতেছে না কেন? তাহার একমাত্র কারণ অস্পৃশ্যতা। উচ্চজাতির হিন্দুরা যদি তাহাদের সংসর্গ বর্জ্জন না করিত, তাহা হইলে তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া চণ্ডালও আচার ব্যবহারে উন্নত হইতে পারিত—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরই গুণ ও আচরণ লাভ করিতে পারিত। এবং এই ভাবে

* বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় এবং শ্রীধর স্বামী এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—ব্রাহ্মণে শ্বপাকে কর্ম্মণা বৈষম্যম্ গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্।

সকল মানুষকে টানিয়া উপরের দিকে তুলিয়া লওয়াই গীতার শিক্ষা; লোক সংগ্রহকে গীতা শ্রেষ্ঠ ও মুক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াছে। গীতা বলিয়াছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমন আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাহার অনুসরণ করে, এবং এই ভাবেই তাহারা ক্রমশঃ উন্নত হয়, মানবজীবনের যে পরম অধ্যাত্ম লক্ষ্য সেইদিকে অগ্রসর হয় (৩।২১)।

কোন বংশে জন্মের জন্য কোন মানুষ অস্পৃশ্য হয় এরূপ কথা বেদ উপনিষদ বা গীতায় কোথাও নাই। এমন কি প্রথমে সমাজের চারিবর্ণ বিভাগও সুস্পষ্ট ছিল না, জন্মগত জাতিভেদ যে ছিল না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বিশেষ গবেষণার দ্বারা তাঁহার Rig Vedic Culture নামক গ্রন্থে ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলরও এই মত সমর্থন করিয়াছেন *। সে-যুগে কর্ম্মের উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না, আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইত এবং তাহাতেই তাহার বর্ণ নির্দ্ধারিত হইত। একই পিতার পুত্রগণ এইভাবে বিভিন্ন গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন বর্ণ লাভ করিত এবং কোন কর্ম্ম বা বর্ণই হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। এক ঋষির পিতা চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহার মাতা শস্য নিষ্পেষণ করিতেন (ঋক্ ৯।১১২।৩।) রাজন্য হইয়াও বিশ্বামিত্র পুরোহিতের কার্য্য করিতেন (ঋক্ ৩।৫৩।৯); দেবাপিও ঐরূপ করিতেন (১০।৯৮)। মহর্ষি ভৃগুর বংশধরেরা সূত্রধর ছিলেন এবং তাঁহারা রথ নির্ম্মাণ করিতে নিপুণ ছিলেন (১০।৩৯।১৪)। এক ঋষি জুয়াড়ীদের জুয়া না খেলিয়া কৃষিকার্য্য করিতে বলিতেছেন (১০।৩৪। ১৩)। ঋষি মুদ্গলের গাভীগুলি দস্যুদল চুরি করিয়া লইয়া গেলে তিনি নিজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন (১০।১০২)।

---

* "There was no caste system in the sense in which we now understand it, with its exclusiveness and strict elaborate rules as regards eating, drinking, association by marriage, and touchability."—Rig Vedic culture by A. C. Das.

"If then with all the documents before us, we ask the question, does caste as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No"—*Chips from a German Workshop* by Maxmuller.

যুবতীগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া যুবকগণকে আকৃষ্ট করিতেন এবং প্রণয় হইলে যে কোন বর্ণ হইতে তাহাদের পতি বাছিয়া লইতেন (ঋক্—১০।৮৫।২১-২২ ; ৮।৩৫।৫ ; ৮।৬২।৯)। অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণ বলিয়া কোন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় আছে যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, পঞ্চম বর্ণ বলিয়া কিছু নাই—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তুপঞ্চমঃ॥ মনু—১০।৪

মহাভারতেও আছে,

স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারো পঞ্চমো নাভিগম্যতে।

মনু ও মহাভারতের রচনাকাল যদি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ধরা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভের পূর্ব্বে বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারতের ভারতবর্ষে কোথাও অস্পৃশ্য বলিয়া পঞ্চম বর্ণ ছিল না। কিন্তু মনু ও মহাভারতে "পঞ্চম" কথার উল্লেখ হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ সময় সামাজিক দেশাচারে এক শ্রেণীর লোক অস্পৃশ্য পঞ্চম বলিয়া গণ্য হইতেছিল—কিন্তু উহা যে অশাস্ত্রীয় তাহাই মনু ও মহাভারতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গতানুগতিক দেশাচারের প্রকোপে মনু ও মহাভারতের ঐ কল্যাণকর বিধান হিন্দুসমাজ অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং তাহার জন্য নিদারুণতম শাস্তিও তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে।

যাঁহারা বেদ ও উপনিষদ হইতে অস্পৃশ্যতার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে চান তাঁহাদিগকে কিরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া শ্রুতিবাক্যের বিকৃত অর্থ করিতে হয়, এখানে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শুক্ল যজুঃ সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা ১।১৩তে এই বাক্য পাওয়া যায়,

"দৈবায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বম্ দেবযজ্যয়ৈ যদ্বোঽশুদ্ধাঃ পরাজঘ্নুরিদং বস্তচ্ছন্ধামি"। এই বাক্যটির এইরূপ অর্থ করা হয় যে, ইহার দ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত যজ্ঞীয় পাত্র শুদ্ধ করা হইতেছে, বলা হইতেছে—"হে পাত্র সকল! অশুদ্ধ ব্যক্তিগণ (তক্ষ বা ছুতার) তোমাদিগকে ছেদন করিয়াছিল, তোমরা অশুদ্ধ হইয়াছ, তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতেছি।" কিন্তু এখানে পাত্রসকলকে যে অশুদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ কোন ব্যক্তির স্পর্শের জন্য নহে, আর সে যুগে ছুতারগণ যে অস্পৃশ্য ছিল না, ভৃগুর পুত্রগণ ছুতারের কাজ করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই

দেখাইয়াছি। বৈদিক ক্রিয়ায় যজ্ঞীয় পাত্র সমস্তই শোধন করিয়া লইতে হয় (ব্রাহ্মণের দ্বারা আনীত হইলেও)—ইহার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত পাত্রে অপবিত্র বস্তু লাগিয়া থাকিলে তাহার শুদ্ধি করণ। কোন ব্যক্তিবিশেষ যে সাময়িক ভাবে অশুচি থাকিতে পারে, ইহা ত কেহই অস্বীকার করে না—কিন্তু ইহার দ্বারা কাহারও জন্মগত অশুচিতা প্রমাণিত হয় না।

জন্মগত অশুচিতা প্রমাণ করিবার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যটি উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে—"যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে তাহারা উত্তম যোনিপ্রাপ্ত হয়—যথা ব্রাহ্মণ যোনি বা ক্ষত্রিয় যোনি বা বৈশ্য যোনি। যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম করে তাহারা নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়—যথা কুক্কুর যোনি, অথবা শূকর যোনি অথবা চণ্ডাল যোনি।" চণ্ডাল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ, তাহার আচরণ যে পশুর তুল্য—ইহা স্বীকার্য্য এবং যাহারা অসৎ কর্ম্ম করে তাহারা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে—এ-কথায় সৎকর্ম্মের প্রশংসা এবং অসৎ কর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে আর বলা হইয়াছে আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করিতে সকলকেই এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এখানে এমন কথা বলা হয় নাই যে, চণ্ডাল চিরকাল চণ্ডাল থাকিবে। আচারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি, চণ্ডাল যদি অশুদ্ধ আচার বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ আচার গ্রহণ করে—তাহা হইলে সেও শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতে পারে। আবার ব্রাহ্মণও যদি অসৎ আচরণ করে সেও পতিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের পরের বাক্যেই বলা হইয়াছে—স্বর্ণচোর, মদ্যপায়ী, গুরুস্ত্রীগামী এবং ব্রাহ্মণঘাতী এই চারিজন এবং যে ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গ করে এই পাঁচজন হইতেছে পতিত।* চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই আমরণ পতিত অস্পৃশ্য থাকিতে হয় এমন কথা এখানে বলা হয় নাই। গীতাতেও বলা হইয়াছে, "পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন। গুণসকলের প্রতি আসক্তির বশেই এই পুরুষের সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্ম হয়।" কিন্তু গুণসকল স্থির নহে—তাহারা অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ, কখনও তমঃ প্রবল হইতেছে (১৪।১০)—এবং এই পরিবর্ত্তনের কারণ হইতেছে পুরুষের অনুমতি; পুরুষ যে গুণকে প্রশ্রয় দিবে সেই গুণই প্রবল হইয়া উঠিবে। জঘন্য গুণবৃত্তি-সম্পন্ন

* বর্ত্তমানে যাহারা পতিত অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই উচ্চ বর্ণের লোক ছিলেন—তাহাদের গোত্র হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

চণ্ডাল যদি সুশিক্ষা এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে নিকৃষ্ট তমোগুণকে প্রশ্রয় না দেয়, সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহার অন্তরাত্মার সেই সম্মতি অনুসারে তাহার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইবে, সেও পরমগতি লাভ করিবে, এ কথা গীতা স্পষ্টভাবে বলিয়াছে (৯।৩২) ।

অস্পৃশ্যতার সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে এই বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়—

তস্মাৎ ন জনম্ ইয়াৎ ন অন্তম্ ইয়াৎ নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুম্ অন্ববায়ানীতি ।

১।৩।১০

শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—গ্রামের বাহিরে দিগন্তের নিকট যে-সকল অন্ত্যজ বাস করে সেখানে যাইবে না। "ঐরূপ করিলে আমি পাপরূপ মৃত্যুর কবলগত হইব" ইহা চিন্তা করিবে ।

উপনিষদের এই মহৎ বাক্যটির এই বিকৃত ব্যাখ্যা সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হিন্দুকে তাহারই সমাজের এক অংশকে পাপরূপ মৃত্যু বলিয়া সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে। কিন্তু নির্ব্বিবাদে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া আমরা যদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, তিনি সামাজিক গতানুগতিক সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—ঐ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ ঐরূপ হইতেই পারে না। ঐ বাক্যটির প্রথমাংশে বলা হইয়াছে, "সেই মুখ্য প্রাণরূপ দেবতা পাপরূপ মৃত্যুকে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিভিন্ন করিয়া যেখানে পূর্ব্বাদি দিকের শেষ হইয়াছে সেইখানে অর্থাৎ দিগন্তে প্রেরণ করিলেন এবং সেখানে তাহাকে স্থাপিত করিলেন।" দিগন্ত শব্দের দ্বারা গ্রামের প্রান্ত বুঝায় না—দৃষ্টির শেষ সীমায় যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাকেই দিগন্ত বলা হয়। আর দেবতা ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে পাপকে ও মৃত্যুকে টানিয়া লইয়া অন্ত্যজগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করিলে দেবতাকে অসুরের সামিল করা হয় কারণ দেবতা কখনও কোন মানুষের মধ্যে পাপ প্রতিষ্ঠিত করেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের ঐ মহৎ বাক্যটিতে "দিগন্ত" শব্দটি কেবল রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আসক্তিরূপ পাপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, গীতার কথায়—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ (৩।৩৪)।

সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে এই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সেই বাসনা বা আসক্তিরূপ পাপকে আমাদের গণ্ডীর বাহিরে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সাধকই তাঁহার চতুর্দ্দিকে একটি আধ্যাত্মিক মণ্ডল বা পরিবেষের (atmosphere) সৃষ্টি করেন, এবং সমস্ত পাপকে তাহার বাহিরে নিক্ষেপ করেন। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গণ শুদ্ধ হইলে তাহারা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়, দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়, মানুষ দিব্য জীবন লাভ করে—ইহাই উপনিষদের পরের বাক্যগুলিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না এই রূপান্তর সাধিত হইতেছে— ততক্ষণ প্রত্যেক সাধককেই খুব সাবধান ও সতর্ক থাকিতে হয়, যে পাপ বর্জ্জিত হইয়াছে তাহা যেন পুনরায় আক্রমণ করিয়া তাহার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ না করে। এই জন্যই সাধককে নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে এবং জনসাধারণের সহিত মিলামিশা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। শঙ্কর "জনং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন অন্ত্যজ চণ্ডাল—কিন্তু পাপ কি শুধু চণ্ডালের মধ্যেই আছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে নাই? অধ্যাত্ম সাধককে সমান ভাবে সকল পাপীর সংসর্গ বর্জ্জন করিতে হইবে—গীতাতেও বলা হইয়াছে,

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি (১৩।১১)।

এই জন্যই আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধকগণ নির্জ্জন অরণ্যে অথবা আশ্রমে বা মঠে থাকিয়া ঐকান্তিকভাবে সাধনা করেন—এবং উপনিষদের উক্ত বাক্যে ইহার অধিক আর কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু যাহারা সমাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকিয়া সংসার করিতেছে, নিজেদের মধ্যে নানাবিধ পাপকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে তাহারা যদি শুধু জন্ম বা বংশের জন্যই সমাজের কোন শ্রেণীর লোককে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখে তাহাতে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম অনুসরণ করা হয় না, মিথ্যা দম্ভ ও কুসংস্কারকেই অনুসরণ করা হয়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতার মূল উৎস বেদ ও উপনিষদে যদি অস্পৃশ্যতার বিধান নাই তাহা হইলে হিন্দু সমাজে ইহা কেমন করিয়া স্থান পাইল, আর বহু স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে এই বিধান কোথা হইতে আসিল? হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ইহা কেমন করিয়া স্থান পাইল? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশাচার হইতেই অস্পৃশ্যতার উৎপত্তি, স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে সেই আচার লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্তভূষণ তাঁহার "স্মৃতি ও সমাজ" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,

শাস্ত্র আচারের অনুসরণ করিয়াছে; পক্ষান্তরে আচার শাস্ত্রের অনুসরণ করে নাই। মীমাংসকদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করিয়াছেন, কেহ কেহ কৌশলে প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়াছেন।" (বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৩৭)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাতুল কন্যা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও দক্ষিণ দেশীয় আচারের অনুসরণে উহা স্মৃতিশাস্ত্রে সমর্থিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য পরাশর ভাষ্যে মাতুল কন্যা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বৌধায়ন সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারেরও সমর্থন করিয়াছেন। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন, "যাহা হউক বিভিন্ন দেশীয় সংস্থানের লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারের প্রামান্য নাই'—এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থেই প্রসুপ্ত অজগরের ন্যায় রহিয়াছে মাত্র। ইহা সমাজের উপর আত্ম-প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যে মুনি যে দেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনি সেই দেশের অস্থিমজ্জাগত অসদাচারকেও একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। কার্য্যটা অন্যায় এমত বিবেচিত হইয়াও তাহা সমর্থিত হইয়াছে।"

এই ভাবেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অস্পৃশ্যতার ন্যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিতান্ত গর্হিত আচার সমর্থিত হইয়াছে। সব স্মৃতি-শাস্ত্র শ্রুতির অনুগামী—ইহা ঠিক নহে; "শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিবাক্য অপ্রামাণ্য" এই কথা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, স্মৃতির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। এ-বিষয়ে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য জোতিঃশাস্ত্রী তাঁহার "স্মৃতিশাস্ত্র ও দেশাচার" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"ঋষিগণের শ্রুতি-জ্ঞান হইতে যে স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহাতে ব্যতিক্রম ছিল না; কেন না, ঋষিগণ অভ্রান্ত ছিলেন। কালক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয়ের মধ্যে কোন একটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন আর মিল হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ও আপস্তম্ব সংহিতা মিলাইয়া দেখিলে এ ধারণার দৃঢ়তা ঘটিবে। এক্ষণে জানা গেল, স্মৃতিশাস্ত্রে বৈদিক প্রথা বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। তারপর স্মৃতি সংগ্রহকার রঘুনন্দন, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির যে-সকল গ্রন্থকে আমরা স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া জানি ও মানি, সেই সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই

পরস্পরবিরুদ্ধ। ইঁহাদিগের গ্রন্থে এমন অনেক শ্লোক আছে যাহাদের মূল কোথায় তাহার সন্ধান একেবারে পাওয়া যায় না; এমন কি যে সংহিতার নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সংহিতায় তাহা আদৌ পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত একের উদ্ধৃত শ্লোক অন্য কেহ অমূলক ঘোষণা করিয়া থাকেন। অথচ ইঁহারাই দেশের স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা! বাহুল্য ভয়ে দৃষ্টান্তাদি দিলাম না, তবে এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত শিরোমণি মহামতি কাশীরাম বাচস্পতিকৃত স্মৃতিতত্ত্ববিবৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। রঘুনন্দন বা কোন আধুনিক স্মার্ত্ত যদি কোন আচার জনমতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে চালাইয়া থাকেন বা চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন তবে তাহা যে সদাচার বলিয়া মানিতে হইবে এমন কথা নাই, সকলেই জানেন রঘুনন্দনের অনেক মত এখনও এ দেশের সর্ব্বত্র চলে নাই, হয়ত কোন দিনই চলিবে না···শাস্ত্র শব্দে অনেক কিছু বুঝায়, বেদ হইতে পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যত কিছু গ্রন্থ সবই শাস্ত্র আখ্যার অন্তর্ভুক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে দেশাচার শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রত্যেক দেশে প্রচলিত প্রথাকে লোকে শাস্ত্র বলিয়া মানে। আবার ·শাচারের মধ্যেও বহুবিধ পার্থক্য দেখা যায়। এই বাঙ্গালা দেশেই ভিন্ন ভিন্ন ·ন ভিন্ন ভিন্ন প্রথা ও লোকাচার প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে বিধবার নির্জ্জলা একাদশী প্রথা আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নাই। এমন কি, সুবিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থানেও নির্জ্জলা একাদশী প্রথা নাই।” (দৈনিক বসুমতী)

অতএব কোন দেশাচার স্মৃতিশাস্ত্রে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়াই সেইটিকে যে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে এমন কথা নাই। যদি দেখা যায় কোন দেশাচার সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে মারাত্মক, যদি তাহা বর্জ্জন করা সনাতন ধর্ম্মের মূল উৎস বেদ, উপনিষদ, গীতার শিক্ষার অনুকূল হয়—তবে নির্ম্মম ভাবে সে প্রথাকে বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মানুষকে তাহার জন্ম বা বংশের জন্য চির-অস্পৃশ্য করিয়া রাখা, পশুরও অধম বলিয়া গণ্য করা এইরূপই সাংঘাতিক মারাত্মক প্রথা।

কিন্তু যে হিন্দুর ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে আর কোথাও নাই, যে হিন্দু জীবমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছে সেই হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় এই নিদারুণ অসাম্য

ও অসদাচার স্থান পাইল কেমন করিয়া? হিন্দু সমাজের এই দোষ তাহার গুণ হইতে, তাহার মহত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান মানবজীবনের স্বরূপই এই, ইহা অজ্ঞানের ক্রিয়া, কোন সত্য এখানে খাঁটি থাকে না, অবিকৃত থাকে না, সত্যের সহিত মিথ্যা, শুভের সহিত অশুভ, সুখের সহিত দুঃখ, জীবনের সহিত মৃত্যু এখানে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মানুষ যে মনবুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান করে, অনুসরণ করে তাহা নিজেই অপূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত, সত্যকে সে সমগ্রভাবে ধরিতে পারে না, ফলে তাহার সত্যও মিথ্যায় পরিণত হয়। মানুষ যেদিন মন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে অতিমানস বিজ্ঞানশক্তির বিকাশ করিবে,তখনই সে প্রকৃতভাবে সত্যকে পাইবে, সত্যকে অনুসরণ করিতে পারিবে, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের আদর্শগুলি ঠিকমত জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারিবে—তখনই হইবে প্রকৃত সত্য যুগ, পৃথিবীর উপরেই স্বর্গরাজ্য। তাহার পূর্ব্বে সমাজে নানা মিথ্যা ও আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিবেই, এবং মানুষের কর্ত্তব্য হইতেছে কোন জিনিষ মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া একবার বুঝিতে পারিলে দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত তাহা বর্জ্জন করা। যে মানব-সমাজে এইরূপ দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা থাকিবে, সেই সমাজের ভিতর দিয়াই জগতে সত্য যুগের প্রতিষ্ঠা হইবে। মানব-সমাজে পুঞ্জীভূত এই সব মিথ্যা ও গ্লানিকে দূর করিয়া মানুষকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান নিজে যুগে যুগে এই পাপময় অজ্ঞানময় দুঃখময় মৃত্যুময় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গীতার যুগে সমাজে যে-সব ভেদ বৈষম্য গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল সে-সব দূর করিবার জন্য ভগবান গীতার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন—আজিকার দিনেও আমরা আমাদের সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সেই গীতা হইতেই অনুপ্রেরণা ও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ লাভ করিব।

হিন্দু বহু দিনের সভ্য জাতি, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শুচিতার প্রয়োজনীয়তা সে গভীর ভাবেই অনুভব করিয়াছে এবং ইহাতে কোন ভুলই হয় নাই—কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের যেমন শুচিবাই হয়, হিন্দুসমাজের বার্দ্ধক্যের অবস্থায় সেই ভাবেই অস্পৃশ্যতা দোষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনিই জাতির ও সভ্যতার জীবনেও বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আসে। ভারতীয় সভ্যতার দিব্য তরুণ যুগ হইতেছে বেদ ও উপনিষদের যুগ, তাহার দীপ্ত যৌবন ও পৌরুষের যুগ হইতেছে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ;

তাহার পর হইতেই অর্থাৎ প্রায় খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই তাহার বার্দ্ধক্যের সূচনা হইয়াছে—তাহার পরও ভারত অনেক শক্তি ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা ও গ্লানিও প্রবেশ করিয়াছে। আজ তাহার জীবনের উৎস বেদ ও উপনিষদ হইতে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া ভারতীয় সভ্যতা যদি বহু শত বৎসরের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে তবেই তাহার আবার এক অপূর্ব্ব গৌরবময় নূতন যুগ আরম্ভ হইবে—নতুবা অন্যান্য বহু প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় ভারতীয় সভ্যতাও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বহু মহাপুরুষ যে প্রয়াস করিয়াছেন ও করিতেছেন—হিন্দু সমাজের অজ্ঞান ও জড়তা কি সে সবকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া হিন্দুজাতির ধ্বংসকেই বরণ করিয়া লইবে?

সভ্য উন্নত জীবনলাভ করিতে হইলে শুদ্ধ ও সংযত হইতেই হইবে—এবং প্রাচীন কাল হইতেই ভারত সংযম শিক্ষা দিয়াছে। বাসনা কামনার বশে না চলিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ অনুসরণ করিলে মানুষ ক্রমশঃ নীচের প্রকৃতির অন্ধ পাশবিক প্রেরণা সকলকে জয় করিয়া উচ্চতর দিব্য জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এইজন্য ভারতে বহু ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং গীতা শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছে (১৬।২৪)। কিন্তু অন্য দিকে গীতা ইহাও বলিয়াছে যে, প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া কোন লাভ নাই (৩।৩৩), সংযত ভাবে প্রকৃতির বাসনা কামনাকে ভোগ দিতে হইবে, তৃপ্তি দিতে হইবে, অর্থ ও কামকে বর্জ্জন করিতে হইবে না, ধর্ম্মের দ্বারা সে সবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সনাতন আদর্শ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ। গীতায় এই আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ভারতবাসী সংযমের নামে নিগ্রহ চালাইয়া ভারতীয় জাতির প্রাণশক্তিকে অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। যে-শাস্ত্র ছিল জীবনকে সুশৃঙ্খল কবিবার উপায়, তাহাই লৌহময় শৃঙ্খল হইয়া জাতির বুকের উপর বসিয়াছে। অসংখ্য বিধিনিষেধ সৃষ্টি করিয়া মানুষের প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রেরণা-সকলকে ব্যাহত করা হইয়াছে এবং সেই সব বিধিনিষেধ সংস্কৃত শ্লোকে ঋষিদের নামে চালান হইয়াছে, ঋষি ও শাস্ত্রের উপর হিন্দুর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে এইভাবে তাহার সর্ব্বনাশের

কারণ করিয়া তোলা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে,

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসপলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৫।১৮০

এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারতেগো-মেধ যজ্ঞ করিয়া গোমাংস ভোজন করা হইত এবং বিধবারা দেবরের দ্বারা পুত্র লাভ করিতে পারিত। কলিযুগে এসব নিষিদ্ধ হইল। কেন? কলিকালের লোক দুর্ব্বল, তাহাদের ধর্ম্মে তেমন মতি নাই, সেজন্য পূর্ব্বযুগের প্রথাসকল কলিযুগে চলিতে পারে না—এইরূপ কারণ দেখান হয়। কিন্তু পুত্রহীনা বিধবারা সন্তান কামনা বর্জ্জন করিয়া আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে—ইহা কি দুর্ব্বলচরিত্র ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থা? এ ব্যবস্থা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের স্ত্রীলোকেরা অনুসরণ করিতে পারিল না, * আর তমোময় শ্রদ্ধাহীন দুর্ব্বল কলিযুগের লোক পারিবে? বস্তুতঃ এরূপ বিধিনিষেধ-সকলের পিছনে কোন শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক যুক্তি প্রমাণ নাই—দেশাচার যেমন দাঁড়াইয়াছিল, স্মৃতি ও পুরাণগুলি তদনুসারে রচিত, পরিবর্ত্তিত, বিকৃত করা হইয়াছিল। আর দেশাচার স্বভাবতঃই ভিতরের অধ্যাত্ম সত্য ও তথ্যকে হারাইয়া বাহিরের কড়াকড়ির দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। এইভাবেই অস্পৃশ্য প্রথাও হিন্দুর শাস্ত্রে ও সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অস্পৃশ্য প্রথার মূলে যে সত্য রহিয়াছে তাহা হইতেছে হিন্দুর বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শুচিতার আদর্শ। বাহ্য শুচিতাকে গীতা শারীরিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (১৭।১৪)। কিন্তু এই তপস্যাও যখন ভ্রান্ত ধারণার বশে করা হয় এবং নিজেকে পীড়া দিয়া অথবা পরকে ব্যথা দিয়া করা হয়, তাহা তামসিক হইয়া দাঁড়ায় (১৭।১৯)। হিন্দুর অস্পৃশ্যতা এইরূপ তামসিক প্রথা। হিন্দুজাতি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ

* পূর্ব্বকালে হিন্দুর বিধবারা যে ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত, তাহাদিগকে পুনর্ভূ বলা হইত, তাহাদের সন্তানকে পৌনর্ভব বলা হইত ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। —অথর্ব্ববেদ—৯।৫।২৭-২৮; মনু ৯।১৭৫; বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ৪।১।১৬; নারদ সংহিতা, পরাশর সংহিতা, বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র (১৯।২০।৭২) ইত্যাদি।

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, জীবাণুর দ্বারা যে রোগ সংক্রামিত হয় এ তথ্য তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীমৎ চক্রপাণি দত্ত চরকের টীকায় ক্রিমিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। কীটাণু, জীবাণু, বীজাণু আয়ুর্ব্বেদে ক্রিমি নামে পরিচিত। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব হইতে বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয়গণ অদৃশ্য (microscopic) ক্রিমির বিষয় জ্ঞাত ছিলেন,

সূক্ষ্মযোনীতি ভূতানি তর্কলভ্যানি ভারত।

এই জন্যই যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে জীবাণুর ভিতর দিয়া সংক্রামক রোগ হইবার আশঙ্কা আছে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। মনুসংহিতাতে এইরূপ ব্যবস্থাই আছে—

দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥

মনু—৫-৮৪।

দিবাকীর্ত্তি, রজঃস্বলা স্ত্রীলোক, পতিত, সূতিকা, শব এবং শবস্পৃষ্টকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এখানে "দিবাকীর্ত্তি" শব্দের দ্বারা চণ্ডালও বুঝা যায়, নাপিতও বুঝা যায়, আর উভয়েরই বৃত্তি ও কর্ম্মের জন্য তাহাদের ভিতর দিয়া রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে—অতএব এরূপ বিধানে কোন দোষই নাই। কিন্তু চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ কুক্কুর মাংস ভোজন প্রভৃতি অসদাচার না করে, শ্মশানে শবদাহ কার্য্য প্রভৃতি না করে, অথবা করিয়াও স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আসে—তাহাকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া অথবা তাহার অন্ন গ্রহণ না করা অজ্ঞান কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই ভাবে যে প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গড়াইয়াছে এবং তাহার ফলে হিন্দু সমাজের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, মানুষ এখন যে মানসিক অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে ইহা শুভ ও সত্যকে বিকৃত করিয়া কেমন অশুভ ও অসত্যে পরিণত করে। অতএব মানুষ যতদিন না এই মানসিক অজ্ঞানের উর্দ্ধে অতিমানস সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন মানব জীবন ও মানব সমাজের কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না—তাই গীতা সামাজিক আচার বিচার ভেদ

বৈষম্যের উপরেই জোর না দিয়া আত্মার ঐক্য, সাম্য ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। দৃঢ়মূল সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে গীতার এই শিক্ষা যে এ-পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই তাহার কারণ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি দার্শনিক যুক্তি তর্কের দ্বারা এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা সমাজের এই প্রথাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সমাজের এক শ্রেণীর লোককে চিরকাল পতিত অস্পৃশ্য হইয়া থাকিতে হইবে। সমাজের সকল অঙ্গ একদিন শুদ্ধ ও উন্নত হইবে, এই পৃথিবীতেই সত্যযুগ বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—শঙ্কর ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। পারেন নাই কারণ পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাতেই ত্রুটি ও গলদ ছিল। শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদান্তের সার উপদেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"একমাত্র অবাঙ্‌মনসগোচর চিৎরসৈকঘন পরমাত্মাই আছেন এবং তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই যথার্থ সর্ব্বভেদাতীত অবাধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সার উপদেশ। সেই আত্মতত্ত্বের অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিলে বা সেই তত্ত্বে কোন প্রকার স্বগত ভেদ অথবা আত্মবিরুদ্ধ কোন কিছু কল্পনা করিলে তাহা আর অবাধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।" শঙ্কর এইরূপ দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অবিদ্যা মায়া—তাহাই জগৎ সৃষ্টির মূল। এই ভাবে যিনি ব্রহ্মের মধ্যেই অবিদ্যার কল্পনা করিয়াছেন—তিনি যে সমাজে চিরস্থায়ী ভেদ কল্পনা করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যও এইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন অচিৎ তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গীতার বেদান্ত শিক্ষায় আমরা যে ব্রহ্মের পরিচয় পাই—তাহা চিৎরসৈকঘন সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় তত্ত্ব। গীতা অবিদ্যা বা মায়া বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন কোন তত্ত্বকে শঙ্করের ন্যায় জগতের মূল বলিয়া স্বীকার করে নাই—গীতায় ভগবান বলিয়াছেন তাঁহার পরাপ্রকৃতি হইতেই এই জীব ও জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। অচিৎ বা জড় বলিয়া যাহা দেখায় তাহাও ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, তাহা ব্রহ্মেরই চৈতন্যের একটি অবস্থা, একটি রূপ—প্রত্যেক জড় অণু পরমাণু হইতেছে সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। গীতা সর্ব্বত্র এই মূলগত সাম্যের উপরই জোর দিয়াছে এবং স্পষ্ট বলিয়াছে, সমাজে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালের যে ভেদ করা হয়, ইহা মূলতঃ সত্য নহে—সকলের মধ্যেই

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, সকলেই সাধনার দ্বারা পরম গতি লাভ করিতে পারে (৯৷৩২)।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষকে যদি আমরা সমাজের বাহিরে রাখিয়া সকল প্রকার শিক্ষা ও সাধনার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখি তাহা হইলে তাহারা তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার বিকাশ কেমন করিয়া করিবে? অতএব অস্পৃশ্যতা হইতেছে গীতার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। গীতা চারি বর্ণের বাহিরে কোন পঞ্চম বর্ণ স্বীকার করে নাই—গীতার মতে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক সকলেই শূদ্র; এবং উচ্চতর বর্ণ-সকলের পরিচর্য্যা করিবার অধিকার সকল শূদ্রেরই আছে,

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। ১৮৷৪৪

হিন্দু সমাজ যদি শূদ্রগণকে পরিচর্য্যার অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিত' তাহাদের প্রস্তুত অন্ন, তাহাদের আনীত জল গ্রহণ করিত তাহা হইলে তাহারা উচ্চতর বর্ণের সংস্পর্শে আসিয়া নিজদিগকে সংশোধিত ও উন্নত করিতে পারিত—এবং এইভাবে পতিত, চণ্ডাল সকলেরই উদ্ধার সাধিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু তাহা করে নাই—শূদ্রকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ক্রমশঃ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কেও শূদ্রের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সকলকেই অস্পৃশ্য করিয়া চণ্ডালের সহিত এক করিয়া দিয়াছে! ব্রাহ্মণের উপর ছিল শাস্ত্রের ভার, সমাজের নেতৃত্ব—এই ভাবে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও কি তাহারা নিজেদের শুচিতা ও ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে? আজ ব্রাহ্মণের অবস্থা কি? অপরকে পতিত করিতে গিয়া নিজের উপরেই কি সে পতন ডাকিয়া আনে নাই? বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ শব্দ আজ "পাচক" অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে! বামুন ও চাকর এক পর্য্যায়—পরের চাকুরি, শ্ববৃত্তি, যাহা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়—বহু ব্রাহ্মণ তাহা অবলম্বন করিয়াও আজ আর পতিত হয় না, কিন্তু তাহারা যাহাদিগকে পতিত করিয়াছিল তাহারা আজও অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে! ব্রাহ্মণের কি চূড়ান্ত অধঃপতন হইয়াছে তাহার এক জীবন্ত চিত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'পণ্ডিত মশাই' নামক উপন্যাসের মধ্যে দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"এই ব্রাহ্মণই একদিন জগতের গৌরবের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে!" সেই গৌরব

ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে—সমাজে আজও যাহারা পতিত অস্পৃশ্য রহিয়াছে তাহাদিগকে সেবার অধিকার দিয়া উন্নত করিয়া তোলা, নতুবা চতুর্দ্দিকে শুধু শূদ্র ও অস্পৃশ্যের দ্বারা বেষ্টিত থাকিলে ব্রাহ্মণ কখনই ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না—একথা মনুসংহিতাতেই স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে।

আমরা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ"

অর্থাৎ জঘন্য কলিযুগে মাত্র দুই জাতি আছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলার বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিল। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের স্থান নাই। আইনী-ই-আকবরীতে জানা যায়, বাঙলার জমীদারেরা প্রায়ই কায়স্থ; এবং তাহারা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দিয়া থাকিত। বিষ্ণুপুরের রাজা যুদ্ধ করিয়া মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেনাপতিগণ ছিল কায়স্থ, "রায়" উপাধিধারী তাহাদের বংশধরেরা আজ শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, পরকালে রৌরব নরকে পচিতে হইবে—হিন্দুর এই আশঙ্কা খুবই প্রবল, তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এবং সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া যে বিধান দিয়াছে, সমস্ত সমাজ মাথা পাতিয়া তাহা মানিয়া লইয়াছে—ফলে সমস্ত জাতি হইয়াছে শূদ্রজাতি, দাসের জাতি। যে শূদ্র সে নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে, তাহার দ্বারা যে মহৎ কিছু হইতে পারে সে তাহা ভাবিতে পারে না—পরের দাসত্ব করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করাই হয় তাহার আদর্শ। এই ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের লোক দাসভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—ইংরাজ লেখক মেকলে তাই বলিয়াছিলেন, "There never perhaps existed such a nation as the Bengalis who seem to be naturally fitted for a foreign yoke." "প্রকৃতি যেন বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীনতার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছে, এমনটি জগতে আর কোথাও দেখা যায় না।" অথচ একদিন এই বাংলাদেশকে পরাধীন করিতে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল!

হিন্দু সমাজ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলকেই শূদ্র করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে পতিত ও অস্পৃশ্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, সেজন্য শাস্ত্রও রচিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত,

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকাঃ ॥ ১০
বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ ॥ ১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥ ১২

—ব্যাস সংহিতা

বেদব্যাসের নামে সংহিতা রচনা করিয়া বিধান দেওয়া হইল কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশ্য, বণিক, নবশাখ সকলেই চণ্ডালের সামিল—তাহারা শুধুই অস্পৃশ্য নহে, তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে স্নান করিতে হয়, তাহাদের মুখ দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়! কিন্তু শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, এতটা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। কায়স্থ আজও দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না, বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে না, ওঁ উচ্চারণ, বেদ পাঠ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ন্যায় সে এক মাস অশৌচ পালন করে—তথাপি কায়স্থ বস্তুতঃ অস্পৃশ্য নহে, নাপিত প্রভৃতি নবশাখকেও জল চল করিয়া লওয়া হইয়াছে, যদিও এখনও অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কায়স্থের জল গ্রহণ করেন না। তথাপি সমাজে ইহাদের অবস্থা কতকটা সহনীয়; কিন্তু হরিজনদের প্রতি আজও যে আচরণ করা হইতেছে তাহা অতিশয় গর্হিত—তাহারা শুধুই ব্রাহ্মণের কাছেই অস্পৃশ্য নহে, কায়স্থাদি অন্যান্য জাতিরও অস্পৃশ্য। উত্তর ভারতে উচ্চ জাতির হিন্দু ও মুসলমানেরা যে কূপ হইতে জল গ্রহণ করে হরিজনেরা সেখান হইতে পানীয় জল লইতে পারে না। দক্ষিণ ভারতে অবস্থা আরও গুরুতর—ব্রাহ্মণ যে পথে চলিতেছে, সে পথে হরিজনদের চলিবার অধিকার নাই, সে পথ যতই প্রশস্ত রাজপথ হউক না কেন! হরিজনকে দেখিলে ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে হয়, তাই মালাবার প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ পথে চলিবার সময় এক প্রকার হিশ্ হিশ্ শব্দ করেন—দূর হইতে তাহা শুনিয়া হরিজনদিগকে ব্রাহ্মণের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতে

হইবে, নতুবা তাহাদের নির্য্যাতনের সীমা থাকিবে না। ব্রিটিশ শাসনে সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা কিছু শিথিল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্পৃশ্যতার মূল নীতি সর্ব্বত্র হিন্দু-সমাজে আজিও অটুট রহিয়াছে—মানবাত্মার, মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবানের এমন অপমান আর কোন জাতি কোথাও করিয়াছে কিনা সন্দেহ।*

হিন্দুসমাজে যখন অস্পৃশ্যতার নিদারুণ প্রকোপ সেই সময়ে ভারতে মুসলমান তাহার সাম্যের নীতি লইয়া আবির্ভূত হয়। সমাজে পতিত অস্পৃশ্য হইয়া থাকার যে ব্যথা তাহা পতিতেরাই বুঝে, অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই মুসলমান সমাজে সাম্যের ব্যবস্থা দেখিয়া অস্পৃশ্যেরা দলে দলে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিল—যে ভারত একদিন হিন্দুস্থান ছিল তাহা যে আজ পাকিস্থান হইতে চলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হিন্দু-সমাজের ঘোর অভিশাপ, অস্পৃশ্যতা দোষ। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া হিন্দুজনসাধারণ যে একদিন মুসলমান ধর্ম্মকেই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, শূন্যপুরাণ হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা, ইহাতে তৎকালীন সামাজিক নির্য্যাতনের জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে—

মালদহে লাগে কর দিল এ কন্ন যুন।
দক্ষিণ্যা মাগিতে যায় জার ঘরে নাঞি পায়,
শাপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥
মনেতে পাইয়া মৰ্ম্ম সভে বোলে রাখ ধৰ্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধৰ্ম্ম মনেতে পাইয়া মৰ্ম্ম
মায়াতো হইল অন্ধকার॥

* "পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই।" —বঙ্কিমচন্দ্র—'সাম্য' ২১৭—১৮, গ্রন্থাবলী।

ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথা অত কাল টুপি
হাতে শোভে তিরুচ কামান !
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥

১৯২১ সালে সেন্‌সাস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, এক বঙ্গদেশে ৯০ লক্ষ পোদ এবং নমশূদ্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ১৮৭১ সালে বাংলা-দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক ছিল ৪ লক্ষ; আর পঞ্চাশ বৎসর পর মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা বেশী হইল ৫০ লক্ষ। সমগ্র ভারতে এই ভাবে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিয়া দ্রুতগতিতে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ ভারতে যে পৌণে আট কোটি মুসলমান—তাহারা আরব হইতে আইসে নাই, তাহারা অধিকাংশই হিন্দু—মুসলমান হইয়াছে। শ্রদ্ধানন্দ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এখন ভারতবর্ষে যত হিন্দু আছে তাহাদের ⅙ অংশ হইতেছে অস্পৃশ্য—এবং হিন্দুর সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারে ইহারা অনবরত মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইতেছে। ভারতে ৫০ লক্ষ খ্রীষ্টানের মধ্যে ৪৭ লক্ষ আসিয়াছে পঞ্চম শ্রেণী হইতে।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে যে ভাবে ক্ষয় করিতেছে তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ইহা মহা অধর্ম্ম—কারণ, ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা লোক-সকলকে ধারণ করে, রক্ষা করে,

মহাভারতে কৃষ্ণ উক্তি :

ধারণা ধর্ম্ম নিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণং প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

গীতাতেও আমরা দেখিতে পাই ভগবান বলিতেছেন, "আমি যদি অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম না করি, এই লোক সকল উৎসন্ন যাইবে, আমি প্রজাসকলের ধ্বংসের কারণ হইব।" অতএব যে প্রথা সমাজকে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া, শাস্ত্র বিচার করিয়া চলিতেছে না, তাহারা গতানুগতিক ভাবে দেশাচারেরই অনুসরণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সমাজ দেশাচারের অধীন, শাস্ত্রের অধীন নহে এবং দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয়

সাধারণ উন্নতি দরকার।" এই দেশাচার যে অতি অশুভ সে বিষয়ে সন্দেহের স্থান নাই—কিরূপে ইহার উচ্ছেদ হয় তাহাই প্রশ্ন। সমাজের বহু লোকের আচরণ যে নিকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহাদের মধ্যে শৌচ নাই, আচার নাই কিন্তু সে-জন্য তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলে লোক-সংগ্রহ হয় না। গীতা মুক্ত ব্যক্তিকে লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে (৩।২০)। আমরা দেখি প্রাচীন ভারত এই প্রথাই অনুসরণ করিয়া সমাজকে শক্তিশালী করিয়াছিল। হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের মধ্যে সকল প্রকার লোকের স্থান করিয়া দিয়াছিল—অনার্য্যগণ আর্য্য সমাজে শূদ্রের স্থান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, আর্য্যগণের সেবার দ্বারা তাহারাও আর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এক সময়ে শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশাগত অহিন্দু জাতিসমূহ দলে দলে আসিয়া ভারতের অনেকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল—তাহারা এখন বিশাল হিন্দুজাতির সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিবার আর কোন চিহ্নমাত্র নাই। মুসলমানেরা যখন ভারতে আসে তখন হিন্দু-সমাজের প্রাণশক্তি এবং সেই সঙ্গে গ্রহণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের শরীরে অস্পৃশ্যতারূপ মহাব্যাধি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাহ্য আচার বিচারের কড়াকড়িতে হিন্দু মানবতার সত্য ভুলিয়াছে—তাই বিদেশ হইতে আগত মুসলমানগণকে আপন করিয়া লইতে পারে নাই, পক্ষান্তরে আপনার জনকেই দলে দলে সমাজ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়া মুসলমানেরই দলপুষ্টি করিয়াছে।*

কিন্তু আশার কথা এই যে, হিন্দু-সমাজের বাহ্য আচার ব্যবহারে যতই গ্লানি প্রবেশ করুক হিন্দু অধ্যাত্ম সত্যকে কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই। বহু সাধু সন্ত মহাপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মানুষ মাত্রেই ভাগবত সত্তা, বাহ্য আচার ব্যবহার যাহার যাহাই হউক, সকলেই নিজের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার বিকাশ করিয়া ইহ জীবনেই উচ্চতম অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারে। ধর্ম্মগ্রন্থের

* গুজরাটের ইতিহাস হইতে জানা যায়, মুসলমানেরা গ্রামের কোন পাড়ায় যদি গোমাংস ফেলিয়া দিত—সেই পাড়ার সমস্ত লোক হিন্দু সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমান হইতে বাধ্য হইত!

ভিতর দিয়াও এই আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি ভগবানকে ভক্তি করে তবে সে শীঘ্রই সাধু ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে, কোন কূলে জন্ম বা কোনরূপ আচরণের জন্য কেহ চিরকাল পতিত থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এই শিক্ষারই প্রতিধ্বনি করিয়া পতিত উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭

হে প্রভো! যাহার রসনাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

শ্রীমদ্ভাবগত ৩।৩৩.৬

হে ভগবান! তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমাকে স্মরণ অথবা প্রণাম করিলে চণ্ডালও যখন আশু পবিত্র হইয়া সোমযাজী দ্বিজতুল্য হইয়া উঠে, তখন তোমার দর্শনে যে কি ফল হয় তাহা আর কি বলিব।

এই সব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রবল দেশাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। স্মৃতি সংহিতা কর্ত্তৃক সমর্থিত দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গীতা ও ভাগবতের এই শিক্ষা সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করিতে সাহস করিয়াছিলেন বাংলা দেশে প্রথমে শ্রীচৈতন্য। তাঁহারই উপদেশে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য যবন হরিদাসকে সৎপাত্র ও সদ্ব্রাহ্মণ জ্ঞানে স্বকীয় পিতার শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করিতে দেন। তিনি সুবর্ণ বণিক উদ্ধরণ দত্তের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতেন,

প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ।

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

প্রায় ঐ সময়েই পঞ্জাবে গুরু নানক এবং যুক্ত প্রদেশে মহাত্মা কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতিমূলক ধর্ম্মের প্রচার করেন। বাউল গানে আমরা এই অভিনব মানবধর্ম্মের সুন্দর পরিচয় পাই—তাহা মূলতঃ বেদান্ত ও গীতারই শিক্ষার সহজ প্রকাশ—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

* * * *

নরদেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন।

* * * *

তাইতে বাউল হইনু ভাই,
এখন লোকের বেদের ভেদ বিভেদের দাবী দাওয়া নাই।

* * * *

আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়,
যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস এই দেহে সে রয়।

* * * *

প্রেম দুয়ারের নানা তালা,
পুরাণ কোরাণ তসবী মালা।

এই সব বাণী ভারতের লক্ষ লক্ষ পতিত অস্পৃশ্যের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল, তাহাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল—এইভাবে হিন্দু সমাজ রক্ষা পাইল, নতুবা এতদিন সব অস্পৃশ্য অপমান ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, স্পৃশ্য হিন্দুগণ হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু সেই সব অস্পৃশ্যের উদ্ধার আজিও হয় নাই—শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, হিন্দু সমাজের জড়তা ও তামসিকতা তাহা সম্পূর্ণ হইতে দেয় নাই, তাঁহাদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেশাচারের কঠিন নিগড় সমাজকে চাপিয়া ধরিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে একই সময়ে বাংলার ব্রাহ্মসমাজ এবং পঞ্জাবে ঋষি দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ হিন্দুর অজ্ঞান জড়তা দূর করিবার চেষ্টা করে—তাহাতে অনেক কাজ হইলেও এখনও হিন্দু-সমাজ

হইতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই। তবে এখন অবস্থা অনেক অনুকূল হইয়াছে—পাশ্চাত্য শাসন ও সভ্যতা হিন্দুর অনেক কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদ করিয়াছে, এখন বহু ব্রাহ্মণই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে অগ্রণী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিসাব দিয়াছিলেন, ভারতে অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী গোঁড়া ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪০ লক্ষ; মোট ১ কোটি ৪২ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে বাকী ব্রাহ্মণগণ সকলেই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে বিশেষ সমুৎসুক। অতএব আশা করা যায় এইবারে এই পাপ হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া যাইবে। বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র স্বরূপ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ ভাগবতরত্ন বলিয়াছেন—

"যস্মিন্ যুগে যদাচার যুগধর্ম্ম বিশিষ্যতে"

—এ যুগে যাঁহারা যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, এ যুগের যাঁহারা ঋষি, তাঁহাদের উদার বাণীর সহিত শাস্ত্র-বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নব্য ভারতে আবার নূতন ভাবে হিন্দু সমাজ গড়িয়া তুলিয়া, মানব-কল্যাণের পথে আনন্দে অগ্রসর হইতে হইবে। অমৃতের সন্তান, আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসক হিন্দু আজ নিরানন্দ হইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর, এ দুঃখ কে বুঝিবে, কে শুনিবে?"

(অমৃত, পৌষ, ১৩৪২)।

এ-যুগের যুগ-প্রবর্ত্তক দুইজন মহাপুরুষের বাণী উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের এই সুদীর্ঘ নিবন্ধ শেষ করিতেছি। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মত সকলেই জানেন, কিন্তু এখনও কার্য্যতঃ অনুসরণ করেন না, তাই এখানে পুনরায় কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"হিন্দুর ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁতমার্গে—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে প'ড়ে প্রাণ খুইও না। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি কেবল পুঁথিতে থাক্‌বে না কি? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি, সাবধান! কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাচ্ বিচার করেই জীবনটা কাটাতে হবে—না ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে? শাস্ত্র বলেন, খাদ্য্ ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। ১ম—জাতি দুষ্ট—যেমন

পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি; ২য়—নিমিত্ত দুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশগণ্ডা মাছি ম'রে পড়ে আছে,—রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়ছে ইত্যাদি; ৩য়—আশ্রয়দুষ্ট, যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কিনা তা সকল সময়ে খুব নজর রাখতে হবে। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝ্‌তে পারে না,—তাই নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চল্‌ছে; "ছুঁও না" "ছুঁও না" ক'রে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নাই,—গলায় একগোছা সুতো থাক্‌লেই হ'লো, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নাই।"

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—"চাই মৌলিক সত্য-সন্ধানী চিন্তা, বলিষ্ঠ ও সাহসিক অন্তর্জ্ঞান, কিন্তু বিশেষ করিয়া চাই অবিচল আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক সততা। আমাদের জীবনের নীতি এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে-গুলি অবনত ও দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে সে-গুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-গুলি নিজেরাই ভ্রান্ত, সমর্থনের অযোগ্য, আমাদের জীবনের দুর্ব্বলতাসাধক অথবা আমাদের সভ্যতার পক্ষে লজ্জা ও অপমানের কথা, কোনরূপ কূটতর্ক বা কুণ্ঠা না করিয়া সে-সব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পতিতদের প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করিতেছি ইহাই একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ ইহার অজুহাত স্বরূপ বলিবেন যে পুরাকালে এই ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল, এমন কি তখন এইটিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমাধান; কিন্তু এই শেষের যুক্তিটি খুবই তর্কের বিষয়, আর কোন জিনিষের একটা অজুহাত দেখাইতে পারিলেই যে সেটা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা নহে। আবার কেহ কেহ ইহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহা হউক কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া ইহাকে আমাদের সমাজের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থায়ীভাবেই বজায় রাখিতে চাহিতেছেন। যে সমাধান জাতির পঞ্চমাংশকে চিরকাল হীন করিয়া রাখে তাহা বস্তুতঃ সমাধান নহে, তাহা হইতেছে দুর্ব্বলতাকে মানিয়া লওয়া, সমাজ-শরীরের পক্ষে এবং সমাজের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পক্ষে একটা স্থায়ী ক্ষতকে মানিয়া লওয়া। যে সমাজ-সমন্বয় স্বদেশ-বাসীকে হীনাবস্থায় রাখাকেই একটা চিরস্থায়ী বিধান করিয়া তবে বাঁচিতে

চিরস্থায়ী বিধান করিয়া তবে বাঁচিতে পারে, তাহার বাঁচিবার অধিকার নাই। অশুভ ফলগুলিকে চাপা দিয়া রাখা চলিতে পারে, তাহারা কেবল কর্ম্মের সূক্ষ্মধারায় অদৃশ্যভাবে কার্য্য করে, কিন্তু এই সকল অন্ধকার স্থানে একবার সত্যের আলোক পতিত হইলে আর তাহাদিগকে স্থায়ী করিয়া রাখার অর্থ ধ্বংস ও মৃত্যুর বীজকেই জীয়াইয়া রাখা।" ("Is India Civilised? Arya, Vol. V, p 429).

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯

অন্বয়—যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ; হি ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ।

অনুবাদ—যাঁহাদের মন সাম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারা ইহলোকে এই পৃথিবীতেই সংসার জয় করিয়াছেন; ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন।

ব্যাখ্যা

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ—আত্মজ্ঞান লাভের ফল হয় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি, সকল ঘটনার প্রতি সমভাব। জ্ঞানী যখন নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তখনই তাহার মন সর্ব্বদা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি বা জ্ঞান বা চৈতন্য ইহা সব কিছুকে ছাড়িয়া শুধু ব্রহ্মকে দর্শন করা নহে, পরন্তু সকল জিনিষকে ব্রহ্মের মধ্যে দেখা, সকল জিনিষকেই আত্মা বলিয়া দেখা। ইহা উপনিষদেরই প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান—আত্মৈবেদং সর্ব্বং, ছান্দোগ্য—৭।২৫।২)। পরবর্ত্তী বেদান্ত দর্শনে এই জ্ঞানকে মোক্ষের উপায়রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—জ্ঞান লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মে লীন হয়, এবং সেই সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে হইলে দেহের পতন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু। (৪।১।১৪),

জ্ঞান প্রভাবে সংসারবন্ধনের হেতুভূত পুণ্য-পাপ উভয়েরই অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হওয়ায় দেহপতনান্তর জ্ঞানীর মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥ ৪।১।১৫;

কিন্তু যে সব পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বিনাশ হয় না, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, সেই পর্য্যন্তই মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটে (ছান্দোগ্য—৬।১৪।২)। কিন্তু গীতা বলিয়াছে, এই দেহের মধ্যে থাকিয়াই পূর্ণতম মুক্তি লাভ করা যায়, ইহৈব। জীব ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই—কিন্তু দেহের মধ্যে, এই পৃথিবীতে থাকিয়াই যে মুক্ত দিব্য জীবন লাভ করা যায় গীতা তাহারই উপর জোর দিয়াছে। গীতার মতে মুক্তির প্রকৃত অর্থ হইতেছে, বিক্ষোভময় নিম্নতন প্রকৃতির বশ্যতা হইতে, অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্তিলাভ —এইরূপ মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে এবং সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্য কর্ম্ম করা, দিব্য জীবন যাপন করা, ইহাই গীতার আদর্শ। এই দিব্য জীবনের স্বরূপ কি তাহা গীতা বিশদভাবে পরিস্ফুট করে নাই, কেবল পন্থাটি দেখাইয়া দিয়াছে। পন্থাটি হইতেছে কর্ম্মযোগ এবং তাহার ফল হইতেছে এই সংসারে থাকিয়াই সংসারকে জয় করা। সংসার দুঃখময় অনিত্য, গীতা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছে, তবে ব্রহ্মে লীন হওয়া হইতেছে দুঃখময় সংসার হইতে পলায়ন করা, তাহাকে জয় করা নহে। গীতা বলিয়াছে, এই সংসারে যত শত্রু আছে, তাহাদিগকে জয় করিয়া এইখানেই দিব্য জীবন ভোগ করিতে হইবে, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ব্রহ্মকে জানা, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ব্রহ্ম হওয়া—ইহাই প্রকৃত মুক্তি, ইহা যে এই পৃথিবীতে এই দেহ থাকিতেই হইতে পারে—তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে কেন যাইতে হইবে, আর মরণের পথই বা কেন দেখিতে হইবে? শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ সাম্য লাভ করিয়াছে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ ৪।৪।৬),—তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে ব্রহ্মভূত হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার ব্যক্তি "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"

(কঠ ৬।১৪), এইখানেই ব্রহ্ম লাভ করেন। তাহা হইলে অন্য শ্রুতিবাক্যে যে বলা হইয়াছে জ্ঞানীকে মুক্তির জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়—এখানে কি বিরোধ হইতেছে না? না—জীবত্বের, ব্যষ্টিগত জীবনের সম্পূর্ণ লয় সাধন করিয়া ব্রহ্মের মধ্যে লীন হওয়া যে-মুক্তির অর্থ তাহার জন্যই দেহপাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ এই দেহটিই হইতেছে ব্যষ্টিগত জীবের স্থূল আধার—এইরূপ লয় বা মুক্তিকে "বিদেহ" মুক্তি বলা যায়। আর দেহের মধ্যে থাকিয়া ইহৈব যে মুক্তিলাভ করা যায়, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিতই এই বিশ্বলীলার আস্বাদন করে—তাহাকে "জীবন্মুক্তি বলা যায়। পূর্ব্ব বৈদান্তিকগণ বিদেহ মুক্তির উপরেই জোর দিয়াছিলেন, গীতা জীবন্মুক্তির উপরেই জোর দিয়াছে। পূর্ব্ব বৈদান্তিকগণ জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের মতে ইহা কেবল পূর্ণ ও চরম মুক্তিলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। চরম বিদেহমুক্তিই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য, পরম গতি—জ্ঞানলাভের পর যত দিন না দেহটার পতন হয়, ততদিন বাধ্য হইয়া জ্ঞানীকে এই অপূর্ণ মুক্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হয়, যতটুকু কর্ম্ম না করিলে নয়, ভিক্ষা ইত্যাদি করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে হয়। কিন্তু গীতা এই শিক্ষা দেয় নাই, গীতা বলিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই পরম গতি, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ (কঠ ৩।১১)। তাহা এই সংসারে, এই দেহে থাকিয়াই হয়। এবং সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের সকল দুঃখ দ্বন্দ্বকে জয় করা যায়, তখন আর সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার কোন আবশ্যকতা থাকে না; মুক্ত পুরুষ সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের সকল কর্ম্ম করিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে উপভোগ করেন—সেই চৈতন্যময়, আনন্দময় অবস্থা হইতে তাঁহার আর কিছুতেই পতন হয় না।

কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষগুলিকে ত বর্জ্জন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে? এই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য যোগীকে যে কত কষ্টকর প্রয়াস করিতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে, আত্ম-দর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করা হয়। 'হে অর্জ্জুন, যে-ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিষকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাঁহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম যোগী মনে করি' (৬।৩২)। আর ইহার দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, তিনি নিজে দুঃখলেশশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং অপরের

দুঃখের মধ্যেই পুনরায় সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিবেন, পরন্তু তিনি যে-সকল দ্বন্দ্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, জয় করিয়াছেন সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে চলিতে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন এবং দ্বন্দ্ব-সকলের বাহ্য দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ বা বিভ্রান্ত না হইয়া কেবল তাহাদের প্ররোচনায় সাহায্য করিতে, নিরাময় করিতে, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিজেকে ব্যাপৃত করিতে, মানব-সকলকে অধ্যাত্ম আনন্দের দিকে লইয়া যাইতে, ভগবদ্ অভিমুখে সংসারের প্রগতির জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই সংসারে যতদিন তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হয় এইভাবেই তিনি দিব্য-জীবন যাপন করিবেন। যে ভগবদ্ ভক্ত ইহা করিতে পারেন, এইভাবে সকল জিনিষকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করিতে পারেন, শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণ-সকলের মধ্যে ও তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ অধ্যাত্ম একত্বের উচ্চভূমি ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি ভগবদ্দর্শনের উদারতায় মুক্ত ও স্বাধীন, ভাগবত প্রকৃতির শক্তিতে মধুর, মহান ও জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম যোগী বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২য় খণ্ড।

যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ—জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণতম সমতা লাভ হয় তাহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান বলিয়া দেখা যায়, সকলকেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া দেখা যায়। গীতার এই শিক্ষার দ্বারা পাছে সামাজিক ভেদ বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, ভক্ষ্য অভক্ষ্য ভেদ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ দূর হইয়া যায়, সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর এখানে গৌতম স্মৃতি হইতে একটি বচন তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সমত্ব-দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাঁহার মতে গীতা যে সমদর্শনের কথা বলিয়াছে তাহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রযোজ্য, সংসারীর পক্ষে নহে। কিন্তু গীতা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিবার কথাই বলিয়াছে, তাহাই গীতার কর্ম্মযোগ; সংসার ত্যাগ ও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য গীতা জ্ঞান ও সমতার শিক্ষা দেয় নাই। আর, সকল জিনিষে যে ভেদ ও বৈষম্য দর্শন করিবে সে সমদৃষ্টি লাভ করিবে কেমন করিয়া? সংসারের মধ্যে থাকিয়া সকলকে সমানভাবে দেখা অভ্যাস করিতে করিতেই আমরা

প্রকৃত অদ্বৈত উপলব্ধি ও সমদৃষ্টি লাভ করিতে পারি। অতএব সমাজে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যে অলঙ্ঘ্য ভেদ প্রচলিত আছে তাহা সত্যজ্ঞানের বিরোধী এবং বর্জ্জনীয়। গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে সাময়িক বাহ্য ভেদ থাকিবে, কিন্তু মূল সত্তায় সকলেই ব্রহ্ম, সকলেই এক, এই দৃষ্টি সকলকেই অভ্যাস করিতে হইবে এবং গীতা এখানে সেই শিক্ষাই দিয়াছে। যে-মানুষকে আমি অস্পৃশ্য বা অদর্শনীয় বলিয়া সর্ব্বদা দূরে রাখি, তাহার সহিত আমি মূলতঃ এক, সে ব্রহ্ম, ভগবান—এ জ্ঞান আমার কিছুতেই হইতে পারে না। সর্ব্বভূতের মধ্যে সমান ভাবে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, ভগবান রহিয়াছেন,তাঁহার ভজনা ও সেবা করিতে করিতেই আমরা একত্বের জ্ঞান লাভ করি, ব্রহ্মজ্ঞানে, ভগবদ্‌জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন সংসারে সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আর আমাদের ভগবদ্‌জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি হয় না (৬।৩১)।

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম, এই দৃষ্টি অনুসারে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়েই সমান ভাবে ব্রহ্ম, এবং ইহাই গীতার মত। শঙ্করের মতে "সর্ব্বং" বলিয়া, জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইতেছে—এ সবই মিথ্যা, মায়া, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তাই তিনি সামাজিক ভেদ বৈষম্য স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার মতে যতক্ষণ সংসার আছে, সমাজ আছে, ততক্ষণ ভেদ আছে। অভেদই সত্য, ভেদ সত্য নহে; সমাজ মিথ্যা ভেদের খেলা—এই মিথ্যা হইতে সরিয়া গিয়াই ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিতে হয়। কিন্তু গীতা যে প্রাচীন বৈদান্তিক মত প্রচার করিয়াছে, তাহাতে ভেদও সত্য, অভেদও সত্য, ব্রহ্মও আছেন, জগৎও আছে, ব্রহ্মই এই সব জগৎ, সব জীব হইয়াছেন—ইহাই "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" বাক্যটির প্রকৃত অর্থ। এই অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে জগৎকে, জগতের সকল বস্তু ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া, ভগবান বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে—সমাজ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করিয়া রাখিয়াছে তাহা এই পূর্ণ ব্রহ্মোপলব্ধির বিরোধী।

ভক্ষ্য অভক্ষ্যের প্রভেদ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের প্রভেদ হিন্দুর দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দেশাচারই লিপিবদ্ধ হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এইসব আচারকে শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। দেশাচারের সদাচারেরও মূল্য আছে, সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে

আচারের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল সামাজিক আচার বিচার পরিবর্ত্তনশীল, এক সময়ে যাহা উপযোগী ছিল অন্য সময়ে তাহা অনুপযোগী হইয়া উঠিতে পারে—তখন যদি গতানুগতিকতার বশে সেইসব আচারকে ধরিয়া থাকা যায় তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হয়। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌতম স্মৃতি হইতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইটি অনুধাবন করিলেই আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে (১৭।২০) "তাঁহার অন্ন অভোজ্য" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সম ও অসম ব্যক্তিগণকে দানাদি করিয়া তাঁহাদের বিষম ও সম করা হইলে তাদৃশ স্থলে পূজার জন্য অর্থাৎ দানাদির জন্য" এইরূপ বলা হইয়াছে। বচনটির অর্থ ·এইরূপ—"চতুর্ব্বেদে পারদর্শী অত্যন্ত সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিকে যেরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্নাদি দিয়া পূজাবিশেষ করা হয় তাঁহারই সদৃশ অন্য একজন চতুর্ব্বেদ পারগামী সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যদি তদপেক্ষা অল্প বস্তু দিয়া বিষম অর্থাৎ পূজাবিশেষের ন্যূনতা করা হয় এবং অল্পবেদজ্ঞ হীনাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির যেরূপ নিকৃষ্ট উপকরণ দিয়া পূজা-বিধি করা হয় যিনি সেইরূপই অসম অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বেদপরায়ণ সদাচার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন তাঁহার সম্বন্ধে সেই হীন পূজার আধিক্য করিলে অর্থাৎ প্রধান (উৎকৃষ্ট) ব্যক্তির যেরূপ পূজা করা হয় সেইরূপ পূজা করিলে উত্তম ব্যক্তির হীনতা করায় এবং হীন ব্যক্তির উত্তমতা করায় সেই পূজা হেতু সেই পূজয়িতার অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সেইরূপ পূজা করে তাহার অন্ন অভোজ্য হয়" (মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা)।

সমাজে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি আছে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিও আছে, তাহাদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে—গীতা সে শিক্ষা দেয় নাই, তবে গীতা বলিয়াছে যে, এইরূপ নিকৃষ্ট ভেদ জন্ম বা জাতির উপর নির্ভর করে না, সকল মানুষই মূল সত্তায় ব্রহ্ম, অতএব সকলেই শিক্ষা দীক্ষা সাধনার দ্বারা নিজ নিজ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে—এই যে মূলগত সাম্য, এইটিই গীতার শিক্ষা। আর, মানুষের গুণ ও কর্ম্মভেদে তাহার প্রতি ব্যবহারের যে তারতম্য করিতে হইবে তাহাও দেশকালভেদে বিভিন্ন হয়, সে সম্বন্ধে চিরদিনের জন্য কোন বিধান বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। সে যুগে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন পন্থা ছিল না, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, সমাজের অন্যান্য বর্ণের

কর্ত্তব্য ছিল দান ও পূজার দ্বারা সদাচারী ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্যভাবে সম্বর্দ্ধিত করা—সেইজন্য যাহারা তাহা না করিবে তাহাদের প্রতি সামাজিক দণ্ডের বিধান ছিল। আজ আর সমাজের সে পরিস্থিতি নাই, অতএব গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐসব বিধানের যে আর সেইরূপ উপযোগিতা নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজের বিকাশের এক অবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রয়োজন ছিল, তাই তদনুরূপ সামাজিক বিধিবিধানও হইয়াছিল; কিন্তু চিরকাল এক শ্রেণীর লোকই বিদ্যার অনুশীলন লইয়া থাকিবে, অন্য সকলে অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত থাকিবে ইহা ভগবানের বিধান নহে, ক্রমশঃ সকল মানুষকেই ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে হইবে—তবেই আদর্শ মানবসমাজ গড়িয়া উঠিবে; সমাজের প্রগতি যে সেই দিকেই চলিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট—এবং গীতা এই সাম্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তিটি দেখাইয়া দিয়াছে।

গ্রামের এক প্রান্তে অন্ত্যজ চণ্ডালেরা বাস করিবে, কোন ভদ্র, শিক্ষিত ব্যক্তি সে ধার দিয়া যাইবে না, তাহারা অজ্ঞান ও অনাচারের মধ্যে চিরকাল পড়িয়া থাকিবে—এ-ব্যবস্থা কখনই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে, কারণ ঐ পল্লীতে যত পাপ ও রোগের সৃষ্টি হইবে তাহা সমস্ত সমাজ অঙ্গেই ছড়াইয়া পড়িবে, ক্রমশঃ সকলেই ঐ চণ্ডালের স্তরে নামিয়া যাইবে। প্রকৃত পন্থা হইতেছে, যাহারা নীচে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া উৎকৃষ্টের স্তরে তুলিয়া লওয়া; গীতা এই পথই দেখাইয়াছে, স্পষ্ট বলিয়াছে যে, পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডালও পরম উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারে (৯।৩২)।

শঙ্করাচার্য্য গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌতমধর্ম্মসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু সমাজে প্রচলিত ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিভাগ অর্থাৎ "ইহা ভক্ষ্য, ইহা অভক্ষ্য" এইরূপ বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সহস্রাধিক বৎসর পরে আজও হিন্দুসমাজে সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার চলিতেছে। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কি সংক্ষেপে এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে এইরূপ শ্রুতি আছে—"প্রাণবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলের অন্নই তাঁহাদের ভক্ষ্য" (ছান্দোগ্য—৫।২।১)। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও এইরূপ উক্তি আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে ভক্ষ্য অভক্ষ্য সম্বন্ধে যে বধিনিষেধ আছে তাহা এইসব শ্রুতিবচনের বিরুদ্ধ। তাই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা

করিলেন যে, শ্রুতি বস্তুতঃ সর্ব্বান্নভোজনের বিধান দেয় নাই, অন্নাভাবে প্রাণ-বিয়োগরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রাণরক্ষার নিমিত্তই সর্ব্বান্নভোজনে অনুমতি করা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র—৩।৪।২৮)। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে শ্রুতি-সম্মত দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। চাক্রায়ণ ঋষি বিপন্ন হইয়া হস্তীপালকের অর্দ্ধভুক্ত কুল্মাষ অর্থাৎ ছোলার ঘুংনি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"এই অন্ন না খাইলে আমার জীবন রক্ষা হইত না, জীবনরক্ষার জন্যই উচ্ছিষ্টও খাইয়াছি, কিন্তু জল সুলভ, সর্ব্বস্থানেই জল পাইব।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়ম শ্রুতিশাস্ত্র-সম্মত কোন সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক শাশ্বত বিধান নহে, কোন বিশেষ অবস্থায় উহা সামাজিক আচার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবং সেই দেশাচারই স্মৃতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় না যে, কাহারও স্পর্শের জন্য কোন অন্ন বা জল অভক্ষ্য বা অপানীয় হইত। উচ্ছিষ্ট জল ও অন্নই অভক্ষ্য, এবং তাহার কারণও সুস্পষ্ট—উহা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান। আরও কথা এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রাণবিয়োগরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভোজনের অনুমতি করা হইয়াছে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলেও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ঐ অনুমতি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ অস্পৃশ্যতা-দোষে শুধু ব্যক্তি বিশেষের নহে, সমগ্র হিন্দু সমাজ, হিন্দুজাতিরই প্রাণান্ত হইতে চলিয়াছে।

গীতা শ্রুতিশাস্ত্রের সার, তাহার মধ্যে আমরা কোথাও দেখিতে পাই না যে স্পর্শ দোষে কাহারও অন্ন অভক্ষ্য হয়। গীতাও ভক্ষ্য অভক্ষ্যের বিভাগ করিয়াছে—কিন্তু তাহার লক্ষ্য হইতেছে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা। গীতার মতে সাত্ত্বিক আহার হইতেছে, আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (১৭।৮)। অতিশয় কটু ও রুক্ষ, যে সব খাদ্যের দ্বারা রক্ত গরম হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা রাজসিক এবং পচা, বাসি, উচ্ছিষ্ট তামসিক। অতএব যাহাতে শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহাই ভক্ষ্য, এবং তাহার বিপরীত অভক্ষ্য—খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর অন্য কোন নিয়মই পালনীয় নহে। স্পর্শ-দোষও আছে, যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়, সেই অন্নের সহিত তাহার প্রভাব সূক্ষ্মভাবে আসিতে পারে—কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বাহ্য সামাজিক বিধিনিষেধ বাঁধিয়া দেওয়া চলে না,

অধ্যাত্ম সাধনায় যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারাই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে গতানুগতিক ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার চলিতেছে—ইহার মূলে কোন সত্য বা হিতকারিতা নাই, ইহা কেবল সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুর প্রাচীন মহামান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে-সব বিধান রহিয়াছে, সে-সব অমান্য করিলে কি হিন্দুসমাজ উৎসন্ন যাইবে না? হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর হিন্দুত্বই যদি লোপ পাইল তাহা হইলে আর সমাজ রক্ষার সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, হিন্দুধর্ম্মে কতকগুলি শাশ্বত সনাতন নীতি আছে —তাহাই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম, তাহা শুধু হিন্দুর ধর্ম্ম নহে, সকল মানবেরই ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই মানুষ ক্রমশঃ ভগবানের দিকে, ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সনাতন ধর্ম্মকে হিন্দু যে-ভাবে ধরিয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া অনুসরণ করিয়াছে, জগতে আর কোন জাতিই তাহা পারে নাই— এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়। এবং উহার শাস্ত্র হইতেছে বেদ, উপনিষদ ও গীতা। কিন্তু হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যে সব বিধান আছে সে-সবই ঐ সনাতন ধর্ম্ম নহে, বিশেষ দেশ ও কালের উপযোগী বহু নৈতিক ও সামাজিক বিধান ঐ সকল শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, এবং মানুষের ক্রম-বিকাশের ধারায় যে-সব বিধান অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে তাহাদের স্থলে নূতন নূতন বিধিবিধান প্রয়োজন হইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Synthesis of Yoga গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "প্রাচীনেরা জ্ঞানীদের নীতিরূপে মনুসংহিতা প্রভৃতি যে-সকল ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা সামাজিক বিধান, নৈতিক আদর্শ এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি শাশ্বত নীতি বিধিবদ্ধ করিয়া সেই সবের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ক্রমবিবর্ত্তনশীল (evolutionary), তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শেষেরটিরও তদবস্থা হইয়াছে (অর্থাৎ তাহারা নিজেরা শাশ্বত হইলেও তাহাদের রূপের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন)। অতএব কালক্রমে শাস্ত্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ উহার উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন করিতে হয় অথবা শেষ পর্য্যন্ত উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়, নতুবা উহা মানবজাতির আত্ম-বিকাশে কঠিন বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কেবল তাহাই নহে, শাস্ত্রের ঝোঁক হইতেছে সমষ্টিগত

ও বাহ্য বিধিনিষেধেরই দিকে, তাহা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির খবর লয় না। কিন্তু মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে এই ভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না, তাহার দাবী অলঙ্ঘনীয়; উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত চালিত হইলে তাহার পতন হইতে পারে বটে, কিন্তু বাঁধাধরা গতানুগতিক বিধিনিষেধের দ্বারা জোর করিয়া তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিলে অগ্রগতি প্রতিহত ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইবে। আসল কথা, ব্যক্তিই শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করিবে এবং তাহা সমাজকে দিবে, অন্য লোককে দিবে—তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবে না, পরন্তু যে-উপায়ে ব্যক্তি নিজ জীবনে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়াছে সেই পথ প্রদর্শন করিয়া। অধ্যাত্ম জীবন চিরকালই বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে অস্বীকার করে। অধ্যাত্ম জীবন বিস্তৃতি লাভ করিলেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করিবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মের সহিত, আত্মার সহিত সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই নিরবচ্ছিন্ন সংস্পর্শেরই পরিণতি হইতেছে ভগবদ্-ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং যে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম এই সবই হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের নিমজ্জন। ইহার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী স্বরূপ হইবে আত্মার সার্ব্বজনীন ভাব, সাম্য ও সকলের সহিত ঐক্য। সেই সার্ব্বজনীনতা ও ঐক্যের মধ্যেই আমরা মানবজীবনের মধ্যে ভাগবত প্রকাশের পরমতম সত্যটি লাভ করিব।" (Arya, Vol. I. P. 690)

নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম—শঙ্কর গীতার এই উদার ও গভীর অর্থপূর্ণ শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, জ্ঞানীগণ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে ভেদ করেন না, কিন্তু এইরূপ বিষয়ে সমদর্শন শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং পাপ; সেইজন্য গীতা এই শ্লোকে (১৯) বলিতেছে যে সর্ব্বত্র সমদর্শন দোষ হইলেও জ্ঞানীগণকে সে দোষ স্পর্শ করে না, কারণ তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া যে-ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থান করেন তাহাতে কোন দোষের লেশমাত্র নাই। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা গীতার মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়। সমদর্শনে কোনরূপ দোষ হয় তাহা গীতা এখানে স্বীকার করিয়া লয় নাই—এইসব বাহ্য সামাজিক ভেদ সমর্থন করা আদৌ গীতার লক্ষ্য নহে, অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়া এই সংসারেরই কর্ম্ম করিতে হইলে, প্রকৃত কর্ম্মযোগী হইতে হইলে, এই সংসারে

থাকিয়াই সংসারের দুঃখ দ্বন্দ্বকে জয় করিতে হইলে যে সাধনা ও সিদ্ধি প্রয়োজন গীতা এখানে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে, এবং তাহা হইতেছে সর্ব্বত্র সমদর্শন ও সাম্য। গীতা অন্যত্র এই সমত্বকেই যোগ বলিয়াছে, সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীতার এই সমতা শুধু উদাসীনতা বা নিরপেক্ষতা বা অন্য কোনরূপ মানসিক ও প্রাকৃতিক সমতা নহে—ইহা হইতেছে গভীর আধ্যাত্মিক সমতা—ইহাতে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত নিজদিগকে এক করিয়া দেখি, সকলের সহিত একত্ব অনুভব করি—ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই এই সমতা লাভ করা যায়, কারণ ব্রহ্মই সকলের মূল সত্তা, সকলের মধ্যে সমান, এক ও সম, সেইজন্যই, তস্মাৎ, যোগীগণ ব্রহ্মের সন্ধান করেন, ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হন।

ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, একথা এখানে বলিবার তাৎপর্য্য কি? শঙ্কর বলিয়াছেন চণ্ডালাদি হইতেছে স্বভাবতঃই অপবিত্র, দোষবৎ—কিন্তু ব্রহ্ম চণ্ডালের মধ্যে থাকিলেও অপবিত্র হইয়া যান না। অজ্ঞান লোকেরাই মনে করে যে ব্রহ্ম অপবিত্র চণ্ডালের সংস্পর্শে অপবিত্র হইয়া যান, সেইজন্যই গীতা বলিতেছে, না সেরূপ নহে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সকল সময়েই নির্দ্দোষ। কিন্তু ব্রহ্ম চণ্ডাল সংস্পর্শে কলুষিত হইয়া যান, অজ্ঞান লোকের এই ধারণা দূর করিবার জন্যই গীতা এই শ্লোকটি রচনা করিলে—ইহার সহিত গীতার পূর্ব্বাপর বক্তব্যের কোনই সঙ্গতি থাকে না। বস্তুতঃ চণ্ডালের সংস্পর্শে ব্রহ্ম অপবিত্র হন কিনা গীতা এখানে সে নিরর্থক আলোচনা করে নাই। যিনি জানেন যে, চণ্ডালের মধ্যেও ব্রহ্ম আছেন, তিনি জ্ঞানী, ব্রহ্মবিৎ—তিনি কখনই মনে করিবেন না যে, ব্রহ্ম অপবিত্র হইতে পারেন। অতএব শঙ্কর যে বলিয়াছেন, "দোষযুক্ত শ্বপাকাদিতে (চণ্ডাল প্রভৃতিতে) স্থিত বলিয়া মূঢ়গণ সেই শ্বপাকাদির দোষে ব্রহ্মকেও দোষযুক্ত মনে করিয়া থাকে"—ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক, যে ব্যক্তি মূঢ় অজ্ঞান সে কেমন করিয়া জানিবে যে চণ্ডালের মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন? এইভাবে শঙ্কর এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্তিজনক হইয়াছে। গীতা সমদর্শনের দোষ খণ্ডন করিবার জন্যই এই শ্লোক রচনা করে নাই, পরন্তু পূর্ব্বশ্লোকে যে সমদর্শনের কথা বলা হইয়াছে তাহারই প্রশংসা করিয়া এই শ্লোকে বলিয়াছে যে, যাঁহারা সমদর্শী তাঁহারা সংসারের সকল অশুভ ও পাপকে জয় করিয়াছেন, আর এই সমদর্শন ও সাম্যের ভিত্তি হইতেছে নির্দ্দোষ ও সমব্রহ্মের জ্ঞান। নির্দ্দোষ ব্রহ্ম হইতেছেন সম, অতএব যাঁহারা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সংসারকে ইহজন্মেই

জয় করিতে চান তাঁহাদিগকে এই নির্দোষ ও সমব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ—শঙ্কর বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃ দুষ্ট (অপবিত্র) চণ্ডালের মধ্যে স্থিত হইলেও ব্রহ্ম সেই চণ্ডালাদি আশ্রয়ের (উপাধির) অপবিত্রতায় দুষ্ট অর্থাৎ অপবিত্র হন না—এইভাবে তিনি গীতার দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে চণ্ডালের অপবিত্রতা এবং অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে গীতার অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত—গীতা বলিতেছে যে, সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম সমানভাবে রহিয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যে রহিয়াছেন ঠিক তেমনিই চণ্ডালের মধ্যেও রহিয়াছেন—অতএব মূলসত্তায় ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে কোন প্রভেদই নাই, সমাজে যে ভেদ করা হয় তাহা বাহ্য ও সাময়িক। শঙ্কর আত্মা ও দেহে তীব্র প্রভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন দেহ স্বভাবতঃ পবিত্র, কোন দেহ অপবিত্র কিন্তু সকল দেহের মধ্যেই যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহা কখনই অপবিত্র হয় না। কিন্তু দেহ ও আত্মায় এইরূপ সত্তাগত প্রভেদ করা, শ্রুতি ও যুক্তি উভয়েরই বিরুদ্ধ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছে, এই দেহও ব্রহ্ম। অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ (তৈত্তিরীয় ৩।২)। ব্রহ্ম বা আত্মাই যে সব কিছু হইয়াছেন তাহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—আত্মৈবেদং সর্ব্বং (ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২), সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছা—৩।১৪।১), ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং (ছা—৬।৮।৭), ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ (বৃ—১।৪।১০),—ইদং পদবাচ্য সমস্তই আত্মরূপে পূর্ব্বে ছিল। তৎ সর্ব্বমভবৎ (তৈ—২।৬), তিনিই সমস্ত হইলেন। অতএব চণ্ডাল যে কোন অসৎ অশুদ্ধ বস্তু হইতে উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণের ন্যায়ই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই চণ্ডাল হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহের স্থান নাই—এবং গীতা এখানে সেই কথাই বলিয়াছে। তাহা হইলে চণ্ডাল কেমন করিয়া মূলতঃ অশুদ্ধ হয়? যে জিনিষ স্বর্ণধাতুতে গড়া, সাময়িকভাবে তাহা যত মলিনই হউক, তাহার স্বর্ণত্ব কখনও লুপ্ত হয় না, ময়লা দূর করিয়া দিলেই সে নিজ প্রভায় প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় চণ্ডালের মধ্যেও ব্রহ্ম সমানভাবে নিজ গৌরবে প্রকাশিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—"সমম্ ব্রহ্ম" বলিতে গীতা ইহাই বুঝাইয়াছে।

ব্রহ্মই যে চণ্ডাল হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে আরও দুই একটি প্রমাণ দেওয়া যাক্। অথর্ব্ববেদের একশাখীরা "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা'—

দাশ (কৈবর্ত্ত) সকল ব্রহ্ম, দাস সকল ব্রহ্ম, কিতব (ধূর্ত্ত) সকলও ব্রহ্ম—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মেরই দাস কিতবাদিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। ২।২।১২

আমরা সংসারে মানুষ বলিয়া যাহা দেখি তাহা ব্রহ্মেরই ব্যষ্টিগত সত্তা, individual being; এক ঈশ্বরই বহু হইয়া সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়াছেন, একই রূপকে তিনি বহুভাবে গঠন করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ। ৪।৩

"তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী; তুমিই বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া যষ্টির সাহায্যে ভ্রমণ কর। তুমিই সর্ব্বরূপে জন্মগ্রহণ কর।" গীতাতেও বলা হইয়াছে—

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪।৪

"হে কুন্তিনন্দন! সর্ব্বযোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরা প্রকৃতিই তাহাদের যোনি বা মাতৃস্বরূপ এবং আমিই তাহাদের গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা স্বরূপ।" অতএব চণ্ডালকে যে হীনযোনিসম্ভূত, পাপযোনিসম্ভূত বলা হয়, সেটা কেবল সামাজিক কৃত্রিম ভেদ, পরমার্থতঃ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলেই মূল সত্তায় একই ধাতুতে গড়া, সকলেই জগদীশ্বর ও জগন্মাতার সন্তান।

এক ব্রহ্মই যে সব হইয়াছেন, এই বৈদান্তিক সত্যটি শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই শ্রুতিবাক্যের উপরেই তিনি সমস্ত জোর দিয়াছেন। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ, ২।১।১১) প্রভৃতি যে-সব বাক্যে বলা হইয়াছে বহুত্ব মিথ্যা, দ্বৈত মিথ্যা—শঙ্করের মতে সেইগুলিই পারমার্থিক সত্য; আর যে-সব শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে একই বহু হইয়াছেন, শঙ্করের মতে সেগুলি হইতেছে ব্যবহারিক সত্য—অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন ছিলেন তেমনই আছেন, এক কখনও বহু হয় নাই, তবে

যে আমরা বহু দেখিতে পাই এটা আমাদের মনের ভ্রম, মায়ার কুহক। কিন্তু দুই শ্রুতির মধ্যে যদি বলা হয় একটি প্রবল, অপরটি দুর্ব্বল, একটি পারমার্থিক সত্য, নিত্য সত্য, আর একটি ব্যবহারিক সত্য—অর্থাৎ যথার্থ নিত্য সত্য নহে—তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যেরই প্রামাণ্য হ্রাস করা হয়, আর প্রামাণ্য হ্রাস করার অর্থই অপ্রামাণ্য বলা। কোন্ শ্রুতি পারমার্থিক সত্য, আর কোন্ শ্রুতি ব্যবহারিক সত্য তাহার নির্ণয় কে করিবে? তাহা করিবে আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি। কিন্তু শঙ্কর ত নিজেই বলিয়াছেন, মনের যে জ্ঞান তাহা মিথ্যা, বুদ্ধি কখনও অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, সেইজন্যই ত শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব বুদ্ধির দ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য বিচার করিতে হইলে সমস্ত শ্রুতিকেই অপ্রমাণ বলিতে হয়। শঙ্কর তাহা বলেন না, শ্রুতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—এইভাবে তিনি নিজেই নিজের মতের বিরোধ সাধন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রুতিবাক্যে বিরোধ নাই—ব্রহ্ম এক, এবং ব্রহ্ম বহু—এই দুই শ্রুতিই সত্য, কোনটিই দুর্ব্বল নহে। ব্রহ্ম একই, তিনি বহু হইয়াও একই থাকেন, প্রকৃত দ্বৈত বা বহুত্ব বা নানাত্ব কোথাও নাই—তিনি তাঁহার মায়াশক্তি দ্বারা এক হইয়াও বহু রূপ গ্রহণ করেন, এক থাকিয়াও বহু হন—এই মায়া মিথ্যা-প্রসবিনী নহে, কারণ ইহা ব্রহ্মেরই মায়া, আর সৎস্বরূপ ব্রহ্মের মায়া বা শক্তি কখনই অসৎ বা মিথ্যা-প্রসবিনী হইতে পারে না। মানুষ যে জগতে শুধুই নানা দেখে, বহু দেখে, ভেদ দেখে—কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐক্য বা সাম্য দেখিতে পায় না, এইটি হইতেছে মনের ভ্রম; জ্ঞানীগণ এই ভ্রম হইতে মুক্ত হন, সকল ভেদের মধ্যে মূলগত সাম্য দেখিতে পান—এবং সেই জ্ঞান ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারে সকল দুঃখকে জয় করেন—কারণ অজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল। জ্ঞান লাভের ফলে দ্বৈত বা নানাত্ব দূর হয় না, সংসার বিলুপ্ত হয় না, কেবল সমস্ত সংসারকে এবং সকল বস্তুকে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ বলিয়া দেখা যায়, উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তির দ্বারা বহু হইয়াছেন, ব্রহ্মেরই মায়া ব্রহ্মের ভোগের জন্য, আনন্দের জন্য ব্রহ্মকে বহুরূপে প্রকট করিয়াছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

—শ্বেতাশ্বতরঃ ৪।১০

"প্রকৃতিই মায়া এবং তাহা মহেশ্বরেরই মায়া, তিনিই মায়াবী, তাঁহারই অঙ্গস্বরূপ সত্তাসকলে এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"

ব্রহ্ম আপন শক্তিরূপে আপনাকে প্রকটিত করিয়া জগন্মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন, শ্রুতি হইতে এইরূপ জানা যায়, অতএব জগৎলীলা ভ্রান্তিদর্শন, মরীচিকার প্রকাশ বা জীবের কল্পনার মত একাগ্র কল্পনা মাত্র নহে। কিন্তু ব্রহ্ম যদি নিজেকে জগৎরূপে প্রকট করেন—তাহা হইলে কি তিনি বিকৃত হন না? তাঁহার শাশ্বত, অক্ষর, অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ কি ক্ষুণ্ণ হয় না? তাহা হইলে আর ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ কেমন করিয়া বলা যায়? ব্রহ্ম যতক্ষণ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ততক্ষণ তিনি নির্দ্দোষ। অতএব ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব, অবিকার্য্যত্ব বজায় রাখিবার জন্যই শঙ্কর প্রভৃতি মায়াবাদীরা বলিয়াছেন জগৎ মিথ্যা, ইহা মানব-মনের ভ্রান্তি মাত্র, ব্রহ্ম কখনই কোন রূপ পরিগ্রহ করেন না। এই শ্লোকে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ব্যাখ্যা করিতে শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ সকল প্রকার দোষবর্জ্জিত,কারণ চৈতন্য নির্গুণ এবং নির্গুণত্ব নিবন্ধনই উহা স্বগত গুণ-বিশেষবশতঃ বিভিন্ন হইতে পারে না; ভগবানও বলিবেন, 'ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, আত্মার অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব নিবন্ধন' (গীতা ১৩।৩২) [পরমাত্মা বিকারী নহেন]" ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবে জগৎকার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের অবিকারিত্ব রক্ষা করিতে হইলে, শ্রুতি ও গীতায় যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে কেবল সেইগুলিকেই গ্রাহ্য করিতে হয়, কিন্তু শ্রুতির অনুসরণ করিয়া গীতা যে বলিয়াছে—জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—সে কথাকে দুর্ব্বল বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়। যে শ্লোকে গীতা ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছে সেই শ্লোকেই বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম শরীরের মধ্যে থাকিয়াও দোষে লিপ্ত হন না, এবং ঠিক তাহার পূর্ব্ব শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে জগতের সকল বহু পদার্থ সেই এক আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে,

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩।৩১

ভূতসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে এক আত্মার মধ্যে অবস্থিত এবং একমাত্র আত্মা হইতেই তাহারা উদ্ভূত ও প্রকটিত হইয়াছে। আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিলেও শরীরের বিকার, শরীরের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করে না, কারণ তাহা অনাদি, শাশ্বত, সকল গুণের অতীত, নির্গুণ। এখানে

গীতা যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছে কেবল সেইটিকেই যদি পারমার্থিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, আর গীতা যে বলিয়াছে ব্রহ্মই সব হইয়াছেন, বহু শরীর রহিয়াছে এবং সে-সবের মধ্যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন—গীতার একথা কেবল ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক ভাবে অসত্য হয়—তাহা হইলে সমস্ত শ্রুতির ন্যায় গীতাও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ শ্রুতি ও গীতার বাক্যে কোনরূপ বিরোধ নাই, ব্রহ্ম অরূপ বলিয়াই সকল রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, নির্গুণ বলিয়াই সকল গুণ প্রকট করিতে পারেন, অনাদি বলিয়াই সব কিছুর অনাদি কারণ হইতে পারেন—ইহাতে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন বা বিকারই হয় না, তিনি যদি এই সব না হইতে পারিতেন তাহা হইলেই তাঁহার ব্রহ্মত্ব ক্ষুণ্ণ হইত।

ব্রহ্ম অরূপ হইয়াও কেমন সকল রূপ গ্রহণ করেন, রূপের বিকারে বা পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না,শ্রুতি তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়াছে। "যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" (ছান্দোগ্য—৬।১।৪)—যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডজ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই জানা যায় যে এগুলি প্রকৃত-পক্ষে মৃত্তিকাই, মৃত্তিকারই ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশ, এ বিশ্বও তদ্রূপ প্রকৃত পক্ষে আত্মাই ও আত্মারই কৃত ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় মূর্ত্তি। মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করিলে মৃত্তিকাত্ব যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে ও কুম্ভত্ব প্রকাশ পায়, তেমনিই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁহার সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের যদি কোন বিশেষ গুণ থাকিত তাহা হইলে অন্য গুণ প্রকাশের সময় সেই গুণটি বিকৃত হইবার আশঙ্কা করা যাইত, কিন্তু এখানে ব্রহ্মের সক্রিয় ঈশ্বররূপ গুণ প্রকাশে সেরূপ আশঙ্কা করা যায় না। "এই ভাবেই বিশ্বপ্রকাশ হয়। সেই জন্যই সে অলিঙ্গ, আত্মা আপনাকে শক্তিরূপে প্রকাশ করিবার পর সেই সক্রিয়ত্বের অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয়ত্বরূপে পরিলক্ষিত হন ও নির্গুণ আখ্যার যোগ্য হন। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তিং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং প্রভৃতি শ্রুতির এইখানেই সার্থকতা, তখন সত্তারূপে তাঁহাকে নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিরূপে তাঁহাকে সগুণ সক্রিয় বা পরমেশ্বর, এইরূপ বলিতে হয়।……এই যে আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ, ইহাতে আত্মার বিকার আশঙ্কা করা যায় না। নির্গুণবাদীরা এই বিকারের ভয়েই জগৎক্রিয়া তাঁহাতে সাক্ষাৎভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহস করে না ও সেইজন্য ভ্রান্তি আদি কল্পনা করে। ক্রিয়াপ্রকাশে অলিঙ্গ পূর্ণ সত্তার বিকার হয় না;

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে (বৃহদারণ্যক ৫।১)—পূর্ণে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ণের পূর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রকাশ পায়, এবং পূর্ণ হইতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাও পূর্ণ, পূর্ণ তত্ত্বই এইরূপ। অনায়তন আত্মা ক্রিয়ারূপে ব্যাপ্তি প্রকাশ করিয়া জগদাকারীয় নামরূপ প্রকাশ করেন। তাঁহাতে ক্রিয়া ও ব্যাপ্তির নামরূপাত্মক রূপান্তর হয় মাত্র। বিশেষতঃ বিকার অর্থেই লিঙ্গবিকৃতি, অলিঙ্গের বিকার সম্ভব নহে। এই নাম, রূপ ও ক্রিয়ার বিকার শ্রুতি-স্বীকৃত। কিন্তু এ বিকারের অর্থ বস্তুবিকার নহে।" শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের "অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা।"

সর্ব্বত্র সমদর্শন, ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্বর্ণপ্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির চক্ষে উভয়েই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র স্বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। সেইরূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈত প্রপঞ্চ এবং তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয়। কিন্তু স্বর্ণ একই ধাতু হইলেও তাহা সিংহাসন ও প্রতিমা এই দুইরূপে প্রকট, অতএব যাহারা শুধু সিংহাসন ও প্রতিমার রূপের পার্থক্যটি দর্শন করে তাহারা যেমন ভুল করে, যাহারা শুধু স্বর্ণ ই দেখে, স্বর্ণের বিভিন্ন রূপকে ভ্রান্তি মনে করে তাহারাও ভুল করে। সর্ব্বত্র এক অদ্বৈত দেখাই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান বা সমদৃষ্টি নহে; স্বর্ণ বিভিন্নরূপ গ্রহণ করিলেও এক স্বর্ণই থাকে, তাহার স্বর্ণত্বের কোন হানিই হয় না—ইহাই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান ও সমদৃষ্টি। গীতা 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' বলিতে এই তত্ত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সম ও নির্দ্দোষ দেখেন কেবল তাঁহারাই প্রকৃত সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, তেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

পরব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ, অক্ষর এবং ক্ষর উভয়ই—গীতায় তাঁহাকেই পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। এখানে "সমম্ ব্রহ্ম" বলিতে গীতা পুরুষোত্তমের নির্গুণ ও অক্ষর সত্তাই বুঝাইয়াছে—ইহা প্রকৃতির সকল ক্রিয়া ও পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে, অথচ সমভাবে, নিরপেক্ষভাবে সব কিছু ক্ষরলীলাকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেই জন্যই তাহা নির্দ্দোষ এবং সম। প্রকৃতির সকল দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠিতে হইলে, এই সংসারে থাকিয়াই সংসার জয় করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে এই অক্ষর পুরুষের সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা

পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিতে পারিব—তাঁহারই ন্যায় ভিতরে অক্ষর প্রতিষ্ঠা হইতে বাহিরে সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে পারিব। তখন আর কোন কর্ম্মই আমাদিগকে বদ্ধ, বিকৃত, কলুষিত করিতে পারিবে না।

ভগবান পুরুষোত্তমই নিজেকে বহুত্বের মধ্যে প্রকটিত করিতেছেন, স পর্য্যগাৎ। সম, অক্ষর, শাশ্বত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত বহুরূপের যে পরিবর্ত্তন লীলা—ইহার সমগ্রতাই বিশ্ব বা জগৎ বলিয়া অভিহিত। অতএব এই যে জগৎরূপে আত্মবিস্তার, ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে—একটি হইতেছে শুদ্ধ, অনন্ত, সম্বন্ধহীন অক্ষরতা; আর একটি হইতেছে দেশ ও কালের মধ্যে বহু বস্তুর কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের বিকাশ—ইহাই জগৎ। দুইটি হইতেছে একই অনির্ব্বচনীয় পুরুষোত্তমের দুইটি বিভিন্ন দিক, আত্মপ্রকাশের দুইটি ধারা—এই দুইটি পরস্পর মিলিয়াই তাঁহার আত্মপ্রকাশকে পূর্ণ করিতেছে। এই অক্ষর দিকটি বর্ণনা করিতে উপনিষদ ক্লীবলিঙ্গে কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে—শুক্রং (জ্যোতির্ম্ময়), অকায়ং (অশরীরী), অব্রণং (ক্ষতরহিত), অস্নাবিরং (স্নায়ুবিহীন), শুদ্ধং (নির্ম্মল), অপাপবিদ্ধম্ (নিষ্পাপ)—[ঈশা-৮]; গীতা এক কথায় এই সমস্ত বিশেষণের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছে, নির্দ্দোষম্।

আর পুরুষোত্তমের যে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরভাব—সেই দিকটি প্রকাশ করিতে ঐ একই বাক্যে ঈশা উপনিষদ কতকগুলি পুংলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে—কবিঃ (দ্রষ্টা), মনীষী (মননকর্ত্তা), পরিভূঃ (সর্ব্বত্র বিরাজমান), স্বয়ম্ভূঃ। গীতাও পরে পরমপুরুষের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে (৮৮-৯)। কিন্তু এখানে গীতা পুরুষোত্তমের কেবল অক্ষর দিকটিই নির্দ্দেশ করিতেছে, প্রথমে ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির সকল দুঃখ দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—তাহার পর পুরুষোত্তমের সহিত যোগে তাঁহারই ভাব প্রাপ্ত হইবে। এই অক্ষর সকলের মধ্যে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, সমম্ ব্রহ্ম—সকল বিশ্বকর্ম্ম, বিশ্বলীলা এই অক্ষর সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবান পুরুষোত্তম তাঁহার এই শাশ্বত অক্ষর প্রতিষ্ঠা হইতেই নিজেকে জগৎলীলার মধ্যে প্রকট করিতেছেন, তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে তিনি যাহা দেখিতেছেন, কল্পনা করিতেছেন, জগতের মধ্যে নিজেই তিনি সেই সব রূপ গ্রহণ করিতেছেন, স্বয়ম্ভূঃ।

অতএব ব্রাহ্মণও তিনি, আর চণ্ডালও তিনি, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। পশু, পক্ষী, সকল জড়পদার্থও তিনি। তবে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ সমান নহে—পৃথিবীতে মানুষের মধ্যেই হইয়াছে তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

সকল মানুষেও যে তাঁহার প্রকাশ সমান তাহা নহে, তবে মানুষে মানুষে প্রকাশের যে ভেদ, তাহা সাময়িক—প্রত্যেক মানুষই, ইহ, এই জন্মেই তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকট করিতে পারে—স্ত্রী, বৈশ্য, চণ্ডালও পরম গতি লাভ করিতে পারে (গীতা ৯।৩২)। ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই সমান ভাবে রহিয়াছেন—ইহার অর্থ নহে যে, সকলেরই জীবন ও কর্ম্ম একই রূপ হইবে। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকিয়া সকলকেই নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করিতেছেন—যেন প্রত্যেকেই আপন আপন বিশিষ্ট সত্তার, স্বভাবের পূর্ণতম বিকাশ করিতে পারে, এবং পরস্পরের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই জগতেই দিব্য-জীবন-লীলার বিকাশ করিতে পারে। সম্বন্ধহীন অক্ষর সম ব্রহ্মে যেমন ভগবানের প্রকাশ, তেমনই মানুষে মানুষে সকল দিব্য সম্বন্ধের ভিতর দিয়াও তাঁহারই প্রকাশ হইতেছে—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ—

এই বহুর জগৎ, সম্বন্ধের জগৎ মায়া নহে, মিথ্যা নহে—ইহার ভিতর দিয়া ভগবান বহুরূপে নিজেই নিজের প্রেম আস্বাদন করিতেছেন। মানুষ যেদিন এই দিব্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেই দিনই হইবে তাহার দিব্য জীবন।

তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ—ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ, সেই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী যতির জীবন যাপন করেন, ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসীত্যর্থঃ। তাঁহার মতে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু

আমরা দেখাইয়াছি যে, গীতার অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত; গীতা কর্ম্মত্যাগের নহে, কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়াই এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছে এবং সকল কর্ম্ম করিলেও যোগী কেন লিপ্ত হন না, কোনরূপ দোষ বা পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এখানে তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। কারণ সর্ব্বভূতের মধ্যে সমান ভাবে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, আর তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহারাও সেই ব্রহ্মেরই ন্যায় 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্' থাকেন। পাপ বা দোষ কি? অজ্ঞান অহং ভাব লইয়া ব্যক্তিগত বাসনা কামনার বশে আমরা যে কর্ম্ম করি তাহাই পাপ। অহংভাবের বশে আমরা নিজদিগকে অন্য সকল হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া মনে করি, তাই আমাদের রাগ দ্বেষ আছে এবং ইহাই সকল পাপের মূল। ব্রহ্ম সম ও এক, তাহাতে অহং ভাবের ক্ষুদ্রতা নাই, তাই তাহা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—তাঁহার সেই সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরাও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হই—ইহাই গীতার বক্তব্য।

নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইতেছেন নির্দ্দোষ, ইহার অর্থ নহে যে সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম সদোষ। সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা একই ব্রহ্মের দুইটি ভাব—এবং দুই ভাবেই ব্রহ্ম শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্। মানুষ যাহাতে ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে সেই জন্যই গীতা এখানে ব্রহ্মের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সাক্ষী ভাবের উপরেই জোর দিয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা আত্মার কোন পরিবর্ত্তনই হয় না, কেবল বিভিন্ন রূপেরই পরিবর্ত্তন হয়—আত্মা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই শুদ্ধ, আনন্দময়, পূর্ণ—যেমন নিষ্ক্রিয়তার অবস্থায়, তেমনিই কর্ম্মের অবস্থায়—আর মানুষও তাহার মূল সত্তায় এই আত্মার সহিত এক, অতএব কর্ম্ম তাহাকে বদ্ধ করে না, ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে। কেবল অহংভাবের বশেই মানুষ নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। অহংভাবের বশে আমরা দেহ, প্রাণ, মনকে তাহাদের প্রকৃত মূল সচ্চিদানন্দ হইতে পৃথক বলিয়া দেখি—ইহাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের বশে মন নিজেকে পাপের দ্বারা বিদ্ধ বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু সক্রিয় ব্রহ্ম হইতেছেন সকল সময়েই সচ্চিদানন্দ, তিনি দেহ, প্রাণ, মনকে নিজের বহু রূপ প্রকাশের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। মানুষ সচ্চিদানন্দের সহিত এক; আত্মবিস্মৃত হইয়া সে নিজেকে ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, আর সব কিছু হইতে পৃথক ভাবিয়া দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু এটা হইতেছে তাহার বাহ্যভাব—ভিতরের মানুষটি কখনই এ-সবের দ্বারা স্পৃষ্ট

হয় না। সকল মানুষের মধ্যে সমান ভাবে যে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাঁহার সহিত যোগ ও একাত্মতা অভ্যাস করিয়াই মানুষ তাহার সত্য ও পূর্ণ স্বরূপ লাভ করিবে।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

অন্বয়—ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত স্থিরবুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার মোহবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না।

ব্যাখ্যা

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়া অর্জ্জুন প্রথমে খুবই উল্লসিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি ক্ষত্রিয়বীর, ধর্ম্ম যুদ্ধের ন্যায় প্রিয়বস্তু তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই,

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২।৩২

কিন্তু যখনই তিনি এই যুদ্ধের অপ্রিয় স্বরূপটি দেখিতে পাইলেন, নিজ হস্তে সকল স্নেহের বন্ধন ভক্তি ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, তখনই তিনি শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অতএব দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম —ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে ততক্ষণই তাহাদিগকে এই সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। অর্জ্জুন এই-রূপ প্রস্তুত হইয়াছেন বুঝিয়া গুরু তাঁহাকে সেই উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দিলেন, সে আদর্শ হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সকল সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সেই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করা। তাহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ, এবং তাহার প্রাথমিক সাধনা হইতেছে, সমতা।

অতএব যাঁহারা বলেন যে, দেশসেবা, জনসেবা, সমাজ-সেবা—ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম নাই, তাঁহারা গীতার কর্ম্মযোগের মর্ম্মটি ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সব সামাজিক ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে পারে, যদি এই সকলকে সজ্ঞানে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয়—তাহাই কর্ম্মযোগের প্রারম্ভ। সামাজিক, নৈতিক, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানই যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে, ইহাদের ঊর্দ্ধে উঠিয়া আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই মানুষ প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে—বুদ্ধ ও শঙ্কর ভারতের এই সনাতন আদর্শটির উপরেই জোর দিয়াছিলেন, এই ভাবেই তাঁহারা ভারতে আধ্যাত্মিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক দিকে জোর দিতে গিয়া তাঁহারা সেই আদর্শের আর একটি দিককে অবহেলা করিয়াছিলেন —এই ভাবে যে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহা ফিরিয়া পায় নাই। গীতার মধ্যেই আমরা সেই সামঞ্জস্যের সূত্রটি দেখিতে পাই।

গীতার সূত্রটি দুই কথায় বলা যাইতে পারে—ঐক্য ও সমতা। গীতার পদ্ধতি হইতেছে, ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়া গ্রহণ, অহংয়ের ঊর্দ্ধে যে সত্তা রহিয়াছে তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা, নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব ও অবিচল শান্তির ভিতর দিয়া কর্ম্ম।

সকল জিনিষই হইতেছে এক অদ্বিতীয় অবিভাজ্য ব্রহ্ম, জীব-সকলের মধ্যে তাহাকে বিভক্ত বলিয়াই মনে হয়,

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ব্রহ্ম বিভক্ত বলিয়া আপাত মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা এক ও সম; আমরা ঐ আপাত দৃশ্যের মধ্যে বাস করিতে পারি অথবা প্রকৃত সত্যের মধ্যেই বাস করিতে পারি। আমরা যদি আপাত দৃশ্যের মধ্যে, অজ্ঞানের মধ্যে বাস করি, বিভাগকেই সত্য বলিয়া মনে করি, ঐক্য না দেখি—তাহা হইলে আমরা হই "অহং", প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীন—আপাত দৃশ্য দ্বন্দ্ব-সকলের, সুখ দুঃখ, সফলতা বিফলতা, শুভ অশুভ, প্রিয় অপ্রিয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অধীন হই। আমরা স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতেছি মনে হইলেও, বস্তুতঃ আমাদের স্বাধীনতা থাকে না, আমরা কি ইচ্ছা করিব না করিব তাহা প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। অন্য পক্ষে আমরা যদি সত্যের মধ্যে বাস করি, তাহা হইলে আমরা অহংয়ের ঊর্দ্ধে আমাদের প্রকৃত আত্মাকে পাই, প্রকৃতির গুণত্রয়ের

অতীত হই এবং এই ভাবে যে পূর্ণতম সমতা লাভ করি তাহাতে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের প্রকৃত একত্ব উপলব্ধি করি, যে তৎব্রহ্ম সর্ব্বভূতে নিজেকে প্রকট করিতেছে তাহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করি। এই একত্ব ও সমতা হইতেছে দিব্য জীবনের ভিত্তি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।

যখন আমরা এই ভাবে ব্রহ্মের ঐক্য ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হই, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান দৃষ্টিতে দেখি, সকলকেই এক ব্রহ্ম বলিয়া জানি তখন সেই একত্বের মধ্যে বাস করিয়া আমরা ব্রহ্মের ন্যায়ই দেখি যে, আমাদের সকল কর্ম্ম প্রকৃতি হইতেই উত্থিত হইতেছে—তখনই হয় আমাদের প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস। এই যে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ, পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষী চৈতন্যময়, প্রকৃতি নিশ্চেতন জড় কর্ম্মশক্তি—এই ভেদটি স্পষ্টভাবে ধরিতে না পারিলে গীতার কর্ম্মযোগের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধি নাই, তাহা যন্ত্রের মত কর্ম্ম করে, কিন্তু সে পুরুষের বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, তাই তাহার সকল কর্ম্মের মধ্যে এক অনন্ত বুদ্ধি ক্রিয়া করে; পুরুষ কর্ম্ম করে না, কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মকে ধরিয়া থাকে, তাহাতে অনুমতি দেয়; পুরুষ ভোগ করে, প্রকৃতি হয় ভোগের বস্তু—সকল জ্ঞান, প্রভুত্ব, আনন্দ রহিয়াছে পুরুষের মধ্যে, প্রকৃতি অধীন হইয়াই নিজের মধ্যে সে-সব প্রতিফলিত করিতে পারে।

মানবাত্মা যখন প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করে, তখন সে আর প্রভু, ভোক্তা, জ্ঞাতা থাকে না, সে হয় প্রকৃতিরই ন্যায় অজ্ঞান, অধীন, তাহার সকল কর্ম্ম হয় যন্ত্রবৎ—সে নিজেকে স্বাধীন মনে করিলেও তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে আত্মার নিমজ্জনের লক্ষণ হইতেছে সমতার অভাব—বাহ্য স্পর্শে তাহার মধ্যে কখনও সুখ, কখনও দুঃখের উদয় হয়, প্রকৃতির বশ্যতা হইতে আত্মা মুক্ত হইবার চেষ্টা করে, তাই সফলতা বিফলতা, শুভ অশুভ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কেবল যখন মানবাত্মা সর্ব্বভূতে একত্বের সন্ধান পায় তখনই সে এই সব দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়, প্রকৃতির সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহার গুণসকলের ক্রিয়ার প্রতি উদাসীন হয়, সকল দ্বন্দ্বের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়, এবং সেই জন্যই স্বাধীন, প্রভু, জ্ঞাতা হইতে পারে, নিজের সত্তার অবিমিশ্র আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে। তখনও সে কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা আর জড়িত বা বদ্ধ হয় না। কর্ম্ম আর তাহার উপর কোন

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কর্ম্মের সকল ফল প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন সকল কর্ম্ম সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠিয়া বিলীন হইয়া যায়, সমগ্রং প্রবিলীয়তে, সে-সবের দ্বারা তাহার নিজস্ব অতলস্পর্শ শান্তি, আনন্দ ও সর্ব্ব-ব্যাপী সমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এইরূপ সাধনার দ্বারা যে আদর্শ দিব্য-কর্ম্মীর অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে—

ভগবানের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অহংয়ের মধ্যে নহে—অর্থাৎ আমরা অন্য সকল হইতে ভিন্ন এই অজ্ঞান অহংভাব বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মের সাম্যে প্রতি-ষ্ঠিত হইতে হইবে, বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতে হইবে। সকল ঘটনা ও সকল জীবের প্রতি সম্পূর্ণ সমভাবাপন্ন হইতে হইবে, সকলকেই এক অদ্বিতীয় আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত এক বলিয়া দেখিতে হইবে, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলের মধ্যে নিজেকে দেখিতে হইবে।

ভগবানের মধ্যেই কর্ম্ম করিতে হইবে, অহংয়ের মধ্যে নহে—ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা আদর্শ অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না করিয়া ভগবদ্ ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্মকে ঘটিতে, বিকশিত হইতে দিতে হইবে—সে কর্ম্ম বাসনা, সহজাত সংস্কার বা ভ্রান্ত মানসিক স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না—পরন্তু তাহা আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-আনন্দে বিকশিত হইবে, যে ভাগবত আত্মা প্রকৃতির উর্দ্ধে থাকিয়া প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছে প্রাকৃত মানব সজ্ঞানে তাহার অধীন হইয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ কিরূপ সাধনার দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিব? যেহেতু এই সিদ্ধিলাভের মূল কথা হইতেছে অহং-চৈতন্য ছাড়াইয়া উঠা, ব্রহ্ম-চৈতন্য, ব্রহ্মের সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—সেই হেতু আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভেদাত্মক চৈতন্যের দুইটি গ্রন্থিকে ছিন্ন করা, দুইটি গ্রন্থি—বাসনা ও অহং, প্রাণের বাসনা কামনা, মনের অহংভাব। কর্ম্মের ক্ষেত্রে বাসনার স্বরূপ হইতেছে ফল-কামনা। সাধারণ মানুষ ফলের জন্যই কর্ম্ম করে—সে ফল আভ্যন্তরীণ হইতে পারে, যথা আমাদের অহংমুখী প্রবৃত্তি-সকলের তৃপ্তি, আমাদের মানসিক পরিকল্পনা, উচ্চাশা প্রভৃতির সাফল্য, অথবা তাহা বাহ্যিক ফল হইতে পারে, যথা যশ, মান, সম্পদ, জয়। এই সবের লোভ দেখাইয়াই অহং আমাদিগকে ভুলায়, আমাদের মনে হয় আমরা স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতেছি

—কিন্তু বস্তুতঃ যে বাসনা-শক্তি জগৎকে চালাইতেছে, আমরা তাহারই কোন স্থূল বা সূক্ষ্মরূপের দ্বারা অবশভাবেই চালিত হই। সেইজন্যই গীতা কর্ম্মের প্রথম নিয়ম এই দিয়াছে যে-কর্ম্মই করিতে হউক নিষ্কাম ভাবে করিবে (৬।১), মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন কর্ম্ম করিও না।

নিয়মটি খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা অনুসরণ করা কত কঠিন! রামকৃষ্ণ বলিতেন, মনে করি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছি কিন্তু সকাম হইয়া পড়ে,—এইভাবে আত্মপ্রতারণা করিলে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যে মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহা সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ আমরা যেটাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলি—তাহাতে কামনাটা তত উগ্র বা স্থূল নহে, এবং এইভাবে আমাদের ক্ষুদ্র অহংভাবকে যদি কতকটা সংযত করা হয় তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। এই যে আংশিক আত্ম-সংযম—ইহাকে আমরা নানা নামে অভিহিত করি, যথা, কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করা, বাসনার বশে কর্ম্ম না করিয়া কোন নীতি বা শাস্ত্র অনুসরণে কর্ম্ম করা, সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করা, ভগবানের ইচ্ছা মাথা পাতিয়া লওয়া। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে এই সবের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অহং ও বাসনা কর্ম্ম করে; পুত্র, দারা, গৃহ ইত্যাদিতে আমাদের গভীর আসক্তি, সে-সবকে আমরা আমাদের অহংয়ের সহিত এক করিয়া দেখি, তাহাদের শুভ, তাহাদের উন্নতির কামনা লইয়া কর্ম্ম করি, অথচ মুখে বলি ও মনে করি কর্ত্তব্য করিতেছি, শাস্ত্র অনুসরণ করিতেছি, ধর্ম্ম পালন করিতেছি। দেশের সেবা করি, সমাজের সেবা করি, তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন করিলেও, বৃহত্তর স্বার্থ থাকে—আমার দেশ আমার সমাজ, আমার ধর্ম্ম, আমার সম্প্রদায় এইরূপ বোধ থাকে, এবং আমাদের সেই প্রসারিত আমিত্বের তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করি। বাহ্যতঃ যে কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম বলিয়া মনে হয়, তাহারও মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে যশ, মান, প্রভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এইভাবে কর্ম্ম করা গীতার শিক্ষা নহে—গীতার লক্ষ্য হইতেছে এমন সম্পূর্ণভাবে নিখুঁতভাবে নিষ্কামতা যাহার মধ্যে কোন গোঁজামিল থাকিবে না, কোন আত্ম-প্রতারণা থাকিবে না, তাহার দ্বারা আমাদের সত্তার ধারাই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

নিষ্কামতা এইরূপ পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা হইতেছে সমতা—সকল ফলাফল, সকল রকম প্রতিক্রিয়ায় যখন আমাদের মন ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে

সমতা রক্ষা করিতে পারে তখনই বুঝা যায় যে আমাদের নিষ্কামতা সিদ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, মান ও অপমান, যশ ও নিন্দা, জয় ও পরাজয়, প্রিয় ও অপ্রিয় ঘটনা—এসবে যদি আমরা কেবল অবিচলিতই থাকি না, এসব যদি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, কোনরূপ হর্ষ বা উদ্বেগ না হয়, স্নায়ুমণ্ডলে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়, মনে কোনরূপ দ্বিধা না হয়—তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, গীতা যে মুক্তির কথা বলিয়াছে আমরা তাহা পাইয়াছি। যদি কোথাও বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া বা চাঞ্চল্য হয় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদের মধ্যে কোন অংশ এখনও অহংভাব ও আসক্তিকে ধরিয়া রহিয়াছে।

একেবারেই এই পূর্ণ সমতা লাভ করা যায় না, সাধারণতঃ যে সব আংশিক সমতার প্রশংসা করা হয়, প্রাথমিক সাধনা হিসাবে সেই সবের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। গীতার এই শ্লোকে এই সাধনা বুঝাইবার জন্য "প্রহৃষ্যেৎ" এবং "উদ্বিজেৎ" এই দুই স্থলে দুইটি বিধিবোধক লিঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে— প্রিয় বস্তুলাভে স্বভাবতঃ যে হর্ষ হয়, অপ্রিয়লাভে উদ্বেগ হয়, ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগে সেই প্রতিক্রিয়াকে সংযত করা অভ্যাস করিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা মানিয়া লওয়া, সুখ দুঃখের অনিত্যতা বিচার করা, ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগে সুখ দুঃখের বেগ সহ্য করা, অবিচলিত থাকা—এই সব অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ যেমন চাঞ্চল্যের উপশম হইবে, তেমনই পুরুষ প্রকৃতির ভেদ করিতে হইবে, প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়া-সকল হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে, সংসারের সকল ঘটনায় অনাসক্ত থাকা অভ্যাস করিতে হইবে— সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয় এসব হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এসব আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে না, আমাদের আত্মা কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টা মাত্র—এইভাবে নিজেদের মধ্যেই বিভাগ করিতে হইবে; সকল বিক্ষোভের মধ্যেও ভিতরে আত্মায় সমতা ও শান্তি বজায় রাখিতে হইবে, আমাদের দেহে, প্রাণে, মনে বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া হইলেও সে-সব আমাদের নহে, প্রকৃতির— এই উপলব্ধি অভ্যাস করিতে হইবে। এইভাবে ভিতরে যে শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা বাহিরে দেহ, প্রাণ, মনেও ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইবে—তখন প্রিয় অপ্রিয় কোন বস্তু বা ঘটনাতেই আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে কোথাও কিছুমাত্র চাঞ্চল্য থাকিবে না, আত্মার মধ্যে যে দুঃখলেশশূন্য স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ

রহিয়াছে আমরা সেই সচ্চিদানন্দের আনন্দ চিরদিনের জন্য লাভ করিব, অমৃতমশ্নুতে।

গীতা এই যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে ইহা হৃদয়হীনতা বা উদাসীনতা নহে। শঙ্কর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর সব কিছুকেই মিথ্যা বা অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন—তাঁহার প্রিয়প্রাপ্তি বা অপ্রিয় প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই, অর্থাৎ সংসারের শুভ অশুভ সব কিছুতেই তিনি সমানভাবে উদাসীন থাকেন। কিন্তু গীতার সমতা মানুষকে এইরূপ উদাসীন করে না, সংসারে শুভ অশুভ আছে, প্রিয় অপ্রিয় আছে—কিন্তু জ্ঞানী সে-সবকে জ্ঞানের চক্ষুতেই দেখেন, অজ্ঞানীর ন্যায় অহংভাবের বশে নহে—তিনি দেখেন যে শুভ অশুভ সব কিছুর ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, এইভাবে এক উচ্চতর সত্যের মধ্যে তিনি সংসারের সকল দ্বন্দ্বের সমাধান করেন। গীতা পূর্ণতম সমতার শিক্ষা দিয়াছে, অথচ বলিয়াছে, "যুদ্ধ কর, শত্রুকে ধ্বংস কর, জয়লাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর।" অর্জ্জুন নিরপেক্ষ হইতে চাহিয়াছিলেন, শত্রু ও মিত্র উভয়পক্ষ হইতেই সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন, শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি তাহাদের বিরুদ্ধতা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এমন পূর্ণতম সমতার শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনের ঐরূপ মনোভাবকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া বলিলেন "সমভাব রক্ষা কর এবং স্পষ্টভাবে পরিষ্কার ভাবে সত্যকে জানিয়া যুদ্ধ কর।" অতএব সত্য পক্ষ, ধর্ম্ম পক্ষ সমর্থন করা, যে মিথ্যা প্রবল আক্রমণশীল হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় বা সুযোগ না দেওয়া, একনিষ্ঠভাবে সত্যকে অনুসরণ করা, অকুণ্ঠভাবে শত্রুকে, আক্রমণকারীকে, মিথ্যাকে বাধা দেওয়া—এ-সবের দ্বারা সমতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কেবল ব্যক্তিগত অহং-মুখী কাম, ক্রোধ, লোভ বর্জ্জন করিতে হইবে; সকলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের কর্ম্ম চলিবে কেমন করিয়া? মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে, কারণ তাহার কোন কামনা থাকে অথবা সে কোন প্রয়োজন অনুভব করে, ধন, মান, শরীর ও মনের ভোগসুখ চায়, অন্ততঃ তাহার আদর্শের, তাহার দেশের অথবা তাহার ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে। এইসব বা অন্য কোন বাসনা কামনা যদি না থাকে, আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণা না দেয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মই বন্ধ হইয়া যাইবে না কি? গীতার উত্তর—কর্ম্ম

করিবে যজ্ঞার্থে, ভগবানের জন্য, জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। ঐক্য, সমতা ও যজ্ঞ—এই তিনটিই গীতার কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব। বস্তুতঃ এই যজ্ঞ-তত্ত্বের দ্বারাই গীতা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়াছে, ভগবানকেই সকল যজ্ঞের ভোক্তা বলিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের বর্ণনা শেষ করিয়াছে।

কর্ম্মযোগের মূলকথা হইতেছে ফল-কামনা বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা—আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সমুদায় কর্ম্ম করা। আর এই নিষ্কামতার ভিত্তি হইতেছে সমতা, সকল ফল, সকল অভিজ্ঞতার প্রতি আত্মার সমভাব; কারণ ঐ সমতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও বাসনা কামনা থাকিতে বাধ্য। কিন্তু যখন আমরা সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানকে দেখি, তখন এই সমতার ক্ষেত্র সকল বস্তু, সকল জীবের প্রতি প্রসারিত হয়। গীতা শুধু সুখ দুঃখ, সফলতা বিফলতা, শুভ অশুভের প্রতি সমতার কথা বলে নাই, পরন্তু মানুষ ও পশু, উচ্চ ও নীচ, পুণ্যবান ও পাপী, মিত্র ও শত্রু সকলের প্রতিই সমভাব রাখিতে বলিয়াছে। ইহার অর্থ নহে যে, বস্তুতে বস্তুতে ভগবদ্-প্রকাশের যে ভেদ রহিয়াছে আমাদের চক্ষু সে-সবের প্রতি অন্ধ থাকিবে, আমাদের বুদ্ধি উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ বিচার করিবে না; পরন্তু সকল ভেদ ও বৈষম্যের পশ্চাতে এক অদ্বিতীয় ভগবান রহিয়াছেন জানিতে হইবে, এবং আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রকৃতি আমাদের ঐ অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে অনুসরণ করিবে। বাহ্য ভেদ-সকল নহে, পরন্তু ঐ একত্বই আমাদের দৃষ্টি, আমাদের অনুভূতি, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের সার তত্ত্ব হইবে। নতুবা আমরা বাহ্য দৃশ্যেরই অধীন থাকিব, ভগবদ্ চৈতন্যের, বিশ্বচৈতন্যের মুক্তি ও উদারতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না।

কিন্তু তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব কোন মানদণ্ড অনুসারে? সকলকেই যদি সমানভাবে দেখি তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য করিব কোন নীতি অনুসারে? আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য, অথবা আমাদের বন্ধু, আত্মীয়, দেশ, মতবাদ, সম্প্রদায় এ-সব আমাদের বলিয়া তাহাদের জন্য কর্ম্ম করা আর চলিবে না। কারণ আমরা অহংভাবের পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছি। যাহা কিছু আমাদের নয় এবং

যাহা কিছু আমাদের, সে-সবের মধ্যে ভগবানকে সমানভাবেই দেখিতে হইবে। পাপ পুণ্য বিচার করিয়াও কাজ করা চলিবে না, কারণ পাপী ও পুণ্যবান উভয়কেই সমান চক্ষে দেখিতে হইবে—একজনকে সম্মান করা, আর একজনকে সাজা দেওয়া কি বৈষম্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না? সকলের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, অতএব কাহাকেও সেবা করিব, কাহারও বিরুদ্ধতা করিব কেমন করিয়া?

এক মীমাংসা হইতেছে, পরোপকারব্রত—সকল প্রকার দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল লোকহিতকর কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকা, কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট না করা, মানুষে মানুষে, জীবে জীবে সকল প্রকার ভেদ অগ্রাহ্য করা।* খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মানবধর্ম্ম এই শিক্ষাই দিয়াছে,—নির্ব্বিচারে সকলের হিতসাধন কর, কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করিও না। এ আদর্শ খুবই উচ্চ, সুন্দর, মহান, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা গীতার সমাধান বলিয়া মনে হয় না; কারণ এই গভীর অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমগ্র শিক্ষাটিই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কথিত হইয়াছে, এবং সে যুদ্ধ অতি ঘোর, ধ্বংসসঙ্কুল গৃহযুদ্ধ। অহিংসা, জনহিতসাধন প্রভৃতি আদর্শের অনুসরণ ব্যক্তিগত মুক্তি আনিয়া দিতে পারে, আদর্শবাদীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে পারে, কিন্তু গীতা মুক্ত কর্ম্মীকে যে একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে—দেশ ও কালের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী জগৎকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা, লোক-সংগ্রহ—সে উদ্দেশ্য এইরূপ অহিংসা দ্বারা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা পরোপকার ব্রত ও করুণার বশে যে সেবাকার্য্য করি তাহার দ্বারা লোকের দুঃখের কিছু উপশম করা যায় বটে কিন্তু তাহার দ্বারা সে দুঃখের কারণগুলি দূর হয় না। বস্তুতঃ গীতা বলিয়াছে যে, সকল কর্ম্মেই দোষ আছে, আমরা এমন কোন কর্ম্ম করিতে পারি না যাহার দ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট না হয়,

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।১৮।৪৮

আমরা যদি যুদ্ধ বর্জ্জন করি, কেবল আহতদের শুশ্রূষা কার্য্য করি, তাহা হইলেও সমস্যাটি হইতে আমরা মুক্তি পাই না। কারণ যুদ্ধ করিলে আমরা যেমন আত-

---

* বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীই এই আদর্শটি প্রচার করিতেছেন। বুয়োর যুদ্ধে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন কেবল আহতদের শুশ্রূষা করিয়া—বর্ত্তমান যুদ্ধে তিনি সর্ব্ব প্রকারে বাধা দেওয়া-কেই নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

তায়ীর অনিষ্ট সাধন করি, যুদ্ধ না করিলে যাহারা অত্যাচারিত হইতেছে, সঙ্কটে পড়িয়া উচ্চহৃদয় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন, হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিকার করা যায় না—আমরা যদি অহিংসভাবে সকল নির্য্যাতন নিজেদের মাথার উপর লই তাহা হইলে যাহারা হিংসা করিতেছে তাহাদের হৃদয় গলিবে, তাহাদের অন্তরাত্মা উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহারা হিংসা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু জগৎ কি এখনও সে অবস্থায় আসিয়াছে? যাহাদের হৃদয় আছে, অন্তরাত্মা আছে—তাহাদিগকেই অহিংসার দ্বারা বিগলিত করা যায়, কিন্তু কয়জন অত্যাচারী সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়? তাহারা স্বার্থ চিন্তায়, অহংভাবে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশে অন্ধ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর ন্যায়, এমন কি তাহাদের অপেক্ষাও নৃশংসভাবে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে বাধা না দিলে তাহারা নিজেদের আসুরিক প্রেরণার বশে সব-কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে, তখন অহিংসা ও প্রেম কোথায় থাকিবে? ভগবান আমাদিগকে এই যে জগতে আনিয়াছেন ইহা অতি জটিল, জীবনের সমস্যা অতি কঠিন, অহিংসার ন্যায় কোন সহজ সরল নীতির দ্বারা ইহার সমাধান হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাসনা কামনা বর্জ্জন করিয়াও আমরা কর্ম্মের প্রেরণা পাইতে পারি যজ্ঞভাব হইতে; নিজের কোন ব্যক্তিগত বাসনার তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু ভগবানের উদ্দেশে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা কর্ম্মে প্রেরণা পাইতে পারি। কিন্তু কোন্ কর্ম্মটি করিব, কোন্‌টি করিব না, ব্যক্তিগতভাবে তাহা নির্ব্বাচন করার সমস্যাটি তখনও থাকিয়া যায়। ইহার সমাধান এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে কোনরূপ নির্ব্বাচনই অভিপ্রেত নহে। আমরা নিজেরা যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি, তাহা যতই উচ্চতম আদর্শ বা নীতি অনুসারে হউক না কেন, তাহা হইতেছে সেই স্তরের যাহাকে আমরা ছাড়াইয়া উঠিতে চাই—তাহার মূলে রহিয়াছে 'আমি একটি স্বতন্ত্র সত্তা' এই অহংভাব। আমরা যে সমাধান চাহিতেছি তাহা হইতেছে আরও উচ্চ স্তরের। সেই জন্যই গীতা আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে বলিয়াছে। যখন আমরা আমাদের কর্ম্ম হইতে সকল প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা কামনা বর্জ্জন করিয়াছি, যখন আমরা সকল কর্ম্ম ভগবানের

উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তখন আর শুধু কর্ম্মফল নহে, কর্ম্মটিকেও ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। অন্য কথায় আমাদের মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত ইচ্ছা, ভাগবত শক্তিকে আহ্বান করিতে হইবে, তাহাই অহংয়ের পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে এবং কর্ম্মটিও সম্পন্ন করিয়া দিবে, আমাদের মন, হৃদয় ও শরীর সেই সর্ব্বজয়ী ভাগবত শক্তি ও শাশ্বত জ্যোতির নির্ব্বাধ অনুগত যন্ত্র হইবে।

ইতিমধ্যে যতক্ষণ না আমরা এই সিদ্ধি লাভ করিতেছি ততক্ষণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে যেটি সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে হয় তদনুসারেই কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করিতে হইবে। আমরা বিবেকের অনুসরণ করিতে পারি, শাস্ত্র অনুসরণ করিতে পারি, নিখুঁতভাবে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, কোন উচ্চতম ভাগবত আদর্শ বা আমাদের প্রকৃতিরই উচ্চতম নীতি অনুসরণ করিতে পারি। এইভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাচনে যদি আমাদের ভুলও হয়,—মানুষের মানদণ্ড, মানুষের বিচারে যদি তাহা অন্যায় বলিয়াই মনে হয়—তাহাতেও কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু যাহাই আমরা করি না কেন, যতক্ষণ তাহা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত করি, যজ্ঞভাবে করি, যতদূর সম্ভব ভাগবত ও বিশ্বসত্তার মধ্যে, ব্রহ্মভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া করি, আমাদের মধ্যে অহংয়ের সকল প্রকার সূক্ষ্ম চাতুরীকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্জ্জন করি, আমাদের অবস্থায় যতটা সম্ভব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের বাণী শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে সেইটিই হইবে আমাদের যথার্থ সাধনা, সেই পথেই আমরা ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারিব।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ—ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, অজ্ঞান ও অহংভাবের বশে মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় না—এইটিই হইতেছে মোহ। কারণ অহংভাবের বশে মানুষ সর্ব্বত্র শুধু দ্বন্দ্বই দেখিতে পায়, কোন্ জিনিষটি তাহার ইচ্ছার অনুরূপ, কোন্‌টি নহে—এইরূপে ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষের তৃপ্তি লইয়া সর্ব্বদা সে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া সর্ব্বভূতে যে এক সম ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছে তাহাকে সে দেখিতে পায় না—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭।২৭

এই মোহচক্র হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা আমাদের অহংমূলক প্রাণের কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে সংযত করা। এইভাবে ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃতি শান্ত ও সমভাবাপন্ন হইবে; তখন আমাদিগকে সকল দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক ব্রহ্ম রহিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া নির্ব্যক্তিক ও সমভাবাপন্ন হইতে হইবে। এইভাবে আমরা রাজসিক প্রকৃতির সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব। সেই সঙ্গে আমাদিগকে ভক্তিতেও বর্দ্ধিত হইতে হইবে—কিন্তু গীতা সে কথা পরে বলিয়াছে (৭।২৮)। এখানে শুধু নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম ভাবে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপরেই জোর দিয়াছে। এইরূপ সমতা লাভ করিলেও যতক্ষণ আমাদের বুদ্ধি ব্যক্তিগত বাসনা কামনার বশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে থাকিবে—ততক্ষণ সে সমতা কখনই পূর্ণ হইবে না; কারণ আমরা যে ক্ষুদ্র অহংভাব ছাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ তাহার মধ্যেই নামিয়া আসিবে। এই জন্যই জ্ঞানের পরিপক্কতার জন্য সন্ন্যাসিগণ সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্মের দ্বারা কোন ক্ষতিই হয় না, ব্যক্তিগত বাসনা কামনার বশে কর্ম্ম করিলেই বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ আত্মজ্ঞান হইতে স্খলিত হয়, এই জন্যই গীতা কর্ম্ম হইতে সকল প্রকার ফলকামনা বর্জ্জন করিতে বলিয়াছে। যোগী যেমন ব্যক্তিগত প্রিয় অপ্রিয় ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সমতার সহিত নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য করিতে থাকেন, তেমনই ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে এক ঊর্দ্ধের জ্যোতি ও শক্তির বিকাশ হয়, তাঁহার পূর্ব্বতন অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক পশুর জীবনের পরিবর্ত্তে এক দিব্য অধ্যাত্ম জীবন গড়িয়া উঠে।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ। যোগী যে ব্রাহ্মীস্থিতি, যে উচ্চ উদার অনন্ত চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে চান, তাহার ভিত্তি হইতেছে পূর্ণতম সমতা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যেই তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ, তিনি আর ক্ষুদ্র দেহ, প্রাণ, মনের জীবনে সীমাবদ্ধ থাকেন না, তাঁহার বিশ্বপ্রসারিত চৈতন্যের মধ্যেই তিনি সর্ব্বভূতকে দেখেন, সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মকে দেখেন—আর যিনি এই জ্ঞান ও দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর কখনও মোহের মধ্যে পতিত হইতে হয় না—

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪।৩৫

গীতা যে বলিয়াছে প্রিয় লাভ করিয়া হর্ষ করিবে না, অপ্রিয়লাভ করিয়া উদ্বিগ্ন হইবে না—ইহা কেবল তখনই পূর্ণরূপে সম্ভব যখন আমরা ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছি। তবে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের যাহা স্বাভাবিক আচরণ তাহাই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের প্রযত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা উচিৎ, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যই গীতা এই শ্লোকে "প্রহৃষ্যেৎ" ও "উদ্বিজেৎ" এই দুইস্থলে দুইটি বিধিবোধক লিঙ্ বিভক্তি প্রয়োগ করিয়াছে।

প্রকৃতি জড়, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কারণ উপস্থিত হইলে সেখানে কার্য্য উপস্থিত হইবেই—আমাদের দেহ, প্রাণ, মন হইতেছে প্রকৃতিরই অঙ্গ, অতএব হর্ষ ও শোকের কারণ উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হইবেই—আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে আমাদিগকে দেহ, প্রাণ, মন হইতে পৃথক আত্মারূপে দেখিতে অভ্যাস করা। এই অভ্যাসেরই অঙ্গ হইতেছে, সকল ইচ্ছা ও দ্বেষ, সুখ ও দুঃখের বেগ ধীর ভাবে সহ্য করা, কারণ আত্মাকে এ-সব স্পর্শ করে না, এ-সব হইতেছে প্রকৃতিরই বিকার—(১৩।৭), এ-সবের অনুসরণে কোনরূপ কর্ম্ম করা উচিত নহে। আর সেই সঙ্গেই সকল জীবের প্রতি সমভাব অভ্যাস করা প্রয়োজন, কারণ এক ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই রূপে সকল বস্তু ও সকল ঘটনার প্রতি সমভাব অভ্যাস করিতে করিতে আমরা নির্দ্দোষ সমব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইব, প্রকৃতি হইতে নিজেদিগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করিব।

কিন্তু তখন কি আর কর্ম্ম থাকিবে? তখনও প্রকৃতি পূর্ব্বসংস্কার বশে যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া চলিবে কিন্তু মুক্তপুরুষকে আর সে-সব বদ্ধ করিবে না, স্পর্শ করিবে না (১৪।২৩)। যখন সংস্কারের শেষ হইবে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে তখন এই দেহের পতন হইবে, প্রকৃতির লীলা সাঙ্গ হইবে, জীবাত্মা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মে লীন হইবে। ইহাই প্রাচীন বেদান্তদর্শনের মত, ব্রহ্মসূত্রে আমরা এই মতই দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্য ইহারই অনুসরণ করিয়া গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা গীতার মত বলিয়া মনে হয় না। কারণ গীতা মুক্ত পুরুষের কর্ম্মের যে লক্ষণ দিয়াছে তাহা প্রকৃতির গুণ-সকলের যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে তাহা হইবে লোকসংগ্রহের জন্য, জগৎকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য। সে-কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে

যজ্ঞ রূপে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পুরুষ যদি উদাসীন থাকে, কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম সাক্ষীর মত দর্শন করে, তাহা হইলে জড় প্রকৃতি দিব্য কর্ম্মের জন্য আলোক ও প্রেরণা কোথা হইতে পাইবে? তাই গীতা বলিয়াছে পুরুষের শুধু দ্রষ্টাভাবই সব নহে—পুরুষ অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর (১৩।২২)। মানবাত্মাকে প্রথমে পুরুষের দ্রষ্টাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব কিছুকে উদাসীন ভাবেই দেখিতে হইবে, তাহার পরে হইবে অনুমন্তা ভাব—পুরুষ নিজের চৈতন্য ও আলোকে প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিবে, পুরুষের জ্যোতিতেই প্রকৃতির যন্ত্রবৎ কর্ম্ম সজ্ঞান দিব্য কর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

এই জন্যই গীতা পুরুষোত্তমের সন্ধান দিয়াছে, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্, (৫।২৯) তাঁহার প্রতি ভক্তির উপরে জোর দিয়াছে, যিনি আমাদের সকল যজ্ঞ ও কর্ম্মের ভোক্তা ও ঈশ্বর তাঁহাকেই সজ্ঞানে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিতে বলিয়াছে—তখন সকল জ্যোতির উৎস পুরুষোত্তম হইতে জ্যোতি ও শক্তি উৎসারিত হইয়া আমাদের প্রকৃতিকে চালিত করিবে, আমাদের এই যে দেহ, প্রাণ, মন এখন অপরা প্রকৃতির গুণত্রয়ের যন্ত্রবৎ খেলা, তখন তাহাদের মধ্যে ভগবানের পরা প্রকৃতির খেলা বিকশিত হইবে। আমাদের সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমরা হইব ভগবানের ইচ্ছার দিব্য জ্যোতিষ্মান আনন্দময় যন্ত্র, নিমিত্তমাত্রম্।

শঙ্করাচার্য্য গীতার এই পুরুষোত্তম ও পরা প্রকৃতির সন্ধান পান নাই—তাঁহার মতে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই হইতেছে পরম সত্তা, সেখানে কোন প্রকৃতি নাই, কর্ম্ম নাই, কর্ম্মের প্রেরণা নাই। তাঁহার মতে পুরুষোত্তম হইতেছে সগুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ মায়ার বশে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হয়, পুরুষোত্তম ও তাঁহার বিশ্বকর্ম্ম ঐ ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা ঠিক গীতার মত নহে। গীতায় ভগবান পুরুষোত্তম বলিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই (৭।৭)। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম তাঁহারই একটি ভাব (১৪।২৭)। আমাদিগকে প্রথমে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিতে হইবে, জগতে তাঁহার ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হইতে হইবে, তাঁহারই ন্যায় দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মী হইতে হইবে, ইহাই গীতার শিক্ষা।

শঙ্কর বলেন, আমরা যখন বাসনা কামনা বর্জ্জন করি, তখন আর কর্ম্মের কোন প্রেরণাই থাকিতে পারে না, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

তাহার আবার কর্ম্ম কি? সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়াই তাঁহার একমাত্র পরিণতি। সাধারণ মানুষও মনে করে যে, বাসনা কামনা বর্জ্জন করিলে মানুষ জড় পদার্থ হইয়া যাইবে, প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ তমোগুণের কবলে পতিত হইবে। এই দুই মতের মধ্যেই যে সত্য রহিয়াছে, গীতা তাহা গ্রহণ করিয়াছে এবং সমন্বয় করিয়াছে। অর্জ্জুন প্রথমে তামসিকতার বশেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন—গুরু তাঁহাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু সাধারণ মানবের ন্যায় রাজসিক প্রেরণার বশে অর্জ্জুন কর্ম্ম করেন ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে—এই জন্য তিনি তাঁহাকে গুণ-সকলের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিলেন। এইটিই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা—বৈদিক কামনামূলক কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিবার উপর শঙ্কর যে জোর দিয়াছিলেন তাহার দ্বারাই তিনি ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভিত্তি লাভ করিয়া যে কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হয় না, পরন্তু উহাকেই দিব্য কর্ম্ম ও দিব্য জীবনের ভিত্তি করিতে হয়—গীতার এই পূর্ণতর আদর্শটি শঙ্করের শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই, এতদিন পরে অপূর্ব্ব যোগসাধনালব্ধ দিব্য দৃষ্টি লইয়া শ্রীঅরবিন্দ সেই আদর্শটি ভারতবাসীর সন্মুখে, সমগ্র জগৎবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন।

গীতার মুক্ত পুরুষ সাধারণ বাসনা কামনার বশে কর্ম্ম করেন না, দেশ-সেবা, পরোপকার, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অহিংসা প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না। এই সকলের ঊর্দ্ধে তাঁহার দৃষ্টি। "তিনি শুধু দেখেন যে-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ ক্রমশঃ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার রক্ষা ও বিকাশের জন্য ভগবান তাঁহার নিকট কি চান। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ দ্বেষ তৃপ্ত করিবার নাই, তাঁহার কর্ম্মের এমন কোন চির-নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য বিধিনিষেধ নাই যাহা বিকাশশীল মানব সমাজের ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু যদি ধর্ম্মের স্রোতে যুদ্ধ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা এবং ঘটনাচক্র সম্বন্ধে জ্ঞান লইয়াই তিনি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্ব

শক্তি ও জয় উল্লাস বিনষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না"।

"কারণ তিনি সর্ব্বত্র দুইটি জিনিষ দেখেন; তিনি দেখেন যে, ভগবান সর্ব্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন, কেবল সাময়িক অবস্থা বিশেষে সর্ব্বত্র ভগবানের প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুক্কুরে, অশুচি চণ্ডালে, বিদ্বান ও পুণ্যবান ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, শত্রু ও বন্ধুতে, যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার হিতসাধন করে এবং যাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করে, তাঁহার অনিষ্টাচরণ করে—সর্ব্বত্রই তিনি নিজেকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন, এবং সকলের প্রতিই তাঁহার অন্তরে সমান বন্ধুভাব, একই দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে হয়ত কাহাকেও বাহ্যতঃ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে হয়, আবার কাহাকেও যুদ্ধে আহ্বান করিতে হয়, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় ও আন্তরিক ভালবাসার প্রত্যবায় হয় না। আর তাঁহার সকল কর্ম্মের মূলে একই অধ্যাত্ম নীতি থাকে—পূর্ণতম সমতা, এবং একই কর্ম্মনীতি থাকে—মানবজাতিকে ক্রমশঃ বিকাশের ভিতর দিয়া ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার মধ্যে সক্রিয় ভগবৎ ইচ্ছার প্রেরণা।" —শ্রীঅরবিন্দের গীতা

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—অন্তরাত্মা যখন আর বাহ্য বিষয়ে আসক্ত থাকে না তখনই মানুষ আত্মায় যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করে; সেইরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করে, কারণ তাহার অন্তরাত্মা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত।

ব্যাখ্যা

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংস্পর্শ বা সংযোগ তাহাই বাহ্য স্পর্শ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই আপন আপন

বিষয়ে স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষ আছে (৩।৩৪), তাহাদের অধীন হইলে আমরা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া থাকি, মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি না। অতএব ইন্দ্রিয়গণের এই আসক্তি অনুসরণ করিয়া বাহ্য বিষয়ে আমাদের আসক্ত হওয়া চলিবে না, ইন্দ্রিয়বশে কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে, বিষয় সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয় তাহা সংযত করিতে হইবে—তখন আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে আমরা তাহার সন্ধান পাইব, ক্ষণিক বিষয় সুখ হইতে নিবৃত্ত হইলে আত্মায় যে অক্ষয় সুখ রহিয়াছে তাহা ভোগ করিব।

কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগেই অভ্যস্ত, ইহার মর্ম্ম সে জানে—আত্মায় যে-সুখ আছে তাহার আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বে সে ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষ কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকে কথিত হইয়াছে, "আনন্দ শ্রুত অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও তাহা যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিষয়ীকৃত না হয় অর্থাৎ তাহা যদি প্রত্যক্ষতঃ অনুভব না করা হয় তাহা হইলে তাহা দৃষ্ট (লৌকিক) আনন্দ বিষয়ে পুরুষের যে অভিলাষ তাহাকে মন্দীভূতও করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা ত দূরের কথা তাহাকে আংশিক হ্রাসও করিতে পারে না।" যাহাদের বুদ্ধির সম্যক বিকাশ হইয়াছে সেইরূপ দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখের অনিত্যতা এবং তাহার দুঃখময় পরিণাম বিচার করিয়া বাহ্য ইন্দ্রিসুখে আসক্তি পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিজেদের মধ্যেই উচ্চতর আনন্দের সন্ধান পান। কিন্তু সকল মানুষই এই ভাবে দার্শনিক বিচার করিয়া ইন্দ্রিয় সুখের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তবে তাহারা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে যোগী ও সন্ন্যাসিগণ সংসারের সকল সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন—কৌপীন-সম্বল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের শান্ত আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের অতীত আত্মানন্দের আভাস পায়—ইহাই সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহত্ত্ব। এইভাবে সন্ন্যাসীরা নিজেদের দৃষ্টান্তের দ্বারা সংসারী লোকের মনে বিষয়াসক্তিকে শিথিল করিয়া দেন, তাহাদিগকে এক উচ্চতর জীবনের দিকে আকৃষ্ট করেন—এইভাবেই তাঁহারা লোক-সংগ্রহ রূপ মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। আমরা শঙ্করের মায়াবাদের যতই সমালোচনা করি না কেন, শঙ্কর ভারতের চারি প্রান্তে সন্ন্যাসীর মঠ স্থাপন করিয়া এবং সর্ব্বত্র সন্ন্যাসের মহান আদর্শ

প্রচার করিয়া মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তিটি সুদৃঢ় করিয়াছেন। আজ যে ভারত আধ্যাত্মিকতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, ভারতের সর্ব্বত্যাগী সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিগণই হইতেছেন তাহার মূল, এবং শঙ্কর উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতেই ভারতের সন্ন্যাসিগণ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। মানুষের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে শিথিল করিবার জন্য সন্ন্যাসবাদের এমন কি মায়াবাদেরও প্রয়োজন ছিল—এবং সেই পরম প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতীয় সভ্যতার এক সন্ধিক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগৎ যখন ক্রমশঃ জড়বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িল, ভারত মানবজাতির অধ্যাত্ম আদর্শটিকে রক্ষা করিল। কিন্তু আজ আর এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত —আজ মানবজাতিকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, সন্ন্যাসের সহিত সংসারের, ত্যাগের সহিত ভোগের, শান্তির সহিত কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা যাহাতে হয় সেই মহৎ প্রয়াস আরম্ভ করিতে হইবে—তাই এখন আর মায়াবাদকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না, গীতার শিক্ষার অর্থটি পূর্ণতর ভাবে, গভীরতরভাবে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া আমরা সেইভাবেই গীতার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিতেছি।

এই শ্লোকে "আত্মা" শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহ্য বিষয়ে যাহার আত্মা অনাসক্ত তিনি আত্মাতেই সুখলাভ করেন। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যাহার আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত।" কিন্তু অন্তঃকরণ বলিতে বুদ্ধিকেই বুঝায় (সাংখ্যদর্শন—১।৬৪)। অন্যান্য ব্যাখ্যা-কারেরাও শঙ্করের অনুসরণে এখানে আত্মা বলিতে মন অথবা চিত্ত বুঝিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অন্তঃকরণ—এ সবই হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্গত, অতএব অনাত্ম। গীতা অনাত্ম তত্ত্ব বুঝাইতে আত্মা শব্দ কেন ব্যবহার করিবে? বস্তুতঃ গীতা এখানে "আত্মা" বলিতে ব্যষ্টি আত্মা বা ব্যষ্টি পুরুষকেই বুঝিয়াছে, প্রকৃতিকে নহে—আমাদের মধ্যে যে পুরুষ বা ব্যষ্টি আত্মা (individual soul) রহিয়াছে তাহাই প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া প্রকৃতির গুণ-সকলে বদ্ধ হয়। আমাদের এই পুরুষ যখন প্রকৃতিতে অনাসক্ত হইয়া পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়, তখনই আমরা মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করি।

শঙ্কর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ তিনি পরমাত্মা ও

জীবাত্মা, পরম পুরুষ ও ব্যষ্টিগত পুরুষ এরূপ কোন ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এক আত্মা বা ব্রহ্মই আছেন—জীবত্ব বা ব্যষ্টিত্ব বলিয়া আমরা যাহা দেখি বা অনুভব করি তাহা মায়ার ভ্রম মাত্র। আত্মা বা ব্রহ্ম কখনই বাহ্য বিষয়ে আসক্ত বা বদ্ধ হন না—আমাদের বুদ্ধিই আসক্ত হয়, বুদ্ধির এই আসক্তি দূর হইলেই আমাদের মোক্ষ বা মুক্তি হয়। কিন্তু এখানে যে আমাদের মুক্তি হয় বলিতেছি—এই "আমি" কে? এই "আমি" নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নহে, কারণ ব্রহ্ম ত চিরমুক্ত, তাহার আবার মুক্ত হওয়া কি? এই "আমি" বুদ্ধি নহে, কারণ বুদ্ধির আসক্তি বা অনাসক্তির দ্বারাই ইহা বদ্ধ বা মুক্ত হয়; বুদ্ধি এই 'আমি'রই একটি শক্তি বা গুণ মাত্র—ইহা নিজে বুদ্ধি নহে। শঙ্কর বলিয়াছেন—এই যে আমরা "আমি" বলিতেছি, ইহার কোন অস্তিত্বই নাই, ইহা মায়া। কিন্তু ইহা গীতার মত বলিয়া মনে হয় না—গীতা পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি স্বীকার করিয়াছে,—

> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
> কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ১৩.২২

এই যে প্রকৃতিস্থ পুরুষ—প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করিতেছে, সে-সবে আসক্তিবশতঃ জন্ম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিয়াছে—ইহাই হইতেছে মানুষ। মানুষের মধ্যে যেমন পুরুষ রহিয়াছে, তেমনিই প্রকৃতিও রহিয়াছে—ঐ পুরুষই হইতেছে মানুষের অন্তরাত্মা। আবার ইহার পরের শ্লোকেই (১৩।২৩) গীতা বলিতেছে যে, মানুষের এই দেহেই আর এক পুরুষ রহিয়াছে তাহা উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, তাহা কখনও প্রকৃতির অধীন হয় না, এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও তাহা প্রকৃতির অতীত, চির-মুক্ত, ঈশ্বর—ইহাকেই গীতা বলিয়াছে পরঃ পুরুষঃ, পরমাত্মা। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে আমাদের মধ্যে দুই পুরুষ রহিয়াছে, পর পুরুষ এবং ব্যষ্টিগত পুরুষ; এই ব্যষ্টিগত পুরুষই হইতেছে জীবাত্মা, আমাদের প্রকৃত 'আমি'—ইহা যতক্ষণ প্রকৃতিতে আসক্ত থাকে ততক্ষণ ইহা বদ্ধ; এই আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যখন ইহা অন্তর্মুখী হয় তখনই ইহা ঐ পর পুরুষকে দেখিতে পায়, উপলব্ধি করে যে ঐ পর পুরুষ বস্তুতঃ তাহার নিজেরই উচ্চতর সত্তা, সে উহারই অংশ, প্রতিনিধি, উহা হইতেই প্রকৃতির

মধ্যে আসিয়াছে, তখনই উহা মুক্ত হয়। উপনিষদ এক বৃক্ষে দুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছে,

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
—মুণ্ডাকোপনিষৎ, ৩।১।১,২

"এক বৃক্ষে দুই পক্ষী, এক সূত্রে আবদ্ধ চির-সখা। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে; অপরটি নিজে খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। একটি পক্ষী নিজের শক্তিহীনতাবশতঃ মুহ্যমান, শোকগ্রস্ত। কিন্তু প্রথম পক্ষীটি যখন অপরটিকে দেখিতেছে এবং বুঝিতেছে যে, সকল মহিমা তাহারই, তখনই সে শোক হইতে মুক্ত হইতেছে। এখানে প্রথম পক্ষীটি হইতেছে প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ, বদ্ধ জীব; এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে চির-মুক্ত, শান্ত, অক্ষর পুরুষ—সমস্ত বিশ্ব তাঁহার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। প্রথমটি জীবাত্মা, দ্বিতীয়টি পরমাত্মা।"—গীতার বাণী।

অতএব শঙ্কর যে এক ব্রহ্ম ছাড়া জীবের ব্যষ্টিগত কোন সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই—জীবকে প্রকৃতিরই একটি সৃষ্টি বা রূপ বলিয়াছেন; এই মত উপনিষদের নহে। গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, আমারই অংশ জীবরূপে সংসারলীলায় আবির্ভূত হয় (১৫।৭)।

কিন্তু যাহা ভগবানের অংশ তাহা ত ভগবানই, ভগবানকে কখনও খণ্ড খণ্ড করা যায় না, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। জীব ভগবান হইতে ভিন্ন নহে, সে একেরই বহু রূপ,—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
—কঠ উপনিষদ ৫।১২

"এক ভগবানই বহু হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াছেন, তিনি একই

রূপকে বহুভাবে গঠন করেন। নিজ অন্তরস্থ সেই ভগবানকে যে জ্ঞানী মনুষ্য দেখিতে পান, তিনিই শাশ্বত সুখ লাভ করেন, অন্য কেহ নহে।"

অতএব শঙ্কর যে বলিয়াছেন জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে, তাহাতে কোন ভ্রমই হয় নাই ; তবে তিনি যে বসিয়াছেন ব্রহ্ম তাঁহার একত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তিনি নিজকে বহুরূপে প্রকট করিতে পারেন না বা করেন না—এইখানেই তিঁনি শ্রুতিবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে তাহার বন্ধন দশা কেমন করিয়া হয়? বস্তুতঃ জীবাত্মা কখনই বদ্ধ হয় না—আমরা যে বলি আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত বা বদ্ধ হইতেছে, এটা লৌকিক অজ্ঞানের ভাষা। জীব ভগবানের অংশ, সংসারে আসিয়াছে নিজ ভাগবত সত্তাকে প্রকট করিতে এবং প্রকৃতি হইতে দেহ, প্রাণ, মন বিকাশ করিতেছে জগৎমাঝে নিজেকে রূপ দিবার জন্য (১৫।৭)। এই বিকাশের প্রয়োজনেই জীব নিজেকে রাখিয়াছে পিছনে—তাহার সম্মুখে তাহারই একটি সাময়িক রূপ প্রকৃতির গুণ-সকলের সহিত ব্যবহার করিতেছে, এই সাময়িক রূপটি বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিরই গুণ-সকলের দ্বারা গঠিত, এইটিকেই আমরা সাধারণতঃ "আমি" বলিয়া মনে করি, আত্মা বলিয়া মনে করি—কিন্তু এইটি বস্তুতঃ আমাদের আত্মার আভাস বা ছায়া মাত্র। এই প্রাকৃত আত্মারই জন্ম মৃত্যু, বন্ধন মুক্তি হয়, আমাদের যে অধ্যাত্ম আত্মা, জীবাত্মা তাহা চিরমুক্ত। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে—একটি জীবাত্মা এবং একটি তাহার বাহ্য প্রাকৃত রূপ (তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের এবং এই অধ্যায়ের ৭ এবং ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বাহ্য বিষয়ের স্পর্শে এই প্রাকৃত আত্মাই বিক্ষুব্ধ হয়, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু আমাদের যে প্রকৃত আত্মা তাহা সব কিছুই ভোগ করে, কিছুতে আসক্ত হয় না বলিয়া তাহা সকল স্পর্শের মূলে, বিষয়ের মূলে যে সচ্চিদানন্দের আনন্দ রহিয়াছে তাহা আস্বাদন করে, তাই তাহা কোন কিছুর সম্মুখে সঙ্কুচিত হয় না—সংসারের সকল বস্তু, সকল ঘটনাকে আলিঙ্গন করিয়া সবের মধ্যেই আনন্দ আস্বাদন করে,

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।—কঠ ৪।৫

সৃষ্টি-মধু-পানকারী এই আত্মাকে যে জানে, সে আর কোন কিছুতেই সঙ্কুচিত হয় না, আর কিছুতেই ভয় পায় না (তৈত্তিরীয় ১৩।১৯)।

আমাদের ভিতরে আমাদের এই যে প্রকৃত আত্মা ভগবানের অংশ, আমাদের প্রকৃত ব্যষ্টিসত্তা—ইহাকেই অন্তরাত্মা বা অন্তঃপুরুষ বলা যাইতে পারে, আর প্রকৃতির মধ্যে ইহারই যে বাহ্য রূপকে সাধারণতঃ আমরা "আমি" বলি, যাহা আমাদের প্রাণের বাসনা কামনা, হৃদয়ের আবেগ, সত্য, শিব, সুন্দর, সুখ, শক্তির জন্য আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ক্রিয়া করে—ইহাকে আমাদের বাহ্য বা প্রাকৃত আত্মা বলা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় প্রথমটি হইতেছে আমাদের 'পাকা আমি' এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে "কাঁচা আমি"। কাঁচা আমির বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি বর্জ্জন করিয়া আমাদের "পাকা আমি"কে সম্মুখে আনিতে হইবে। এই পাকা আমির ভিতর দিয়া, এই অন্তরাত্মার ভিতর দিয়াই আমরা সর্ব্বভূতের যে এক আত্মা তাহাকে লাভ করিব, কারণ এই অন্তরাত্মা হইতেছে ঐ বিশ্ব আত্মারই ব্যাষ্টিসত্তা, তাহারই প্রতিনিধি।

আমাদের কাঁচা "আমি"র জীবন অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে আমরা নিজদিগকে জগতের আর সব কিছু হইতে ভিন্ন, পৃথক বলিয়া মনে করি, তাই আমাদের হয় "আপন পর" দ্বন্দ্ব, শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব, বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ-সকলকে আমরা সমতার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, জয় পরাজয়ের মানদণ্ডে বিচার করি, এই ভাবে আত্মার যে চিরশান্তিময় আনন্দময় জীবন তাহার মধ্যে, প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনে আমরা বাস করিতে পারি না।

সংসারের এইটিই হইতেছে মূল রোগ যে, ব্যষ্টিগত মানব তাহার প্রকৃত আত্মাকে, অন্তঃপুরুষকে জানে না, আর এই রোগের মূল কারণ হইতেছে যে, যে-জগতের মধ্যে সে বাস করিতেছে তাহার প্রকৃত আত্মাকে সে পায় না, কেবল বস্তুসকলের বাহ্য স্পর্শই লাভ করে। সে চায় আনন্দ কিন্তু পায় সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব। সে যদি জগতের সত্য আত্মার সন্ধান পায় তাহা হইলেই তাহার সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, বাহ্য স্পর্শ-সকলের আপাতদৃশ্য দ্বন্দ্বের মধ্যে সে যে সত্য বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখে তাহাতে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সে নিজের অন্তরাত্মার সন্ধান পায়, তাহার ভিতর দিয়া তাহার

মহত্তর আত্মার সন্ধান পায়, তাহার সেই আত্মা এবং জগতের আত্মা একই বলিয়া উপলব্ধি করে। কিন্তু ইহা সে পারে না কারণ তাহার মনের অজ্ঞান অহংভাব, তাহার হৃদয়ের আবেগ, তাহার ইন্দ্রিয়গণের রাগ দ্বেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়—এইগুলি লইয়াই তাহার বাহ্য প্রাকৃত আত্মা। বাহ্য বিষয়ের স্পর্শকে ইহা ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারে না, আসক্তির বশে কখনও সে-সবকে ধরিতে তীব্র বেগে ধাবিত হয়, দ্বেষের বশে কখনও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়—প্রাণ মন হৃদয় খুলিয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতে পারে না, তাই জগতে সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে, সকল ঘটনায় যে আনন্দ অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার আস্বাদ পায় না, অতৃপ্ত তৃষা ও অশান্তি লইয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। তাই অধ্যাত্ম জীবন লাভের প্রথম সাধনা হইতেছে বাহ্য আত্মার আসক্তি ও বাসনা ও অহংভাব বর্জ্জন করা, আমাদের প্রকৃত আত্মার এবং তাহার ভিতর দিয়া বিশ্ব-আত্মার, পরমাত্মার সন্ধান করা, তাহার সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া থাকা।

বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্—বাহ্য বিষয় ভোগে যে ব্যক্তি আসক্ত নহেন তিনি আত্মাতে যে-সুখ আছে তাহাই লাভ করেন। মানুষ স্বভাবতঃ সুখ চায়, আনন্দ চায়, সুখের আশাতেই সে বাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, কিন্তু সেখানে সুখ তাহার ভাগ্যে জোটে না, সে পায় শুধু দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তি। মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে, যে-সুখের সন্ধান সে করিতেছে আত্মার মধ্যেই তাহা প্রকৃষ্ট ভাবে মিলিতে পারে, বাহিরে তাহার আশা করা মরীচিকায় জলের আশা করার ন্যায়ই বৃথা তাহা হইলে সে বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে প্রকৃত মুক্তি ও আনন্দের পথ দেখিতে পায়।

আত্মায় যে সুখ আছে তাহার স্বরূপ কি? ইন্দ্রিয়সুখের সহিত আত্মানন্দের প্রভেদ কি? বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি বস্তু লাভ হইবে? শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাসনা, আসক্তি, তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাতেই এক প্রকার উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ আছে যাহার তুলনায় বিষয় সুখ তুচ্ছ। সংসারের বাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকিলে আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয়, ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই বহির্মুখ ও বিচলিত থাকে। আমরা যখন আসক্তি বর্জ্জন করি, তখন আমাদের মধ্যে প্রকৃতির এই সব চাঞ্চল্য দূর

হইয়া যায়, তাহার ফলে অপূর্ব্ব শান্তি সুখ লাভ করা যায়। মহাভারতে ইহা কথিত হইয়াছে,

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

"সংসারে কামনার জন্য যে সুখ হয় এবং স্বর্গীয় যে মহৎ (বিপুল) সুখ আছে এতদুভয়ই তৃষ্ণাক্ষয়মূলক কামনা-ত্যাগ জন্য যে-সুখ সেই সুখের ষোড়শ ভাগেরও সমান নহে।" গীতাতেও বলা হইয়াছে যে, স্বর্গ সুখ বিশাল বিপুল হইলেও তাহা অক্ষয় নহে,

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ ৯।২১

কিন্তু তৃষ্ণাক্ষয়মূলক যে সাত্ত্বিক সুখ তাহা বস্তুতঃ প্রকৃতিরই সুখ, আত্মার নহে—সত্ত্বগুণ প্রকৃতিরই একটি গুণ, আত্মার যে সুখ তাহা সকল প্রাকৃত সুখ, সাত্ত্বিক সুখের ঊর্দ্ধে ভাগবত আনন্দ, সচ্চিদানন্দের আনন্দ, তাহার সহিত প্রাকৃত জীবনের কোন সুখেরই কোনরূপ তুলনা হয় না। গীতা এখানে সেই আত্মার সুখের কথাই বলিতেছে, আত্মনি যৎ সুখম্।

সেই জন্য মধুসূদন সরস্বতী আর এক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ত্বং পদার্থ প্রত্যগাত্মায় যে স্বরূপভূত সুখ আছে যাহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইতে থাকে এবং যাহা বাহ্য বিষয়াসক্তিরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে লাভ করা যায় না, সেই সুখই তৎকালে প্রতিবন্ধক না থাকায় লাভ করা যায়। আর 'ত্বং' পদার্থ প্রত্যগাত্মায় যে-সুখ তিনি তাহাই যে কেবল পাইয়া থাকেন তাহা নহে, কিন্তু ('তত্ত্বমসি' বাক্য অনুসারে) 'তৎ' পদার্থের সহিত একতা অনুভব হওয়ায় তিনি পূর্ণ সুখও লাভ করেন, স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।" কিন্তু গীতা এখানে ত্বং পদার্থে যে সুখ আছে আর তৎ পদার্থ ব্রহ্মের সহিত যোগে যে সুখ আছে তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন প্রভেদই করে নাই। "তৎ" ও "ত্বং", ব্রহ্ম ও জীব মূল সত্তায় একই আত্মা, তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে; আত্মাতে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহা লাভ করার অর্থই হইতেছে ব্রহ্মের সহিত যোগের বা তাদাত্ম্যবোধের আনন্দ লাভ করা, আর সেই যে অধ্যাত্ম আনন্দ তাহা সমস্ত প্রাকৃত আনন্দের ঊর্দ্ধে স্বপ্রতিষ্ঠ, অক্ষয়।

স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ আত্মাই যে ব্রহ্ম, শ্রুতিতে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে,

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—মাণ্ডুক্য, ২। অতএব আত্মার আনন্দ এবং ব্রহ্মের আনন্দ, এইরূপ প্রভেদ করিবার কোনই সার্থকতা নাই। সাধারণ মানুষ দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়ায় যে আনন্দ ও সুখ অনুভব করে, আত্মার আনন্দ তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু, ইহাই এখানে গীতার বক্তব্য। আত্মার আনন্দ কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না, তাহার স্বরূপই হইতেছে আনন্দ। উপনিষদ বা বেদান্ত এইভাবেই ব্রহ্মকে দেখিয়াছে—ব্রহ্ম সৎ, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, চরম সত্য বস্তু; কিন্তু তাহা শুধুই সৎ নহে, তাহা চিৎ—তাহা চৈতন্যময়, আর তাহার সেই চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে আনন্দ। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি আপনার চৈতন্যে আপনি আনন্দময়—তিনি একই সঙ্গে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, ইহাই হইতেছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্ম দৃষ্টি। ব্রহ্ম অনন্ত, অতএব তাহার মধ্যে কোন অভাবই নাই, কোন চ্যুতি নাই, কোন ত্রুটি নাই—তাই তাহার মধ্যে কোন দুঃখ নাই, তাহার আত্মানন্দ কখনই, কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না। সকল অসীমতা, অনন্ততা, পূর্ণতা হইতেছে বিশুদ্ধ আনন্দ; ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, পূর্ণ তাই তাহার স্বরূপই হইতেছে বিশুদ্ধ দুঃখলেশহীন, ছায়াহীন জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ। আমাদের সাধারণ মানব জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে, সকল প্রকার অতৃপ্তি ও দুঃখের কারণই হইতেছে কোনরূপ বাধা, সীমা, অপূর্ণতা, খণ্ডতা। তৃপ্তি আসে যখন আমরা অলব্ধ বস্তু লাভ করি, সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাই, বাধাকে জয় করি। ইহার কারণ হইতেছে আমাদের মূল সত্তায় আমরা আত্মা, ব্রহ্ম, আপন সত্তায় আপনি পূর্ণ, অনন্ত আত্মশক্তি ও আত্ম-চৈতন্যে চিরপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-আনন্দে চির-প্রতিষ্ঠ। আর যে পরিমাণে আমরা আমাদের সেই মূল সত্তার সহিত যুক্ত হই, তাহাকে স্পর্শ করি, সেই পরিমাণে আমরা তৃপ্তি লাভ করি, আনন্দের স্পর্শ পাই।

তবে আমরা সাধারণ জীবনে যে আনন্দ বা সুখের স্পর্শ পাই তাহা আত্মার আনন্দ হইতে ভিন্ন জিনিষ। আত্মার চৈতন্য যেমন আমাদের মানসিক চৈতন্য হইতে ভিন্ন, স্ব-প্রতিষ্ঠ, উদার, বিশাল, তেমনিই আত্মার আনন্দ আমাদের ব্যক্তিগত দেহ, প্রাণ, মনের আনন্দ হইতে বিভিন্ন, তাহা উদার ও স্বপ্রতিষ্ঠ। মানুষ সুখ, হর্ষ, আনন্দ বলিতে যাহা বুঝে সে-সব হইতেছে সীমাবদ্ধ ও সাময়িক, তাহাদের বিপরীত দুঃখ ও শোকের ন্যায় সে-সব বিশেষ কতকগুলি কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, বাহির হইতে, অন্য বস্তু হইতে আইসে। আত্মার আনন্দ হইতেছে সর্ব্বব্যাপী, অপরিমেয় এবং স্ব-প্রতিষ্ঠ, কোন বিশেষ কারণের

উপর তাহা নির্ভর করে না, অন্য কোন বস্তু হইতে তাহার উদ্ভব হয় না, পরন্তু তাহাই হইতেছে সকল বস্তুর আধার ও ভিত্তি; মানুষের যে সুখ, দুঃখ তাহাও ঐ আনন্দেরই বিকার, ঐ আনন্দ হইতেই উদ্ভূত। আত্মার আনন্দ যখন দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে প্রকট হইতে চায়, প্রথমে তাহাকে নানা বাধা পাইতে হয়—সেই জন্যই তাহা খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া সুখ দুঃখ বা অসাড়তায় পরিণত হয়। কিন্তু ইহার লক্ষ্য হইতেছে দেহ, প্রাণ, মনকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে তাহা এখানেই নিজ পূর্ণ স্বরূপে প্রকট হইতে পারে, ইহৈব। সচ্চিদানন্দ যেমন সীমার মাঝে নিজের অসীমত্বকে প্রকট করিতে চাহিতেছেন, অরূপকে রূপের মধ্যে, নিরাকার চৈতন্যকে দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে প্রকট করিতে চাহিতেছেন—ইহাই বিশ্বলীলার, মানবলীলার নিগূঢ় রহস্য, তেমনিই তিনি পরিবর্ত্তনশীল বিষয়-ভোগের মধ্যেও তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠ বিশ্ব-ব্যাপী আনন্দকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন। এখন যে-সকল বস্তুকে আমরা চাই আমাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তৃপ্তি উদ্ভব করিবার জন্য, যখন আমরা মুক্ত হইব, আত্মাকে লাভ করিব, আত্মার সহিত যুক্ত হইব, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা, তখন আর আনন্দের জন্য আমরা সে-সকল বস্তু কামনা করিব না, সে-সকল বস্তু কেবল আমাদের চিরস্থায়ী আত্ম আনন্দের উপলক্ষ্য মাত্র হইবে; তাহারা সে আনন্দ সৃষ্টি করিবে না, বরং আমাদের আত্মানন্দকেই আমরা সেই সব বস্তুতে প্রতিফলিত দেখিব, আমরা সর্ব্বদা যে আনন্দের মধ্যে বাস করিব, সর্ব্বত্র সেই আনন্দকেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইব, তখন আমাদের অন্তর বাহ্য সবই আনন্দময় হইয়া উঠিবে, সুখম্ অক্ষয়মশ্নুতে।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মের সহিত যোগের দ্বারা যাহার আত্মা যুক্ত হইয়াছে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। আত্মা কি? গীতা বলিয়াছে বিষয় সকলের ঊর্দ্ধে ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের ঊর্দ্ধে মন, মনের ঊর্দ্ধে বুদ্ধি, বুদ্ধির ঊর্দ্ধে যাহা তাহাই পুরুষ, তাহাই আত্মা (৩।৪২)। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে,—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্
মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতং তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতমিতি। কঠ ৬।১৭

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা জীব সকলের হৃদয়দেশে অবস্থিত, ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া জানিতে হইবে, সেই আত্মা শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ। যাহা দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত, আমাদের কেন্দ্রীয় সত্তা, আত্ম-চেতন, যাহা এই সবের ঈশ্বর, এই সবকে চালিত করিতেছে, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আধাররূপে সব কিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাই আত্মা। আমরা যাহাকে "আমি" বলি প্রথমে সেইটিকেই এই আত্মা বলিয়া মনে হয়, এবং সাধারণ লৌকিক ভাষায় আত্মা বলিতে এই "আমি"কে, "অহং"কেই বুঝায়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অজ্ঞান, এই "অহং" প্রকৃতির উর্দ্ধে পুরুষ নহে, ঈশ্বরও নহে, ইহা হইতেছে আমাদের মানসিক চৈতন্যের মধ্যে প্রকৃত আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সাধারণ জীবন গড়িয়া উঠে, আমাদের ব্যক্তিগত সত্তার বিকাশ হয়, তাই ইহাকে অজ্ঞানের ভাষায় আত্মা বলা যাইতে পারে। এই আত্মা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত, বাসনা-কামনাময়, বহির্মুখী। ইহাকে যখন আমরা অন্তর্মুখী করি, তখনই আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে, যাহা এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত এক তাহাকে আমরা জানিতে পারি। সেই ব্রহ্মে আমাদের মন ও বুদ্ধি নিবেশ করা, তাহার ধ্যান করা, তাহাতে আমাদের সকল কর্ম্ম সমর্পণ করা—ইহাই হইতেছে ব্রহ্মযোগ, ইহার দ্বারা আমরা ক্রমশঃ ব্রহ্মভাব লাভ করি, আমাদের মূল সত্তায় আমরা যে ব্রহ্ম তাহা উপলব্ধি করি—তখনই আমরা হই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। তখন আর সাধারণ মানুষের মত আমরা অহংকেই আত্মা বলিয়া মনে করি না, আমাদের যে-অন্তরাত্মা আমাদের মধ্যে ব্রহ্মেরই অংশ, তাহাকেই আমাদের জীবনের কেন্দ্র করি। সাধারণ মানুষের মত এই আত্মা সুখের জন্য বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। সে যে বাহ্য বিষয়ে আনন্দ পায় না, সুখ পায় না তাহা নহে, কিন্তু সে আনন্দ ঐ সব বিষয়ের বাহ্য স্পর্শের জন্য নহে, কিন্তু সকল বস্তুর মধ্যেই সমানভাবে যে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছে সে তাহারই সন্ধান করে, সর্ব্বত্র সে ভগবানেরই প্রকাশ দেখে, ভগবানেরই বিভূতি দেখে, এবং এইভাবে সকল বস্তু, সকল ঘটনাতেই সে ব্রহ্মসংস্পর্শের গভীর আনন্দ লাভ করে, অত্যন্তং সুখমশ্নুতে (৬।২৮)।

ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা শব্দের দ্বারা শঙ্কর বুঝিয়াছেন, সমাধি—ব্রহ্মের মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত সত্তার লয়। যিনি এইরূপ সমাধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার

আর সংসারও নাই, কর্ম্মও নাই। কিন্তু ইহা গীতার শিক্ষা নহে। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ, তিনি কিরূপ পূর্ণ সমতা লাভ করেন, পঞ্চম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে গীতা ব্রহ্মযোগ এবং ব্রহ্মে নির্ব্বাণ বলিতে কি বুঝিয়াছে সেইটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত হইয়াছেন তিনি কোন বস্তু বা কর্ম্ম বাহ্যভাবে বর্জ্জন করেন না, পরন্তু সকল বিষয়ে আসক্তি বর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকায় সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন, এবং ইহাই গীতায় উপদিষ্ট দিব্য কর্ম্মীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি যে দিব্য ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহার স্বরূপই হইতেছে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ আনন্দ ও শান্তি, তাহা বাহিরের কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না, কোন কর্ম্ম, কোন ঘটনার দ্বারাই তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না, ইহা হইতেছে অধ্যাত্ম চৈতন্যের স্বভাবসিদ্ধ সুখ। "দিব্য মানব বাহ্য বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুর জন্য নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সে জন্য নহে, পরন্তু ঐ সকল বস্তুতে যে আত্মা রহিয়াছে, ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিষের মধ্যে যাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহার অগোচর হইতে পারে না, তাহার জন্যই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে আনন্দ পান, সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন কারণ ঐই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজের আত্মা এক, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত একাত্ম হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদের মধ্যেও যে এক সম ব্রহ্ম রহিয়াছে সেই ব্রহ্মের সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা, সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সুখময় জিনিষের স্পর্শে উল্লসিত হন না বা দুঃখময় জিনিষের স্পর্শে ব্যথা অনুভব করেন না (৫।২০); কোন জিনিষের ব্যথা, কোন বন্ধুর দেওয়া বেদনা, কোন শত্রুর আঘাত—কিছুই তাঁহার হৃদয় ও মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃ (উপনিষদের ভাষায়) অব্রণম্, ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য, শুক্রম্ অমৃতম্, শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ। সকল জিনিষেই তাঁহার একই অক্ষয় আনন্দ, সুখমক্ষয়মশ্নুতে।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় ! যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ তে দুঃখযোনয়ঃ এব, আদ্যন্তবন্তঃ, তেষু বুধঃ ন রমতে।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! বিষয়-সংযোগ হইতে উৎপন্ন ভোগসমূহ দুঃখেরই হেতু, তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি উহাতে প্রীতি অনুভব করেন না।

ব্যাখ্যা

যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ। মানুষ সুখ চায়, আনন্দ চায়, কিন্তু যতক্ষণ সে বাহ্য বিষয়-ভোগে আসক্ত থাকে ততক্ষণ সে প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারে না, কারণ আসক্তি হইতে কাম-ক্রোধাদি রিপুর উদ্ভব হয়, আর মানুষ যতদিন এ-সবের অধীন থাকে ততদিন প্রকৃত সুখের আশা দুরাশা। কিন্তু বাহ্য ভোগে আসক্তি আমাদের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিব কেমন করিয়া? প্রকৃতির মধ্যেই সে উপায় রহিয়াছে, প্রকৃতির গুণ-সকল আমাদিগকে বদ্ধ করে, আবার তাহারাই আমাদের মুক্তির পথ করিয়া দেয়। মানুষ সুখ চায়, কিন্তু দুঃখ চাহে না। রজোগুণ প্রবল থাকিলে মানুষ সুখের আশায় দুঃখকেও বরণ করিতে অগ্রসর হয়, এবং এই ভাবে সে যে সংসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার ভিতর দিয়াই তাহার প্রকৃতির বিকাশ হয়, তাহার বাসনা ও আসক্তির ভিতর দিয়াই প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। কিন্তু আবার এই আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার উর্দ্ধতর বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এইখানে তমোগুণ সহায় হইতে পারে। সংসারের সুখ ভোগ করিতে গিয়া পদে পদে যে ব্যথা ও আঘাত পাইতে হয় তাহাতে আমাদের মন সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এইরূপ বিতৃষ্ণা খুব ভাল জিনিষ নহে, কারণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মানুষ তামসিকতাকে ছাড়াইয়া উঠে, তাহার উর্দ্ধতর বিকাশ হয়। তামসিকতা নিম্নতম গুণ এবং ইহা মানুষকে হীন করিয়া তোলে—অতএব নির্ব্বিচারে সকল মানুষকে বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতে নাই, তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে পারে, তামসিকতা প্রশ্রয় পাইতে পারে। তবে যদি ঐ তামসিকতার ভিতর

দিয়া মানুষ বাহ্য সুখে অনাসক্ত হইয়া আত্মার সন্ধানে, ভগবানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এই দুঃখদ্বন্দ্বময় প্রাকৃত জীবনের উর্দ্ধে যে অধ্যাত্মজীবন রহিয়াছে তাহা লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ বৈরাগ্য কল্যাণকর হয়, এবং গীতা এইরূপ বৈরাগ্যই শিক্ষা দিয়াছে, সংসার জরা-ব্যাধি-দুঃখে পূর্ণ ইহা অনুধাবন করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে বলিয়াছে। ভারতের সন্ন্যাসধর্ম্ম এইরূপই, ইহা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে চায় এক উর্দ্ধতর জীবনের জন্য—এবং যদি কেহ সংসারের দুঃখের আঘাতে কাতর হইয়া সংসার ত্যাগ করে তবে তাহার পর সে উর্দ্ধতর জীবনের সন্ধান পাইতে পারে—এইজন্য এই তামসিক ত্যাগও কার্য্যকরী হয়।

কিন্তু সকলকেই যে এই তামসিক বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, যাঁহাদের বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে, বুধ. তাঁহারা সংসারের ভোগসুখের অসারতা ও অনিত্যতা বিচার করিয়াই এই সবে আসক্তি বর্জ্জন করেন, তখন তাঁহারা আত্মায় যে অক্ষুণ্ণ সুখ আছে তাহা লাভ করেন। তবে প্রাচীন দার্শনিকেরা যে বলিয়াছেন, এই সংসার অসার, এখানে সকল সুখই অনিত্য, দুঃখের সহিত জড়িত, এবং সে-সব হইতে মুক্তির একমাত্র পন্থা হইতেছে সকল বাহ্য সংস্পর্শের প্রতি উদাসীন হওয়া, সাংসারিক জীবনকেই বর্জ্জন করা—ইহাই আমাদের জীবন সম্বন্ধে চরম কথা নহে, ইহা শুধু আমাদের বাহ্য আত্মার পক্ষেই সত্য। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম জ্ঞান আমাদিগকে গভীরতর সত্যের সন্ধান দেয়। অহংভাবের বশে আমরা বাহ্যবস্তুর স্পর্শকে সুখ ও দুঃখ রূপে গ্রহণ করি বটে, কিন্তু আমাদের যে প্রকৃত অন্তরাত্মা তাহা এই সবের মধ্যেই সমান ভাবে রস পায়, আনন্দ উপভোগ করে—এবং সেই অন্তরাত্মাকে আমরা যতই সম্মুখে আনিতে পারি, অহংয়ের পরিবর্ত্তে সেই আত্মাকে যতই আমরা আমাদের জীবনের কেন্দ্র করি—ততই আমরা সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যেই এক ব্যাপক নির্ব্যক্তিক আনন্দ উপভোগ করি। সাধারণ জীবনেও আমরা এই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের কিছু আভাস পাই। কবি, শিল্পী, জ্ঞানী, ভক্ত—ইহারা সর্ব্বত্রই আনন্দের সন্ধান পান, এবং আমাদের সকলের মধ্যেই কবিত্ব ও অন্যান্য শক্তি কিছু কিছু নিহিত রহিয়াছে। সংসারে মানুষ যে-সব জিনিষ হইতে তীব্র দুঃখ পায়,—ভয়, ক্রোধ, বিরহ, মৃত্যু, বেদনা, কবি এ-সবের মধ্যেই রসের সৃষ্টি করেন,

সাহিত্যে যেমন মধুর (আদি) রস আছে, শান্ত রস আছে, তেমনিই ভীষণতা (বিভৎস) প্রভৃতি অন্য রসও আছে। জনমদুঃখিনী সীতার কাহিনী, শ্মশানে সর্ব্বহারা হরিশ্চন্দ্র, সপ্তরথী বেষ্টিত ষোড়শবর্ষীয় অভিমন্যু—শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত আনন্দ দিয়াছে, বারবার এইসব দেখিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না, এ-সব কাহিনী কখনও পুরাতন হইল না। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যেই যে নিয়মের খেলা দেখিতে পান তাহাতে তিনি যেমন প্রকৃতির কল্যাণময় রূপের মধ্যে, তেমনিই তাহার ধ্বংসলীলার মধ্যেও, সমান ভাবে আনন্দ পান। ধার্ম্মিক ব্যক্তি দুঃখের মধ্যেও ভগবানের স্পর্শ অনুভব করিয়া তীব্র আনন্দ অনুভব করেন, তাই তিনি ভগবানকে বলিতে পারেন,—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ধরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে।

নাটকাদিতে বিয়োগান্ত দৃশ্য হইতে, হৃদয়ভেদী দুঃখ হইতেও আমরা যে রস পাই, তাহার কারণ আমরা সেই সময়ে অনেকটা নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠি, ঐ-সব সুখ-দুঃখকে অনাসক্তভাবে দ্রষ্টারূপে দেখিতে পারি, আমাদের নিজেদের অহংয়ের ভালমন্দ, শুভ-অশুভের মানদণ্ডে সে-সবকে বিচার করিয়া দেখি না। যে পরিমাণে আমরা এই অহংকে বর্জ্জন করি, নির্ব্যক্তিক হই, দ্রষ্টা অনাসক্ত-ভাব অবলম্বন করি সেই পরিমাণেই আমরা সংসারের সব কিছুর মধ্যেই বিশুদ্ধ রস ও আনন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু যে-সব জিনিষের সহিত আমাদের দেহের বা হৃদয়ের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেখানে আমাদের দেহে আঘাত লাগে, আমাদের স্ত্রী-পুত্রের অনিষ্ট হয়, স্বার্থের বিপর্য্যয় হয় সেখানে সমতা রক্ষা করা আমাদের অহংয়ের পক্ষে কঠিন এমন কি অসম্ভব হয়, এমন কি সে-সব জিনিষের মধ্যে আনন্দ অনুভব করাকে আমাদের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে আমরা যে নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিতে পারি, সাধারণ সাংসারিক জীবনে সে-ভাব রক্ষা করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সেই জন্যই গীতা অহংভাব বর্জ্জন করিবার উপর, নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইবার উপর এত জোর দিয়াছে, বাহ্যসংস্পর্শে সকল প্রকার আসক্তি বর্জ্জন করা অভ্যাস করিতে বলিয়াছে। ইহার অর্থ নহে সংসার পরিত্যাগ করা, সংসারের সকল সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হওয়া, পরন্তু ইহার উদ্দেশ্য আমাদের যে অন্তরাত্মা

সংসারের সকল স্পর্শেই সমান ভাবে আনন্দ পায় সেই আত্মার আনন্দ লাভ করা, অহংয়ের ঊর্দ্ধে সেই আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিয়া দিব্য ভাবে সংসারকে ভোগ করা।

ভগবান যদি আনন্দময় তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট এই সংসারে এত দুঃখ কেন, বেদনা কেন—দর্শন শাস্ত্রের এই চিরন্তন সমস্যার প্রকৃত সমাধান এই ভাবেই হইতে পারে। ভগবান যেমন আনন্দময়, এই বিশ্বলীলাও তেমনই আনন্দময়; সর্ব্বত্র এক অখণ্ড আনন্দ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই বিশ্বলীলাকে ধরিয়া রহিয়াছে, নতুবা এই সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তের জন্যও টিকিতে পারিত না।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

এই যে আনন্দময় আকাশে আমরা বাস করিতেছি ইহা যদি না থাকিত তাহা হইলে কেই-বা জীবন ধারণ করিতে পারিত আর কেই-বা নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত?

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

আনন্দ হইতেই এই সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, আনন্দতেই তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ২।৭, ৩।৬

এই যে অখণ্ড স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বাহ্যস্পর্শে আমরা যে সুখ-দুঃখ অনুভব করি ইহা হইতেছে ঐ আনন্দেরই বিভিন্ন রূপ, ঐ সাগরেরই তরঙ্গ ও ফেনা। সকল বস্তুর মূলে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা হইতেছে অনন্ত অখণ্ড সৎবস্তু; ঐ সৎএর মূল স্বরূপ বা শক্তি হইতেছে অনন্ত অবিনাশী আত্ম-চৈতন্য; আবার ঐ আত্ম-চৈতন্যের মূল স্বরূপ হইতেছে অনন্ত চ্যুতিহীন আনন্দ—সচ্চিদানন্দ আত্মা বা ব্রহ্মই হইতেছে জগৎলীলার মূল, জন্মাদস্য যতঃ। ব্রহ্ম অরূপই থাকুন, অথবা অসংখ্যরূপ গ্রহণ করুন, অবিভক্ত থাকুন অথবা সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করুন, তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার এই স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দ কখনও কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না, হইতে পারে না। আমাদের অন্তরাত্মা সাধারণ চৈতন্য ও অজ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে যেমন বাহ্যতঃ জড় সত্তার মধ্যে এক অনন্ত চিৎশক্তির সন্ধান পায়, তেমনই ঐ জড়ের দৃশ্যতঃ অসাড়তার মধ্যেও এক অনন্ত সচেতন আনন্দের সন্ধান পায় এবং নিজেকে সেই সর্ব্বব্যাপী

অবিচল আনন্দের সহিত যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ অন্তরাত্মার এই অভীপ্সা প্রকাশ করিয়াই গাহিয়াছেন,

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

আবার,

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে,
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।

কবি সকল বাহ্য স্পর্শে, সকল ইন্দ্রিয়-ভোগেই জগতে সর্ব্বত্র অনুস্যূত অখণ্ড আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। এ আনন্দ তাঁহার অন্তরাত্মারই আনন্দ। সর্ব্বভূতের যে আত্মা তাহা তাঁহার নিজেরই আত্মা। কিন্তু আমাদের সাধারণ দৃষ্টি ইহা দেখিতে পায় না, ইহা শুধু বাহ্য দৃশ্যে প্রতারিত হয়, তাই সংসারের সকল সুখ-দুঃখ বা অসাড়তার অন্তরালেই যে গভীর আনন্দ রহিয়াছে আমাদের বাহ্য চৈতন্যে তাহা অনুভূত হয় না। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মার নিকট সংসারের সকল সুখ-দুঃখ হাসিকান্না হইতেছে এ বিশ্বব্যাপী আনন্দ-যজ্ঞেরই অঙ্গ-স্বরূপ, তাই কবি বলিতেছেন,

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশী
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।

যেমন প্রাণের হাসির মধ্যে তেমনই সমানভাবে গভীরভাবে প্রাণের কান্নার মধ্যেও যে আনন্দ রহিয়াছে আমাদের বাহ্য চৈতন্য তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের অন্তরাত্মা তাহা অনুভব করে—এই জন্যই মানুষ সংসারে হাজার দুঃখ বেদনা পাইয়াও জীবনকে ছাড়িতে চায় না—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্ ॥

অঙ্গ শিথিল হইয়াছে, মাথায় কেশ নাই, দন্ত নাই, পিণ্ডাকার বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া তবে চলিতে পারে—তথাপি তাহার আশার শেষ নাই! তাহার ইন্দ্রিয়-সকল অক্ষম হইলে কি হয়, তাহার অন্তরাত্মা যে সকল প্রকার অনুভূতি বা অনুভূতিহীনতা ও জড়তার মধ্যেও গভীর আনন্দ অনুভব করে। কখনও কখনও মানুষ যে আত্ম-হত্যা করে তাহারও কারণ—সে জীবনে আনন্দই চায়, আনন্দতেই বিশ্বাস করে—বর্ত্তমান জীবনে তাহার সন্ধান না পাইয়া ইহাকে ধ্বংস করিয়া অন্য জীবন চায়। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। আনন্দের জন্য এ-জীবন ছাড়িতে হয় না, কেবল যে অজ্ঞান আমাদিগকে জগতের স্বরূপ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া আমাদের অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। সন্ন্যাসীরা যে সংসারের দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র সুখের, শান্তির, আনন্দের সন্ধান করেন—ইহাও ঐরূপ এক আত্ম-হত্যা, কারণ দুঃখ রহিয়াছে শুধু বাহিরের চৈতন্যে, অজ্ঞান অহংভাবে। মূলতঃ এই জগতের স্বরূপ হইতেছে আনন্দ, আনন্দের জন্যই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, আনন্দ হইতেই আমাদের জন্ম হয়, আনন্দতেই আমরা জীবন ধারণ করি, আবার জন্মের শেষে আনন্দের মধ্যেই আমরা ফিরিয়া যাই।

জগৎ মায়া। ইহার অর্থ নহে যে জগৎ মিথ্যা, কারণ ইহা যদি স্বপ্নও হয় তাহা হইলে আত্মার স্বপ্নরূপেও ইহা সত্য; আর ইহা অনিত্যও নহে,কারণ ইহা লয় পাইয়া আবার পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হয়, ভূত্বা ভূত্বা প্রলয়তে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য; তবে ব্রহ্ম জগৎ অপেক্ষা উচ্চতর সত্য—ব্রহ্ম নিজেকে জগৎরূপে প্রকট করিতেছেন, এক হইয়াও বহুরূপ গ্রহণ করিতেছেন, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত হইতেছেন—ইহাই তাঁহার মায়া-শক্তি, আর তিনি ইহা করিতে-

ছেন তাঁহারই অনন্ত স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দকে অনন্ত রূপের ভিতর দিয়া অনন্তভাবে আস্বাদন করিবার জন্য। অতএব এই জগৎকে আমরা বলিতে পারি তাঁহার লীলা, শিশু যেমন খেলায় আনন্দ পায়, কবি ও শিল্পী যেমন কাব্য ও শিল্প রচনায় আনন্দ পায়, কর্ম্মী যেমন কর্ম্মে আনন্দ পায়—তেমনই এই বিশ্ব হইতেছে বিশ্ব-কবির, বিশ্ব-কর্ম্মীর আনন্দ-লীলা; চির-নবীন তিনি অনন্তকাল ধরিয়া নিজের মধ্য হইতে নূতন নূতন সৃষ্টির বিস্তার করিয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

অতএব শাশ্বত অক্ষর আত্মানন্দ জগৎ মাঝে অনন্ত বৈচিত্র্যময় আনন্দে নিজেকে প্রকট করিতেছে—ইহাই যখন জগৎ ও জীবনের মূল রহস্য তখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের সকল অনুভূতির পশ্চাতেই এক অখণ্ড সচেতন সত্তা রহিয়াছে, তাহার চ্যুতিহীন আনন্দের দ্বারা আমাদের জীবনকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহাই বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শের ভিতর দিয়া আমাদের বাহ্য জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখ রূপে পরিণত হইতেছে। সেইটিই হইতেছে আমাদের প্রকৃত আত্মা, আমাদের যে মানসিক সত্তা সুখ-দুঃখের অধীন তাহা ঐ অন্তরাত্মারই বাহ্য রূপ, তাহাতে আমরা নিজদিগকে সর্ব্বভূত হইতে, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করি, আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে কেন্দ্র করিয়া বাহিরের স্পর্শকে গ্রহণ করি তাই সে-সব সুখ, দুঃখ বা অননুভবতা রূপে পরিণত হয়। আমাদের বিকাশশীল চৈতন্যের এইটি হইতেছে প্রথম ছন্দ, এ ছন্দ হইতেছে জটিল এবং অপূর্ণ, ইহার মধ্যে অনেক ছন্দ-পতন আছে, বাহিরের স্পর্শ আমরা ঠিক মত গ্রহণ কবিতে পারি না, ঠিক ভাবে তাহাতে সাড়া দিতে পারি না। তবে এই সব অনুভূতির ভিতর দিয়া আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে, সচেতন পুরুষ, তাহার পূর্ণ ও ঐক্যময় জীবনের জন্য আমরা এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠি। আমরা যদি একবার সর্ব্বভূতের এক আত্মার সহিত ঐক্যবোধ লাভ করিতে পারি, যে অখণ্ড সঙ্গীত জগৎ জুড়িয়া বাজিতেছে তাহার সহিত নিজদিগকে এক সুরে বাঁধিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে সত্য ও পূর্ণ ছন্দে জীবন যাপন করিব, আমাদের বর্ত্তমান মানসিক সত্তার সুখ-দুঃখময় জীবন হইতে তাহা বিভিন্ন।

আমাদের মূল গভীরতম সত্তায় আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত এক,

আমাদের প্রকৃত সত্তায় আমরা অখণ্ড চৈতন্য এবং চ্যুতিহীন আনন্দ; আমাদের ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে যে সুখ-দুঃখ বা অনসুভবতা তাহা কেবল একটা বাহ্য সাময়িক ব্যবস্থা, আমাদের বর্ত্তমান জাগ্রত চৈতন্যে যেটি এখন সর্ব্বোপরি রহিয়াছে তাহারই দ্বারা সৃষ্ট। এ-সবের পিছনে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন বস্তু রহিয়াছে—বাহ্য চৈতন্য অপেক্ষা বিশালতর, গভীরতর, সত্যতর বস্তু রহিয়াছে—যাহা সকল স্পর্শেই সমান আনন্দ উপভোগ করে, সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে; সেই আনন্দই পিছন হইতে আমাদের বাহ্য মানসিক সত্তাকে ধরিয়া রহিয়াছে, বিক্ষুব্ধ জীবনের সকল প্রয়াস, দুঃখ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতেছে। যাহাকে আমরা আমাদের "আমি" বলি সেটি কেবল বাহিরের একটি কম্পমান রশ্মি; পিছনে রহিয়াছে আমাদের বিশাল অবচেতন সত্তা, বিশাল অতি-চেতন সত্তা, তাহা এই সব বাহ্য অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হইতেছে, বাহ্য সত্তার আবরণের ভিতর দিয়া বাহ্যজগতের স্পর্শ-সকল গ্রহণ করিতেছে; নিজে আবৃত থাকিয়া সে এই সবকে গভীরতর মহত্তর সম্পদে পরিণত করিতেছে। সেই গভীরতা হইতেই আমাদের শক্তি, চরিত্র, জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেরণা আসিতেছে; এ সবের মূল কোথায় আমরা জানি না, কারণ আমাদের মন বহির্ভাগেই ঘুরিতেছে, অন্তর্মুখী হইয়া গভীরতার মধ্যে বাস করিতে সে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই।

সাধারণ জীবনে এই সত্যটি আমাদের কাছে লুক্কায়িত থাকে, কেবল কখনও কখনও আমরা ইহার কিছু আভাস পাই, আবার ভুলিয়া যাই। কিন্তু যদি আমরা অন্তর্মুখী হইয়া জীবন যাপন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিতই আমাদের মধ্যে এই গভীরতর সত্তা সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠি; সেইটিই আমাদের সত্যতর সত্তা, তাহা গভীর, শান্ত, সুখময়, শক্তিময়, জগৎ তাহাকে অধীন বশীভূত করিতে পারে না, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরাই জগৎকে জয় করি, জিতঃ সর্গঃ। সেই সত্তা আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বর না হইলেও তাঁহারই অংশ। আমরা দেখিতে পাই ভিতর হইতে আমাদের এই সত্তাই আমাদের বাহ্য দৃশ্য সত্তাকে ধরিয়া রহিয়াছে, একটি শিশুর ভুল, ভ্রান্তি, ক্রোধ, অভিমান দেখিয়া আমরা যেমন হাসি, তেমনই সে আমাদের বাহ্য সুখ-দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে, সব সময়েই সাহায্য করিতেছে। আর আমরা যদি আমাদের অন্তরের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি, আমাদের বাহ্য অনুভূতির সহিত নিজদিগকে এক না করিয়া ঐ জ্যোতির্ম্ময় ভগবদংশের সহিত নিজ-

দিগকে এক করি, আমরাও বাহ্য জগতের স্পর্শ-সকলের প্রতি তাহারই ভাব লাভ করিতে পারি এবং আমাদের সমগ্র চৈতন্যে দেহ প্রাণ ও মনের সমস্ত সুখ দুঃখ হইতে সরিয়া গিয়া সে-সবকে অভিজ্ঞতা রূপেই গ্রহণ করিতে পারি; সে-সব স্বরূপতঃ বাহ্য হওয়ায় আমাদের মূল ও প্রকৃত সত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানসিক সত্তার পিছনে এক বিশাল আনন্দময় সত্তা রহিয়াছে, উপনিষদের ভাষায় মনোময় পুরুষের পিছনে আনন্দময় পুরুষ রহিয়াছে, মনোময় হইতেছে ঐ আনন্দময়ের ছায়ামাত্র, বিকৃত রূপ। আমাদের যাহা সত্য তাহা বাহিরে নাই, ভিতরে আছে।

দুঃখযোনয়ঃ এব তে—দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া দেখেন যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে যে-সব ভোগ সুখ উৎপন্ন হয় সে-সবই দুঃখজনক, দুঃখের আকর। সংসারের সব কিছুরই দুঃখস্বরূপতা যোগদর্শনে এবং বেদান্তদর্শনে কি ভাবে দেখান হইয়াছে মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার টীকায় তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ
দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"। (পাঃ দঃ ২।১৫)

"বিবেকী ব্যক্তির নিকট সমস্তই দুঃখ-স্বরূপ, কারণ সমস্ত বিষয়ই পরিণাম-দুঃখ, তাপ দুঃখ, এবং সংস্কার-দুঃখের দ্বারা বিজড়িত, এবং গুণবৃত্তি-সকলও পরস্পর বিরুদ্ধ"। সমস্ত সুখানুভবের সহিতই রাগ বা আসক্তি বিজড়িত রহিয়াছে, কারণ বিষয়াসক্তিই প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ বিষয়-প্রাপ্তি নিবন্ধন সুখরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ সকল সুখই হইতেছে কোন বাসনা বা কামনার তৃপ্তি। আর বাসনার স্বরূপই হইতেছে দুঃখ, ইহা প্রতিক্ষণই বাড়িতে থাকে, ভোগে ইহার তৃপ্তি হয় না,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অতএব কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া বিষয়-সুখও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে, কারণ বিষয়-সুখ হইতেছে আসক্তিরই পরিণাম। ইহাই হইল বিষয়-সুখের পরিণামদুঃখতা। আবার সুখানুভবকালে সর্ব্বদাই সেই সুখের যাহা পরিপন্থী অর্থাৎ প্রতিকূল তাদৃশ পদার্থের উপর বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকে, কাজেই বিষয় সুখে তাপ-দুঃখও অনিবার্য্য। কারণ বিদ্বেষ হইতেছে তাপ। আবার

বর্ত্তমান সুখানুভব নিজ সংস্কার রাখিয়া যায় অর্থাৎ সুখ অনুভূত হইয়া গেলে মনের মধ্যে তাহার ছাপ আঁকিয়া যায় যাহার ফলে সেই সংস্কার আবার সুখস্মৃতি জন্মায়; সুখস্মৃতি সুখে অনুরাগ উৎপাদন করে, সেই অনুরাগ সেই সুখলাভের জন্য শরীর বাক্ ও মনের চেষ্টা জন্মায়, সেই চেষ্টা আবার পুণ্য বা অপুণ্য কর্ম্মাশয় আধান করে এবং সেই কর্ম্মাশয় আবার জন্মাদি সম্পাদন করে। ইহাই হইল সুখের সংস্কার-দুঃখতা। অতএব দেখা যাইতেছে বিষয়সুখের মধ্যে তিনকালেই দুঃখ বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া ফলতঃ উহা দুঃখেরই সামিল

আবার বিষয়সুখ যে স্বরূপতঃ ও দুঃখ অর্থাৎ বস্তুগত্যা তাহা যে দুঃখস্বরূপ তাহা দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ"। গুণ হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; সেগুলি যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ এবং সেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। কিন্তু তাহারা সকল সময়েই পরস্পরের সহিত জড়িত থাকে, কোন একটি গুণ প্রধান হইলেও অপর দুইটি সেই সঙ্গে অপ্রধান হইয়া থাকে, অতএব সুখানুভব সত্ত্বগুণের ক্রিয়া হইলেও উহা ত্রিগুণাত্মকই বটে, উহাতে যেমন সুখ আছে, তেমনিই দুঃখ এবং মোহও আছে। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তির নিকট সমস্তই দুঃখ স্বরূপ।

এইরূপে পতঞ্জলির যোগদর্শন অনুসারে গীতার এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করা হইল। ঔপনিষদ অর্থাৎ বৈদান্তিকগণের মতে অনাদি ভাব স্বরূপ যে অজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা, এবং এই অবিদ্যাই হইতেছে জগৎ প্রপঞ্চের মূল। এই অবিদ্যার দ্বারা যে অহংভাবের সৃষ্টি হয়, তাহাই অস্মিতা এবং মানুষের রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ হইতেছে ঐ অহংভাব হইতেই উদ্ভূত। সুখের উপর যে তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, দুঃখের উপর যে ক্রোধ তাহাই দ্বেষ, এবং বিদ্বানই হউক আর অবিদ্বানই হউক জীবমাত্রের মধ্যে যে বদ্ধমূল মরণভয় তাহার নাম অভিনিবেশ। এই তিনটিই জীবনে ওতঃপ্রোত। অবিদ্যামূলক বলিয়া সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। আর রজ্জুতে সর্প ভ্রম মিথ্যা হইলেও তাহা যেমন ভয়, কম্প, পলায়নাদির হেতু হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ অবিদ্যামূলক হইলেও এইগুলি দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। বুধঃ অর্থাৎ যাঁহার ভ্রম নিবৃত্ত হইয়াছে তিনি বিষয়সুখে রতি বা তৃপ্তি অনুভব করেন না অর্থাৎ যে ব্যক্তি মরীচিকার স্বরূপ অবগত আছে সে যেমন তথায় জলাভিলাষে প্রবৃত্ত হয় না সেইরূপ জ্ঞানী

ব্যক্তিও তাহাতে আসক্ত হয় না। শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এই সংসারে সুখের লেশমাত্রও নাই, ইহা বুঝিয়া বিষয়-মৃগতৃষ্ণা হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করিবে।"

কিন্তু বাস্তবিকই কি সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই? সংসারে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলে সুখের মাত্রা দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়। আমরা সাধারণতঃ সুখেই থাকি, সুখেই অভ্যস্ত, তাই সেটাকে গণ্য করি না, তাহার কিছু ব্যতিক্রম বা অভাব হইলেই সেটা আমাদিগকে বিচলিত করে এবং সেই জন্য দুঃখটাকেই আমরা বড় করিয়া দেখি। সৌন্দর্য্য হইতেছে সুখ ও আনন্দের উৎস, এ সংসারে কি তাহার কিছু অপ্রাচুর্য্য আছে? প্রকৃতি অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী, আর ক্ষণে ক্ষণে তাহার কত নূতন রূপ, কখনও তাহা পুরাতন হয় না। ঊষালোকে পাখীর গানে আমরা জাগিয়া উঠি, সদ্য প্রস্ফুটিত শত শত কুসুম আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে—এ-সব নিত্য অফুরন্ত ভাবে আমরা ভোগ করি বলিয়া এ-সবকে আমরা লক্ষ্য করি না, কিন্তু অজ্ঞাতে এ-সবই আমাদের অন্তরকে মধু-সিঞ্চিত করে—

মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ *
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

—বৃহদারণ্যক—৬।৩।৬

—এই পৃথিবীর ধুলিকণাও যে মধুময়! মানুষ যে শুধু প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য ভোগ করে তাহা নহে, কাব্যে ও চারুশিল্পে অফুরন্ত ভাবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে—মানুষ কি কখনও এ সব ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিবে? ইহাদের কি আদি ও অন্ত আছে? তাহার পর প্রেম—মানুষের হৃদয়ে প্রেমের ক্ষমতা অসীম, আর এই প্রেম হইতেছে নিরতিশয় আনন্দের উৎস—মানুষ জন্মাবধি মাতৃক্রোড় হইতে এই প্রেম আস্বাদন করে, ইহাতে তাহার জন্মগত অধিকার—তাহার পর সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কত ভাবে কত বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহার আস্বাদ পায়। এ সংসারে কি সুখের সীমা আছে?

সংসারে দুঃখও আছে, অতি তীব্র, হৃদয়ভেদী দুঃখ আছে, কিন্তু তাহাই জীবনের সব নহে। সংসারে যে নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ আছে তাহার জন্য

মানুষ ঐ দুঃখকে বরণ করিয়া লয়—এমন কি বলিতে পারা যায় যে, সুখকে বাড়াইবার জন্যই যেন দুঃখ রহিয়াছে, যেমন সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত রহিয়াছে, তেমনিই দুঃখের সহিতও সুখ জড়িত রহিয়াছে—অতি বড় দুঃখের মধ্যেও অতীত সুখের স্মৃতি থাকে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকে, বর্ত্তমান দুঃখের আদি আছে, অন্ত আছে বলিয়া মানুষ দুঃখের মধ্যেই সুখ পায়। দুঃখ যত তীব্র হয়, তাহার পর সুখও তত তীব্র হয়। বিরহের দুঃখ মিলনের আনন্দকে তীব্রতর গভীরতর করে—

পাপ সুধাকর যত দুঃখ দিল
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল।

এই যে সুখ-দুঃখের মিশ্রিত খেলা মানবজীবন, ইহাতে আমাদের অন্তরাত্মা গভীর আনন্দ পায় তাই মানুষ জীবনকে দুঃখের ভয়ে ত্যাগ করিতে চায় না—কেবল যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহারাই দুঃখের ভয়ে সুখকেও ছাড়িয়া অসাড় জড়বৎ জীবন যাপন করিতে চায়। আর যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, বুধঃ, তাঁহারা এই মিশ্রিত সুখ-দুঃখে তৃপ্তি পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধতর আনন্দের সন্ধান করেন, তাই তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখের আকর্ষণ বর্জ্জন করিয়া নিজেদের মধ্যে মনবুদ্ধির উচ্চতর ক্রিয়া সকলের মধ্যে, ত্যাগ, সংযম, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা—এই সবের মধ্যে উচ্চতর সুখের সন্ধান করেন। কিন্তু এই যে উচ্চতর মানসিক সুখ, সাত্ত্বিক সুখ ইহাই মানুষের চরম সম্ভাবনা নহে। দেহ, প্রাণ, মনের যে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত আনন্দ, ইহা হইতেছে প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতির মধ্যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র—আত্মায় যে বিশুদ্ধ আনন্দ রহিয়াছে, আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের ত্রুটি ও অপূর্ণতার জন্য তাহাকে পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে না, খণ্ডিত করে, বিকৃত করে, তাই তাহা সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। নীচের প্রাকৃত ভোগ সকলের প্রতি আমাদের যে তীব্র আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিয়া অন্তর্মুখী হইলে আমরা আত্মার ও আত্মানন্দের সন্ধান পাই—সেই আত্মচৈতন্যের মধ্যে দুঃখের লেশ নাই, তাহার স্বরূপই হইতেছে—শান্তি, জ্যোতি, নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ। সন্ন্যাসীরা এই আত্মানন্দের আশাতেই সংসারের জীবন হইতে নিবৃত্ত হইতে চান। কিন্তু গীতার শিক্ষা তাহা নহে, ঐ আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের মধ্যে

দিব্য ভাবে জীবন যাপন করাই গীতার আদর্শ—তখন মানুষ সংসারের সকল বাহ্য সুখ দুঃখের মধ্যে আত্মানন্দ আস্বাদ করে, সকল বস্তু, সকল ঘটনার মধ্যে আত্মাকে দেখে—তখন আর সংসার ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এই সংসারেই, ইহৈব, মানুষ আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে, গীতা পরের শ্লোকেই (৫।২৩) তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে।

* পাতঞ্জল দর্শনে সংসারের দুঃখময় স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া পাঁচ প্রকার ক্লেশের উল্লেখ করা হইয়াছে—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ; ইহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ দুঃখপতিত করে, এই জন্য ইহাদের ক্লেশ বলা হইয়াছে। এই ক্লেশগুলি চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে; আর বিবেকখ্যাতিবলে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর নাশ হইলে অবিদ্যাদি ধর্ম্মের নাশ হয়। অবিদ্যাই ঐ সকল ক্লেশের মূল—বিপর্য্যয়, মিথ্যাজ্ঞান ও অবিদ্যা এইগুলি একার্থ বাচক। সেই মিথ্যাজ্ঞানই অশেষ সংসারের নিদান। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে সংসারের নিবৃত্তির সহিত সকল দুঃখ ও ক্লেশের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অবসান হয়। যোগ সাধনার দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই অবিদ্যা আর আশ্রয় পায় না, তখন নির্বীজ সমাধির দ্বারা সংসার ও সকল দুঃখের চির-অবসান হয়। এইরূপ চিত্তনিরোধের উপায়স্বরূপই পাতঞ্জল দর্শনে অষ্টাঙ্গযোগের পথ দেখান হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও বলা হইয়াছে, এই সংসার দুঃখময়, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এই সংসারের মূল—এবং এই অবিদ্যা নাশের উপায় হইতেছে জ্ঞানযোগ। গীতাও বলিয়াছে এই সংসার দুঃখময়, অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্, এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এই দুঃখের মূল—তবে গীতা অবিদ্যাকেই সংসারের মূল বলে নাই। আর রোগীকে নাশ করিয়া রোগ সারাইবার মত সংসারের দুঃখের অবসান করিতে সংসারকেই ত্যাগ করিতে বলে নাই। অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশের উপায় স্বরূপ গীতা পাতঞ্জলের রাজযোগ এবং বেদান্তের জ্ঞানযোগ উভয়েরই উপযোগীতা স্বীকার করিয়াছে—পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে রাজযোগের বর্ণনা করিয়া, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা আরও বিশদ করিয়াছে—তথাপি গীতার যোগ সেই প্রাচীন রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ নহে, আর গীতার সাধনার লক্ষ্যও প্রাচীন দর্শনগুলির ন্যায় সন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগ নহে।

সংসারে দুঃখ আছে বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, আমাদের অন্তরাত্মা ইহাতে সায় দেয় না; সংসারের দুঃখকে জয় করিতে হইবে এইটিই

সত্যতর মহত্তর আদর্শ বলিয়া মনে হয়, ইহৈব তৈর্জিতো সর্গঃ। সংসারের যে সুখ তাহা বস্তুতঃ দুঃখই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলা হয় যে, সকল সুখই হইতেছে কোন না কোন বাসনার তৃপ্তি, আর এই বাসনা ভোগের দ্বারা বাড়িতেই থাকে, তৃষ্ণার কখনও শান্তি হয় না, অতএব সর্ব্বদাই তাহা দুঃখ দেয়। কিন্তু অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই বাসনাই সুখের নিদান, বাসনাতৃপ্তিতে যে সুখ আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না, আর বাসনা যে কখনও নিবৃত্ত হয় না ইহার জন্য আমাদের সুখেরও কখনও অন্ত হয় না, সংসারে যত সুখ পাই তত আরও সুখের পিপাসা বর্দ্ধিত হয়, মানুষ নিত্য নূতন সুখের জন্য চেষ্টা করে, সে চেষ্টাতেই যে-সুখ আছে তাহা সকল বিফলতা ও পরাজয়ের দুঃখকে ছাপাইয়া উঠে। বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃত আত্মায় যে অনন্ত অপরিমেয় আনন্দ রহিয়াছে, আমাদের বাহ্য বাসনাত্মক আত্মা তাহার কিছু আভাস পায় বলিয়াই তাহার সামান্য সুখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, যত পায় তত চায়, এমনি করিয়াই সে একদিন আত্মার মধ্যে অনন্ত আনন্দের সন্ধান পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে।

বলা হয় যে, মাথার উপর মৃত্যুর ছায়া লইয়া যে জীবন যাপন করিতে হয় তাহাতে কি সুখ পাওয়া যাইতে পারে? "বিদ্বানই হউক, অথবা মূর্খই হউক জীবমাত্রের মধ্যে যে বদ্ধমূল মরণভয় তাহার নাম অভিনিবেশ। তাহা স্বরসবাহী—অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন বহু জন্ম ধরিয়া যে অসংখ্যবার মরণ যাতনা অনুভব করা হইয়াছে তাহার নাম স্বরস, সেই স্বরস নিবন্ধনই জীবের উক্ত মরণরূপ অভিনিবেশ হইয়া থাকে।" (মধুসূদন সরস্বতী)। কিন্তু বিদ্বানই হউক আর অবিদ্বানই হউক মৃত্যুকে কে মনে রাখে? জন্ম জন্ম এই ধরণীতে আসিয়া মানুষ যে তীব্র সুখ অনুভব করিয়াছে তাহাই মনে থাকে এবং আমাদিগকে জীবন লীলার দিকে আকৃষ্ট করে। আমাদের অন্তরাত্মা পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলে—

হে ধরণী! তোমা সনে মম নহে শুধু
দুদিনের পরিচয়; জনমে জনমে
আসি তব বক্ষোপরি করিয়াছি আমি
কণ্ঠভরি মর্ত্ত্য সুধা পান, স্মৃতি তার
আধারের স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।

উপনিষদে বলা হইয়াছে,

> ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ
> পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং
> পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো
> যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
> পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্
>
> —বৃহদারণ্যক, ২।৫।১

এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, এই পৃথিবীর সমস্ত ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব।

তাহা হইলে এই পৃথিবীকে, এই পার্থিব জীবনকে মিথ্যা মায়া বলিয়া ইহাকে বর্জ্জন করিবার আগ্রহ কেন? এই জগতে যতক্ষণ আমরা শুধুই "নানা" দেখি, বহু দেখি, কিন্তু ইহাদের অন্তর্নিহিত এক আত্মাকে দেখি না, ব্রহ্মই যে এই সব হইয়াছেন তাহা উপলব্ধি করি না, ততক্ষণই আমরা অজ্ঞানের অধীন, দুঃখের অধীন। বাহ্য জগতের স্পর্শসকলকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না—তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহে ধাবিত হই, অথবা তাহাদিগকে এড়াইতে নিজদিগকে সঙ্কুচিত করি—এই ভাবে আমাদের মধ্যে অহং-ভাবমূলক যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতেই সর্ব্বত্র যে ব্রহ্মানন্দ রহিয়াছে তাহা বিকৃত হইয়া সুখদুঃখরূপে অনুভূত হয়। এই অজ্ঞান ও অহং ভাব হইতে মুক্ত হইয়া আত্মার উদার ঐক্যমূলক চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারের সব কিছুকেই আমরা ব্রহ্মময় এবং মধুময় বলিয়া উপলব্ধি করিব।

আমাদের অন্তরাত্মা জানে যে সে ব্রহ্মের সহিত এক, অমৃত—সেই জ্ঞানের ছায়া আমাদের বাহ্য চৈতন্যের মধ্যেও কিছু প্রতিফলিত হয়, তাই মানুষ প্রত্যহ মৃত্যু দেখিলেও মৃত্যুকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, মৃত্যু দেখিয়া সাময়িক ভাবে ভীত হইলেও সেটা তাহার মনে থাকে না। প্রাচীনকাল হইতে কত ধর্ম্ম ও দর্শনের শিক্ষা মানুষকে সংসারের ও সংসার-সুখের অসারতা শিক্ষা দিতেছে, কিন্তু তাহা মানবজাতিকে সংসার হইতে বিমুখ করিতে পারে নাই, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় অধিকাংশ মানুষই দেহ, প্রাণ, মনের ভোগ-সুখের সন্ধানেই ব্যাপৃত হইয়াছে। দর্শনের বৈরাগ্য-শিক্ষা তাহাদের মধ্যে

বুদ্ধিভেদেরই সৃষ্টি করিতেছে—তাহারা পণ্ডিতদের মুখে শুনিতেছে ভোগসুখ হইতেছে পরিত্যাজ্য অথচ প্রকৃতির প্রেরণায় তাহারা সে উপদেশ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না—তাই তাহারা নিজদিগকে হীন মনে করিতেছে, সকল ভোগসুখে মগ্ন থাকিয়াও সে-সবকে পাপ বলিয়া ধারণা করিতেছে। এই জন্যই গীতা এইরূপ সংসার ত্যাগের, ভোগসুখ বর্জ্জনের শিক্ষা দেয় নাই—যে যেমন অবস্থায় আছে তদনুযায়ী সকলকেই কর্ম্ম করিতে, সংসার করিতে, সমৃদ্ধ সুখ পূর্ণভাবেই উপভোগ করিতে বলিয়াছে—ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

যাহারা তামসিকতার স্তরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ করিতে গীতা স্পষ্টভাবেই নিষেধ করিয়াছে—যাহাতে তাহারা সকল প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে বলিয়াছে। আর যাহারা রাজসিক-প্রকৃতিসম্পন্ন, তীব্র বাসনা ও অহং ভাবের তৃপ্তি করিতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছে, গীতা তাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছে যে, এই বাসনা, কামনা ও অহংই মানবজীবনের উচ্চতম স্বরূপ নহে, এ-সবকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ অসুরে পরিণত হয়। জীবন মিথ্যা নহে, জীবনের ভোগসুখও পরিত্যাজ্য নহে, জগতের সব কিছুই হইতেছে ভগবানেরই অভিব্যক্তি—কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহা বাসনাত্মক অহংয়ের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে—এই আবরণ দূর করিতে না পারিলে আমরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না—অতএব বাসনার অনুসরণ না করিয়া কোন উচ্চতর নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভোগ না করিয়া সংযতভাবে শাস্ত্র ও নীতি অনুসারে, ধর্ম্ম অনুসারে অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—তাহা হইলে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবেও তাহার নীচের প্রকৃতিকে সংযত করিয়া এক মহত্তর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৬।২৪

যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, ইন্দ্রিয়ের বশে, বাসনা-কামনার বশে চালিত না হইয়া সামাজিক, নৈতিক বা বুদ্ধিগত আদর্শ ও ধর্ম্ম অনুসারে, প্রতিষ্ঠিত নীতি ও শাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহাদের প্রতি গীতার বাণী হইতেছে যে, এই পন্থা অনুসরণ করিতেই হইবে এবং ঠিক মত

ইহা অনুসরণ করিতে পারিলে ইহা মানুষকে অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়—কিন্তু এইটিই জীবনের সমগ্র ও চরম সত্য নহে। মানসিক প্রকৃতির উর্দ্ধে মানুষকে অধ্যাত্ম প্রকৃতির অমৃত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এবং সে জন্য প্রয়োজন হইতেছে মন-গড়া সকল নীতি ও ধর্ম্মের উর্দ্ধে উঠিয়া সকল প্রকার অহংভাব বর্জ্জন করিয়া, সকল জীবের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত যুক্ত হওয়া এবং সেই আত্মার ঐক্যে বাস করা। পঞ্চম অধ্যায়ে গীতা এইরূপে আত্মার সহিত, ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবার কথাই বিশেষ ভাবে বলিয়াছে। কোন বাহ্য নীতি বা ধর্ম্ম অনুসারে, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করাই চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে—আত্মা কিছু করিতেছে না, প্রকৃতিই সব করিতেছে, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ত্রিগুণাতীত হইয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—এই ভাব লইয়া যে-কোন কর্ম্মই করা যাক না কেন তাহাতে আর পাপ হয় না (৫।১০)।

আর যাহারা সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করে, আত্মার মধ্যে উর্দ্ধতর অধ্যাত্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইয়া জীবনকে, কর্ম্মকে একেবারে বাদ দিতে চায়, অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের নীরব নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে জীবত্বের ও ব্যষ্টিসত্তার সম্পূর্ণ লয় করিতে চায়, তাহাদের প্রতি গীতার বাণী হইতেছে যে, অনন্তের মধ্যে যাইবার এইটিও একটি পথ বটে, তবে ইহা হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পথ (৫।২,৬), দৃষ্টান্ত বা উপদেশের দ্বারা নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ প্রচার করা বিপজ্জনক, এই পথ মহান হইলেও ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, এই জ্ঞান সত্য হইলেও ইহা সমগ্র জ্ঞান নহে (২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ভগবানকে শুধু নিশ্চল নীরব নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানাই সব নহে, তাঁহাকে সকল যজ্ঞ কর্ম্মের ভোক্তা, সকল জীবের নিয়ন্তা ঈশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদরূপে জানিয়া দেহ, প্রাণ, হৃদয়, মনের সকল ক্রিয়ায় সকল ভাবে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই মানুষ পরম শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করিবে (৫।২৯)।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

অন্বয়—যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ সোঢ়ুং শক্নোতি সঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী নরঃ।

অনুবাদ—যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহলোকেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী মানব।

ব্যাখ্যা

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং। বাহ্য বিষয়সুখের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মানুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে—কিন্তু শুধু ইহার দ্বারাই উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যায় না। দুঃখের ভয়ে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া তামসিকতা, তাহার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। শান্ত ভাবে, অনাসক্ত ভাবে সংসারের সকল দুঃখের স্পর্শ গ্রহণ করিবার শক্তি চাই, গীতার মতে এই সমতাই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি।

ইন্দ্রিয়সকলের ভিতর দিয়া আমাদের মন জগৎকে যে ভাবে দেখে, গ্রহণ করে, সেইটিই হইতেছে আমাদের সাধারণ মানব জীবন—তাহার স্বরূপই হইতেছে সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ, জন্ম মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পূর্ণ। এই দ্বন্দ্বময় জীবনে আমাদের অন্তরাত্মা আনন্দ পাইলেও এইটিই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বা চরম সম্ভাবনা নহে—আমাদের যাহা প্রকৃত জীবন তাহার ভিত্তি রহিয়াছে ভিতরে, বাহিরে নহে, নেদং যদিদমুপাসতে। সংসারে জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ দেখিয়া মানুষ যদি এই বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণ হয়, ভিতরের দিকে ফিরিতে পারে তাহা হইলে এইরূপ তামসিকতাও অধ্যাত্ম জীবনের সূচনারূপে বিশেষ সহায়প্রদ হইতে পারে—সেই জন্য গীতা ইহারও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (১৩।৯)। এইভাবে বুদ্ধের সাধনার সূচনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তবে এইরূপ সংসারত্যাগ যে করিতেই হইবে এমনও কোন কথা নাই—সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়াও মানুষ সংসারে থাকিয়াই (ইহৈব) তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস করিতে পারে এবং গীতার মতে প্রকৃত অধ্যাত্ম-সাধনার আরম্ভ হইতেছে এইখানে, সংসারের সকল সুখ দুঃখ, সকল বেগকে সমান ভাবে সহ্য করিতে অভ্যাস করা। সংসারের সকল দুঃখ ও কষ্ট হইতে সরিবার একটা প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, বস্তুতঃ ইহা হইতেছে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, উপনিষদের ভাষায় জুগুপ্সা। অন্যদিকে সকল বাধা, সকল দুঃখকে জয় করিবারও প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, এইটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তির পথ, সিদ্ধির পথ—গীতা অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিকে লক্ষ্য

করিয়া এই প্রবৃত্তিটিকেই উৎসাহিত করিয়াছে, কাম ক্রোধকে জয় কর, সুখ দুঃখকে সমানভাবে সহ্য কর—ইহাই মুক্তির পন্থা।

কিন্তু মানুষ কি ইচ্ছা করিলেই সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করিতে পারে, সুখের প্রতি কামনা, দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে পারে? প্রথমে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির বিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুখ দুঃখের দ্বারা, কাম ক্রোধের দ্বারা আমাদের জীবনের কতকগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, তাই সেগুলি রহিয়াছে—কিন্তু এসব আদৌ নিত্য বস্তু নহে, অবশ্যম্ভাবীও নহে। কোন বাহ্য স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে আমরা বাধ্য নই, তেমনই কোন স্পর্শে দুঃখ অনুভব করিতেও আমরা বাধ্য নই—কেবল অভ্যাসের বশেই আমরা কোন জিনিষে সুখ কোন জিনিষে দুঃখ অনুভব করি—এই অভ্যাস বর্জ্জন করা যায়, এমন কি যেখানে আগে সুখ পাইতাম তাহাতেই দুঃখ পাইতে পারি, যাহা হইতে দুঃখ পাইতাম তাহা হইতেই সুখ পাইতে পারি। আবার, আমাদের অন্তরে আনন্দময় আত্মা যে সংসারের সব কিছুর স্পর্শেই আনন্দ উপভোগ করে, আমাদের বাহ্য চৈতন্যকেও তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া সব-কিছুতেই আমরা সমান আনন্দলাভ করিতে পারি—আর এইটি হইতেছে সমতা অপেক্ষাও বড় জয়, কারণ, ইহার দ্বারা আমরা সুখ দুঃখকে কেবল সহ্য করি না, পরন্তু তাহারা যে আনন্দের অপূর্ণ রূপ ও বিকৃতি সেই আনন্দই আমরা লাভ করি।

সুখ দুঃখ যে অবশ্যম্ভাবী নহে, সুখই দুঃখ হয়, আবার দুঃখই সুখ হয়—মনের ব্যাপারে ইহা সহজেই বুঝা যায়। জয় পরাজয়ে, মান অপমানে আমরা সাধারণতঃ বিচলিত হই, কিন্তু অভ্যাস করিলে এই দুইকেই আমরা সমানভাবে অগ্রাহ্য করিতে পারি। কিন্তু শরীরের ব্যাপারে এইরূপ করা তত সহজ নহে, প্রাণের ব্যাপারেও নহে—কাম, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে আমাদের হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে নাচিয়া উঠে, সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, এ-সব যেন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। চিনি যেমন মিষ্ট লাগিবেই, তেমনই আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় পুরুষের কাছে অপমান, অশুভ, পরাজয় এ সব দুঃখ উৎপাদন করিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের মনে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই, পরাজয়, অপমান, ক্ষতি, এ-সবই সে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি এ সবকেও সে পূর্ণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। তাই মানুষ দেখে যে,

সে যত দেহ, প্রাণের প্রতিক্রিয়াতে সায় দিতে অসম্মত হয়, সে-সবের বশে পরিচালিত হইতে না চায়, ততই সে অধিকতর মুক্ত হয়। এইভাবে মানুষ সংসারের সকল আঘাতের উপর জয়ী হইতে পারে, তাহাকে আর বাহ্য স্পর্শের অধীন থাকিতে হয় না।

শরীরের ব্যাপারে ইহা সিদ্ধ করিয়া তোলা কঠিন। বাহ্য স্পর্শের বশে চালিত হওয়া শরীরের অলঙ্ঘ্য স্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এখানেও আমরা ঐ একই সত্যের ইঙ্গিত পাই। এখন আমার শরীর যাহাতে কষ্ট পাইতেছে, অভ্যাসের দ্বারা তাহাতেই সুখ পাইতে পারে। এক ব্যক্তি যাহাতে কষ্ট পায় আর এক ব্যক্তি তাহাতে আরাম পায়। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে শরীরের যন্ত্রণা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতি থাকে না—অন্য সময়ে যে ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, যুদ্ধক্ষেত্রে সেইরূপ একাধিক ক্ষত লইয়াও সৈন্যগণ অম্লানবদনে যুদ্ধ করে, হয়ত শরীরের মধ্যে কত বন্দুকের গুলি প্রবেশ করিয়াছে, যোদ্ধার সেদিকে খেয়ালই থাকে না। সাধারণ জীবনেও দেখা যায়, হয়ত কোন অঙ্গ কাটিয়া গিয়াছে আমাদের খেয়ালই নাই, কিন্তু যখনই দেখা গেল রক্ত পড়িতেছে অমনিই পুরাতন অভ্যাসের বশে যাতনা আরম্ভ হইল! কিন্তু এই যে শারীরিক আঘাতে যাতনা বোধ করার অভ্যাস, ইহা অপরিহার্য্য নহে। কোন ব্যক্তিকে hypnotise করিয়া তাহার অঙ্গে সূচ বিদ্ধ করিয়া যদি তাহাকে যন্ত্রণা বোধ করিতে নিষেধ করা যায় —সে যন্ত্রণা বোধ করিবে না; তাহাকে কুইনাইন খাইতে দিয়া যদি বল চিনি খাইতেছে, সে সেই কুইনাইন চিনির মত সুখে খাইবে, আর চিনি দিয়া যদি বল কুইনাইন, সে মুখ বিকৃত করিয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ, হিপ্‌নটিজমের দ্বারা মানুষের অভ্যস্ত বাহ্যচেতনার ক্রিয়া বন্ধ করা হয়,—এই চেতনাতেই মানুষ স্নায়ুমণ্ডলের গতানুগতিক অভ্যাস-সকলের দাস হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহার যে আভ্যন্তরীণ মানস-সত্তা তাহা ইচ্ছা করিলে শরীরের ও স্নায়ুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারে—হিপ্‌নটিজমের দ্বারা বাহ্য-চেতনাকে নিদ্রিত করিয়া সেই আভ্যন্তরীণ মানস-সত্তাকে যেমন বলা হয় সে সেই ভাবেই বাহ্য স্পর্শ সকলকে গ্রহণ করিতে পারে, কারণ, সে কোনরূপ অভ্যাসের বশ নহে। আর হিপ্‌নটিজমের সময় অস্বাভাবিকভাবে আমরা যে সুখ দুঃখ অনুভবের বশ্যতা হইতে মুক্ত হই, অভ্যাসের দ্বারা, সাধনার দ্বারা সাধারণ জীবনে আমরা

নিজেদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে, অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে, ক্রমশঃ ঐরূপ শক্তি লাভ করিতে পারি, শরীরের অভ্যন্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সুখ দুঃখ বোধ, কাম ক্রোধের বেগ সবকেই জয় করিতে পারি ; এবং গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে। এইভাবে যে সমতা লাভ করা যায় তাহাতে আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়, আত্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তখন সংসারের সব কিছুতেই পরম অধ্যাত্ম আনন্দ উপভোগ করা যায়, অমৃতমশ্নুতে।

মন ও শরীরের যে কষ্ট ও বেদনা, এটা হইতেছে প্রকৃতির একটা কৌশল। মানুষকে এই ভঙ্গুর শরীর লইয়া যে-জগতের মধ্যে বাস করিতে হয় সেখানে তাহাকে অনেক স্পর্শ, অনেক আঘাত গ্রহণ করিতে হয়—যে-সব আঘাতে বিপদ আছে, মানুষ যাহাতে সে-সব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে সেই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি মানুষের মধ্যে বেদনা-বোধ দিয়াছে। প্রকৃতির এই প্রবৃত্তিই হইতেছে জুগুপ্সা। মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে, নিজেকে অহংভাবের বশে জগতের অন্য সকল বস্তু ও জীব হইতে পৃথক বলিয়া দেখিতেছে, ততক্ষণ সে বাহ্যস্পর্শের সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়, কুণ্ঠিত হয়, তাহার নিজের সহিত যাহার সামঞ্জস্য হয় না তাহাকে বর্জ্জন করিতে চায়, নিজের পক্ষে যেটি শুভ বলিয়া মনে হয়, আগ্রহের সহিত সেইটি গ্রহণ করিতে চায়, এইভাবে রাগ ও দ্বেষ হইতে কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়, আর তাহাদের বশে মানুষ বাহ্যস্পর্শ হইতে সুখ বা দুঃখ পায়। মানুষের মন যতক্ষণ দেহ ও প্রাণের অধীন ততক্ষণই এ-সবের উপযোগিতা আছে—এই সব অনুভূতি ও বেগের দ্বারাই তাহার জীবন রক্ষা হয়। মন যখন অজ্ঞান ও অহংভাব হইতে মুক্ত হয়, অন্য সকল বস্তু, সকল শক্তির সহিত নিজের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, তখন আর দুঃখ ও বেদনা-বোধের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, সংসারের সব কিছুকেই সে এক ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলিয়া মুক্তভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে, শুধু নিজের ক্ষুদ্র "আমি"র স্বার্থের কথা না ভাবিয়া প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যে রস রহিয়াছে (ভগবানই রস রূপে বিরাজ করিতেছেন) তাহাকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে—তখন সংসারের সব সুখ, দুঃখ, অনমুভবতা এক অনির্ব্বচনীয় অসীম আনন্দধারায় পরিণত হয়।

মানব জীবনে যে অশেষ দুঃখ রহিয়াছে, ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন এই সব দুঃখেরই অন্ত হইবে। ইহা সম্ভব, কারণ—সুখ ও দুঃখ দুইই

হইতেছে স্বষ্টিতে যে আনন্দ-স্রোত বহিতেছে তাহারই দুইটি ধারা—সুখ হইতেছে ঐ আনন্দেরই একটি অপূর্ণ রূপ, এবং দুঃখ হইতেছে উহারই একটি বিকৃত রূপ। এই যে অপূর্ণতা ও বিকৃতি, ইহার কারণ হইতেছে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া—এই অজ্ঞানের বশে মানুষ নিজের আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, জগতের সব-কিছুর মূলে যে এক সর্ব্বব্যাপী আত্মা রহিয়াছে, সে আত্মা তাহার নিজেরও আত্মা, তাহা ভুলিয়া সে নিজেকে সংসারের আর সব বস্তু, সব জীব হইতে স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করে, এবং বাহ্যজগতের সকল স্পর্শকে উদারভাবে গ্রহণ না করিয়া সঙ্কীর্ণ অহংভাবের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করে। যে-ব্যক্তি সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, সে সংসারের সকল বস্তু, সকল স্পর্শের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আনন্দের আস্বাদ পায়। সংস্কৃত ভাষায় এই অন্তর্নিহিত আনন্দকে সাধারণভাবে রস নামে অভিহিত করা হয়—সব কিছুর মধ্যে সচ্চিদানন্দ ভগবানই হইতেছেন এই রস, রসো বৈ সঃ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল বিষয়ের মধ্যে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহা সচ্চিদানন্দ ভগবানেরই বিভূতি, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, জলের মধ্যে রস আমি, পৃথিবীতে যে পুণ্য গন্ধ তাহাও আমি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে মূলগত আনন্দ রহিয়াছে তাহা সচ্চিদানন্দেরই আনন্দ—আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা ভগবানেরই স্পর্শ পাই, আনন্দের স্পর্শ পাই—কিন্তু এই আনন্দ সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষে পরিণত হয়, কারণ আমরা এই স্পর্শকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, অজ্ঞান ও অহংভাবের ভিতর দিয়া খণ্ডিত ও বিকৃত করি। প্রকৃত পক্ষে ইহাই মায়া, অবিদ্যা। বস্তু-সকলের মূল সত্তার, রসের সন্ধান আমরা করি না, আমরা কেবল দেখি তাহাদের স্পর্শে আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের কি লাভ ক্ষতি হইবে,তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনা কতটা পূর্ণ হইবে বা ব্যাহত হইবে—সেই জন্যই রস সুখ দুঃখের বিকৃত রূপ গ্রহণ করে। যদি আমরা আমাদের মনে ও হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরহং নিঃস্বার্থ হইতে পারি, রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রাণ ও স্নায়ুমণ্ডলকেও সেইরূপ সমতায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঐ অপূর্ণতা ও বিকৃতিকে দূর করা সম্ভব হয় এবং অখণ্ড আনন্দকে তাহার সকল বৈচিত্র্যে উপভোগ করা আমাদের আয়ত্তাধীন হয়। কাব্য ও চারুকলায় আমরা যে অখণ্ড

রস পাই, সুখ দুঃখ, সুন্দর ভীষণ, পাপ পুণ্য, শুভ অশুভ সবই কাব্যরসের বিচিত্ররূপ বলিয়া অনুভব করি তাহাতে আমরা কতকটা এই সামর্থ্যেরই পরিচয় পাই। আর ইহাব কারণ হইতেছে এই যে, এখানে আমরা অনাসক্ত, নিঃস্বার্থ, নিজেদের শুভাশুভ বা আত্মরক্ষার কথা না ভাবিয়া বস্তুটির এবং তাহার অন্তর্নিহিত সত্তার কথাই ভাবি। অবশ্য এই যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ—ইহা সেই অধ্যাত্ম আনন্দের আস্বাদন হইতে ভিন্ন জিনিষ, কারণ অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে দুঃখ, ভয়, ঘৃণা এ-সবের স্থান নাই; তবু মুক্ত আত্মা কিরূপে সকল বস্তুর মধ্যেই রস পায়, অহংভাবের বশে আমরা যেথানে শুধু দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা দেখি তাহার মধ্যেই সুসামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য দেখে, তাহার কতকটা আভাস এইখানে পাওয়া যায়। পূর্ণ মুক্তি তথনই আসিবে যথন আমাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সবই আসক্তি হইতে, রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইবে অথচ সংসারে সব কিছুর সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিবে,

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥—গীতা ২।৬৪ ॥

আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি রহিয়াছে তাহা জগতের স্পর্শ-সকলকে ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারে না, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হয়—ইহাই হইতেছে দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ, আর ইহার মূল হইতেছে অহংভাব হইতে উদ্ভূত অসমতা। আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে, সচ্চিদানন্দ ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞান, আমরা অহংভাব লইয়া সব কিছুকে দেখি, ধরিতে যাই—সেই জন্যই অশেষ দুঃখ পাই। অতএব আমাদের প্রকৃতি হইতে দুঃখকে নির্ম্মূল করিতে হইলে আমাদিগকে জুগুপ্সা বা আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তির বশে পদে পদে ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে তিতিক্ষার দ্বারা সংসারের সকল স্পর্শ, সকল আঘাতকে গ্রহণ করিতে, সহ্য করিতে, জয় করিতে হইবে। এইরূপ সহিষ্ণুতা ও জয়ের দ্বারা আমরা যে সমতা লাভ করিব—তাহার স্বরূপ হইতে পারে সকল স্পর্শের প্রতিই সমান উদাসীনতা অথবা সকল স্পর্শেই সমান আত্ম-প্রসাদ। আবার এই সমতার ভিতর দিয়াই আমরা ইহার অধ্যাত্ম ভিত্তি-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে পারিব, সে চৈতন্যের স্বরূপই হইতেছে আনন্দ, তাহা আমাদের অহং-চৈতন্যের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করে না। এই যে সচ্চিদানন্দ-

চৈতন্য, ইহা জগতের উর্দ্ধে, বিশ্বাতীত হইতে পারে—এই উর্দ্ধস্থিত, দূরবর্ত্তী আনন্দের মধ্যে যাইবার পথ হইতেছে সংসারের সব কিছুর প্রতি সমান উদাসীনতা ; সন্ন্যাসিগণ এই পন্থাই অনুসরণ করেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-চৈতন্যের ঐটিই একমাত্র পদ নহে, উহা একই সঙ্গে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত হইতে পারে ; আর এই যে আনন্দ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সব কিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে উঠিবার পন্থা হইতেছে আত্ম-সমর্পণ, বিশ্বভাবের মধ্যে ক্ষুদ্র অহংভাবের বিলয় এবং সর্ব্বত্র সমান আনন্দের উপলব্ধি। এইটিই ছিল প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের পন্থা ; গীতার মধ্যে এবং শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine গ্রন্থে আমরা এই পন্থারই সন্ধান পাই।

প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ—কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিয়া, সংসারের সকল স্পর্শ, সকল আঘাতে অবিচলিত থাকিয়া যে সমতা ও অখণ্ড আনন্দলাভ করা যায়, গীতা বলিয়াছে মৃত্যুর পূর্ব্বেই, প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ, সেই মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে। সন্ন্যাসিগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের মত যতক্ষণ এই দেহ আছে, ততক্ষণ পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নহে। তাঁহারা এই দেহটাকে স্বরূপতঃ অশুচি এবং আত্মার বন্ধন স্বরূপ, কারাগার স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের মতে অবিদ্যা ও অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞানই সংসারের সকল দুঃখের মূল, সংসারের মূল—আর এই অশুচি দেহে শুচিতা জ্ঞান হইতেছে ঐ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ! মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার টীকায় বলিয়াছেন, "অশুচি (অপবিত্র) পরম বীভৎস অতিশয় ঘৃণিত যে শরীর তাহাতে শুচিতাজ্ঞান যথা—এই কন্যা অভিনব চন্দ্রলেখার ন্যায় কমনীয়া, ইহার অবয়বগুলি যেন মধু অথবা অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত, যেন এ চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আসিয়াছে, নীল কমল পত্রের ন্যায় আয়তনয়না এই কন্যা হাবভাবযুক্ত লোচনদ্বয়ে যেন জীবজগৎকে আনন্দময় করিতেছে—এই প্রকারে অশুচিতে শুচিতাজ্ঞান হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ ?"

বস্তুতঃ শরীরটাকে অধ্যাত্মজীবনের পরম প্রতিবন্ধকস্বরূপই মনে হয়, শরীরের দাবী মিটাইতে গিয়া মানুষ আত্মার সন্ধান করিতে পারে না, শরীরের স্থূলভোগের মধ্যে তাহার সূক্ষ্ম কোমল বৃত্তি সকল বিকশিত হইতে পায় না। তাই প্রায় সকল ধর্ম্মই শরীরটাকে অভিশাপ দিয়াছে, মায়াবাদীরা ত ইহার

অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছে, বলিয়াছে জড় শরীর সত্য নহে, জড় জগৎই সত্য নহে—অবিদ্যা বা মায়ার বশেই মানুষ এ-সবকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া আসক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মতে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ ও পরীক্ষাই হইতেছে এই শরীরটাকে অগ্রাহ্য করা, ইহার মধ্যে সাময়িক জীবনটা কোন রকমে অতিবাহিত করিয়া পূর্ণ মুক্তির জন্য শরীর ত্যাগের অপেক্ষা করা। শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ এই ভাবেই গীতার 'প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাক্" শব্দের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে "পূর্ব্বে"; শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে এই অশুচি শরীরের মধ্যেই পূর্ণ অধ্যাত্মজীবন ও মুক্তিলাভ করা যায় এ-কথা সন্ন্যাসিগণ স্বীকার করিতে পারেন না—তাই তিনি "প্রাক্" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "পর্য্যন্ত"—"যে ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কামক্রোধের বেগ সহন করিতে সমর্থ হয়; মরণ পর্য্যন্ত সীমা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ দেহধারী জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী; কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত। সুতরাং আমরণ উহাকে বিশ্বাস করিবে না।" এই বিশ্বাসঘাতক শরীরটাকে জব্দ করিবার জন্য সমাজ যে কত বিধিনিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছে তাহার অন্ত নাই; তাই মানুষের আত্মা হাঁফাইয়া উঠিয়া এই দেহটাকে পরম শত্রু স্বরূপ জ্ঞান করে এবং ইহার জীবনকে একেবারেই ছাড়িয়া যাইতে চায়। কিন্তু বৈদিক যুগে সমাজের বিধিবন্ধন এত কড়া হইয়া উঠে নাই, তখনকার মানুষ এই জড় দেহ ও জড় পৃথিবীকে শত্রু বলিয়া মনে করিত না, বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে মাতা বলিয়া এবং স্বর্গকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিগূঢ় শিক্ষা আমাদের বোধগম্য হয় না। আমরা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন কল্পনা করিতে পারি না, হয় জড়বাদের বশে স্বর্গকে অস্বীকার করি, অথবা মায়াবাদের বশে এই পৃথিবী ও পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করি।

কিন্তু গীতা তাহা করে নাই, গীতা সেই প্রাচীন বৈদিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া জোরের সহিতই বলিয়াছে মরণের পূর্ব্বে এই দেহেই চরম মুক্তি লাভ করিতে হইবে, সেই জন্যই গীতা এখানে 'প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ' কথাটিকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য "ইহৈব" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। বস্তুতঃ শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন "আমরণ" মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তাহাতে গীতার এই শ্লোকটি

অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে শরীরপাতের সময় পর্য্যন্ত কাম-ক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে হইবে, তবেই মানুষ সুখী হইবে—শ্রীধর টিপ্পনী করিয়াছেন, "কেবল ক্ষণমাত্র সহ্য করিলে হইবে না, দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।" তাহা হইলে যতক্ষণ না মৃত্যু আসিতেছে ততক্ষণ এই শ্লোক অনুযায়ী আমি কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারিব কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাহা হইলে এ-জন্মে ত কাহারও পক্ষেই যোগী হওয়া, সুখী হওয়া সম্ভব নহে—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যদি মানুষ কামক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে পারে তবেই অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরকালে সে সুখী হইবার আশা করিতে পারে। কিন্তু গীতা এখানে স্পষ্ট বলিতেছে, ইহৈব, এই সংসারে এই দেহেই যোগ ও সুখলাভ করিতে হইবে। অতএব শঙ্কর প্রভৃতির ঐরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। গীতার এই শ্লোকটির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা হইতেছে,—যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগকে জয় করিয়াছে সেই যোগী এবং সেই সুখী।

শঙ্কর প্রভৃতির মতে এ-জীবনে এরূপ সুখের কোনই সম্ভাবনা নাই। শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "মরণ পর্য্যন্ত সীমা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত। সুতরাং আমরণ উহাকে বিশ্বাস করিবে না।" অতএব শঙ্করের মতে এই দেহের মধ্যে থাকিয়া জীবিতাবস্থায় কাহারও পক্ষেই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জয় সম্ভব নহে, যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহাদিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা নিজের উপর সজাগ পাহারা দিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কাম ক্রোধের অসংখ্য নিমিত্ত রহিয়াছে সেখানে বাস করিয়া আমরণ কয়জন ব্যক্তি এইরূপ সতর্ক জীবন যাপন করিতে পারে? তাই শঙ্করের ব্যবস্থা, যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চান তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতেই হইবে, এ-সব হইতে যত দূর সম্ভব দূরে থাকিয়াই অধ্যাত্ম-সাধনা করিতে লইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতা বার বার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে, এই দেহের মধ্যে থাকিয়া এই জীবনেই সম্পূর্ণভাবে কাম ও ক্রোধকে জয় করা যায়, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় (২।৫৫-৭২)। বুদ্ধিকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া ইহ সংসারেই পাপ ও পুণ্যের অতীত হওয়া যায়, মুক্ত হওয়া যায়,

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। ২।৫০

আর যে ব্যক্তি এইভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন তাঁহার আর পতনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই সংসার ছাড়িয়া, এই দেহ ছাড়িয়া যাইতে হয় না, পরন্তু মানুষ এখন যে অজ্ঞানের মধ্যে, অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে ইহার ঊর্দ্ধে অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠাকেই গীতা ব্রাহ্মী স্থিতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ইহা একবার লাভ করিতে পারিলে মানুষকে আর কখনই কামক্রোধের বেগের মধ্যে, মোহের মধ্যে পতিত হইতে হয় না,

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। ২।৭২

আত্মোপলব্ধির দ্বারা আমরা ব্রহ্মকেই আমাদের প্রকৃত আত্মা বলিয়া অবগত হই, তখন আমরা যে দিব্য শক্তি লাভ করি তাহা আমাদিগকে সাধারণ মানব জীবনের সকল ত্রুটি, দুর্ব্বলতা, মোহ ও দুঃখের ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, এই দেহেই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হই; জগতের সকল জীবে, সকল ঘটনায় এক ব্রহ্মকে দেখিয়া আমরা এই-সবের ঊর্দ্ধে দিব্য জীবনের অসীমতা, সর্ব্বজয়ী শক্তি, সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতি, শুদ্ধ পরমানন্দ লাভ করি।

কেন উপনিষদেও বলা হইয়াছে, এই মহান সিদ্ধি এই মর জগতে, এই দেহেই লাভ করিতে হইবে,

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।—কেন ২।৫

"যদি ইহ জীবনে সেই জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা হইলেই মানুষ তাহার প্রকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহ জীবনে যদি সে জ্ঞান লাভ করা না যায় তাহা হইলে মহান অনর্থ হয়।" কারণ, তাহা হইলে আমরা দেহ, প্রাণ, মনের বাহ্য জীবনেই বদ্ধ থাকি, এই জীবনের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের অনিত্য সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঊর্দ্ধের যে সত্য অতি-মানস জীবন তাহার মধ্যে আমরা উঠিতে পারি না। এটা মনে করা ভ্রান্তি যে ইহ জীবনে আমরা যদি সেই জ্ঞান লাভ করিতে না পারি, মৃত্যু আমাদিগকে

অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সহজ লোকে লইয়া যাইবে, সেখানে আমরা সহজেই সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিব। কেবল যাঁহারা তাঁহাদের জাগ্রত বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বভূতের মধ্যে এক অদ্বিতীয় অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্মের সন্ধান পান তাঁহারাই এই মর্ত্ত্যজীবনের উর্দ্ধে অমৃতত্ব লাভ করেন।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং—কাম ও ক্রোধ হইতেছে মানুষের পরম শত্রু, ইহারা যে শুধু আত্ম-জ্ঞান ও অধ্যাত্ম জীবনলাভের পরিপন্থী তাহা নহে, সাধারণ জীবনেও ইহাদিগকে সংযত করিতে না পারিলে মানুষকে অশেষ দুঃখ পাইতে হয়। ইহাদিগকে জয় করা কঠিন। তবে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত প্রযত্ন করিলে ইহাদের বেগ সম্বরণ করা যায়, এই দেহেই ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায়, এবং যাঁহারা তাহা করিতে পারেন তাঁহারাই যোগী, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী।

বাংলা ভাষায় "কাম" শব্দ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলন-কামনা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা কামনার একটি তীব্র রূপ। কিন্তু সকল বাসনা কামনাই মানুষকে বিপথগামী করে, সে-সবেরই বেগ সহ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অভিলষিত সুখকর বস্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে অথবা শ্রুত হইলে কিংবা পূর্ব্বে অনুভূত ছিল বলিয়া কোন কারণ বশতঃ স্মরণপথে উপস্থিত হইলে, তাহার উপর যে গর্দ্ধি অর্থাৎ তৃষ্ণা হয়, তাহারই নাম কাম। যে-সকল বস্তু দুঃখহেতু, নিজের প্রতিকূল, সেই সকল বস্তুর দর্শন, শ্রবণ বা স্মরণ হইতে ঐ সকল বস্তুর উপর যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্রোধ বলা যায়। সেই কাম ও ক্রোধ হইতে যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ বলা যায়। শরীরে রোমাঞ্চ, হৃষ্টনেত্র ও হৃষ্টবদন প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্য অনুমিত হয়, তাহারই নাম কামোদ্ভব বেগ। শরীরে কম্প, প্রস্বেদ, অধরোষ্ঠের দংশন, আরক্ত নেত্র প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্য অনুমিত হয়, তাহাকে ক্রোধোদ্ভব বেগ কহা যায়। যে-ব্যক্তি সেই কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগকে সহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই যুক্ত (অর্থাৎ যোগী) এবং ইহলোকে তিনিই সুখী।"

কাম ক্রোধ হইতেছে প্রকৃতির কৌশল; ইহার দ্বারা প্রকৃতি জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, রজোগুণের ক্রিয়া দ্বারা জীবের প্রকৃতিগত তমোগুণকে দমন করে, নতুবা সৃষ্টিই লোপ পাইবে। কামোপভোগে তীব্র সুখ আছে,

ইহাই মানুষকে জীবন-লীলায় আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই কামোপভোগের জীবনে মানুষের সহিত পশুর বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। আর যদিও পশুরই ন্যায় মানুষের দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় আছে তথাপি এই সবকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই—এই স্থূল আধারের মধ্যে, দেহের মধ্যে মানুষকে এক ঊর্দ্ধতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে, এই দেহ ও প্রাণের পাত্রেই স্বর্গের সুধা পান করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে অমৃতত্ব, মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, কারণ ইহারা আমাদের চৈতন্যকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দেহের পাশবিক জীবনের মধ্যেই বদ্ধ করিয়া রাখে। দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশে যাহা এককালে সহায় ছিল, ঊর্দ্ধতর বিকাশের জন্য তাহাই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া নির্ম্মম ভাবে তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

ইচ্ছা করিলে মানুষ যে কাম ও ক্রোধের বেগ সহন করিতে পারে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পরিণাম চিন্তা করিয়া সকল মানুষই এই দুইটি প্রবল রিপুকে অনেকখানি সংযত রাখে, এই খানেই পশুর সহিত মানুষের প্রভেদ; পশুর এই সহন শক্তি নাই, প্রকৃতির কোন বেগ আসিলেই সে অন্ধভাবে সেই বেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে; কিন্তু পরিণাম চিন্তা করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মানুষ কর্ম্ম করে, ইহাই মানুষের স্বধর্ম্ম। যে-মানুষ যত প্রকৃষ্ট ভাবে এই সংযম করিতে পারে সে তত উন্নত, সভ্য, পুণ্যবান, সুখী; সেই মানুষই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য।

তবে মানুষ নীতিবুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করিয়া যে কাম ও ক্রোধের বেগ সংযত করে, ইহা অনিশ্চিত। সারা জীবন সংযম অভ্যাস করিয়াও কেহ বলিতে পারে না যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন মুহূর্ত্তে তাহার স্খলন হইবে না। শঙ্কর যে বলিয়াছেন, আমরণ কাম ও ক্রোধকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, যে কোন সময়ে তাহারা প্রবল হইয়া মানুষের সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে পরাভূত করিতে পারে—ইহা খুবই ঠিক। কাম ক্রোধ আমাদের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মনোবুদ্ধির প্রয়াস সকল সময়েই খুব কষ্টকর; বহুদিনের বহু প্রযত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মানুষ নিজ প্রকৃতির মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, কিন্তু এইভাবে তাহা কখনই

সম্পূর্ণ বা নিশ্চিত হয় না। সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে হইলে মন বুদ্ধির উর্দ্ধে যে আত্মা রহিয়াছে তাহাকে লাভ করিতে হইবে। তাহার সহিত যুক্ত হইয়া তাহার শক্তিতেই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করা যায়। এই জন্যই গীতা অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সন্ধান করিতে বলিয়াছে। কিন্তু প্রথম প্রথম আমাদিগকে বুদ্ধি ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে হইবে। যতদিন না অধ্যাত্ম-শক্তি দ্বারা প্রকৃতির সম্পূর্ণ জয় সাধিত হইতেছে ততদিন কাম ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে আমাদের মধ্যে তাহাদের বেগ উৎপন্ন হইবেই—এই বেগ ধারণ করা অভ্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার বশে কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। মধুসূদন সরস্বতী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নানাবিধ কারণে সর্ব্বদা যাহা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, সেই কামক্রোধ-জনিত বেগকে তাহা যখন অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইবে তৎকালেই অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ গর্ত্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই যে যতি ধীর ব্যক্তি, তিমি মৎস্য যেমন নদীবেগে বিচলিত হয় না, সেইরূপ অবিচলিত থাকিতে পারেন অর্থাৎ তাহার অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন না করিয়া তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হন, স এব যুক্তঃ, তিনিই প্রকৃত পক্ষে যুক্ত অর্থাৎ যোগী, স এব সুখী, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুখী, স এব নরঃ, তিনিই প্রকৃত পুরুষ, কেন না তিনি পুরুষার্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মনুষ্য আছে তাহারা কেবল আহার নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুনরূপ পশুধর্ম্মে নিরত থাকে বলিয়া তাহারা মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট পশু ছাড়া আর কি ?"

কিন্তু তাহা হইলে যোগিপুরুষ কি আহারাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার বর্জ্জন করিবেন? সন্ন্যাসিদের ইহাই মত, সকল রকম ইন্দ্রিয়ভোগ বর্জ্জন করা, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা, যতক্ষণ এই শরীরটা আছে ততক্ষণ ইহার রক্ষার জন্য যতটুকু আহার গ্রহণ না করিলে নয় কেবল তাহাই গ্রহণ করা এবং পূর্ণ মুক্তির জন্য এই দেহের পতন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা গীতার শিক্ষা নহে। কেহ যদি এইরূপ সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে চান গীতা তাহাতে আপত্তি করে নাই, বলিয়াছে এইটিও একটি পথ—তবে দেহধারী জীবের পক্ষে এই পথটি সহজ নহে, এবং কঠিন বলিয়া এই পথটি যে শ্রেষ্ঠ তাহাও নহে। গীতার আদর্শ হইতেছে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে সরিয়া

যাওয়া নহে, পরন্তু রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগই গ্রহণ করা। একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া গীতা বলিয়াছে যে, যাহারা উপবাস করে তাহারা ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে রস বা লালসা সেটি থাকিয়াই যায়। যখন ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়সুখে আমরা আসক্ত হই না, বিষয়ের সংস্পর্শ যে ইন্দ্রিয়সুখ দেয় তাহাই কামনা করি না, ইন্দ্রিয়ভোগের বাসনা বর্জ্জন করি, তখনই হয় সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা,

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। ২।৬৪,৬৫

গীতা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছে (২।৭০), সমুদ্র সমস্ত নদীর জল নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু নদীসকলের তীব্র বেগ সমুদ্রে পতিত হইয়াই শান্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা সমুদ্রের মধ্যে বেগের সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না। সমুদ্র অসংখ্য নদীর বেগ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াও যেখানকার সেইখানেই রহিয়াছে, এতটুকুও বিচলিত হয় না। এইভাবে আমাদিগকেও সমস্ত কাম ক্রোধের বেগকে সহ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে, অন্তঃকরণের মধ্যে বেগ উপস্থিত হইলে তাহাতে অবিচলিত থাকিতে হইবে, তাহার বশে কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। সকল প্রকার কাম, ক্রোধ, ভয়, আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং ইহার জন্য প্রয়োজন তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে অভ্যাস করা। তাহাদের কারণ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নির্জ্জন আশ্রমে, মঠে বা পর্ব্বত-গুহায় বাস করিলে আমরা সে অভ্যাসের সুযোগ পাইব না। অতএব গীতা যে সাধনার পথ দেখাইয়াছে, সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। আকর্ষণের বস্তু সম্মুখে থাকিলে তাহা হইতে উদ্ভূত বেগ সহ্য করিবার উপায় কি? মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, বিষয়দোষ-দর্শনাভ্যাসজেন বশীকারসংজ্ঞকবৈরাগ্যেণ, বিষয়-সুখের দোষ-দর্শন অভ্যাস করিলে যে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারাই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়ভোগে যেমন পরিণামে দুঃখ আছে তেমনি, ভোগকালে তীব্র সুখ আছে—অতএব মনের দ্বারা শুধু দোষের দিকটা দেখিলেই আমাদের প্রাণের মধ্যে বিষয়ভোগের যে তীব্র লালসা

রহিয়াছে তাহা দমিত হইবে এমন কোন কথা নাই। এমন কি দুঃখের ভয়ে কোন কিছু বর্জ্জন করাও দুর্ব্বলতা, আর দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অতএব বিষয়দোষ দর্শন হইতে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কাহারও কাহারও পক্ষে প্রথম অবস্থায় তাহা সাহায্যপ্রদ হইলেও—সংসারের সকল দুঃখ, সকল বেগের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই প্রকৃষ্ট পন্থা এবং গীতা অর্জ্জুনকে এই পন্থাই দেখাইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ-ভীমকে বক্ষে চাপিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইভাবে কাম ক্রোধের বেগকে আলিঙ্গন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। গীতা বলিয়াছে, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি, তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহার দ্বারা ব্যথিত হন না, বিচলিত হন না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন না। তিনি জরা মৃত্যু দুঃখের সম্মুখীন হন, সেই সবকে বরণ করিবার জন্য নহে, পরন্তু জয় করিবার জন্য, জরামরণমোক্ষায় যতন্তি। কামক্রোধের বেগ উদ্ভূত হইলে তাহা ঊর্দ্ধতর জীবনের পরিপন্থী বলিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহাদের বেগ সহ্য করা অর্থাৎ তাহাদের বশে কোন কাজ না করা অভ্যাস করিতে হইবে, সাধনা করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসিবে যখন কাম ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহা আর আমাদের মধ্যে কোন বেগ সৃষ্টি করিবে না, তখন আমরা রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়-ভোগের ভিতর দিয়াই পরম আত্মানন্দ উপভোগ করিব। যে ব্যক্তি এই ভাবে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করা অভ্যাস করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "তিনি দুঃখ ভোগ করেন কিন্তু ঘৃণা করেন না, সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমন কি সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে, ইহাও এই সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, কিন্তু সে সবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষ-সিংহের (পুরুষর্ষভ) সত্য সহজাত প্রেরণা। এইরূপে বাধ্য হইয়া প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ দূর করিয়া দেয়; পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট্, সম্রাট্।"

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, গীতা যে নিষ্কামতার শিক্ষা দিয়াছে, ইহা সংসারী মানুষের জন্য উপযোগী নহে, যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবে কেবল তাহাদের পক্ষেই গীতার এই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব। বাসনা কামনার তৃপ্তি লইয়াই মানুষের জীবন, সেই তৃপ্তিই যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তাহা হইলে আর জীবনে থাকিল কি? কাম ক্রোধাদির বেগের বশেই মানুষ কর্ম্ম করে। যদি কাম ক্রোধ নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহা হইলে মানুষ কর্ম্ম করিবে, সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে কিসের প্রেরণায়? কিন্তু গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই সব প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে যে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায় সে-সবই যে পাপ বা বর্জ্জনীয়, গীতা তাহা বলে নাই, যদিও অনেক নীতিবিৎ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনরূপ সুখ ভোগ করাটাই অন্যায়, পাপ, উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবন লাভের পরিপন্থী। সুমিষ্ট খাদ্য আস্বাদন করিয়া, সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া, শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, সুন্দর চিত্র বা সুন্দরী রমণী দেখিয়া চিত্তে যে আনন্দের উদয় হয় তাহাতে কোন পাপই নাই, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না, বরং এই সব আনন্দের ভিতর দিয়াই আমরা আত্মোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হই, কারণ আমাদের আত্মা হইতেছে আনন্দময়, আনন্দই তাহার স্বরূপ, রসো বৈ সঃ। আর বাহিরের যে বস্তুতে আমরা আনন্দ পাই তাহাও ভগবানেরই বিভূতি; গীতায় ভগবান বলিয়াছেন সংসারে শ্রীসম্পন্ন সৌন্দর্য্যময় যাহা কিছু দেখিবে সে-সব তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই তেজ হইতে উদ্ভূত,

যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

গীতা—১০।৪১

সংসারের সব কিছুতেই ভগবান রহিয়াছেন, সকল বাহ্য স্পর্শেই আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সাধারণ মানবের চৈতন্য অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই সে সর্ব্বত্র এই উপলব্ধি পায় না। যেখানে ভগবানের শক্তির বিশেষ প্রকাশ, যে-সব বস্তু বিশেষভাবে সুন্দর, সুশ্রী, আনন্দপ্রদ—সেই সবেই সে ভগবানের কিছু আভাস পায়, স্পর্শ পায়, তাই সে সেই-সব বস্তুতে আনন্দ লাভ করে—অতএব ইহাতে পাপ বা দোষাবহ কিছুই নাই। কিন্তু অজ্ঞান

ও অহংভাবের বশে সে নিজেকে এই সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, সেই সবকে নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্য ধরিয়া রাখিতে চায়, নিজের অজ্ঞ ধারণা অনুযায়ী ভোগ করিতে চায়, ব্যবহার করিতে চায়—এইভাবে তাহার মধ্যে যে কামনার বেগ উদ্ভূত হয় তাহাতে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, মোহ উৎপন্ন হয়, আত্মস্মৃতি নষ্ট হয়, সে হিতাহিত শুভাশুভ জ্ঞানশূন্য হয় এবং এই ভাবেই পাপে লিপ্ত হয়। অতএব এই বেগকে সংযত করিয়া শান্তভাবে সংসারের যে কোন ভোগ-সুখ ইন্দ্রিয়-সুখ গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে পাপ হয় না।

গীতা যে ভোগ-সুখ বর্জ্জন করিতে বলে নাই শুধু তাহাই নহে, গীতা স্পষ্টভাবে ভোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে, অর্জ্জুনকে বলিয়াছে, "যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে এই পৃথিবীকে ভোগ করিবে, অতএব দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যুদ্ধ কর।" গীতা অবশ্য বলিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সংস্পর্শ হইতে যে ভোগ উৎপন্ন হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে তৃপ্তি পান না; কিন্তু তাহার কারণ হইতেছে তিনি চান নির্ম্মল সুখ; আর ইন্দ্রিয়-সুখের সহিত দুঃখ জড়িত হইয়া রহিয়াছে, দুঃখযোনয় এব তে। কিন্তু সে-জন্য ঐসব ভোগ-সুখ বর্জ্জন করা গীতার শিক্ষা নহে, ঐ সব সুখের সহিত যে দুঃখ জড়িত রহিয়াছে তাহার মূল উৎপাটন হইতেছে ঐ করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগই গীতার শিক্ষা। কাম ক্রোধের বেগ দুঃখের মূল, তাই গীতা ঐ বেগকে সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছে।

কিন্তু কামক্রোধের বেগ না থাকিলে মানুষ আদৌ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে কেন? সুখের কামনা যদি না রহিল তাহা হইলে মানুষ কেন সুখের সন্ধান করিবে? নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম, অনাসক্তভাবে ভোগ—এসব কি স্ব-বিরোধী নহে? মানব প্রকৃতিতে কি ইহা সম্ভব? সাধারণ মানুষ সকাম কর্ম্মেই অভ্যস্ত, কামনার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ শুধু তাহার মর্ম্মই সে ভাল রকমে বুঝে, তাই নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্ত ভোগ তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা অজ্ঞান, মোহ—এই মোহ ও অজ্ঞান দূর করাই গীতা-শিক্ষার লক্ষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলে সমস্ত গীতার শিক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ নহে যে, কর্ম্মের কোন লক্ষ্য থাকিবে না, উদ্দেশ্য থাকিবে না। কর্ম্মের অর্থই হইতেছে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি; উদ্দেশ্য না থাকিলে অবশ্য

কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিব সেটা যদি আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ লাভ লোকসান হিসাব করিয়া নির্দ্ধারণ করি তাহা হইলেই সেইটি হয় সকাম কর্ম্ম। প্রশ্ন উঠিবে, মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবে না, শুধুই পরের জন্য সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করিবে—ইহাই কি গীতার শিক্ষা? তাহা হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? বস্তুতঃ ইহাও গীতার শিক্ষা নহে—গীতায় অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিতে বলা হয় নাই, ভগবান বলিয়াছেন, "যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর।" ইহা বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থপরতা নহে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কামনা লইয়া যেমন কর্ম্ম করা চলিবে না, তেমনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবে, ভোগসুখ হইবে বলিয়া কোন কর্ম্ম যে বর্জ্জন করিতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। বস্তুতঃ গীতার শিক্ষার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে না হইবে সেটা নিজের ক্ষুদ্র অহংভাব লইয়া বিচার করিও না, নিজের সুখ দুঃখ বিচার করিয়া কর্ম্ম করিও না, দেখিবে কোন্ কর্ম্মটি তোমার কর্ত্তব্য, ভগবান তোমার নিকট হইতে কোন্ কর্ম্ম চান, সেই কর্ম্মটিই সুচারুভাবে, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে করিবে—ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম, সংসারের সকল লোক সকল অবস্থাতেই এই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা করিতে পারে এবং ইহাই প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভের পন্থা।

অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ তিনি ক্ষত্রিয় এবং কর্ম্ম ও ভোগের অধিকারী। দুইটি মার্গ আছে, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। অর্জ্জুন প্রবৃত্তি মার্গের অধিকারী বলিয়াই তাঁহাকে কর্ম্ম ও ভোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা কোথাও এইভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এইরূপ দুই মার্গের ভেদ করে নাই। আর গীতার শিক্ষা শুধু এক শ্রেণীর লোকের জন্যও কথিত হয় নাই, ইহা সার্ব্বজনীন; সকল লোকের সকল কালের উপযোগী যে শাশ্বত অধ্যাত্ম ধর্ম্ম, গীতায় প্রধানতঃ তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত কোন প্রকার সাধনাকেই গীতা অগ্রাহ্য করে নাই, বলিয়াছে সকল প্রকার সাধনা দ্বারাই আত্মোন্নতি সাধন করা যায়—

* সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ। ৪।৩০

তথাপি গীতার একটি নিজস্ব সাধনা আছে, সকল সাধনার সার সমন্বয় করিয়া গীতা এক বিশেষ সাধনপন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছে, এবং অর্জ্জুনকে এক প্রতিনিধি-মানব রূপে গ্রহণ করিয়া সকল মানবের জন্যই সেই পন্থার ব্যাখ্যা করিয়াছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অগ্রসর; কিন্তু সাধারণ ভাবে এই সংসারই এক বিরাট কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র—এখানে বিনা যুদ্ধে কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, যে-সব আসুরিক শক্তি এখন জগৎকে, মানব-জীবনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহারা বিনা যুদ্ধে মানুষকে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। গীতা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল মানবকেই এই মহান জীবন-যুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছে, এবং আসুরিক শক্তি-সকলকে জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই ধর্ম্মরাজ্যের, স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছে—ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্। কাম ক্রোধই হইতেছে মানুষের শ্রেয়ঃ লাভের প্রধান বিঘ্ন, ইহারা মানুষের শত্রু, ইহারা আমাদের মধ্যে যে ছিদ্র করিয়া দেয় সেই পথেই জগতের আসুরিক ও পৈশাচিক শক্তি সকল আমাদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে অধিকার করিয়া লয়, আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া জগতে তাহাদের আসুরিক ও পৈশাচিক লীলার বিস্তার করে, সেইজন্য গীতা প্রথমেই কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে বলিয়াছে,

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৩।৪৩

অথচ মানবজীবনের একটা স্তরে কাম ও ক্রোধের স্থান আছে, উপযোগিতা আছে। যে-সকল মানব নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রকৃতির অধমগুণ তমোগুণের অধীন রহিয়াছে—তাহারা কাম ক্রোধের দ্বারা চালিত না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, জীবনে প্রবৃত্ত হয় না; এ-অবস্থা মানবাত্মার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, ইহা মানুষকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সহসা এই অবস্থাতে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান সকল তমোগ্রস্ত মানবকেই বলিয়াছেন,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।

অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া গীতা মানুষকে জীবনযুদ্ধে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতেই উপদেশ দিয়াছে, এবং এইটিকেই প্রবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। আর যাহারা রজোগুণের বশে কামক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, অর্জ্জুনের রাজসিক ক্ষত্রিয়

প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা তাহাদিগকেই বলিয়াছে, কর্ম্মেই তোমাদের অধিকার কিন্তু ফলে নহে—কর্ম্ম করিবে কিন্তু ফলকামনায় কর্ম্ম করিও না, কাম-ক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে অভ্যাস কর। তাহা হইলে আমরা কি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিব ? কোন কিছু কামনা করিয়াই ত মানুষ কর্ম্ম করে, কামনা না থাকিলে কিসের জন্য কোন্ কর্ম্ম করিব ? এই প্রশ্নের উত্তরেই গীতা বলিয়াছে, শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম কর ; কামের বশে কর্ম্ম না করিয়া কোন উচ্চ নীতি, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম কর, নতুবা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারিবে না, প্রকৃত সুখও মিলিবে না,

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ১৬।২৩

কিন্তু এইটিও গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নহে, মানুষের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা বা পদ নহে। সে পদ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রবিধিকে, সকল প্রকার মানসিক বিধিনিষেধকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, মন বুদ্ধির উর্দ্ধে যে আত্মা রহিয়াছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম-চৈতন্য হইতে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। সেইজন্যই গীতা কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া, অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপ্রেরণায় সকল কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠ পরিণতি—গীতা এইটিকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছে এবং অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সাধনারই বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করিয়াছে। প্রথম স্তর হইতেছে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বর্জ্জন করিয়া বীরের মত জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ; দ্বিতীয় স্তর হইতেছে কাম-ক্রোধের বেগকে জয় করা। এই দ্বিতীয় স্তরটিকেই নিবৃত্তিমার্গ বলা যায় ; ইহার সহিত প্রবৃত্তিমার্গের যে বিরোধ কল্পনা করা হয়, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মতে ইহা সাধনার পর পর দুইটি স্তর বা অবস্থা। নিবৃত্তিমার্গে উঠিলেই প্রবৃত্তির শেষ হইয়া যায় না, তবে সে প্রবৃত্তি কাম ও ক্রোধ হইতে না আসিয়া ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর স্তর হইতে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎভাবে ভগবান হইতে আইসে ; তখনই হয় দিব্য কর্ম্ম, দিব্য জীবন। ভগবান হইতে, আত্মা হইতে এই যে প্রবৃত্তি আইসে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। ৭।১১

জীবের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাহা বর্জ্জনীয় নহে। গীতায় যে কাম

বর্জ্জনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট কাম, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-ক্রোধই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়; ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছার প্রকাশ, তাহার অনুসরণে পাপ হইতে পারে না।

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম বলিতে অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যদি কামোপভোগ করে তাহাতে কোন পাপ হয় না। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা নহে, স্বামী-স্ত্রীও যদি কামের উত্তেজনায় যৌন সংসর্গ করে তাহা হইলে তাহাদের পাপই করা হয়, তাহাদের উর্দ্ধগতি ব্যাহত হয়। রামকৃষ্ণ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসংসর্গের দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দুটো ফুল ফেলে দিলেই কি শুদ্ধ হয়ে যায়?" অর্থাৎ, মন্ত্রপাঠ করিয়া বিবাহ করিলেই যে স্ত্রী-পুরুষ সকল পাপের দায় হইতে মুক্ত হয় তাহা নহে। কামের বশে যখনই চলা যায় তখনই হয় পাপ, এইজন্যই আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য পশুরা যেমন কামের বশে যৌনসংসর্গ করে নর-নারী যেন সেইভাবে মিলিত না হয়, কারণ তাহাতে তাহাদের উর্দ্ধতর অধ্যাত্ম জীবনবিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং সেই অধ্যাত্ম-জীবন লাভই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স্। 'প্রকৃতিই মানুষের মধ্যে কাম দিয়াছে, মানুষ প্রকৃতির অনুসরণ করিবে তাহাতে দোষ কি? জোর করিয়া কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ যাইতে পারে? প্রকৃতিকে এইভাবে নিগ্রহ করিলে তাহার ফল কখনই ভাল হয় না।'—আজকাল অনেকেই এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া কামকে প্রশ্রয় দেন, ইহা মানবজীবনের, মানবসমাজের পক্ষে অতিশয় অনর্থকর। মানুষ পশুর স্তর হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা মানবত্বের মধ্যে উঠিয়াছে, এখনও তাহার মধ্যে পশুসুলভ অনেক কিছুই রহিয়াছে, কাম ও ক্রোধ তাহাদেরই অন্তর্গত। মানুষের প্রকৃতিতে উর্দ্ধতর সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে। রজোগুণ যেমন মানুষের প্রকৃতির অন্তর্গত, তাহার দ্বারা মানুষের মধ্যে কাম ও ক্রোধের উদ্রেক হয়, তেমনই মানুষের প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণও রহিয়াছে, তাহার দ্বারা মানুষ কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া উর্দ্ধতর জীবনের বিকাশ করিতে চায়—অতএব ইন্দ্রিয়সংযম, কামজয় এ-সব মানব-প্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযম করিলে বস্তুতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না, পরন্তু প্রকৃতির উর্দ্ধতর প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার নিম্নতন পাশবিক

প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে অগ্রসর হয়।

এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ—সংসারের ভোগসুখ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সম্পূর্ণ-ভাবে বর্জ্জন করা নহে; আবার ঐ সবকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাও নহে। যাহারা কামোপভোগকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, কামোপভোগপরমাঃ, গীতা তাহাদিগকে আসুরিক-প্রকৃতিসম্পন্ন মানব বলিয়াছে, তাহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে না (১৬।৭)। প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, পশুর মত কাম উপভোগ না করিয়া এমনভাবে তাহা করিতে হইবে যেন তাহা আমাদিগকে মানবজীবনের যাহা পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা অধ্যাত্মজীবন সেই দিকে লইয়া যায়। অর্থ ও কামকে বর্জ্জন করিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাদের ভিতর দিয়াই মানুষের প্রকৃতির সুবিকাশ হইবে, মানুষ দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহাই চতুর্ব্বর্গ। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার ফলে ভারতবাসী অর্থ ও কামকে বর্জ্জন করিয়া সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতেছিল, ঐরূপ নিবৃত্তিকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, এইভাবে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে গীতা পুনরায় সেই বৈদিক আদর্শের মূল সত্যটি প্রচার করিয়াছে। সংসারকে ত্যাগ করা নহে, সংসারে থাকিয়া সংসারের ভোগসুখ এমনভাবে গ্রহণ করা যেন এই সংসারেই মানুষ দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাল্মীকি রামচরিত্রে ভারতের এই আদর্শটি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন,

ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২২

"রামচন্দ্র ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ ভাবে অবগত ছিলেন, তিনি সমুচ্চ প্রতিভা ও স্মৃতিসম্পন্ন ছিলেন, লোকাচার ও দেশাচারে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সে-সব সম্যক্‌ভাবে অনুসরণ করিতেন।" তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতি গভীরভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম

ও অর্থের দাবী পূরণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক কর্ত্তব্যসকল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া তবে তিনি ভোগসুখ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন, তিনি কখনও অলস থাকিতেন না—

অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ।

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২৭

জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্য যে-সব শিক্ষা প্রয়োজন রামচন্দ্র সে-সবেই সুশিক্ষিত ও বিশারদ ছিলেন,

বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১।২৮

"তিনি সুকুমার শিল্পসকলে পারদর্শী ছিলেন, কেমন করিয়া অর্থ বিভাগ ও ব্যয় করিতে হয় তাহা ভাল রকমেই জানিতেন, তিনি অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন এবং হস্তী ও অশ্বকে শিক্ষিত করিতে জানিতেন।"

রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কশ্চিদর্থং চ কামং চ ধর্ম্মং চ জয়তাংবর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ১০০।৬৩

"হে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ! তুমি কি সুবিচারপূর্ব্বক তোমার সময় ধর্ম্মাচরণ, রাজ্য-শাসন কার্য্য এবং কামোপভোগের জন্য বিভাগ কর?"

অতএব সন্ন্যাসীরা যে কামিনী ও কাঞ্চন একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেন, ইহা ভারতের সনাতন আদর্শ নহে, তাহাদের সুব্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষ বা দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হয়—এই আদর্শই বেদে প্রচারিত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই আদর্শ মলিন হইয়া পড়ায় ভারতবাসী যখন সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে, সন্ন্যাসকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রচার করে, তখন গীতা আবার সেই বৈদিক আদর্শের প্রচার করিয়াছে।

গীতা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিতে বলে নাই, পরন্তু যে-ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ গ্রহণ করিলে তাহা দুঃখ ও বন্ধনের কারণ হয় তাহাই সমূলে বর্জ্জন

করিতে বলিয়াছে। কাম ও ক্রোধের বেগই হইতেছে এই দুঃখ ও বন্ধনের মূল, অতএব তাহা দূর করিতেই হইবে। কাম ও ক্রোধ আমাদের মন প্রাণ ও স্নায়ুমণ্ডলে যে তীব্র বিক্ষোভ উৎপন্ন করে তাহা বেদনাদায়ক, ঐ অশান্ত অবস্থায় কেহই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ লাভ করিতে পারে না, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। পশুর ন্যায় কামোপভোগ করিয়া মানুষ যে সুখ পায় তাহা অতিশয় ক্ষণিক এবং তাহা বেদনার সহিত মিশ্রিত এবং অবিলম্বে তাহা যে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, তাহাতে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অজ্ঞান মানুষ এইটিকেই পরম সুখ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, তাই সে সর্ব্বদা এই বিষাক্ত পাত্র মুখে তুলিয়া লইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পুনঃ পুনঃ সেই বিষ পান করিয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। এই জন্যই গীতা সর্ব্বপ্রথমে কাম ও ক্রোধকে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিতে বলিয়াছে। আসক্তি হইতে, রাগ ও দ্বেষ হইতেই কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়— আসক্তি বর্জ্জন করিলেই কাম ক্রোধ আর আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, তখন রাগ-দ্বেষ-শূন্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় ভোগ গ্রহণ করিয়া আমরা শান্তি ও প্রকৃত আনন্দ লাভ করি (২।৬৪)।

কিন্তু প্রকৃতির বশেই কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়, কাম-ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য হইবে না ইহা কি সম্ভব? মানুষ কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতে পারে? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। মানুষের মধ্যে কাম-ক্রোধের বেগ আদৌ অবশ্যম্ভাবী নহে এবং উহা প্রকৃতির মূলগত কোন সত্য নহে। অভ্যাসের বশেই মানুষ কাম-ক্রোধের অধীন হয়, সাধনা ও প্রযত্নের দ্বারা মানুষ এই অভ্যাস নিশ্চয়ই দূর করিতে পারে, বহু মানবই তাহা করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকেই সাধু ও সচ্চরিত্র বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সুন্দরী যুবতী রমণী সম্মুখে আসিলে পুরুষের মধ্যে যে কামের বেগ উৎপন্ন হয়, সেটা কেবল অভ্যাসের দোষ, পূর্ব্ব সংস্কারের ক্রিয়া। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্বন্ধটাকেই মানুষ বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, তাই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সম্মুখে আসিলে ঐ যৌন ক্ষুধাটাই জাগ্রত হইয়া উঠে। সমাজ যে স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে নিষেধ করে তাহাতে ঐ অভ্যাস ও সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়, কোনরকমে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইলে যৌনচিন্তা দূর

২

করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। রীতিমত সৎ শিক্ষা ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা এই বিকৃতি সম্পূর্ণভাবেই দূর করা যায়।

স্ত্রীলোকের সম্মুখে আসিলেই যে কামভাব উৎপন্ন হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত মা ও বোনের সহিত পুত্র ও ভ্রাতার সম্বন্ধ। সুন্দরী স্ত্রীলোকের চিত্র দেখিলে কামভাবের উদয় হয়, কিন্তু পূর্ণযৌবনা অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতীর চিত্র দেখিয়া, এমন কি সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী শ্যামামূর্ত্তি দেখিয়াও বিন্দুমাত্র কামভাবের উদয় হয় না—কারণ ঐ সময়ে আমরা যৌন চিন্তা করি না, যৌনলালসাকে প্রশ্রয় দিই না। মাতা ও ভগ্নীর সম্মুখে, দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে যে পবিত্র ভাব রক্ষা করা সম্ভব, সকল স্ত্রীলোকের সম্মুখেই সেই ভাব রক্ষা করা যায়, সেই অভ্যাসই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযমের উপায়। প্রকৃতিতে কামভাবের উদয় হইলে কখনই তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই, তদনুসারে কোন কাজ করিতে নাই, যৌন চিন্তা মনে স্থান দিতে নাই—তাহা হইলে আমাদের প্রকৃতি হইতে ঐ সব কু-অভ্যাস ও কু-সংস্কার দূর হইয়া যাইবে, কারণ পুরুষ পুনঃ পুনঃ যে সঙ্কল্প করে, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তদনুসারে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করে, ইহাই শাশ্বত বিধান।

কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশ করিতে হইবে, মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা যে-ভাবে অভ্যাস করা হয় তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না, অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে এবং সেই বিপরীত ফলকে লক্ষ্য করিয়াই আজকাল কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসকে অনিষ্টকর বলিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সংযমে দেহ, প্রাণ, মনের কোনই ক্ষতি হয় না, বরং কাম ও ক্রোধের উত্তেজনায় শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহাই মানুষকে জরা ও ব্যাধি এবং শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবলে লইয়া যায়। চিকিৎসাতত্ত্ববিশারদ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন,

মৃত্যুব্যাধিজরানাশি পীযূষং পরমৌষধম্।
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্বলং সত্যমেব বদাম্যহম্॥

"ব্রহ্মচর্য্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যু বিনাশক অমৃতময় পরম ঔষধ, ইহা মহান্ বল স্বরূপ, এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।"

শান্তিং কান্তিং স্মৃতিং জ্ঞানমারোগ্যং যাপি সন্ততিম্।
যদিচ্ছন্তি মহদ্ধর্মং ব্রহ্মচর্য্যং চরেদিহ॥

"যে ব্যক্তি শান্তি, কান্তি, স্মৃতি, জ্ঞান, আরোগ্য কামনা করেন এবং সুস্থ ও মেধাবী সন্তান কামনা করেন তিনি ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহান ধর্ম্ম পালন করুন।"

কাম ও ক্রোধের উত্তেজনায় স্নায়ুমণ্ডলে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, রেতঃ ক্ষয় হয়, সংযম অভ্যাস করিলে ঐ রেতঃ শরীরের মধ্যে থাকিয়া ওজঃ শক্তিতে পরিণত হয়, তাহার দ্বারা শরীর, প্রাণ, মনের দিব্যশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়, মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ যেদিন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিতে পারিবে সেইদিন সে এই পৃথিবীতে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারিবে, এই দেহেই পরম ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে—

যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি···অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।৬,৭,

কাম ও ক্রোধকে নির্ম্মূল করিবার প্রকৃত উপায় কি? মানুষ কাম ক্রোধের বশে চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না, সেইজন্য সমাজ শাস্তির বিধান করিয়াছে, শাস্তির ভয়ে লোকে কাম ক্রোধকে সম্বরণ করে। কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি সাধন হয় না। সমাজে একটা বাহ্যিক শৃঙ্খলা হয়, তাহার মধ্যে মানুষ সভ্য ও শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ পায়, এইজন্য এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের সার্থকতা আছে। কিন্তু শুধু ইহার দ্বারাই প্রকৃত রোগের প্রতিকার হয় না, মানুষ সমাজকে নানাভাবে ফাঁকি দিয়া কাম-ক্রোধের তৃপ্তি করে—ফলে ব্যক্তির জীবন বা সমাজের জীবন উন্নতির পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না, পুনঃ পুনঃ একটা গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিতে থাকে। তাই যুগযুগান্ত ধরিয়া সমাজ-শাসন সত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ যেরূপ কাম-ক্রোধের অধীন ছিল তেমনিই আছে, ক্বচিৎ কখনও দুই এক জন ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের শাসন সমাজের শাসনকে সমর্থন করিয়াছে, সমাজকে ফাঁকি দিলেও ধর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, পাপ করিলে ইহজন্মে না হউক মৃত্যুর পর নরকে গিয়া কিম্বা পরজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে। এইভাবে সমাজে একটা বাহ্যিক নৈতিকতা ও ধার্ম্মিকতার আবেষ্টন সৃষ্ট হইলেও, ভিতরকার মানুষটি যেমনকার তেমনই থাকিয়া গিয়াছে, তাহার প্রকৃতির মূলগত কোন পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরই হয় নাই। ইহা

হইতেই আবার অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, মানুষ যেমন চিরকাল কাম ও ক্রোধের অধীন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকিবে, মানব-প্রকৃতির, মানব-চরিত্রের কোন রূপান্তর সম্ভব নহে। মানুষকে যদি মুক্তি ও অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দেহ, প্রাণ, মনের প্রাকৃত জীবন ছাড়িয়া যাইতেই হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে ; এই দেহে, এই জীবনেই (প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই—বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫) মানুষকে মুক্ত হইতে হইবে, দিব্য জীবন লাভ করিতে হইবে। তবে সেজন্য লৌকিক, সামাজিক,ধার্ম্মিক বিধিনিষেধ পালনই যথেষ্ট নহে,সেজন্য যোগসাধনার প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবন, নৈতিক জীবন—কোনটিই অধ্যাত্ম-জীবন নহে, এ সবের দ্বারা মানুষ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য কতকটা প্রস্তুত হইতে পারে। পরন্তু যোগসাধনা ভিন্ন অধ্যাত্ম-জীবন লাভ সম্ভব নহে, গীতা তাহারই শিক্ষা দিয়াছে। ইহকালে বা পরকালে দুঃখের ভয়, শাস্তির ভয়, নরকের ভয় দেখাইয়া মানুষকে যে বাহ্যিক ব্যবহারে সংযত করা যায় তাহাতে সমাজের সাময়িক সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু মানুষের প্রকৃতির যে আমূল পরিবর্ত্তন অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। অন্য পক্ষে, বিধিনিষেধের অতিমাত্রতা ও নিগ্রহের ফলে দেহ, প্রাণ, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে আত্মার বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ। পাপের ভয় দেখাইয়া সমাজে বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু ঐ ভয়ই আবার আত্মোন্নতির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কাম ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, তেমনই ভয়কেও বর্জ্জন করিতে হইবে, বীতরাগভয়ক্রোধঃ, কারণ এই তিনটিই হইতেছে আত্মোন্নতির অন্তরায়।

পাপের ভয়ে মানুষ কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুদ্ধে জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা করিলে যে পাপ হইবে তাহার ভয়েই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। পাপ পুণ্যের প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ অগ্রাহ্য করিলে মানুষের কল্যাণ নাই। যে-সব মানুষ কাম ক্রোধের অধীন থাকিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, পাপের ভয়েই তাহারা নিজদিগকে কতকটা সংযত করে এবং এই ভাবেই ঊর্দ্ধতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই পাপের ভয় প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া

গেলে তাহাই আবার ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই গীতা বলিয়াছে, যোগী পাপপুণ্য উভয়কেই বর্জ্জন করেন, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

পাপের যে ভয়, সেটা অজ্ঞানপ্রসূত। বস্তুতঃ পাপ-পুণ্য কি, তাহাদের ফলাফল কি সে-সম্বন্ধে যখন আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হয় তখন আর আমরা বৃথা ভয় পাই না, সজ্ঞানে পাপকে বর্জ্জন করি, পুণ্যময় পথেই অগ্রসর হই। পাপ করিলে তাহার দুঃখময় ফল আছে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু পাপের ফলে নরকে গিয়া পচিতে হইবে এটা কল্পিত কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর নিম্নে নরক বলিয়া এক ভীষণ স্থান আছে, সেখানে পাপীগণকে অশেষ যন্ত্রণা দেওয়া হয়—এ-সব সম্পূর্ণ অজ্ঞানের কথা। লোকে নরকের কথা বিশ্বাস করে বলিয়া গীতাও নরকের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, নরক কেবল একটি রূপক মাত্র, উহা আত্মার অবনতি বা অধোগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতিতে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে জন্তু, জন্তু হইতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে—মানুষ যে-সব নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের কল্যাণে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে। ঐ ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাতেই তাহাকে আরও উচ্চস্তরে উঠিতে হইবে, দিব্য মানব বা অতিমানব হইতে হইবে। যেরূপ আচরণের দ্বারা মানুষের এই উর্দ্ধগতিতে সাহায্য হয় তাহাই পুণ্য, আর যেরূপ আচরণের দ্বারা সে পাশবিকতার মধ্যেই বদ্ধ থাকে অথবা তাহার মধ্যে রাক্ষস বা অসুর ভাবের বিকাশ হয় তাহাই পাপ। কাম ক্রোধ মানুষকে পাশবিক ও আসুরিক ভাবের দিকেই লইয়া যায়, তাই ইহারা পাপ, মানুষকে যে দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে এইগুলি হইতেছে তাহাতে প্রতিবন্ধক, তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ। সমাজের শাসনের ভয়ে নহে, নরকের ভয়ে নহে, পরন্তু জ্ঞানের সহিত উর্দ্ধতর দিব্য জীবন লাভের কামনা লইয়া যদি আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কাম-ক্রোধকে জয় করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই আমরা কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি। কাম ক্রোধকে জয় করিবার জন্য অনেকেই শরীরকে নানাভাবে নিগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলই হয় না, বরং উল্টা বিপত্তিই হইতে পারে। অনেক সময়ে এইরূপ নিগ্রহের ফলে বাধা পাইয়া কাম ক্রোধের বেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে আর সামলান যায় না। কামকে জয় করিবার জন্য অনেকেই পরামর্শ দেন,

স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসিও না, তাহাদের মুখদর্শন এমন কি তাহাদের চিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিও না। কিন্তু এই ভাবে কামের হাত এড়ান যায় না। যতক্ষণ ইহার বীজ আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত থাকিবে ততক্ষণ ইহার উত্তেজক নিমিত্তের অভাব কখনই হইবে না। কথিত আছে প্রাচীনকালে একজন ঋষি মৎস্যের রমণ ক্রিয়া দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। লতাবৃক্ষের মধ্যেও অহরহঃ যৌন ক্রিয়া চলিতেছে; যে-পুষ্পকে আমরা এত পবিত্র বলিয়া দেবতার চরণে অর্পণ করি তাহা হইতেছে লতাবৃক্ষের জননেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া গুহার মধ্যে বাস করিলেও আমাদের অবচেতনা হইতে কামের বেগ উত্থিত হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করিয়া কামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই—আমাদের ভিতরটাকে শুদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহা কেবল আভ্যন্তরীণ সাধনার দ্বারা হইতে পারে, এবং তাহাই যোগসাধনা।

প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে অনেক প্রকার যোগসাধনা প্রচলিত আছে—হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, তান্ত্রিকযোগ। সাধক আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, গীতা সকল প্রকার যোগসাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছে—তবে গীতার যে নিজস্ব যোগ তাহা হইতেছে একটা সমন্বয়। আর আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে এইরূপ একটা সমন্বয়ই উপযোগী। জীবনের অধিকাংশ সময় হঠযোগ ও রাজযোগের আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করা এখন খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। আমাদের এই দেহ, প্রাণ, মন যে গতানুগতিক ভাবে চলিতে বাধ্য নহে, যত্ন করিলে যে ইহাদের মধ্যে অসাধারণ শক্তিসকলের বিকাশ করা যাইতে পারে, প্রাচীন যোগপ্রণালী-সকল তাহা প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তবে তখন যাহা কতকগুলি বিশেষ সাধকের পক্ষেই সম্ভব ছিল, এখন প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে তাহা মানব-সাধারণের পক্ষেই সহজ ও সুলভ হইতে চলিয়াছে। গীতা এইরূপই একটি সহজ ও সুলভ পথ দেখাইয়া দিয়াছে, সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।

মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির খেলায় নিমগ্ন রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে যে ত্রিগুণের খেলা যন্ত্রবৎ চলিতেছে তাহার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে ততক্ষণ সে কাম ক্রোধের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কাম ক্রোধ রজোগুণের

ক্রিয়া। প্রথমতঃ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরে সকল গুণের অতীত হইয়া, আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মানুষ প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহার পূর্ব্বে যে-সিদ্ধি তাহা কেবল সাময়িক ও অসম্পূর্ণ। আমরা যাহাতে অন্তরস্থিত আত্মা সম্বন্ধে জাগ্রত হই, প্রকৃতির সমস্ত খেলা হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি, সেই জন্য গীতা আত্মা ও অন্তঃপুরুষের সন্ধান দিয়াছে এবং তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছে, তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ (৫।১৭); ইহাই জ্ঞানযোগ। আবার কর্ম্মের দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধি হয়, প্রকৃতির রূপান্তর হয়, সেই জন্য যোগিগণ কায় মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা কর্ম্ম করেন (৫।১১)। ইহাই কর্ম্মযোগ। আবার ভগবানকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়া ভালবাসিতে পারিলে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র সাধু হইয়া উঠে (৯।৩০)। ইহাই ভক্তিযোগ। গীতা এই সকল যোগেরই উপদেশ দিয়াছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে হঠযোগ ও রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। সকল প্রকার যোগ-প্রণালী হইতেই সাধক নিজ সামর্থ্য ও প্রয়োজন ও প্রকৃতির গতি অনুযায়ী কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সকল প্রণালীতেই মূলতঃ তিনটি জিনিষ রহিয়াছে। প্রথমেই চাই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা—মানুষ বর্ত্তমানে যে দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবন যাপন করিতেছে ইহাই যে তাহার চরম সম্ভাবনা নহে, ইহা অপেক্ষা এক উর্দ্ধতর জীবন আছে, সেইটি লাভ করাই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স্, এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সকল সময়ে সেই উর্দ্ধতর জীবনের জন্য অভীপ্সা জাগাইয়া রাখা; তাহাই মন ও বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবে, প্রাণের মধ্যে অধ্যাত্ম-অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। মানুষ যেরূপ কামনা করে সেইরূপই হইয়া উঠে, "কামময় এবায়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ কামনাময়; যিনি যেমন কামনা করেন, তিনি তেমনই গতি লাভ করেন। আমরা যদি সর্ব্বদা পাশবিক ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা করি, আমাদিগকে জন্ম মৃত্যু দুঃখের অধীন এই জীবনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে; আর যদি আমরা বলিতে পারি যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্, তাহা হইলে আমরা ইহজগতেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, প্রকৃতির সমস্ত অশুদ্ধ ক্রিয়াকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত বর্জ্জন করা। যখন কাম-ক্রোধের বেগ উপস্থিত হইবে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির

সহায়ে তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে, তাহার বশে কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। যতবার এইরূপ বেগ উত্থিত হইবে, ততবারই তাহা নিবারণ করা অভ্যাস করিতে হইবে, প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কি অশুদ্ধ ক্রিয়া চলিতেছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হইবে এবং বর্জ্জন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ। সর্ব্বদা ভাগবত জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দকে ঊর্দ্ধ হইতে আহ্বান করিতে হইবে, তাহা যেন আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সমগ্র আধারকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

এই তিনটি—ঊর্দ্ধতম অধ্যাত্মজীবন লাভের অভীপ্সা, যাহা কিছু তাহার প্রতিবন্ধক পুনঃ পুনঃ সে-সব বর্জ্জন এবং ভগবানের নিকট ঐকান্তিক ভাবে আত্মসমর্পণ—এই তিনটিই হইতেছে যোগসাধনার মূল তত্ত্ব; আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে বহিরঙ্গ ও গৌণ, আপন আপন প্রয়োজন বা অভিরুচি মত সাধক সে-সবের সাহায্য গ্রহণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। আর এই যে আভ্যন্তরীণ যোগসাধনা, ইহার জন্য বনে বা পর্ব্বতগুহায় যাইবার প্রয়োজন হয় না, সংসারে সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ এই যোগ অভ্যাস করিতে পারে। তবে এই সাধনার অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা না থাকিলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন এবং অজ্ঞান মানুষ শুধু নিজে নিজেই এই সাধনার পথে চলিতে পারে না—এই জন্যই ভারতে প্রাচীন কাল হইতে গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর সাহায্যে অধ্যাত্ম সাধনার ব্যবস্থা আছে। গুরুই আমাদের শ্রদ্ধা ও অভীপ্সাকে দৃঢ় করিয়া দেন, কাম ক্রোধাদি রিপুর বেগকে সংযত করিতে উৎসাহ ও শক্তি দেন, গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই আমরা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ সিদ্ধ করিয়া তুলি। গীতা এই সকল সাধনার বিষয় বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করে নাই। সাধনার মূল তত্ত্বগুলিরই ইঙ্গিত দিয়াছে।

স যুক্তঃ স সুখী নরঃ—দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বেগকে সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই যোগী, সেই প্রকৃত সুখী। কিন্তু এইরূপ লোকের পক্ষে কি আর সাংসারিক জীবন যাপন করা সম্ভব? সাংসারিক জীবন যাপন করিতে হইলে দুইটি জিনিষ অপরিহার্য্য—আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। এই দুইটির জন্যই কি কাম ও

ক্রোধের বেগ আবশ্যক নহে? গীতা যে বলিয়াছে, এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগকে সম্বরণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি ইহাই নহে যে, শেষ পর্য্যন্ত ইহ-জীবনেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে? শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ গীতার এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতা বলিয়াছে, সন্ন্যাসও নিঃশ্রেয়স্ লাভের একটা পথ বটে, কিন্তু ঐটিই একমাত্র পথ নহে, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে কর্ম্মযোগ। গীতা কাম ক্রোধের বেগ হইতে মুক্ত হইয়াই কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে, এবং তাহাই কর্ম্মযোগের পরিপক্ক অবস্থা। গীতার গুরু অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কাম ক্রোধের বশে নহে, যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ; কাম ক্রোধাদি হইতে প্রাণ মন শরীরে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই জ্বর, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ক্রোধের বেগ না থাকিলে কি যুদ্ধ করা, শত্রুকে হনন করা সম্ভব? ক্রোধের দ্বারা আমাদের শরীরের বল বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়, সেই বলেই আমরা শত্রুকে জয় করিতে পারি, ক্রোধ না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? রক্তপাত ও হত্যা করিতে আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বিমুখ; ক্রোধের দ্বারা যে বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহাতেই এই বিমুখতা দূর হইয়া যায়, আমরা উৎসাহের সহিত শত্রুর বক্ষে ছুরিকাঘাত করি। কিন্তু গীতা বলিয়াছে, এইভাবে শত্রু হনন করিলেই তাহা পাপ হয়। মুক্ত পুরুষ এইরূপ কাম বা ক্রোধের বশে কর্ম্ম করেন না, যুদ্ধ করেন না, তাই তাঁহার কোন পাপই হয় না। হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে,—তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্য ফলভোগী হন না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কেহ শত্রু নাই, তাঁহার প্রতি কেহ শত্রুতা আচরণ করিয়াছে বলিয়া তিনি কাহাকেও জয় করিতে বা বধ করিতে চান না, তিনি শুধু দেখেন ঘটনাচক্র কাহাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছে, ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে যাহা সম্পাদিত হইতে চলিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিয়াই কাহারা তাহাতে সাহায্য করিতেছে। "তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ ক্রোধ বা বিদ্বেষ ভাব থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের স্থান নাই। বাধা মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে প্রবৃত্তি অসুরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত পিপাসা রাক্ষসের মধ্যে

আছে (এবং অসুর ও রাক্ষসের প্রভাবের অধীন মানুষের মধ্যেও যে ধ্বংস প্রবৃত্তি ও রক্ত পিপাসা দেখা যায়), তাঁহার ধৈর্য্য, শান্তি এবং সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে-সব অসম্ভব। তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতিই তাঁহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অনুকম্পার বশে রক্তপাত করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহার হৃদয় তাহার স্নায়ু তাহার ইন্দ্রিয়সকল কাতর হইয়া উঠে, মুক্ত পুরুষের এই করুণা তাহা হইতে ভিন্ন জিনিষ, তাহার প্রসারিত চৈতন্যের মধ্যে তিনি সকল জীবকেই গ্রহণ করেন, সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন—এই ঐক্যবোধ ও সহানুভূতিই তাঁহার করুণার ভিত্তি। আর তিনি এই স্থূল শরীরের জীবনটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ বলিয়া মনে করেন না। ইহার উর্দ্ধে যে অধ্যাত্ম জীবন সেই দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখেন, এবং এই শারীরিক জীবনকে কেবল তাহার আধার মাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু ধর্ম্মের স্রোতে যদি যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং যাহাদের শক্তি ও পরের উপর প্রভুত্ব করিবার উল্লাস তাহাকে নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।" —শ্রীঅরবিন্দের গীতা

কিন্তু ক্রোধ যদি না থাকে তাহা হইলে মানুষ যুদ্ধ করিবার শক্তি পাইবে কোথা হইতে? মানুষ যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার শক্তি পায়, সেই জন্যই ত প্রকৃতি তাহার মধ্যে ক্রোধের বেগ দিয়াছে, সেই বেগ দূর করিলে সে কি যুদ্ধ করিবার, আত্মরক্ষা করিবার প্রেরণা ও শক্তি হারাইয়া বিনষ্ট হইবে না? এরূপ প্রশ্ন ভ্রান্ত ধারণা হইতেই উৎপন্ন, যোগের ইহাই একটি বিশিষ্ট কৌশল যে এ-বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি সে দেখাইয়া দিয়াছে, মানুষের সকল কর্ম্ম-শক্তির প্রকৃত উৎস কোথায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। কাম ও ক্রোধ হইতেছে নিম্নতন স্তরের জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রাকৃত কৌশল। পশু হইতেছে তামসিক স্তরের জীব, তাহাদের মধ্যে মন, বুদ্ধি, চৈতন্যের আলোক বিকশিত হয় নাই, যন্ত্রবৎ চালিত না হইলে তাহারা কর্ম্ম করে না, কর্ম্ম করিতে পারে না, তাই প্রকৃতি তাহাদিগকে কাম ক্রোধ দিয়া অন্ধভাবে যন্ত্রবৎ চালিত করে। কোন একটি কল টিপিয়া দিলেই তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়াটি

যেমন অনিবার্য্য ভাবে আপনা হইতেই সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না, পশুগণ কাম ক্রোধের বশে ঠিক সেইভাবেই চলে, কাম বা ক্রোধের উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা অনিবার্য্য ভাবেই তাহার দ্বারা চালিত হয়, এবং এইভাবেই প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের অধিকতর প্রকাশ হইয়াছে, মানুষের আছে হৃদয়, মন, বুদ্ধি—এখানে আর সেই পশু-স্তরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, পরন্তু এখানে তাহা উর্দ্ধতন বিকাশের পরম বিঘ্নস্বরূপ। মানুষের মনুষ্যত্ব হইতেছে এই যে, তাহার সকল কর্ম্মের প্রেরণা আসিবে তাহার বুদ্ধি হইতে। আর যান্ত্রিক ইন্দ্রিয় ভোগে পশু যে সুখ পায়, তৃপ্তি পায়, মানুষের তৃপ্তি তাহাতে নাই, মানুষ চায় হৃদয়, মন, বুদ্ধির উচ্চতর ভোগ, দেহ কেবল তাহার উপলক্ষ্য ও আধার হইতে পারে। অবশ্য সকল মানবের মধ্যেই এই উচ্চভাবের বিকাশ হয় নাই; মানুষ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে যে পশু-স্তর হইতে উঠিয়াছে, তাহার অনেক অভ্যাস ও সংস্কার এখনও তাহার মজ্জাগত রহিয়াছে, তাই সে মনে করে কাম ও ক্রোধ তাহার স্বভাব, তাহার প্রকৃতি। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান, কর্ম্ম ও আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তাঁহারা আর এই নিম্নতন ইন্দ্রিয়ভোগে তৃপ্তি পান না, ন তেষু রমতে বুধঃ।

ক্রোধ হইতে বল বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাহা সাময়িক; শীঘ্রই তাহা প্রতিক্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে, এবং ক্রোধের সময় যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভ হয় তাহাতে মানুষের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না, সে অবস্থায় কোন কর্ম্মই সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইলেও ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করা প্রকৃত কৌশল নহে। পশু নখ-দন্ত লইয়া যুদ্ধ করে, প্রত্যেক পশুর যুদ্ধের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, প্রকৃতি তাহাকে সেই ধারায় যন্ত্রবৎ চালিত করে, অতএব ক্রোধের বেগ হইতে তাহার সাহায্যই হয়। কিন্তু মানুষের যুদ্ধের মধ্যে বুদ্ধির স্থানই অধিক, শান্ত স্থির একাগ্রভাবে যে যুদ্ধ না করিবে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; যে ব্যক্তি ক্রোধে বিচলিত তাহার লক্ষ্য স্থির হয় না এবং শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে, যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ, কাম ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। শক্তি আসিবে ঊর্দ্ধ হইতে। বস্তুতঃ সকল শক্তির মূল

হইতেছে ইচ্ছা শক্তি, Will force. যখন কোন কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি, তখন তাহার সম্পাদনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই প্রয়োজনীয় বল পাওয়া যায়। আর যখন আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির সহিত যুক্ত করি, নিজদিগকে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের যন্ত্র করি, তখন আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎ শক্তি সাক্ষাৎভাবে কর্ম্ম করে, সে-শক্তি সকল শত্রু, সকল বাধাকে জয় করে অবহেলায়, অব্যর্থ ভাবে। কবি বলিয়াছেন,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।

কাম ক্রোধের বিক্ষোভ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া, ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিয়া জগতে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য তাঁহার শক্তিতে তাঁহার যন্ত্ররূপে আমরা যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তখনই তাহা নিখুঁতভাবে, অব্যর্থভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়, তাই গীতা বলিয়াছে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

যেমন ক্রোধ সম্বন্ধে, কাম সম্বন্ধেও সেইরূপ। পশু কামের প্রেরণায় যৌন-সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়; যে-মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে সে ইহাতে তৃপ্তি পায় না, দেহের মিলন, দেহের জীবনটাকেই সে বড় করিয়া দেখে না, সে চায় পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত মনের, আত্মার সহিত আত্মার মিলন—দেহের মিলন সেখানে গৌণ, তাহা কামের উত্তেজনা হইতে আইসে না, তাহা আইসে প্রেমের আনন্দ হইতে। যে কামকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করিয়াছে, সে কখনই এই প্রেমের আস্বাদ পায় না। কামের বশে দেহের মিলনে যে-সুখ তাহা পাশবিক, অতি ক্ষণস্থায়ী, দেহমনের অবসাদজনক, সে-সুখের আদি আছে অন্ত আছে, তাহা মানুষকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। আর প্রেমের বশে মিলনের যে-আনন্দ তাহা এই অশুদ্ধ পাশবিক ইন্দ্রিয়ভোগের বহু উর্দ্ধে, তাহার আনন্দ কখনও ফুরায় না। কবি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন,

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয় !

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ—
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

ইহাই হইতেছে আত্মানন্দের স্বরূপ, তিলে তিলে নূতন হয়, কারণ আত্মা অনন্ত, তাহার আনন্দ-ভোগের বৈচিত্র্যও অনন্ত। আমাদিগকে চলিতে হইবে রাজসিক কামের প্রেরণায় নহে, পরন্তু আত্মার গভীর প্রেরণায়; আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল ভোগের প্রেরণা আসিবে সাক্ষাৎভাবে আত্মা হইতে, তখনই আমরা এই স্থূল দেহের মধ্যেই অমৃতের আস্বাদ পাইব। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে রাজসিক কাম হইতে মুক্ত হইতে হইবে, যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি···অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে —বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬,৭

স্ত্রী-পুরুষের মিলন যে সম্পূর্ণভাবে কামভাবশূন্য হইতে পারে, চণ্ডীদাস তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,

রজকিনী প্রেম
নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।

এইরূপ প্রেম সুলভ নহে, ইহার জন্য অনেক সাধনা করিতে হয়, উর্দ্ধের ভাগবত শক্তির সহিত ঐকান্তিক যোগ সাধনা করিয়া রাজসিক কাম ক্রোধের সকল বেগ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হয়। এই প্রেমের ভিত্তি হইতেছে আত্মার সহিত আত্মার মিলন। দেহের মিলন যাহার তাহার সহিতই হইতে পারে, যেমন পশুদের হয়, কিন্তু আত্মার মিলনের জন্য অনেক তপস্যা করিতে হয়,

বিদ্যাপতি কহে—প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।

কালিদাস তাঁহার কাব্য ও নাটকে দেখাইয়াছেন, প্রকৃত প্রেম তপস্যালব্ধ বস্তু, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে জয় না করিলে তাহা লাভ করা যায় না; এ প্রেমের মিলন ক্ষেত্র তাই মুনি ঋষির আশ্রম, পার্ব্বতীর তপোবন।

অতএব কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত হইলেই আমরা যে জীবন-শূন্য জড় ইট পাথরের মত হইয়া যাইব তাহা নহে। বস্তুতঃ নীচের প্রকৃতিতে যাহা রজঃগুণ, উর্দ্ধের ভাগবত প্রকৃতিতে তাহাই তপঃশক্তি; নীচের প্রকৃতির কাম ক্রোধাদি বিকার হইতে মুক্ত হইলে আমাদের মধ্যে যে তপঃশক্তির বিকাশ হইবে, তাহারই কল্যাণে আমরা হইব দিব্য কর্ম্মী, দিব্য জীবন ও দিব্য আনন্দের অধিকারী।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অন্বয়—যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—যাহার অন্তরে সুখ, যাহার অন্তরে আরাম ও শান্তি, যাহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা

সাধারণ মানুষ বহির্মুখী, সে তাহার সুখের জন্য, আরামের জন্য, জ্ঞানের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে; কিন্তু প্রকৃত সুখ ও শান্তি ও জ্ঞানের উৎস রহিয়াছে বাহিরে নহে অন্তরে, আমাদের আত্মার মধ্যে। কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেয়ো না রে কারও দ্বারে,
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ না নিজ অন্তঃপুরে।

সাধারণ মানুষ সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাহ্য বস্তুকে সুখের আকর বলিয়া ধরিতে চায়, অধিকার করিতে চায়—এই ভাবেই আসে বাসনা এবং তাহা হইতে কাম ক্রোধের বিক্ষোভ, সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ, ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব। বাহ্য বস্তুর মধ্যে সুখ শান্তির আশা করা হইতেছে মরীচিকায় জলের আশা করার ন্যায় নিরর্থক। যোগীরা ইহা বুঝেন, তাই তাঁহারা বাহ্য-বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া অন্তর্মুখী হন, নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান করেন,

ইহাই অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। এইরূপ যোগ সাধনার দ্বারা যখন আমরা আত্মার চৈতন্যে প্রবেশ লাভ করি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হই—তখন আনন্দ ও শান্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়, কারণ আনন্দ ও শান্তি হইতেছে অধ্যাত্ম চৈতন্যের অন্তর্নিহিত, দিব্য প্রকৃতির স্বরূপ—তাহা কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না।

সাধারণ মানুষ ইহা বুঝে না। সকল আনন্দের উৎস তাহার অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে, তাই তাহার আনন্দ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা এমন অসীম অনিবার্য্য—কিন্তু নিজের মধ্যেই তাহার সন্ধান না করিয়া অজ্ঞানের বশে সে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়,

নিজ নাভি গন্ধে মত্ত মৃগ ইতস্তত:
ঘুরে মরে বনে বনে
তেম্নি তোমায় হৃদে ধরে আকুল তোমার তরে
(আমরা) ঘুরে মরি ভব বনে।

যাঁহারা মানুষকে অন্তর্মুখী হইবার প্রেরণা দেন, পন্থা দেখাইয়া দেন তাঁহারাই মানুষের পরম সুহৃদ। ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতবাসীর এই মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, অধ্যাত্ম-চৈতন্যের মধ্যে, অধ্যাত্ম-জীবনের মধ্যে যে পরম আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছেন।

ভারতে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত, শেষ বয়সে মানুষ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মচিন্তায়, আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে—এই ভাবে অধ্যাত্ম জীবন বা মোক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবে—ইহাই ছিল ভারতের প্রাচীন বৈদিক আদর্শ। তবে ইহা সম্ভবতঃ আদর্শ মাত্রই ছিল, ইহার দ্বারা মানুষ বুঝিত যে অধ্যাত্ম জীবনই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, সাংসারিক জীবন মানুষকে কেবল সেই লক্ষ্যের জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া তোলে। কার্য্যতঃ খুব কম লোকই শেষ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিত। সংসারে থাকিয়া বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করাতেই মানুষের জীবন পর্য্যবসিত হইত। পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি এমনও বলিয়াছেন যে, মুক্তি বা মোক্ষের জন্য ইহার অধিক আর কিছুই প্রয়োজন নাই—সংসারে

থাকিয়া শাস্ত্রসম্মত ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিলেই মানুষ ইহকালে সুখ ও শান্তি ও পরকালে পরমগতি লাভ করিতে পারে।

বৈদিক যাগযজ্ঞের যে একটা নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, মানুষকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করা, অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা, মানুষ ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া যায়, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানকেই সব বলিয়া মনে করে এবং এইভাবে বৈদিক ধর্ম্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেছে ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ বলিলেন, বাহিরের অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে, অন্তরের সাধনার দ্বারাই মানুষ পরম মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিবে আর সে আনন্দ মর্ত্ত্যে বা স্বর্গে কোন বাহ্য জীবনে নাই, তাহা আছে সেই বাহ্য জীবনের নির্ব্বাণ বা বিনাশে। মানুষ বেদের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পশু বলিদানের ন্যায় নৃশংস অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে, শাস্ত্রের অর্থ লইয়া নানা বাক্ বিতণ্ডা করিয়া প্রকৃত সত্যকেই হারাইয়া ফেলে, তাই বুদ্ধ বেদাদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ প্রত্যক্ষ সাধনালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের আলোকেই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই এই সব বিষয়ে বুদ্ধের সহিত গীতার বেশই মিল রহিয়াছে। তবে গীতা বুদ্ধের ন্যায় বেদকে অগ্রাহ্য করে নাই, পরন্তু লোকে বেদের যে বিকৃত ব্যাখ্যা করে সেই বেদবাদেরই নিন্দা করিয়াছে। যখন বুদ্ধের ন্যায় কোন অধ্যাত্ম-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সম্মুখে বিদ্যমান থাকেন তখন শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। কিন্তু, অন্যত্র মানুষকে শাস্ত্রের সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিতে হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে হয়, কেবল মনে রাখিতে হয় যে শাস্ত্র কেবল সহায় মাত্র, উহার অপব্যবহার হইতে পারে, শাস্ত্রের নানা মত ও ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতে পারে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না। অতএব শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে নিজের অন্তরের আলোকের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, অন্তর্জ্যোতি হইতে হইবে, নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি উপলব্ধির আলোকে সকল সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধ নিজে কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিলেও, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার বচনগুলিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল—এবং সেই সব বচন লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে কত বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছে, কত মত, কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বুদ্ধের ন্যায় গীতা বৈদিক যজ্ঞকেও একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই। তবে লোকে যে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া স্বর্গাদি ভোগ লাভের জন্য ক্রিয়া-বিশেষবহুল যজ্ঞ করে তাহারই নিন্দা করিয়াছে এবং যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞরূপে ভগবানে সমর্পণ করা, যেন এইভাবে প্রকৃতির শুদ্ধি ও রূপান্তর সাধিত হয়। গীতা দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে—বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের সাধনার উপরেই জোর দিয়াছে। তথাপি গীতা বাহ্য অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে নাই—বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সাধনাতে সাহায্য হইতে পারে—এবং বাহ্য যাগযজ্ঞাদির ইহাই সার্থকতা। কিন্তু সে-সব অনুষ্ঠান যদি বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহাদের উপযোগিতা নষ্ট হয়—তাই গীতা বাহ্যানুষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব অনাড়ম্বর করিতে বলিয়াছে। ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণই মূল প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাহারই প্রতীক স্বরূপ পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহাই ভক্তিভরে ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাহাই হয় যজ্ঞ।

বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁহার শিক্ষা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে লোকে হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু-সভ্যতার মূল উৎস বেদ ও উপনিষদে আস্থা হারাইতেছিল। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই হিন্দু দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে অনেক যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অধিক কি বলিব, এই বৌদ্ধমতের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনের নিমিত্ত যে দিক দিয়াই পরীক্ষা করা যায়, সর্ব্ব প্রকারেই ঐ মত বালুকাস্তূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, পরস্পরবিরুদ্ধ এই তিনটি বাদ উপদেশ করিয়া বুদ্ধদেব নিজের অসম্বদ্ধ প্রলাপিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব এই মত মুমুক্ষুদিগের সর্ব্বপ্রকারেই অগ্রাহ্য"।

কিন্তু বাস্তবিকই বুদ্ধ যদি অসম্বদ্ধ প্রলাপই বকিয়া থাকিতেন তাহা হইলে "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার" থাকিত না। এক শ্রুতি হইতে যেমন পরস্পর-বিরোধী নানা হিন্দু দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই

বুদ্ধের বচন হইতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ আপন আপন ব্যাখ্যা দিয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন—সে-জন্য বুদ্ধকে দায়ী করা যায় না, মানুষের অজ্ঞ অসম্পূর্ণ বুদ্ধিই এই সব অসামঞ্জস্য ও বিরোধের জন্য দায়ী। আর বস্তুতঃ বুদ্ধ যে সাধনমার্গ দেখাইয়াছেন তাহা একেবারে নূতন কিছু নহে, তাহার মধ্যে আমরা সাংখ্যের জ্ঞান যোগ এবং পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগকেই ভিন্নরূপে দেখিতে পাই। বুদ্ধ কেন বেদকে স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। লোকে যাহাতে বৃথা তর্ক না করিয়া সহজ সরল সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতিতে অগ্রসর হয়—বুদ্ধ সেই শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছিলেন, এবং তাহা ভারতবাসীর উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফল বহুদূরপ্রসারী হইয়াছে। অতএব তর্কের জাল বুনিয়া বুদ্ধকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা বৃথা। গীতা সে চেষ্টা করে নাই, গীতা যেমন অন্য সকল মত ও সাধনার সারবস্তুটি গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধমতেরও সারবস্তু গ্রহণ করিয়াছে, এবং এইভাবে গীতার মধ্যে বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় হইয়াছে, এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" কথাটি উপর্য্যুপরি ব্যবহার করিয়া গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে।

গীতার ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলেই আমাদিগকে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। শঙ্করের প্রতিবাদ আমরাই যে আজ প্রথম করিতেছি তাহা নহে—তাঁহার সমসাময়িক মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি কত মনীষী যে শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই—তাহাতে শঙ্করের অবমাননা করা হয় না। শঙ্কর পরম অধ্যাত্ম সত্যকে যেমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—অসাধারণ প্রতিভার সহিত তিনি তাহা সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন, মানুষ মূলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং এই উপলব্ধিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথা—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য আর কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের ফলে ভারতে বেদ উপনিষদে প্রচারিত এই সত্য ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল—পুনরায় যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় সে জন্য শঙ্করের কৃতিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেইজন্য আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত করিতেছে। সকল মহাপুরুষই আসেন নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে; শঙ্কর তাঁহার কাজ প্রকৃষ্ট-

ভাবেই করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার যুগের প্রয়োজন হইতেছে, শঙ্কর যে সত্যকে দেখিয়াছিলেন সেইটিকে আরও পূর্ণতর ভাবে দেখা। তিনি বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্ম। কিন্তু জগৎও ব্রহ্ম, সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম—ইহাও উপনিষদেরই বাণী, এই বাণীটির উপর তিনি সম্যক দৃষ্টি দেন নাই—তিনি বলিয়াছেন, জগৎ মিথ্যা। আমরা উপনিষদকেই অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, জগৎকে সাধারণতঃ আমরা যে চক্ষুতে দেখি, ভেদ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ, অনিত্যং অসুখং লোকং, ইহা মিথ্যা মায়া বটে—কিন্তু জগৎ মূলতঃ মিথ্যা নহে, ইহা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, সমস্তই ভগবানের বিভূতি, ভগবানের অংশ। গীতায় এই সত্যটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

শঙ্করের কাজ ছিল বাহিরের জগতের সত্যের সন্ধান করা নহে, অন্তর্জগতের সত্যের সন্ধান করা—ইহার জন্য মনকে বাহির হইতে ফিরাইতে হয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বাহিরের জগৎকেই যাহারা পরম সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে সেই আসক্তি পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে, সেইজন্যই তাঁহাকে জগৎ মিথ্যা এই তথ্যটির উপরেই বিশেষ ভাবে জোর দিতে হইয়াছিল।* আর এই বিষয়ে বৌদ্ধেরাই পথ দেখাইয়াছিলেন। বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নাই, উহা শুধু মনের ভ্রম, উহা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক—এই মতটি বৌদ্ধগণই প্রথম প্রচার করেন। আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মসূত্রে এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে—ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দেখাইয়াছে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জন্মাদ্যস্য যতঃ, ব্রহ্মই এই জগৎ হইয়াছেন, অতএব ইহা মিথ্যা হইতে পারে না।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥

ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থের মূলেও কোন বাহ্য বস্তু নাই, স্বপ্ন ও জাগরণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত মত অসিদ্ধ। স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা নিদ্রাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ জ্ঞান পরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান ঠিক তাহার বিপরীত, তাহা কোন

* বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন, জগৎ সত্য; কেবল মানুষের মনে বৈরাগ্য আনয়ন করিবার জন্যই জগৎকে মিথ্যা বলা হয়।

অবস্থাতেই বাধিত হয় না। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শঙ্কর যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিলেও, "জগৎ মিথ্যা" এই মতটি তিনি প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য অনেকেই তাঁহাকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্কর বৌদ্ধমতের সহিত নিজ মতের একটি অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি বলিয়াছিলেন বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, উহা সত্য নহে—তবে তিনি বাহ্য জগৎকে একেবারে স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন মায়াশক্তি এই ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে। আমরা যখন বাহিরে স্তম্ভাদি দেখি, আমরা বাস্তবিকই বাহিরে একটা বস্তু দেখিতে পাই, স্বপ্নের ন্যায় তাহা আমাদের মনের সৃষ্টি নহে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাহা বিলীন হইয়া যায় না—কিন্তু ঐ বস্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই আছেন, বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, তবে মায়াশক্তি একটা ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে—যেমন মরুভূমিতে জল না থাকিলেও অনেক লোক একই সময় জাগ্রতাবস্থায় একস্থানে জল রহিয়াছে বলিয়া দেখিতে পায়—তখন কিছুতেই সে দৃশ্যকে দূর করা যায় না। কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পর আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়, অতএব তাহা সত্য বস্তু নহে, মায়াসৃষ্ট বস্তু, মায়ার শেষ হইলেই তাহারও শেষ হয়। জগৎ রহিয়াছে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, কিছুতেই এই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, অতএব ইহা সৎ; কিন্তু মায়া দূর হইলে জগৎও লোপ পায়, অতএব ইহা অসৎ। তাই শঙ্করের মতে মায়া-সৃষ্ট জগৎ হইতেছে সৎ ও অসৎ উভয়ই। বৌদ্ধগণ বলেন জগৎ অসৎ, শঙ্কর বলেন জগৎ সৎ অসৎ দুইই।

কিন্তু এইরূপ একটা তর্কগত সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিলেও শঙ্কর জগৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধমতই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন—সংসার মায়া, মিথ্যা—সংসার হইতে সরিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ, নিঃশ্রেয়স্, মুক্তি—এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর যে প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এযুগে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার "অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থে তাহা ভালভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন, সেখানে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতি ও যুক্তি অনুমোদিত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "অবিদ্যাকে জগৎকারণ বলিতে গেলে যে পরিমাণে সৎ, সেই পরিমাণে স্বগত

ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং যে পরিমাণে অসৎ, সেই পরিমাণে বৌদ্ধবাদে উপনীত হয়।...জগৎ কখনও রচিত হয় নাই, ইহা কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র, ইহা বলা আর বৌদ্ধের মত জগৎ অসমূল বলা একই কথা।"

তবে শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিলেও ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছেন, এইখানেই বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের বিশেষ প্রভেদ, কারণ বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্য শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে বুদ্ধ স্বয়ং ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "পালিপিটকে" আমরা বুদ্ধের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহার নিকট পরাবিদ্যা অব্যাকৃত বস্তু অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়ই নহে,—দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। বুদ্ধাবিষ্কৃত যে চারিটি আর্য্য সত্যের উপর সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, দুঃখ নিবৃত্তিও সম্ভব, এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা, বাসনা, desire। এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে এবং তাহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ কি, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে, কিছুই থাকিবে কিনা—এ-সব সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছু না বলিলেও বৌদ্ধগণ নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের অথবা সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষ বলিয়াছেন, "মহাযানী দর্শনের শূন্য কথাটি সাধারণতঃ void বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শূন্যবাদ সম্বন্ধে যে অনন্ত আলোচনা আছে তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে সর্ব্বসত্ত্বের অভাবের নামই শূন্য। শূন্য কথাটির প্রকৃত অর্থ গুণশূন্য। বেদান্তে যাহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, মহাযানী দর্শনে তাহারই নাম শূন্য। ব্রহ্ম ও শূন্য একই বস্তু,—উভয়েরই অর্থ Ding au sich বা স্বলক্ষণ বস্তু।" জন্ম মৃত্যু দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যে পদ লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন তাহা অজাতম, অভূতম্, অকলম্, অসংখতম্ (বিশুদ্ধিমাগ্‌গ, উদান ৮)। ইহা সর্ব্ব সত্ত্বের অভাব নহে, ইহা বেদান্তেরই নির্গুণ ব্রহ্ম, কেবল বুদ্ধ ইহাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন নাই, ইহার কোন নামই দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে ইহা হইতেছে সর্ব্বদুঃখের মূল অহংবোধের নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব অনাত্মবাদ। ধর্ম্মপাদে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

সব্বে সংখারা অনিচ্চা
সব্বে সংখারা দুক্খা,
সব্বে ধম্মা অনাত্তা

নৈসর্গিক বস্তুমাত্রই সংখাত (conditioned or compounded) এবং তাহারা অনিত্য ও দুঃখময় *। কেবল নির্ব্বাণ অসংখাত। সুতরাং নির্ব্বাণ নিত্য ও অদুঃখময়। কিন্তু এই অসংখাত নির্ব্বাণও অনাত্ম।

এই অনাত্ম শব্দের অর্থ একেবারে বিনাশ বা সর্ব্বসত্তাশূন্যতা নহে। আত্মা বলিতে বৌদ্ধগণ অহং (ego) বুঝিয়াছে—তাহাদের মতে কোন জীবাত্মা বা ব্যষ্টিগত সত্তা (individual soul) নাই। আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা ভ্রম মাত্র এবং ইহাই সকল বাসনার কেন্দ্র ও দুঃখের মূল—সর্ব্বদা অনাত্মতা ধ্যানের দ্বারা এই অহংভাবের বিনাশ বা দুঃখলেশশূন্য পরম শান্তিময় অবস্থা লাভ করা যায়। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি বৌদ্ধমতের সহিত শঙ্করের মতের মূলতঃ কোন ভেদই নাই, কারণ শঙ্করও ব্যষ্টিগত সত্তা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিতে আর কিছুই নাই—আমরা যাহাকে অহং বলি তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানপ্রসূত। যখন এই অজ্ঞান দূর হইবে তখন জীবে আর ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র ভেদ থাকিবে না।

বৌদ্ধগণ কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন না ইহা ধরিয়া লইয়াই শঙ্কর তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে "বৈনাশিক" বলিয়াছেন—কিন্তু আমরা উপরে দেখিলাম, বস্তুতঃ বৌদ্ধরা বিনাশবাদী বা উচ্ছেদবাদী নহেন, তাঁহারা বেদ ও উপনিষদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না এবং সেইজন্য ব্রহ্ম শব্দটিও ব্যবহার করেন না—কিন্তু মূলতঃ তাঁহাদের মত শ্রুতিরই অনুযায়ী, ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতা এই শ্লোকে নির্ব্বাণের সহিত ব্রহ্ম শব্দটি যোগ করিয়া দিয়াছে। শঙ্কর ইহা লক্ষ্য করেন নাই, গীতা কেন বারবার তিনবার এখানে নির্ব্বাণ শব্দটি ব্রহ্মের সহিত যুক্ত

* গীতাও ঠিক এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, অনিত্যং অসুখং লোকম্।

করিয়া ব্যবহার করিল শঙ্কর তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই—তিনি নির্ব্বাণ শব্দের শুধু সাধারণভাবে "মোক্ষ" বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্কর যতই বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করুন—মূলতঃ তাঁহার মতের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ কোন তফাৎই নাই, বিরোধ কেবল প্রধানতঃ ভাষা ও কথা লইয়াই। আর শঙ্কর যে দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে নিজ মত প্রবলভাবে চালাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সে-জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ ইহাই হইতেছে খাঁটি আধ্যাত্মিকতা—সমস্ত বাহ্য বিষয়ে, বাহ্যবস্তুতে অনাসক্ত হইয়া অন্তর্মুখী হওয়া, অন্তরের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান করা। পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মেরই অনুসরণে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই মত প্রচার করিয়াছে,—যীশু খ্রীষ্টের কথা, "The kingdom of God is within you"। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা—"ঝড়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, মুনি তেমনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার কি অস্তিত্ব থাকে ?" (ধর্ম্মপাদ মাঘসুত্ত, ১০৭৩)। খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও শিক্ষা—"What is your life? For ye are a vapour that appeareth for a little while and then vanisheth away"—St. James IV. 14. কিন্তু খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও এই অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই—তাহা একটি ক্ষীণধারা রূপেই গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে, বিধাতার বিধানেই পাশ্চাত্য জগৎ বহির্মুখী হইয়াছে, জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া এই জগতের জীবনকেই পূর্ণভাবে বিকাশ করিবার, ভোগ করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন আসিয়াছে একটা সমন্বয়ের যুগ। ইহজীবনে দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া ভারতবাসী বুঝিতেছে যে, আধ্যাত্মিকতাই যথেষ্ট নহে, এমন কি অনেকে আধ্যাত্মিকতাকে ভারতের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী করিতেছে। অন্য পক্ষে ভোগবাদ, জীবনবাদ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, পাশ্চাত্য জাতিকে কিরূপ দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহা দেখিয়া এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতেছে, অনেকেই বুদ্ধ ও শঙ্করের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

বস্তুতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতে শঙ্করের বেদান্ত মত যে আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে আমাদের দেশের আধুনিক দার্শনিকগণের শিক্ষা হইতেছে পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট, আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শঙ্করকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়াছেন, বস্তুতঃ বেদান্ত বলিতে তাঁহারা শঙ্করের মতই বুঝিয়া থাকেন—আমাদের দেশেও অনেকেই আজকাল তাহাই করিতেছেন।

কিন্তু আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই বেদান্তের একমাত্র ব্যাখ্যা নহে, আর গীতায় আমরা বেদান্তের যে রূপটি দেখিতে পাই, শঙ্করের মায়াবাদের সহিত তাহার মিল নাই। বস্তুতঃ শঙ্কর অপূর্ব্ব ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া মায়ার যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহা তাঁহারই নিজস্ব। বৌদ্ধদের ন্যায়ই তিনি ঈশ্বর ও জগৎকে ভ্রান্তিবিলাস রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মকেই এই ভ্রান্তির আশ্রয় বলিয়া তিনি বৌদ্ধদের অসদ্‌বাদ পরিহার করিয়াছেন—এবং এইজন্যই মায়াকে সদসদ্‌রূপা ব্রহ্মশক্তিরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। ফল হইয়াছে এই যে, জগৎ মিথ্যা—বৌদ্ধদের এই কথা ভারতবাসী হয়ত প্রত্যাখ্যান করিত, কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্মের উপর মায়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া, শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা জগৎ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া সেই বৌদ্ধবাদই ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। আজ আপামর ভারতবাসী সেই বৌদ্ধবাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে—এই সংসার মিথ্যা মায়া, মানব-জীবনের যে পরম লক্ষ্য তাহা এই সংসারে নহে, এই সংসার ত্যাগ করিয়াই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম আদর্শ নহে। সংসার-ত্যাগ নহে, সাংসারিক জীবনকে গড়িয়া তোলা, দেবগণকে আহ্বান করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা, ভিতরকে সমৃদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে বাহিরের জীবনকেও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা—ইহাই ছিল বেদের আদর্শ, এবং বৈদিক যজ্ঞ ছিল ইহারই প্রতীক ও সাধনা। শুদ্ধ আনন্দের সহায়ে সকল মর্ত্ত্যশক্তিকে জয় করিয়া লাভ করিতে হইবে শুদ্ধ মনের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা, শক্তির, জ্ঞানের, কল্যাণের মূর্ত্ত প্রকাশ—ইন্দ্রের বহু বিচিত্র পূর্ণতা। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে ইহাই নানাভাবে বলা হইয়াছে—

আ ত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১।৫।১

"হে সখাবৃন্দ! প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বহিয়া লইয়া এস, এস এখানে। স্থিরাসনে উপবেশন কর। ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোল তোমাদের গান।"

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং
ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ১৫।২

"যাবতীয় বৈচিত্র্য লইয়া ইন্দ্র পরম বিচিত্র, সকল কাম্যের তিনি বিধাতাপুরুষ। একযোগে কর তবে রসের সৃষ্টি।"

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং।
গমৎ বাজেভিরা স নঃ ॥ ১।৫।৩

"আমরা যাহা কিছু অধিগত করি, তাহাতে তিনি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। তিনি মূর্ত্ত হইয়া উঠেন যেন আমাদের আনন্দ সম্পদে, আমাদের বহুল বুদ্ধিতে। তিনি যেন আসেন আমাদের জন্য সকল পূর্ণ ঋদ্ধি লইয়া।" (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)।

এই সকল বেদমন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে বলেন বেদ আদিম অশিক্ষিত মানবের ঝাড় ফুঁকের মন্ত্র তাহা নহে—বেদ হইতেছে শ্রেষ্ঠতম কাব্যের ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্যের প্রকাশ। আবার আমাদের দেশে বেদ যে কেবল বাহ্য যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতেও বেদকে ঠিক মত বুঝা হয় নাই। বেদে বাহ্য যজ্ঞের বর্ণনা ও নির্দ্দেশ অবশ্যই আছে—কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ ঐ সব বাহ্য যজ্ঞকে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিতেন—আর যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারা শুধু পরকালে স্বর্গ সুখ কামনা করিতেন না, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ভিতর দিয়া যাহাতে এই পার্থিব জীবনই দিব্য জীবনে পরিণত হয়—ইহাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। লোকে ক্রমশঃ এই গূঢ় সত্যটি হারাইয়া ফেলে, গীতা যেমন বলিয়াছে,

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।

উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে, বাহিরের জীবন অপেক্ষা ভিতরের অধ্যাত্ম জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে উপনিষদের মধ্যেই সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয় (পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। উপনিষদগুলিকেও তাহাদের যুগ অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগের উপনিষদগুলি বেদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী; সেখানে আত্মজ্ঞানকে

প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু পার্থিব জীবন ও কর্ম্মকেও অবহেলা করা হয় নাই। অন্তর্মুখী হইয়া, আত্মার সহিত এক হইয়া আত্মাকে জানিতে হইবে। এইরূপ অন্তর্জ্ঞানের সাধনার দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের যে আত্মা বা মূল সত্তা তাহাতে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত এবং ভগবানের সহিত এক, এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহারই আলোকে জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ শিক্ষা—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঈশা প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদগুলিতে আমরা এই শিক্ষাই পাই—সেখানে জ্ঞানলাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, জনকরাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত হইলে জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গো-ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, না, অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য আসিয়াছেন?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"উভয়মেব", হে রাজন, আমি দুই-ই চাই, উভয়মেব (বৃহদারণ্যক ৪।১)। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসারের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শেষ জীবনে সব ছাড়িয়া অনায়াসে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ খণ্ডে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবে। ঈশা উপনিষদে বলা হইয়াছে,

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

—এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে।

কিন্তু পরবর্ত্তী উপনিষদগুলি উত্তরোত্তর সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। জাবালোপনিষদে বলা হইয়াছে, বৈরাগ্যের উদয় হইলে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

বুদ্ধ হইতেছেন এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। রাজার দুলাল সিদ্ধার্থ যুবতী স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন—ভারতের ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা, ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উপর ইহা যে কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা

দুরূহ। উপনিষদের শিক্ষা কতকগুলি বিশিষ্ট সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণকে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। জনসাধারণ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ লইয়া, আচার অনুষ্ঠান লইয়াই গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিত। এই জীবনে যে প্রকৃত সুখ শান্তি নাই, রূপ, যৌবন, রাজার ঐশ্বর্য্য কিছুই যে মানুষকে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, সে তৃপ্তির জন্য সকল বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে, নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে—আধ্যাত্মিকতার এই মূল কথাটিই বুদ্ধ নিজ দিব্য ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের একটি বিপদ ছিল। আধ্যাত্মিকতা চাই-ই, কিন্তু তাহাই সব নহে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বাহিরের জীবনকেও অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে হইবে, এই দুঃখময় পৃথিবীতেই আনন্দের, শান্তির, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এইটিই হইতেছে মানব জীবনের, পার্থিব জীবনের পূর্ণ আদর্শ, বেদে এই আদর্শই সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজপুত্রেরা সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিলে সংসার রক্ষা কে করিবে? আমরা দেখিতে পাই গীতা এই বিপদটি পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে, এবং লোক যাহাতে আধ্যাত্মিকতা লাভের আশায় সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়া সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত না করে সেই জন্যই অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম-মৃত্যু-জরা দেখিয়া সংসারের দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যৌবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রূপ দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে, আবার শেষ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বিভিন্ন ভাবে এই একই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—সন্ন্যাস বড় না কর্ম্মযোগ বড়? অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগই অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াই সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অক্ষম বলিয়া, অযোগ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই পন্থা দেখাইয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "তুমি আমার অতিশয় প্রিয় তাই আমি তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান দিলাম, এখন আমার যে সর্ব্বগুহ্য বাক্য তাহা শ্রবণ কর" (১৮।৬৩, ৬৪)। ভগবানের যে অতিশয় প্রিয়, ভগবান

যাঁহাকে সখা বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যোগ্য অধিকারী ব্যক্তি আর কে হইতে পারে ?

উপনিষদের বাণী,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌ ॥
—মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৩

"বিচার বা ধীশক্তির দ্বারা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, ভগবান নিজে যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন কেবল তিনিই ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকটিত হয়।" অতএব, অর্জ্জুনকে অযোগ্য পাত্র বলিয়া, জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা বৃথা। বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চান, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ করিতে চান, এবং অনির্ব্বচনীয় পরম সত্তার শুদ্ধ নীরব নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত জীবনের লয় বা নির্ব্বাণ করাকেই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করেন তাঁহাদের প্রতি গীতার সুস্পষ্ট বাণী হইতেছে এই যে, এইটিও একটি পন্থা কিন্তু এইটি হইতেছে দুষ্করতম পন্থা, (৫।৬, ১২।৫), আর উপদেশের দ্বারা অথবা দৃষ্টান্তের দ্বারা কর্ম্মত্যাগের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরা হইতেছে অতিশয় বিপজ্জনক (৩।২০-২৬)। এই পন্থা মহান হইলেও, মানুষের পক্ষে এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে (৫।২), আর এই জ্ঞান সত্য হইলেও ইহা পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান নহে। পরব্রহ্ম কেবল এক সুদূরবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তাই নহেন তিনি এইখানে, এই বিশ্বের মধ্যেও রহিয়াছেন, দেব ও মানবের ভিতর দিয়া, সংসারে যত জীব আছে, যাহা কিছু আছে সবের ভিতর দিয়া তিনি নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে শুধুই নিশ্চল নীরবতার মধ্যেই নহে, পরন্তু এই জগতের মধ্যে, জগতের সকল জীব, সকল আত্মা, সকল প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে পাইতে হইবে, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব কিছুর ক্রিয়াকে তাঁহার সহিত পরমতম সমগ্রতম যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ অন্তর্জীবনের সমস্যা এবং বাহিরে কর্ম্মময় মানব জীবনের সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করিতে পারিবে। ভগবানের সাধর্ম্ম্য, ভগবানের ভাব লাভ করিয়া সে যে পরমতম অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে উঠিবে তাহা যেমন জ্ঞান ও ভক্তির ভিতর দিয়া তেমনিই কর্ম্মে

ভিতর দিয়াও লাভ করিতে হইবে। অমৃতত্ব ও মুক্তি লাভ করিয়া, সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্ম্ম করিতে পারে এবং সেইটিকে পরমতম সর্ব্বতোমুখী দিব্য কর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে পারে, বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে সকল কর্ম্ম, জীবন ও ত্যাগের, সংসারের সকল প্রচেষ্টার চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

• গীতা যে দিব্য জীবন, দিব্য কর্ম্মের আদর্শ মানবের সম্মুখে ধরিয়াছে তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মচৈতন্য, ব্রাহ্মীস্থিতি। সাধারণ জীবনে মানুষ রাজসিক প্রেরণায় যে ভাবে কর্ম্ম করে, জীবন যাপন করে, তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, সাত্ত্বিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক জীবনেরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—এই জন্য গীতা আত্মজ্ঞান ও অন্তর্মুখীনতার উপর খুবই জোর দিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই দিকটিতে এত বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে যে মনে হইতে পারে গীতা বুঝি নীরব নিষ্ক্রিয় সত্তায় আত্ম-নির্ব্বাণেরই শিক্ষা দিতেছে, এমন কি এখানে গীতা "নির্ব্বাণ" কথাটিই পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছে। তবে এখানেও গীতা যে-সব ইঙ্গিত দিয়াছে তাহা হইতেই গীতার পূর্ণতর আদর্শটি বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এবং পরে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তীব্রভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারের ফলে গীতার এই আর্দর্শটি ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই—ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, গীতা ইহাতে যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল ভারতের ইতিহাসে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বুদ্ধের তিরোধানের অল্পকাল পরেই ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে পারসীকগণ ভারত আক্রমণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অংশে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্দার ভারত জয় করেন। পরে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিভা এবং কর্ম্মশক্তি লইয়া ভারতে গ্রীক বিজয়ের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দেন এবং বিরাট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ঐ সাম্রাজ্য আবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, ব্যাক্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইয়া যায়। তাহার পর আবার হিন্দুদের রাজত্ব আরম্ভ হয়—গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন, এমন অজস্রভাবে দান করিতে

লাগিলেন যে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া যাইতে লাগিল—এমন কি তিনি তাঁহার নিজ পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ভিখারী সাজিতেন। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহার যত মূল্যই থাকুক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল বিষময় হইয়াছিল। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাহার অল্পকাল পরেই মহম্মদ বিন কাশিমের অধীনে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। সেই সন্ধিক্ষণে ভারতে যদি চন্দ্রগুপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত মন্ত্রীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে গ্রীক আক্রমণের ন্যায় মুসলমান আক্রমণেরও সমস্ত চিহ্ন ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত, ভারত স্বাধীনভাবে নিজ সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের ভাগ্যলিপি অন্যরূপ। ভারতে রাজনীতি বা সমাজনীতির ক্ষেত্রে কোন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইল না—ভারতে পুনঃ পুনঃ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে কেবল আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে। ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিরোধ করিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাসের দিকে ঝোঁকটিকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীর জীবনে যে দুইজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন সেই বুদ্ধ ও শঙ্কর দুইজনেই সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, ফলে ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতায় খুবই অগ্রসর হইলেও ঐহিক জীবনে তাহাদের চূড়ান্ত পতন হইয়াছে।

গীতা এই বিপদ আশঙ্কা করিয়াই একটা গভীর সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন গীতার এই শিক্ষা জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বুদ্ধ যে অহিংসা ও শান্তির আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে গীতার শিক্ষা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তবে অন্যপক্ষে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম্মও অনেকখানি গীতার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।* শান্ত নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সেবাধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল তাহা গীতার শিক্ষারই ফল বলিয়া মনে হয়। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে গীতার অনেক শ্লোক শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মও ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

---

* তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইলেও বুদ্ধের প্রভাব ভারতে বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুগণ বুদ্ধকে এক অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছিল। আর শঙ্করাচার্য্য ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধগণের ন্যায়ই মঠ স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সন্ন্যাস-আদর্শ প্রচারে ভারতের তত ক্ষতি হয় নাই, কারণ তখনও ভারতবাসীর প্রাণশক্তি সজীব ছিল, তাই ভারতবাসী সন্ন্যাস-ধর্ম্মকেও সেবাধর্ম্মে পরিণত করিতে পারিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই কালিদাসের যুগে লোকে সন্ন্যাসকে আদর্শ হিসাবে খুবই উচ্চস্থান দিলেও, সংসারের ভোগ সুখকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে নাই, সংসারের কর্ম্মকে অবহেলা করে নাই। ইহার মধ্যেও গীতার শিক্ষারই প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের যুগে আমরা দেখি, সন্ন্যাসের ত্যাগ ও কঠোরতা যেন পিছনে সরিয়া গিয়াছে, সম্মুখে আসিয়াছে জীবনকে সর্ব্বতোভাবে বিকাশ ও ভোগ করিবার আদর্শ। এই যুগে ভারতের কর্ম্মশক্তি যেন শতধারে উথলিয়া উঠিয়াছিল—দর্শন, বিজ্ঞান, চৌষট্টি কলা, ব্যবসা, বাণিজ্য, ভারতের বাহিরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন, বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য গঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিস্তারিত শাস্ত্র রচনা, যাহা কিছু সুন্দর, মনোরম, সুখপ্রদ সে সবকেই পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার প্রয়াস—এইটিই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। কালিদাসের কাব্যগুলিতে আমরা এই যুগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। কালিদাস ভোগের চূড়ান্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পিছনে ছিল ত্যাগ, সংযম, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শ—এবং এই যে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ, আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবন—এইটিই ভারতের সনাতন আদর্শ। কালিদাসের কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, দেবতারা মানব-রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, অপ্সরারা মানবের সহিত প্রেম করিতেছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন হইতেছে। পৃথিবীতে সমৃদ্ধিশালী জীবন ও ভোগের ইহা অপেক্ষা বড় কল্পনা আর কি হইতে পারে? জার্ম্মানীর মহাকবি গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন, "যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন দেখিতে চাও, তাহা হইলে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠ কর।"

ইহার পরেই ভারতের প্রকৃত পতন আরম্ভ হয়। যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনি জাতির জীবনেও জরা ও বার্দ্ধক্য আসে; সহস্র সহস্র বৎসর জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব কর্ম্ম শক্তির ও সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়া এই সময়েই

ভারতের জীবনী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত চিরকালই আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মে মগ্ন থাকিয়া বাহ্য জীবনকে অবহেলা করিয়াছে—এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা যেমন রামায়ণ মহাভারত হইতে তেমনিই কালিদাসের যুগের অজস্র সাহিত্য হইতে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয়। ভারতীয় সভ্যতা চিরকালই অধ্যাত্মভাবাপন্ন; আধ্যাত্মিকতাকেই তাহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে বাস্তব জীবনকে, ঐহিক জীবনকে অবহেলা করে নাই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় দুই হাত ভরিয়া পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্য এবং অধ্যাত্ম সম্পদ, উভয়মেব, গ্রহণ করিয়াছে। বৈদিক বর্ণাশ্রম আদর্শ ছিল—গার্হস্থ্য জীবনের শেষে সন্ন্যাস আশ্রম। প্রথমে বুদ্ধই এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন, সন্ন্যাসকেই প্রাধান্য দেন—কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত দিন ভারতের প্রাণশক্তি সতেজ ছিল ততদিন এই আদর্শ বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, আর গীতার শিক্ষাও ইহার অনেক খানি প্রতিরোধ করিয়াছিল। তথাপি বৌদ্ধ সন্ন্যাসের আদর্শ ভিতরে ভিতরে জাতির মধ্যে কাজ করিতে ছিল—যখন কালবশে ভারতীয় জাতির মধ্যে জড়তা ও অবসাদ আসিল, তামসিকতার প্রভাব হইল, তখন কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ, সন্ন্যাসের দিকে ভারতবাসী বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে হইল আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি নিজের মতানুযায়ী উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়া সন্ন্যাস ও মায়াবাদকে ভারতীয় মনের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। সকল মানুষই যে তাঁহার শিক্ষার ফলে সংসার ত্যাগ করিল তাহা নহে, কিন্তু সংসারে থাকিয়াও তাহারা জীবনে উৎসাহ ও আস্থা হারাইল—এই সংসার মিথ্যা, এখানে কেহ কখনও সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না, এই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন না করিলে কেহ প্রকৃত জ্ঞান, শান্তি, আনন্দ লাভ করিতে পারে না—এই শিক্ষা যাহাদের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সাংসারিক জীবনে কতটুকু উন্নতি হইতে পারে? উপনিষদের মধ্যেই ইহার বীজ ছিল, বুদ্ধ তাহার বিকাশ করেন, শঙ্করের মধ্যে তাহা চরম পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু সেই উপনিষদের মধ্যেই ইহার প্রতিকার রহিয়াছে। ভারতবাসী আর সব কিছুকে হারাইলেও উপনিষদের অধ্যাত্ম শিক্ষা হারায় নাই—আর যুগে যুগে তাহা ভারতীয় জাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। এখন আমাদের

চোখের সম্মুখে আমরা ভারতের এইরূপই এক নব অভ্যুত্থান দেখিতেছি। একদিকে সেই উপনিষদের শিক্ষা এক নূতন আলোকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, অন্য দিকে জীবন্ত কর্ম্মিষ্ঠ ভোগ-পরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীর ঐহিক জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব দূর হইতেছে। কিন্তু এখনও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। আধুনিক যুগ হইতেছে পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। ভারতের নবজাগরণ ভারতের অন্তর হইতে, ভারতীয় সাধকগণের প্রভাব হইতেই আসিয়াছে সত্য—তথাপি ভারতবাসীর উপর আজিও পাশ্চাত্য প্রভাব খুবই প্রবল। আবার শঙ্করের প্রভাবও বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে। পাশ্চাত্য হইতে ভারতবাসী প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ পাইয়াছে—প্রথম, কর্ম্মের প্রেরণা, সাংসারিক জীবনকে, পৃথিবীতে মানব জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তা-ধারার ভিতর দিয়া বুদ্ধ ও শঙ্করের শিক্ষার পুনরাবির্ভাব। আমাদের দেশের চিন্তানায়কেরা দুইটির মধ্যে কোন রকমে একটা আপোষ করিয়া লইয়াছেন। দার্শনিক চিন্তায় তাঁহারা শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের অনুসরণ করেন, কিন্তু সাংসারিক জীবনে তাঁহারা শঙ্করের নৈষ্কর্ম্ম্যের শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য activism বা কর্ম্মশীলতার অনুসরণ করেন।

লোকমান্য তিলকের গীতারহস্যে এই মনোভাবটা বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শঙ্করের ন্যায়ই মায়াবাদী, তিনি বলিয়াছেন, "এ-পর্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং নির্গুণই সগুণরূপে অজ্ঞান ফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে" (গীতা-রহস্য, নবম প্রকরণ—অধ্যাত্ম)। ইহা নিছক শঙ্করের মায়াবাদ। অথচ তিলক কর্ম্ম সম্বন্ধে শঙ্করের গীতাভাষ্য অনুসরণ করেন নাই।*

* "তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে গীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায় মধ্যে এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচার দৃষ্টিতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত।...তত্ত্বজ্ঞান গীতা ও শঙ্করের সম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকার—অন্য সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণও এই" (তিলক—গীতা-রহস্য, নবম প্রকরণ)।

তিনি বলিয়াছেন, "জগতের সর্ব্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।" কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা হয়, মায়িক হয়, আর সেই আত্মা যদি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত একাত্মতা লাভ করিলে আর কর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে আসিবে? বস্তুতঃ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত, শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করিলে আর কর্ম্মের প্রেরণা থাকে না, যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকল কর্ম্মের অবসান। এ-বিষয়ে শঙ্করের শিক্ষার মধ্যে কোনরূপ স্ব-বিরোধ বা contradiction নাই, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি মায়াবাদ প্রচার করিতে ভারতের সর্ব্বত্র মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু লোকসেবার জন্য মিশন স্থাপন করেন নাই। সকল কর্ম্মের মূল হইতেছে প্রকৃতি, এই প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। এই প্রকৃতি যদি সৎ-অসৎ মায়া হয়, তবে কর্ম্ম কখনই দিব্য কর্ম্ম হইতে পারে না, কর্ম্ম হইলেই তাহা অবিদ্যা অজ্ঞানস্বরূপিনী প্রকৃতিরই কর্ম্ম হইবে—এইজন্য এই মত অনুসারে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ তাঁহার "গীতার্থ সন্দীপনী"তে এই মতটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন—"কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপ নিবৃত্তি-রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্ম করাও সম্ভব নহে; কেন না ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল।" বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধ বলিতেছেন, "যে ভিক্ষু পূর্ণ অর্হৎ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তিনি কিছু না করিয়া গণ্ডারের মত বনে বাস করুন" (সুত্তনিপাত)। মনুসংহিতাতেও আমরা পরিব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের এইরূপ বর্ণনাই পাই। তাহা হইলে কর্ম্মের যে আধুনিক আদর্শ তাহার সহিত সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া হয়?

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও আমরা কতকটা এইরূপ দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই—তিনি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, অথচ তিনি কর্ম্মের উপর আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আজ ভারতে যে নূতন কর্ম্ম প্রেরণা দেখা দিয়াছে, সর্ব্বত্র জনহিতকর কর্ম্মে লোকে অনুপ্রাণিত হইয়াছে ইহা

অনেকখানি বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শেরই ফল এবং ইহা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতবাসীর বহু দিনের জড়তা, নিক্রিয়তা, তামসিকতাকে তিনি তীব্র ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বিরাট দেশব্যাপী জগৎব্যাপী কর্ম্মের জন্য নব্য ভারতকে আহ্বান করিয়াছেন, শঙ্করের বেদান্ত মতের মধ্যে তাহার প্রকৃত সমর্থন লাভ করা যায় না। শঙ্করের মতই যদি আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কিছুতেই হইতে পারে না, হয় কর্ম্মিগণকে আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত মানব-ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে, সংসার হইতে সরিয়া গিয়া আধ্যাত্মিকতার উপাসনা করিতে হইবে। গীতা ঠিক এই সমস্যাটি তুলিয়াই তাহার গভীর সমাধান দিয়াছে, সে-সমাধান ছাড়া আর অন্য কোন সমাধানই নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই জগৎ মূলতঃ মিথ্যা, মায়া, দুঃখময়—ইহার উন্নতি করিবার সকল চেষ্টাই বৃথা—

"Objective society will always be a mixture of good and evil; objective life will always be followed by its shadow, death and the longer the life, the longer will be the shadow···. Every improvement is coupled with an equal degradation···. If good is increasing so is evil···. The progress of the world means more enjoyment and more misery too···. To have good and no evil is a childish nonsense." (Complete Works, VI, p. 341). "Two ways are left open—one by giving up all hope to take up the world as it is and bear the pangs and pains in the hope of a crumb of happiness now and then. The other, to give up the search for pleasure (in the world), knowing it to be pain in another form and seek for Truth··· present in themselves," (Ibid, p. 341). "The musk deer after vain search for the cause of the scent of the musk, at last will have to find it in himself." (Ibid, p. 341).

কিন্তু জগৎ যদি মূলতঃ মিথ্যাই হয়, ইহার কোন উন্নতি সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আর এত জনহিতকর অনুষ্ঠান কেন? মিশন কেন?

যত শীঘ্র মানুষ এই সংসারের দুঃখময়তা উপলব্ধি করিতে পারে তাহাদিগকে কেবল সেই পথ দেখাইয়া দেওয়াই কি ঠিক নহে ? আর তাহারই বা প্রয়োজন কি ? মিথ্যা জগতের মিথ্যা দুঃখ লইয়াই বা এত আন্দোলন কেন ? মাথা নাই যদি তবে আর মাথা ব্যথা কিসের ?

অথচ স্বামী বিবেকানন্দ জনহিতকর অনুষ্ঠানের উপর, সকল প্রকার কর্ম্মের উপর খুবই জোর দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দুইটি জিনিষ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম, মানুষ যে এই দুঃখময় তুচ্ছ ভোগের জীবনে আসক্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে—মানুষের এই আসক্তিকে দূর করিতেই হইবে। শঙ্করের মায়াবাদ হইতেছে এই আসক্তি-রূপ ব্যাধির পরম ঔষধ স্বরূপ, তাই তিনি মায়াবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। মায়াবাদের মূলে যে সত্য রহিয়াছে—এই দুঃখদ্বন্দ্বময় সাংসারিক জীবনের পশ্চাতে অচল, অক্ষর আত্মার অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন শান্তি ও নীরবতা যাহার মধ্যে সকল দুঃখ ও বিক্ষোভের চির অবসান হইয়াছে—এই অধ্যাত্ম সত্যটি স্বামী বিবেকানন্দ খুব গভীরভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন—বস্তুতঃ শুধু এইখানেই ছিল বুদ্ধ ও শঙ্করের সহিত তাঁহার ঐক্য। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি তাঁহার মহিলা বন্ধু Joeকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই এইটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—"Bonds are breaking, love is dying, work becoming tasteless—the glamour is off life. Now only the voice of the Master calling···Yes, I come, Nirvana is before me. I feel it at times, the same infinite ocean of peace, without a ripple, a breath." অর্থাৎ—"সব বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, প্রেম ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কর্ম্ম বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে—জীবনে আর জ্যোতি নাই। এখন শুধু গুরুর ডাক শুনিতেছি,—হাঁ, এবার যাই, নির্ব্বাণ আমার সম্মুখে—মাঝে মাঝে আমি ইহা উপলব্ধি করি—সেই অনন্ত শান্তিসমুদ্র, তাহাতে না আছে তরঙ্গ, না আছে বায়ু।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আর একটি জিনিষকেও খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—সেটি হইতেছে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। তিনি দেখিলেন তমসাচ্ছন্ন ভারত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে,—তাহাকে বাঁচাইতে হইলে সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন, ভারতবাসীকে বহুকাল,

পরে আবার কর্ম্মের বাণী শুনাইয়া তাহাদের মধ্যে তিনি নূতন জীবনের সঞ্চার করিলেন। শঙ্করের মায়াবাদের সহিত এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সমন্বয় কেমন করিয়া হইবে তাহা দেখাইবার তিনি বিশেষ কোন প্রয়াস করেন নাই—সত্য বলিয়া যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন নির্ভীকভাবে তাহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, মানুষের যুক্তিতর্কে কোথায় কোন্ অসঙ্গতি বাহির হইবে তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। বুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার নিজের পক্ষেও তাহা সমানভাবেই প্রযুজ্য—"Shankara sometime resorts to sophistry in order to prove that the ideas in the books go to uphold his philosophy. Buddha was more brave and sincere than any teacher. He said, 'Believe no book; Vedas are all humbug. If they agree with me, so much the better for the books." অর্থাৎ "শঙ্কর কখনও কখনও নিজ মত সমর্থন করিতে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধের ন্যায় এমন নির্ভীক এবং সত্যসন্ধ শিক্ষাদাতা আর কেহই ছিলেন না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "কোন শাস্ত্রেই বিশ্বাস কোরো না; বেদ সব বাজে, আমার মতের সহিত কোথাও যদি তাহাদের মিল হয় সেটা তাহাদেরই লাভ।"

দক্ষিণ ভারতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিবার সময় একজন শ্রোতা স্বামীজীর (বিবেকানন্দ) কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"কিন্তু শঙ্কর ত এমন কথা বলেন নাই।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"না, শঙ্কর বলেন নাই। কিন্তু আমি বিবেকানন্দ, আমি এই কথা বল্‌ছি।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কাজ প্রকৃষ্টভাবেই করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মের নামে ভারতবাসী যে-সব গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানকে অজ্ঞ তামসিকতার বশে ধরিয়া রহিয়াছে সে-সবের ব্যর্থতা ঘোষণা করিয়া তিনি ভারতবাসীকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনাইয়াছেন। অন্যদিকে মুমূর্ষু ভারতবাসীর মধ্যে তিনি অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ জাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে এখনও সমন্বয় হয় নাই, সে সমন্বয়ের যে প্রয়োজনীয়তা আছে এখন তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা * এখন দেখাইয়া

* Dr. Albert Schweitzer, Prof. Heiler, Karl Barth.

দিতেছেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা হইতেছে negation of life, উহা জীবনকে অস্বীকার করে, শঙ্করের ভাষায় "বৈনাশিক"—উহার সহিত জীবন ও কর্ম্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বেদান্ত ও বিবেকানন্দকে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সম্প্রতি একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, "জীবনে যাহারা অকৃতকার্য্য হয় তাহারাই বেদান্তের ভক্ত হয়।" এইসব অধ্যাপকদের প্রভাবে ছাত্র সমাজেও আজকাল নাস্তিকতার ভাব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে—ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাহারা জাতীয় উন্নতির বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেছে। অতএব ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ আদর্শ ও স্বরূপটি কি, উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার সহিত পূর্ণতম জীবন, বিশালতম কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের সূত্র কোনখানে তাহা আজ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর গীতার শিক্ষার মধ্যেই সেই সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে, গীতা অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ ঠিক এই প্রশ্নটি তুলিয়া ইহার চরম সমাধান করিয়াছে।

গীতার সমাধানের এই সূত্রটি রহিয়াছে দুই প্রকৃতির বিভেদের মধ্যে। শঙ্করের মতে অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার স্বরূপ অজ্ঞান, ইহা সৎ ও অসৎ অতএব অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু শঙ্কর যাহাকে মায়া বলিয়াছেন, গীতায় বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির নীচের রূপ, অসৎ রূপ। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির আর একটি রূপ আছে, তাহা সৎ, তাহাই পরা প্রকৃতি, সচ্চিদানন্দময়ী ভাগবত প্রকৃতি। জগৎ মূলতঃ এই পরা প্রকৃতিরই সৃষ্টি, অপরা প্রকৃতি হইতেছে তাহারই এক নিম্নতন mechanical যন্ত্রবৎ প্রক্রিয়া। মানুষের বর্ত্তমান জীবনে এই অপরা প্রকৃতিরই অজ্ঞান খেলা চলিতেছে, ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া এখানে পরা প্রকৃতির জ্ঞানের ক্রিয়ার বিকাশ করিলেই মানুষ দিব্য জন্ম লাভ করিবে, তাহার কর্ম্ম দিব্য কর্ম্মে পরিণত হইবে। গীতার এই দুই প্রকৃতির বিভেদের নিগূঢ় তত্ত্বটি শ্রীঅরবিন্দই প্রথম তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় (Essays on the Gita) দেখাইয়া দিয়াছেন। শঙ্কর পরা প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে প্রকৃতির একই রূপ এবং তাহা হইতেছে অজ্ঞান অবিদ্যা। বস্তুতঃ গীতাও এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে নাই। গীতার পদ্ধতিই হইতেছে কোথাও দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া বেশী আলোচনা না করা। পুরুষোত্তম ও পরা প্রকৃতির তত্ত্ব

অবতারণা করিয়া গীতা দেখাইয়াছে, এই জগৎ মিথ্যা নহে, এই সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহার মধ্যে থাকিয়াই, ইহৈব, মানুষ সংসারের সকল দুঃখকে জয় করিতে পারে। দার্শনিকতার দিক দিয়া এইটুকু ইঙ্গিত মাত্র বুঝিয়া কেমন করিয়া মানুষ এই আদর্শ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে পারে গীতা তাহারই কার্য্যকরী পন্থা ও সাধনাটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই গীতার যোগ। গীতা প্রধানতঃ দার্শনিক গ্রন্থ নহে, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, ইহা হইতেছে প্রধানতঃ যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে। গীতার এই পরা প্রকৃতিকেই রামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপিনী জগন্মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে জগন্মাতাকে স্বীকার করেন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি জগন্মাতাকে স্বীকার করেন। শঙ্করের সৎ-অসৎ অবিদ্যারূপিনী মায়া আর গীতার পরা প্রকৃতি বা রামকৃষ্ণের চিন্ময়ী জগন্মাতা এক নহে। জগন্মাতাকে, ব্রহ্মেরই চিন্ময়ী শক্তিকে স্বীকার করিলে এই জগৎকে আর মিথ্যা বলা যায় না। অনন্ত চিৎশক্তি হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা কখনই নিরর্থক হইতে পারে না—এই জগৎ এক নিগূঢ় ভাগবত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ ও তাহার জীবন এই ভাগবত কর্ম্মেরই অঙ্গ—অতএব এসবকে মিথ্যা নিরর্থক বলিয়া জগৎ হইতে, জীবন হইতে সরিয়া যাইলে যে জন্য মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্বটি এযুগে শ্রীঅরবিন্দই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন তাঁহার The Life Divine নামক গ্রন্থে; দিব্য যোগসাধনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার মধ্যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ তন্ত্র সবেরই সার সমন্বয় দেখিতে পাই। এই দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় ভারতের যে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ধারা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও সিদ্ধিতে। দিব্য দৃষ্টি লইয়া তিনি দেখিয়াছেন,

"Earth-life is not a lapse into the mire of something undivine, vain and miserable, offered by some Power to itself as a spectacle or to the embodied soul as a thing to be suffered and then cast away from it : it is the scene of the evolutionary unfolding of the being which moves towards

the revelation of a supreme spiritual light and power and joy and oneness, but includes in it also the manifold diversity of the self-achieving spirit. There is an all-seeing purpose in the terrestrial creation ; a divine plan is working itself out through its contradictions and perplexities which are a sign of the many-sided achievement towards which are being led the soul's growth and the endeavour of nature." (The Life Divine, Vol. II, pp. 563-64).

ইহার ভাবার্থ, এই পার্থিব জীবন মিথ্যা নহে, অপবিত্র নহে, নিরর্থক নহে, ইহার ভিতর দিয়া ভগবানই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকট করিতেছেন—ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া ইহা এক পরম অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি এবং আনন্দ ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পিছনে রহিয়াছে ভগবানের সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী ইচ্ছাশক্তি—সংসারের সকল দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সমস্যার ভিতর দিয়া এক সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে—পার্থিব জীবনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার এত বহুলতা হইতেছে মানুষ যে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় সম্পদময় দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহারই পরিচায়ক।

পার্থিব মানবজীবনের মহত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে এমন কথা এমনভাবে ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন দার্শনিকই বলিতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর জীবন ও কর্ম্মের যে আদর্শ গীতা মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছিল, অর্জ্জুনের মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও যাহা বুঝা কঠিন হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, শত শত বৎসর পরেও আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী যাহার মর্ম্মটি প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব যোগশক্তিবলে সেইটিকে সমুজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন, আধুনিক মানুষের মন এসম্বন্ধে যত প্রশ্ন তুলিতে পারে, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে সে-সবের সম্যক সমাধান করিয়াছেন, এবং মানুষ কার্য্যতঃ যাহাতে জীবনে উহা অনুসরণ করিতে পারে তাহারও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ও সাধনা দেখাইয়া দিয়াছেন।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ। সকল প্রকৃত সুখ ও আনন্দের উৎস হইতেছে আত্মা এবং তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছে।

অজ্ঞান মানুষসুখের আশায় বাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাই তাহাকে জীবনে অনেক আঘাত পাইতে হয়, অনেক দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। বাহ্য বিষয়ে এই আসক্তি বর্জ্জন করিয়া অন্তর্মুখী হওয়া, অন্তরের মধ্যেই সুখ ও শান্তির সন্ধান করা—ইহাই হইতেছে সকল আধ্যাত্মিকতার মূল কথা এবং গীতা এইটির উপর খুবই জোর দিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি শুধু এই দিকটাই দেখি, গীতার অন্যান্য অংশের সম্যক হিসাব না লই তাহা হইলে মনে হইবে গীতা এইভাবে কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিয়া নীরব নিশ্চল আত্মার মধ্যেই সমাধিস্থ হইতে বলিয়াছে। বস্তুতঃ সন্ন্যাসীগণ এই ভাবেই গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের এই ২৪ শ্লোকটির ব্যাখ্যায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—"তিনি অন্তঃসুখঃ অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে যে সুখ জন্মায় তাহা তাঁহার নাই। আত্মাতেই যাঁহার আরাম অর্থাৎ আরমণ বা ক্রীড়া, কিন্তু বহিঃসুখসাধন স্ত্রী-আদি বিষয়ে যাঁহার আরাম নাই তিনিই অন্তরারাম অর্থাৎ সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাহ্যসুখসাধন-বিহীন। কিন্তু যিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারও ত কোকিলাদির মধুর শব্দ শ্রবণ, মন্দ মলয় পবন স্পর্শন, চন্দ্রোদয়, ময়ূর-নৃত্য প্রভৃতি দর্শন, অতি মধুর শীতল গঙ্গাজল পান এবং কেতকীকুসুমসৌরভ আদির আঘ্রাণ প্রভৃতি গ্রাম্যভাব হইতে যখন সুখোৎপত্তি হয় তখন তিনি যে বাহ্যসুখশূন্য এবং বাহ্যসুখসাধনবিহীন ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ,'—তাঁহার সুখ যেমন অন্তরেই আছে কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় না সেইরূপ কেবল অন্তরেই অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান—কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় হইতে যাঁহার বিজ্ঞান জন্মে না অর্থাৎ যাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারই নাই তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে তাহা তাঁহার নাই। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, সমাধি অবস্থায় তাঁহার শব্দাদি বিষয়ের প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞান হয় না, আর ব্যুত্থানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য অবস্থায় সেই শব্দাদি বিষয়-সকলের প্রতীতি হইলেও তিনি সেইগুলির মিথ্যাত্ব অবধারণ করেন অর্থাৎ সেইগুলি যে স্বরূপতঃ মিথ্যা তাহা তিনি তৎকালে নিশ্চিত অবগত থাকেন, এই কারণে বহির্বিষয় হইতে তাঁহার সুখ উৎপন্ন হয় না।"

কিন্তু বস্তুতঃ কি গীতা এইভাবে সকল প্রকার বাহ্য সুখভোগ বিলুপ্ত করিবার শিক্ষা দিয়াছে? গীতার অন্যান্য অংশ অবধারণ করিলে কখনই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। গীতা শব্দাদি বিষয়কে কোথাও মিথ্যা বলে নাই, বরং বলিয়াছে যে, সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে সারবস্তু তাহা ভগবান নিজেই—রসোঽহমপ্সু। সংসারে যাহা কিছু বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, উর্জ্জিত বস্তু, যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর, সুখপ্রদ সে সবই ভগবানের বিভূতি। অতএব যে ব্যক্তি ভগবানকে চায়, ভগবানের সহিত সমগ্রভাবে যুক্ত হইতে চায়, তাহাকে যেমন অন্তরের মধ্যে তেমনই বাহ্য জগতের সকল বস্তুর মধ্যেও ভগবানকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আগে অন্তরের মধ্যে ভগবানকে না পাইলে বাহিরের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, সেই জন্যই গীতা অন্তর্মুখী হইবার উপদেশ দিয়াছে, বাহ্য জগৎ, বাহ্য বিষয়কে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়া অন্তরের মধ্যেই লীন সমাধিস্থ হইবার জন্য নহে। বাহ্য বিষয়ে যতক্ষণ অজ্ঞান আসক্তি থাকে, ঐ বস্তুটি আমার চাই-ই এইরূপ তীব্র বাসনা থাকে, আত্মপর ভেদ করিয়া ভোগ্যবস্তু সকলকে একান্তভাবে নিজের অধীন করিবার জন্য আগ্রহ থাকে ততদিন কাম ক্রোধের বেগ অনিবার্য্য এবং কাম ক্রোধ থাকিলে কেহই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে না—সেই জন্যই গীতা এখানে বাহ্য বিষয়ে আসক্তি বর্জ্জন করিয়া অন্তর্মুখী হইতে বলিয়াছে, সুখের আশায় বাহ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান না হইয়া আত্মার মধ্যে যে অখণ্ড সুখ ও শান্তি রহিয়াছে তাহারই সন্ধান করিতে বলিয়াছে। আত্মার শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর বাসনা কামনার বেগ থাকিবে না, বাহ্য বস্তুকে ভোগের জন্য ধরিবার আগ্রহ থাকিবে না, পরন্তু তখন যোগী নিজের আত্মার মধ্যে যে আনন্দ পাইবেন বাহ্য বস্তুর মধ্যেও সেই একই আত্মাকে দেখিয়া সেখানেও সেই আত্মানন্দকেই বিচিত্রভাবে লাভ করিবেন—বাহ্য বস্তু হইতে তিনি যে সুখ পাইবেন তাহা সেই বাহ্য বস্তুর জন্য নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহারই জন্য। উপনিষদে বলা হইয়াছে—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

ন বা অরে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫।

"পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পতি প্রিয়। জায়ার জন্য জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই জায়া প্রিয় হয়। সুখস্বরূপ আত্মাই এই সব বিষয়, সমস্তই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য। আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্ত জ্ঞানই সুবিদিত হয়। যাহার দ্বারা জীব সুখ অনুভব করে, সুখের কামনা করে, তাহার ভিতরেই আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন।"

উপনিষদের এই ভাষা হইতে আমরা বাহ্য বস্তু ত্যাগের কোন ইঙ্গিত পাই না, পরন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়া সকল বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে রহিয়াছে। বেদেও আমরা দেখিতে পাই, ভোগমূলক গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বে যে ঋষিরা ছিলেন, যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে সত্য বিষয়ে আলাপ করিতেন—তাঁহারা অপত্যের জনক হইয়াছিলেন এবং সে কারণে ব্রতচ্যুত হন নাই।" অথর্ব বেদে দেখিতে পাই পতি পত্নীকে বলিতেছে,

সামাহং ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।—অথর্ব ১৪।২।৭১

"আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্বেদ; আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী।"

এই যে স্বর্গকে স্বামীর সহিত এবং পৃথিবীকে স্ত্রীর সহিত তুলনা করা, ইহা হইতেই আমরা বৈদিক আদর্শের সুন্দর পরিচয় পাই। এই পার্থিব জীবনকে হীন অশুদ্ধ বৃথা বলিয়া বর্জ্জন করা নহে, পরন্তু স্বর্গের সহিত মিলিত করিয়া স্বর্গের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের দ্বারা এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিয়া তোলা, ইহাই ছিল বৈদিক আদর্শ—গীতা এই আদর্শটিই গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে, পুরুষ স্ত্রীকে ব্রহ্ম লিয়া দেখিবে, স্ত্রী পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখিবে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনন্ত আত্মাকে দেখিয়া পরস্পরের সহিত মিলনে অনন্ত বৈচিত্র্যময় আত্মানন্দ উপভোগ করিবে—ইহা মুখের কথায় হয় না, এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া সহজেই ব্রতচ্যুতি হইতে পারে, সেই জন্যই গীতা আত্মাকে জানিয়া, ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই হইবার উপর এত জোর দিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে বাহ্য বিষয়ে সকল আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিয়া অন্তরের মধ্যেই আত্মানন্দের সন্ধান করিতে বলিয়াছে। গীতা যে সাধনার পথ দেখাইয়াছে তাহার সহিত সন্ন্যাসীদের প্রদর্শিত মার্গের অনেক দূর পর্য্যন্ত

খুবই মিল আছে, এমন কি গীতা বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি গীতা কখনও সংসারের জীবন ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই—নির্ব্বাণের সহিতই সংসারের কাজের সমন্বয় করিয়াছে, এইখানেই গীতার বিশিষ্ট মহত্ত্ব। ঋগ্বেদে ঋষি বলিতেছেন,

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্। তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ—

—ঋগ্বেদ ১০।৫৮।১০

"তোমার যে-মন এই সারা বিশ্বের মধ্যে সুদূরের পারে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি।"

মানবাত্মা নির্ব্বাণের পরম শান্তি উপলব্ধি করিয়া আবার এই সাংসারিক জীবনেই ফিরিয়া আসিবে, সেই শান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে সংসারের সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবে, ইহাই গীতার শিক্ষা।

শঙ্কর "অন্তরারামঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মাতেই যাহার আরাম বা আক্রীড়া তিনিই অন্তরারামঃ। অনেকেই এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ-ব্যাখ্যা সঙ্গত। আরাম শব্দের অন্য অর্থ হইতেছে বিশ্রাম, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং এই অর্থও এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি বাহিরের কোন বস্তুতে নহে পরন্তু আত্মাতেই প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করেন তিনিই অন্তরারাম। অন্তঃসুখ এবং অন্তরারাম এই দুইটি শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে, যে-ব্যক্তি আত্মাতেই সুখ ও শান্তি লাভ করেন। ইহাদের দ্বারা বুঝায় না যে, তিনি বাহ্য বস্তু বর্জ্জন করেন, বাহিরে আর তাঁহার কোন ক্রীড়া বা কর্ম্ম থাকে না—পরন্তু আত্মাই হয় তাঁহার সুখ ও শান্তির ভিত্তি, সেই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি সংসারের সকল কর্ম্ম করেন, সংসারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই সেই এক আত্মাকে দেখিয়া সর্ব্বত্রই পরম আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন। গীতার এই কয়টী শ্লোকের সহিত মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম কয়টি শ্লোকের বেশ মিল আছে। সেখানে বলা হইয়াছে,

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৪

"যিনি আত্মাতে ক্রীড়া করিয়া সকল কর্ম্ম করেন (ক্রিয়াবান), আত্মাতেই যাঁহার সকল সুখ ও আনন্দ, তিনিই হইতেছেন ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" অতএব এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে-ব্যক্তি সকল বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্ হইলেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নহেন, ব্রহ্মকে তিনি সমগ্রভাবে জানেন না ইহাই উপনিষদের অভিমত এবং এইটি গীতারও অভিমত। গীতা পরের শ্লোকেই এইরূপ যোগী সম্বন্ধে বলিয়াছে যে তিনি সর্ব্বভূতের হিত-সাধনে রত থাকেন।

তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মাই যাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ তিনি অন্তর্জ্যোতি। শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আত্মাতে যাঁহার দৃষ্টি, বাহিরের নৃত্য গীতাদিতে নহে, তিনিই অন্তর্জ্যোতি। মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যিনি সমাধিস্থ, বহিরিন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপারই যাঁহার নাই, যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থাপন করিয়াছেন তিনিই অন্তর্জ্যোতি। কিন্তু আত্মা যেমন ভিতরে রহিয়াছে, তেমনিই সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যেও রহিয়াছে, * তাহা হইলে যাহার নিকট আত্ম-জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে বর্হির্জগৎ বিলুপ্ত হইবে কেন? বস্তুতঃ অন্তর্জ্যোতি হইতেছেন তিনি যাঁহার সকল জ্ঞান আত্মা হইতেই উৎসারিত হয়। আত্মা স্বয়ংজ্যোতি, স্বয়ম্প্রকাশ, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে,

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৫

"জ্যোতির্ময় শুভ্র (সমুজ্জ্বল) সেই আত্মাকে দোষহীন যতিগণ এখানে এই শরীরের মধ্যেই দর্শন করেন।" চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা যে জ্ঞান বাহির হইতে লাভ করা যায় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র, অপূর্ণ, অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত। প্রকৃত জ্ঞান রহিয়াছে আমাদের অন্তরে, আত্মার মধ্যে—আমাদের চিত্তের মলিনতার দ্বারা তাহা আবৃত হইয়া রহিয়াছে (৫।১৫)। অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিলে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়,

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। (৪।৩৮)

সুখের জন্য, শান্তির জন্য, জ্ঞান ও আলোকের জন্য কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া যিনি অন্তর্মুখী হন, আত্মার সহিত যোগ সাধনা করেন তিনি

* প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি—মুণ্ডক, ৩।১।৪—বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্বভূতের মধ্যে যে আত্মার জ্যোতি দর্শন করেন।

যথাকালে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ-রূপ সমুচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা প্রাপ্ত হন,—ইহাই এই শ্লোকে গীতার বক্তব্য। আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্ম জীবন কি সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা, সামাজিক কর্ত্তব্যসকল পালন করা, পূজা উপাসনা করা—এই সবকেই লোকে সমুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ-সবই হইতেছে মানসিক চৈতন্যের জিনিষ। মানুষ যতক্ষণ এই চৈতন্যের মধ্যে বাস করে, ততক্ষণ তাহাকে এই সব বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়াই চলিতে হয়, কিন্তু ইহা হইতেছে অজ্ঞানের জীবন, প্রকৃত সুখ ও শান্তি ও জ্ঞান ইহার মধ্যে নাই, যদিও এই সবের দ্বারাই ক্রমশঃ মানুষ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু সেই জীবন লাভ করিতে হইলে মানুষকে এই বাহ্য মানসিক চৈতন্যের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহার জ্যোতিতে, আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সে জন্য অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সহিত যোগাভ্যাস করিতে হইবে।

গীতা এইরূপে অন্তর্মুখী হইবার উপর এখানে বিশেষ জোর দিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে, গীতা বুঝি বাহ্য কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ দিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই যে গীতার আদর্শ নহে, এই পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যেই গীতা তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং। অন্তরেই যাহার সুখ ও শান্তি, অন্তরেই যাহার জ্ঞান ও আলোক, সেই যোগীপুরুষ ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। এখানে যোগী শব্দে কেহ বুঝিয়াছেন কর্ম্মযোগী, কেহ বুঝিয়াছেন সাংখ্যযোগী, আবার কেহ বুঝিয়াছেন বাহ্যসংজ্ঞাহীন সমাধিস্থ পুরুষ যাঁহার নিকট বাহ্য জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যযোগী ও কর্ম্মযোগী এরূপ প্রভেদ যাহারা করে গীতা তাহাদিগকে জ্ঞানহীন বালকের সহিত তুলনা করিয়াছে। গীতার মতে যোগ শব্দের অর্থ হইতেছে ভগবানের সহিত মানবাত্মার যোগ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সবের ভিতর দিয়াই এই যোগের সাধনা করিতে হয় এবং এই তিনের সমন্বয়েই ভগবানের সহিত পূর্ণতম যোগ সাধিত হয়। মানবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে, ইহাই গীতার বক্তব্য, এবং ইহা বেদ ও উপনিষদের বাণী (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০ ; মুণ্ডক ৩।১।১,২)।

এই অমৃতত্বের ভিত্তি হইতেছে নির্ব্বাণ। গীতা নির্ব্বাণ বলিতে সর্ব্বসত্তার বিলোপ অথবা বাহ্য জগৎ-চৈতন্যের বিলোপ বুঝে নাই,—ইহা সুস্পষ্ট। গীতার মতে নির্ব্বাণের অর্থ হইতেছে ব্রহ্মে অর্থাৎ নীরব নিশ্চল নির্ব্যক্তিক অক্ষর আত্মায় ক্ষুদ্র অহং-ভাবের নির্ব্বাণ।

ব্রহ্মভুতোঽধিগচ্ছতি। বাহ্য বিষয়ে সকল প্রকার আসক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিয়া আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করিলে আমরা সেই আত্মাকেই আমাদের মূল সত্তা বলিয়া অনুভব করি, আমরা সেই আত্মাই হইয়া উঠি, ইহাই ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ, এই ভাবেই আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ হয়—এবং ইহাকেই গীতা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—গীতা বলিতেছে আমরা ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করি, অতএব আমাদের সত্তার বিলোপ হয় না, কেবল ব্রহ্মের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বিলয় হয়। ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে হয়, ইহা উপনিষদেরও কথা,

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৬

ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ আমরা যে আমাদের মূল সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক ইহাই উপলব্ধি করা, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। বেদান্ত দর্শনেও বলা হইয়াছে, অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২২)—"কাশকৃৎস্ন আচার্য্য বলেন পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত।" কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, গীতা কোথাও বলে নাই যে, মানবাত্মা ভগবান হয়, পুরুষোত্তম হয়—গীতার বক্তব্য এই যে, জীব ব্রহ্ম হইয়া পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতা বলিয়াছে, জীব পুরুষোত্তমেরই অংশ, মুক্তি লাভে সে সজ্ঞানে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে, মূল সত্তায় সে পুরুষোত্তমের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে, অথচ সেই একত্বের মধ্যেই পুরুষোত্তমের সহিত চিরকাল তাহার একটা ভেদ থাকে, জীবের জীবত্ব বা ব্যষ্টিত্ব কখনই লোপ পায় না, মমৈবাংশো সনাতনঃ। অতএব বৌদ্ধরা যে বলেন, সর্ব্বসত্তার বিলোপ সাধনই মানুষের পরম গতি, অথবা অন্য বৈদান্তিকেরা যে বলেন, ব্রহ্মের মধ্যে সকল ব্যষ্টিগত সত্তা বা জীবত্বের বিলোপ সাধনই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য, 'পূজান্তে প্রতিমা নিরঞ্জনের মত

জীবত্বের সেথা নিরঞ্জন। ইহাই চরম গতি, ইহাই মহামুক্তি, কর্ম্মময় জীব-জীবনের ইহাই শেষ সীমা' (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)—গীতা কোথাও এই আদর্শ শিক্ষা দেয় নাই। আমরা যে অজ্ঞানের বশে আমাদের অহংকেই আমাদের প্রকৃত ব্যষ্টি সত্তা বলিয়া মনে করি, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া, সর্ব্বভূতের এক আত্মাকেই আমাদের আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া এই অজ্ঞান অহংভাবকেই ধ্বংস করিতে হইবে—ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। তখন আমরা মূলতঃ ভগবানের সহিত এক হইয়াও, কর্ম্মজীবনে তাঁহার অংশরূপে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব, ব্রহ্মভূতঃ মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ (১৮।৫৪)।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে।

অনুবাদ—যাঁহাদের পাপের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে এবং সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্। নির্ব্বাণতত্ত্ব হইতেছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধগণের মতে নির্ব্বাণই হইতেছে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। গীতাও বলিয়াছে যোগী পুরুষ ব্রহ্ম হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাহা হইলে গীতা কি বৌদ্ধদের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে? নতুবা পুনঃ পুনঃ এই "নির্ব্বাণ" শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি?

গীতার কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারই এই প্রশ্নটির আলোচনা করেন নাই, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত গীতার যে কোন সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান নাই, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তাঁহারা এক প্রকার "অস্পৃশ্য" করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, গীতার উদার সমন্বয়মূলক শিক্ষায়

বুদ্ধের শিক্ষা অবহেলিত হয় নাই। যেমন অন্যান্য দর্শন ও সাধন-প্রণালীর মধ্যে তেমনই বৌদ্ধ সাধনার মধ্যেও যে সার সত্য আছে গীতা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে এবং নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে।

ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ বুদ্ধ নিজে নির্ব্বাণের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। নির্ব্বাণের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং সে-চেষ্টা করায় কোন লাভই নাই,—কেমন করিয়া মানুষ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বুদ্ধ নিজেই ছিলেন নির্ব্বাণের জীবন্ত আদর্শ—গীতা যে নিষ্পাপ সংশয়হীন আত্মজয়ী সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষির নির্ব্বাণ-লাভের কথা বলিয়াছে বুদ্ধ নিজেই ছিলেন সেইরূপ ঋষি—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়াই লোকে নির্ব্বাণের স্বরূপ উপলব্ধি করিত—মুখের কথায় তাহার ব্যাখ্যা করার আবশ্যক হইত না। বস্তুতঃ এই সব অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভাষায় ঠিক মত প্রকাশ করা যায় না, তর্কবুদ্ধির দ্বারা সে-সব ঠিক মত গ্রহণও করা যায় না। বুদ্ধ বা খৃষ্ট বা মহম্মদ জীবনে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বা কি উপদেশ দিয়াছিলেন—সে-সবই হইতেছে বাহ্য জিনিষ, সে-সব হইতে তাঁদের ঠিক পরিচয় মিলেনা—যদিও বহির্মুখী বুদ্ধি এই সব বাহ্য জিনিষ দিয়াই অবতার বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিতে চায়, স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং? বস্তুতঃ তাঁহারা কি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি অধ্যাত্ম সত্য প্রকট হইয়াছিল, নিজেরা কি হইয়া পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে কি হওয়া তাঁহারা সম্ভব করিয়াছিলেন, কোন্ অভিনব অধ্যাত্ম সিদ্ধির পথ তাঁহারা খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়—তাঁহাদের সেই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্মসিদ্ধির যতটুকু ইঙ্গিত তাঁহাদের বাহ্য আচরণ বা উপদেশ হইতে পাওয়া যায় তাহাতেই তাঁহাদের সার্থকতা। তাঁহাদের জীবিতকালে, তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রভাবের সহায়তায় মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে যে সাহায্য পায় পরে আর সেইরূপটি সম্ভব হয় না; তখন তাঁহাদের প্রবচন ও উপদেশাদির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, আর সে-সব লইয়া মানুষের বুদ্ধি তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নানা গোলমালের সৃষ্টি করে। বুদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই—নির্ব্বাণের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু লঙ্কাবতার-সূত্র নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বিংশতি প্রকার বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই

সব বিভিন্ন মতে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ নিজে বেদ, উপনিষদ বা ভারতের কোন দার্শনিক সম্প্রদায়কে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজের সাধনার দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই নিজের ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন—তথাপি সত্য একই, এবং তাঁহার শিক্ষার সহিত ভারতের বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার মূলতঃ কোন প্রভেদই নাই একথা বলিলে বুদ্ধের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব্ব করা হয় না। অন্যপক্ষে বুদ্ধ প্রকাশ্যভাবে বেদের (প্রামাণিকতা) স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—এ মনোভাব ঠিক নহে, বস্তুতঃ গীতায় আমরা এরূপ মনোভাবের কোন পরিচয় পাই না। মানব জাতির অধ্যাত্ম ক্রম-বিকাশে বুদ্ধের সাধনা ও সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, গীতা সেইটিই দেখাইয়া দিয়াছে।

নির্ব্বাণ বলিতে সাধারণতঃ সর্ব্বসত্তার বিনাশ বা লোপ বুঝা হয়। নির্ব্বাণ কথাটিই এইরূপ অর্থের দ্যোতক। বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনেক স্থলে নির্ব্বাণের সহিত দীপ নির্ব্বাণের তুলনা করা হইয়াছে। যথা,

খিণম্ পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবম্,
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিন্,
তে খিণবীজা অবিরুলহচ্ছন্দা,
নিব্বন্তি ধিরা যথায়ম্ পদিপো। —রতন সুত্ত, ১৪।

"পুরাতন ধ্বংস হইল, আর নূতনের উদ্ভব নাই। যাঁহাদের মন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি বিরক্ত, যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি (জীবনের) বীজকেই বিনষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদের বাসনা আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হন।" তাহা হইলে নির্ব্বাণের পর কি আর কোন সত্তা বা অস্তিত্বই থাকিবে না? হিন্দু দার্শনিকগণ নির্ব্বাণের এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই বৌদ্ধগণকে "বৈনাশিক" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ এইরূপ সত্তার বিনাশকেই জীবনের চরম পরিণতি বলেন মনে করিয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন,

নাস্তি অহম্ ন ভবিষ্যামি ন মেঽস্তি ন ভবিষ্যতি।
ইতি বালস্য সন্ত্রাসঃ পণ্ডিতানাং ভয়ক্ষয়ঃ ॥*

* এই প্রাচীন শ্লোকটি কমল শীল কর্ত্তৃক তত্ত্বসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

—"অহংয়ের কোন অস্তিত্ব নাই, কখনও থাকিবেও না, তেমনই আমার বলিয়া কিছুই নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। এই সত্য অল্পবুদ্ধি বালকদেরই সন্ত্রাস উদ্রেক করে, পরন্তু পণ্ডিতদের পক্ষে ইহা হইতেছে সকল ভয়ের বিনাশক।"

তত্ত্ব-সংগ্রহে (৩৩২২) উদ্ধৃত এই প্রাচীন বৌদ্ধ শ্লোকটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধগণ অহং বা ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সত্তারই অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাকেই তাঁহারা আত্মা বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ভ্রমাত্মক, ইহাই জন্ম ও জীবনের মূল এবং সেই সঙ্গে সকল দুঃখের মূল—অজ্ঞানের নাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রমাত্মক অহং বা আত্মারও লয় হয় এবং প্রকৃত পক্ষে ইহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু তাহার পর থাকে কি? এই প্রশ্নের অনেক রকম উত্তর দেখা যায়, তাহাদিগকে মোটামুটি চারিটিতে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রথম, নির্ব্বাণের পর আর কোন কিছুই বিদ্যমান থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তবে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণের যে ইহা মত নহে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, নির্ব্বাণের পর কেবল শুদ্ধ চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে তাহাতে অহংভাবের লেশ নাই, কোন ক্লেশ বা দুঃখের অবশেষ নাই। এইটি হইতেছে বিখ্যাত বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদীগণের মত। বসুবন্ধু তাঁহার ত্রিংশিকা নামক গ্রন্থে নির্ব্বাণের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,

অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ॥ ২৯
স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্ম্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ॥ ৩০

এই কারিকা দুইটিতে দেখান হইয়াছে কিরূপে যোগী উত্তরোত্তর নির্ব্বাণ লাভ করেন। সাধারণ মানুষের দুই প্রকার মায়া বা ভ্রান্তি আছে, তাহাদিগকে গ্রাহদ্বয় বলা হয়। বিজ্ঞান বা চৈতন্য হইতে পৃথক অবস্থাতেও গ্রাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহ্যগ্রাহ। আর বিজ্ঞানের দ্বারাই বাহ্যবস্তু বিজ্ঞাত, প্রতীত ও সমধিগত হইতেছে, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহকগ্রাহ। বসুবন্ধু তাঁহার "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিবিংশতিকা" নামক গ্রন্থের প্রথম কারিকায় বলিয়াছেন "বিজ্ঞান মাত্রই এমন সব বস্তুর

অবভাসনের বিজ্ঞান যাহাদের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই; উপমা—চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন যেখানে কেশ নাই সেখানেও কেশ দেখিতে পায় বলিয়া মনে করে, এবং আকাশে দুইটি চন্দ্র উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে।" অর্থাৎ আমরা যে বাহিরে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী—এই বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখি, আমাদের চৈতন্যের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্বই নাই—এ-সবই হইতেছে আমাদের চৈতন্যেরই ক্রিয়া। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাই Subjective Idealism বলিয়া খ্যাত। শঙ্করের মায়াবাদেরও উৎপত্তি এইখানে; শঙ্করও জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়াছেন। পূর্ব্বে আর কেহই এইরূপ মত প্রকাশ করে নাই। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমতের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে—শঙ্করাচার্য্য এই মতের নিন্দা করিলেও প্রকারান্তরে এইটিই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। এই মায়া বা গ্রাহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মোক্ষ; বৌদ্ধমতে ইহাই নির্ব্বাণ, বসুবন্ধু এই অবস্থাকেই "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা" নামে অভিহিত করিয়াছেন—কারণ সেখানে আর গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভ্রান্তি নাই, তখন যোগী হইয়া পড়েন "অচিত্ত" এবং "অনুপলম্ভ", তখন আর সাধারণ মানস-চৈতন্য বা বাহ্য-জগতের উপলব্ধি থাকে না, যোগী যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন তাহা পার্থিব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প (undiscriminating) ও "লোকোত্তর" (transcendental)। এ-পর্য্যন্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের সহিত শঙ্করের মতের কোন প্রভেদই নাই। বৌদ্ধগণ এই শুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু কোন চৈতন্যময় বা জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শঙ্করেরও যে ব্রহ্ম তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের লেশ নাই—তাহার স্বরূপই জ্ঞান, চৈতন্য—তিনি নির্গুণ নির্ব্যক্তিক। প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ এই নির্গুণ, নিরূপাধি জ্ঞানকে ব্রহ্ম-নামে অভিহিত না করিয়া কোথাও নির্ব্বাণ, কোথাও শূন্য আবার কোথাও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মকে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু এই শুদ্ধ বিজ্ঞান বা চৈতন্যের মধ্যে গ্রাহ বা মায়ার উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? এই মায়া হইতেই জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহাই দুঃখের আলয়। সত্যময় ব্রহ্মের মধ্যে এই মিথ্যাময়, সকল দুঃখের আলয় জগৎ কেমন করিয়া আসিল?

এই প্রশ্নটিই হইতেছে সকল দর্শনশাস্ত্রের চরম প্রশ্ন—ইহার উত্তরেই দর্শনে দর্শনে সকল প্রভেদ হইয়াছে, এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না হইলে সংসারের এবং মানবজীবনের প্রকৃত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় না। বিজ্ঞানবাদী বলেন মূলে বাস্তব কিছু না থাকিলে মিথ্যা জ্ঞানও সম্ভব হয় না। তাঁহার মতে বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু কোন প্রকার বাহ্যবস্তু না থাকিলেও বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর আকার গ্রহণ করে, ইহাই বিজ্ঞানের "পরিণাম" বলিয়া আখ্যাত। কিরূপ কারণ-পরম্পরায় বিজ্ঞানের এই পরিণাম হয়, বৌদ্ধগণ তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত প্রতীত্য-সমুৎপাদবাদ (পালিপিটকের ভাষায়, পটিচ্চসমুপ্পাদ)।

'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হইল "কারণাবলীর সহযোগে উৎপত্তি" (dependent origination)। পালিপিটকের "পটিচ্চসমুপ্পাদ" বস্তুতঃ একটি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করাই ছিল বুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণ দূরীভূত করিতে হইলে সেই কারণেরই বা কারণ কি তাহাও জানিতে হইবে। এইভাবে অনেক দার্শনিক প্রশ্ন উত্থিত হয়, কিন্তু বুদ্ধ সে-সব আলোচনা করেন নাই—তিনি বলিয়াছিলেন, দুঃখের কারণ তৃষ্ণা (অর্থাৎ কামনা), এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে দুঃখ আপনা হইতেই দূর হইবে। বেদান্তাদি দর্শন আরও দূরে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের মূল কারণ। বৌদ্ধগণ এই মত ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াই পটিচ্চসমুপ্পাদের প্রথম রূপের (যেখানে দুঃখোদ্ভবের কারণ-পরম্পরা "তৃষ্ণা"র অধিক আর অগ্রসর হয় নাই) যে বিকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই :—অবিদ্যা হইতে জন্মে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (ছয়টি ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ (contact), স্পর্শ হইতে বেদনা (sensation), বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি), উপাদান হইতে ভব (continued existence), ভব হইতে জন্ম, এবং জন্ম হইতে জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোকাদি। ইহাই পটিচ্চসমুপ্পাদের পরিণত রূপ।

আমাদের পক্ষে এখানে এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই—কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়

কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছিল, এবং ইহার বিকাশে বেদান্তাদি দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদিগণ দুই প্রকার বিজ্ঞানের কথা বলেন—শুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা এবং আলয়বিজ্ঞান। তাঁহাদের মতে এই আলয়বিজ্ঞান সংস্কারের আশ্রয়, অহংভাবের আশ্রয় এবং সুখদুঃখময় জীবনের কারণ—এই বিজ্ঞান যখন সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত হয় তখনই তাহা হয় শুদ্ধ বিজ্ঞান—সে বিজ্ঞানের বিশেষ কোন রূপও নাই, এমন কি গ্রাহ্য (object) ও গ্রাহক (subject) এরূপ ভেদও নাই। কমলশীল স্পষ্টই ইহা বলিয়াছেন—যেষাং তু বিজ্ঞানবাদিনাং মতং সর্ব্বমেব জ্ঞানং গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে। ইহা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি।

উপনিষদে বলা হইয়াছে, একমাত্র চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে আমরা এই যে জগৎ এবং জগতে অসংখ্য জীব ও বস্তু দেখিতেছি এ-সবই সেই চৈতন্যেরই রূপ, সেই চৈতন্যের বাহিরে ইহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না। অতএব বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ যে বলেন সকল বস্তুই বিজ্ঞানের আকার বিশেষ, বিজ্ঞানের বাহিরে তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই—ইহা কিছুই নূতন কথা নহে, ইহা উপনিষদ বা বেদান্তেরই কথা। এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মের অনন্ত অসীম শুদ্ধ চৈতন্য এইরূপ দৃশ্য চিৎ অচিৎ বস্তু-সমন্বিত জগৎরূপে পরিণত হইল কেমন করিয়া? বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ বলেন, এই পরিণতির মূলে রহিয়াছে গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ (Subject-object relation) বিশ্বব্যাপী অবিদ্যা বা মায়া। এই মায়ার বশে বিজ্ঞান নিজেই গ্রাহক ও গ্রাহ্য এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। এখানেও সেই উপনিষদের প্রতিধ্বনি, তদৈক্ষত, তদসৃজত, তৎ সর্ব্বমভবৎ।—তৈত্তিরীয় ২,৬; বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

"তিনি দর্শন করিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, আপনিই সমস্ত হইলেন"।

তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ—বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

"পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি আপনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহা হইতে সমস্ত হইলেন।"

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তৈত্তিরীয়, ২।৭

"তিনি আপনিই আপনাকে (সর্ব্বরূপে) উৎপাদন করিলেন।"

নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা…বিজ্ঞাতা—বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩

"তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাতা নাই।"

কিন্তু তিনি কি দেখেন? কি জানেন? তিনি নিজেকেই দেখেন। জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেন না, তবে আপনি অন্যবৎ হইতে পারেন এবং আপনার সেই হওয়া মূর্ত্তিটি জানিতে পারেন এবং এইরূপ হওয়া বা জানা দ্বারা দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকাশের মত বিষয়ের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন। দর্পণের সাহায্যে আমরা যেমন এক হইয়াও দুই হই, নিজেই নিজেকে দেখি—সেইরূপ নিজ চিতিশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই জগৎ হন। আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি, তখন আমাদের বুদ্ধি ঐ বস্তুর আকার গ্রহণ করে, আমরা ঐ আকারকেই জানি। সকল জানার মূলেই এই তাদাত্ম্যভাব রহিয়াছে—কোন বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার সহিত এক হইয়াই তাহাকে জানা যায়। আর বদ্ধজীবের বুদ্ধি যদি বিষয়ের আকার গ্রহণ করিতে পারে, তখন মুক্তক্ষেত্রে সে যে স্বাধীনভাবে নানা রূপ গ্রহণ করিবে ইহাতে কোন অন্তরায়ই থাকিতে পারে না। চৈতন্য নিজেকে জানেন—তিনি স্বপ্রকাশ। কূটস্থ অবস্থাতেও তাঁহার এই আত্মবিষয়ক চেতনা থাকে অব্যক্ত ভাবে; সেইটি যখন ব্যক্ত হয়, ব্রহ্ম নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, ব্রহ্মাস্মীতি, তখনই হয় জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত, তিনি নিজেকে জানেন এবং তাহা হইতে সবকে জানেন—তাঁহার সর্ব্ব জ্ঞানটি হইতেছে তাঁহার আত্মজ্ঞানেরই বিস্তৃতি, তিনি নিজেকেই সব বলিয়া জানেন। আর ব্রহ্মক্ষেত্রে নিজেকে সব বলিয়া জানার অর্থই সব হওয়া। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের জগৎরূপ আকার গ্রহণ করার মূল রহস্য। "সাক্ষাৎ আত্মা হইতে এইরূপে জগৎপ্রকাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত 'অস্মি' আকারীয় মহান্ সত্তা প্রত্যয়ে খণ্ড খণ্ড বিশিষ্টতা রচনা করিয়া, সেই সকল বিশিষ্টতায় জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন ও নামরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করেন। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ—মন্বানো মনঃ—তিনি কথা কহিয়া বাগিন্দ্রিয় হইলেন, দর্শন করিয়া চক্ষু হইলেন, মনন করিয়া মন হইলেন (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭), ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-বাদের বিশেষত্ব। বস্তুতঃ অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, সমস্তই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ও ক্রিয়া-প্রকাশ—এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি (ঐতরেয় ৫।২)"—অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, পৃঃ ১২।

অতএব আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ ও বাহ্যবিষয় এ-সবই যে চৈতন্যেরই আকার—নাম ও রূপ, বৌদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিরই অনুযায়ী, যদিও তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করেন না। শ্রুতির সহিত বৌদ্ধদর্শনের প্রভেদ হইয়াছে কোন্‌খানে এবং কেমন করিয়া সেই প্রভেদ হইয়াছে, এইবারে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব। কারণ ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এই বিষয়টি হইতেছে খুবই গুরুতর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম নিজেকে জানিলেন, "আমি" বলিয়া অনুভব করিলেন, ব্রহ্মাস্মি—ইহা হইতেই জগতের সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন কূটস্থ—"আমি" "আমাকে" জানিতেছি এই আত্মজ্ঞান তাহাতে ব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু এই যে আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি, ইহা কি ব্রহ্মের মধ্যে আপনা হইতেই হইল—না, ইহাতে অন্য কোন বস্তু বা শক্তির প্রভাব আছে? সাংখ্যদর্শনের মত এই যে, পুরুষের যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে এই "আমি" ভাবের লেশ নাই—তাহা শুধুই চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয়, গ্রাহক গ্রাহ্য এমন কোন বিশেষ বা ভেদ নাই—এই ভেদ উৎপন্ন হয় যখন পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। সূর্য্যালোক যখন কোন বিষয়ের উপর পতিত হয়, তখনই তাহা আলোকরূপে প্রকট হয়, তেমনই পুরুষের চৈতন্য যখন জড়প্রকৃতির সম্মুখে আসে তখনই তাহার মধ্যে আত্ম-জ্ঞান, অহং-জ্ঞান প্রকাশিত হয়, বস্তুতঃ এই অহংজ্ঞান, অস্মিতা হইতেছে বুদ্ধির ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রকৃতিরই একটি তত্ত্ব, তাহা প্রকৃতির জড় ক্রিয়া, পুরুষের চৈতন্যে তাহা উদ্ভাসিত হইলে পুরুষ নিজকে সেই বুদ্ধির সহিত এক করিয়া দেখে, বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া অনুভব করে—এই ভাবেই হয় পুরুষের সংসার লীলা। মন, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ধর্ম্ম, পঞ্চভূত—এ সবই বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত, বুদ্ধিরই ক্রিয়া বা বিকার, পুরুষ সেই সবকে নিজেরই ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে। অতএব পুরুষের চৈতন্য কখনই কোন আকার গ্রহণ করে না, তাহাতে কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন নাই, যত পরিবর্ত্তন হইতেছে প্রকৃতিতে—এই প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান, পুরুষ কেবল তাহার দ্রষ্টা, ভোক্তা। এই যে সাংখ্য চৈতন্য হইতে পৃথক আর এক তত্ত্ব—জড় প্রকৃতির অবতারণা করিল, এইখানেই হইল বেদান্ত দর্শনের সহিত ইহার মূল প্রভেদ। সাংখ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই এই দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু

বেদান্ত দর্শনের মতে উহা হইতেছে শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা, শ্রুতি কোথাও ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। এখানে আমরা এ প্রশ্নের আলোচনা করিব না—কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাংখ্যদর্শনও অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সাংখ্য যে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ করিয়াছে, অধ্যাত্ম সাধনায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং গীতাও তাহা স্বীকার করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সাংখ্য কেন পুরুষের চৈতন্য অপেক্ষা এক দ্বিতীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিল? মানুষের যে সাধারণ চৈতন্য, ইহা হইতেছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া, ইহাকে ছাড়াইয়া এক উর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠাই হইতেছে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ—যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। এই যে বুদ্ধির উর্দ্ধে পুরুষের বা আত্মার চৈতন্য, কোনরকমে একবার ইহার মধ্যে উঠিলে মানুষ তাহার প্রথম অনুভূতিতেই একান্তভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে—যে পথ দিয়া সে উপরে উঠে সেই এক দিক দিয়াই সে অগ্রসর হয়, অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে যে নানা দিক, নানা উচ্চতা ও গভীরতা আছে সে-সবই একেবারে অধিগম্য করা সম্ভব হয় না। যদি কেহ ভক্তির পথ ধরিয়া অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হয়, সে ভগবানের প্রেমানন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া যায় যে, ভাগবত জীবনের যে আরও কত দিক, কত ভাব আছে তাহা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। শ্রীচৈতন্যের এইরূপই হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' সন্তান সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দের মুখ দিয়া চৈতন্যধর্ম্মের প্রতি বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন—

"চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"

আবার যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হন তাঁহারা আত্মার নীরব নিষ্ক্রিয় শাশ্বত নির্ব্যক্তিক চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের মধ্যেই এমন ভাবে ডুবিয়া যান যে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে শক্তি আছে, প্রেমও আছে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সাংখ্যদর্শন এইরূপই এক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর বৌদ্ধদর্শন ও পরে শঙ্করের মায়াবাদ ঠিক এই অনুভূতিরই

অনুসরণ করিয়াছে। কেবল গীতার মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই সমগ্র অধ্যাত্মভূমির এমন নক্সা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভাগবত-চৈতন্যের কোন প্রধান দিকই বাদ যায় নাই। সাংখ্য হইতেছে একান্ত জ্ঞানের মার্গ, গীতার ভাষায়—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং। ঊর্দ্ধতর চৈতন্য সম্বন্ধে সাংখ্যের যে অনুভূতি তাহা হইতেছে নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প; আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়া—চিন্তা, বেদনা অনুভূতি, ভাবাবেগ, সঙ্কল্প, বিকল্প, ইচ্ছা, দ্বেষ—এ-সবের কোন লেশ পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে নাই। অথচ এ-সবই হইতেছে আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য—ইহাদের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু ইহাদের সহিত পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যের কোন সমন্বয়ই হয় না—এই জন্যই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর এইরূপ বিভাগ করায় সাংখ্য যে সমাধান চাহিয়াছিল তাহাও মিলিয়াছে। সে সমস্যাটি হইতেছে সংসারের দুঃখের সমস্যা—সাংখ্যের আরম্ভই হইল, দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখের ঐকান্তিক উচ্ছেদই মানবজীবনের লক্ষ্য, পুরুষার্থ। সাংখ্য দেখিয়াছে, পুরুষের চৈতন্যে দুঃখের লেশ নাই, সেই চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে সকল দুঃখ ও অশান্তির চির-অবসান হয়। আর পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা—এই জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইতেই ঐ শান্তি ও মুক্তি লাভ করা যায়, পুরুষ আর নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখে না, যে অস্মিতা বা অহঙ্কার হইতেছে সংসারের মূল তাহা বিনষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সংসারও পুরুষের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, কেহ এইরূপ মুক্তিলাভ করিলে জগৎ যেমন চলিতেছিল, প্রকৃতির খেলা যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রমই হয় না। এই জন্য সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে—কোথাও এক পুরুষ মুক্ত হইতেছে, তাহারই পক্ষে সংসার বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য বহু পুরুষ অহং জ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃতির লীলায় বদ্ধ রহিয়াছে—তাই জগৎ কখনই একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে না। সাংখ্যের এই বিশ্লেষণে বিশ্বলীলার সকল প্রশ্নের সমাধান নাই—তবে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তাহার পক্ষে এই জ্ঞানই যথেষ্ট এবং সেই জন্যই সাংখ্য আর ইহার অধিক অগ্রসর হইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

আমরা দেখি বুদ্ধও নিজের ভাবে এই সাংখ্য মার্গেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে দার্শনিকতার দিক দিয়া সাংখ্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে বুদ্ধ ততদূরও যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখের উচ্ছেদ করিতে হইবে—সাংখ্যের এই আরম্ভ বুদ্ধেরও আরম্ভ। সাংখ্য দেখাইয়াছে, আমরা যে অনুভব করি—"আমি" সুখভোগ করিতেছি, "আমি" দুঃখ ভোগ করিতেছি—এই "আমি" বোধ বা অহঙ্কার হইতেছে ভ্রান্তি; পুরুষের শুদ্ধ চৈতন্যে এই অহংবোধ নাই, ইহা হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি, এবং এই সংসার প্রকৃতির লীলা, তাহা অনিত্য। বুদ্ধও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন, "আমি" বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই—এইটি উপলব্ধি হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; ইহাই সকল বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা—অনাত্মবাদ। সাংখ্যের ন্যায়ই বৌদ্ধগণ কোন একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং সাংখ্যের ন্যায়ই তাঁহারা জগতের অনিত্যতার উপর জোর দিয়াছেন। তবে সাংখ্য যে বলিয়াছে "আমি" লুপ্ত হইলে পুরুষ তাহার শুদ্ধ চৈতন্যে ফিরিয়া যাইবে এবং প্রকৃতি তাহার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে—বুদ্ধ ইহা স্বীকার করেন নাই; তবে তিনি অস্বীকারও করেন নাই,—এ-সব দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা তিনি সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। বুদ্ধের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন ছিল সকল দুঃখের অবসান করা। বিষাক্ত শরের দ্বারা বিদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ সেই শরটিকে বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া ঐ শর কোথা হইতে আসিল, কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কে নিক্ষেপ করিয়াছে এই সব তর্ক লইয়া সময় নষ্ট করে, সে যেমন মূর্খতার পরিচয় দেয়, তেমনিই যে-ব্যক্তি এই সংসারে দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় সেও তেমনিই মূর্খতার পরিচয় দেয় (Majjhima-Nikaya-Sutta, 63)।

অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী চিরকাল ভাব-বিলাসী, দার্শনিক চিন্তায় সময় নষ্ট করিয়া বাস্তব জীবনে অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় জীবনধারার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করেন নাই। ভারত চিরকালই অধ্যাত্মভাবাপন্ন, কিন্তু তাহার অর্থ নহে যে, সে বৃথা চিন্তাবিলাসেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, চারুকলা—যাহা কিছু একটা সভ্য জাতির

মহত্ত্বের ও গৌরবের পরিচয়—সে-সকল ক্ষেত্রেই ভারত অসাধারণ কর্ম্মশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে—তাহার অধ্যাত্ম-প্রবণতা তাহাতে প্রতিবন্ধক হয় নাই। এমন কি অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও ভারত যে বৃথা চিন্তাবিলাসে চিরকাল মগ্ন ছিল না, বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বৌদ্ধধর্ম্মকে লোকে জীবন-বিরোধী শূন্যবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার জীবনেই আমরা দেখিতে পাই তিনি কিরূপ কাজের লোক ছিলেন, এবং অলস তর্কে সময় ও শক্তি নষ্ট করাকে তিনি কিরূপ নিরুৎসাহিত করিয়াছেন।

ইহার অর্থ নহে যে, তিনি যুক্তি তর্কের ব্যবহার করিতেন না। বস্তুতঃ বুদ্ধকেই ভারতের প্রথম rationalist বা যুক্তিবাদী বলা যাইতে পারে। বিনা যুক্তি ও সমালোচনায় কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে নিষেধ করিতেন—এই জন্য তিনি ভারতের অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি মানবের দুঃখনিবৃত্তির যে কার্য্যকরী পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিতে তিনি মানব-জীবনের গভীর মূলের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং যুক্তির সাহায্যেই তাহা লোককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তবে সেজন্য ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায় কোন লাভ হইবে না বলিয়া তিনি সে সব বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার কার্য্যকরী উপদেশ-সকলের মধ্যে এই সব দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ছিল তাহার অনুসরণেই পরবর্ত্তিকালে নানা বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল ; এবং ইহাও হইয়াছিল শুধু চিন্তা-বিলাসিতার জন্য নহে—বুদ্ধ যে সাধনার অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখাইয়া দিয়াছিলেন লোককে তাহা লওয়াইবার জন্য এবং বিরুদ্ধ মতবাদীদের সুতীব্র আক্রমণের জবাব দিবার জন্য বৌদ্ধগণকে দার্শনিক চিন্তাশীলতার বিকাশ করিতে হইয়াছিল।

বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে ভারতের সকল ধর্ম্মের বিশেষত্ব—এখানে এমন কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই যাহা উচ্চ দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নহে, অন্যপক্ষে এখানে এমন কোন দার্শনিক মতের উদ্ভব হয় নাই যাহাকে মানব-জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় নাই—ভারতের সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই হইতেছে সাধক সম্প্রদায়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতে দর্শন হইতে ধর্ম্মকে এবং উভয়কেই বিজ্ঞান বা জীবন হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন

করা হয় নাই—এই সবই এখানে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যে ও সহযোগিতায় বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম আধুনিক যুক্তিতর্কের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেছে না—কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা তাহার দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কারণ তাহার ভিত্তি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা সমুচ্চ চিন্তাশীলতার দ্বারা সমর্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মসাধনার বিরুদ্ধে অজ্ঞ সমালোচনার দ্বারা লোকের মনে আজকাল যে-সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয় সে-সবের খণ্ডন করা আবশ্যক। বুদ্ধের বচনগুলি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পালি ভাষায় ত্রিপিটক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে—এই গুলিই সকল বৌদ্ধ দর্শনের মূল। পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ নিজ নিজ অনুভূতি ও যুক্তির আলোকে এই সকল বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতেই বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শাখাগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধ দর্শনের ত্রিশটি শাখার সন্ধান পাওয়া যায় (Systems of Buddhistic Thought by Yamakami Scgen, p. 3). আমরা এখানে বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি প্রধান ধারারই কিছু পরিচয় দিতেছি—কারণ তাহা দ্বারা গীতার শিক্ষার উপর কিছু আলোকসম্পাত করা হইবে।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের সহিত বুদ্ধের শিক্ষার মিল রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধগণ সাংখ্যের ন্যায় কোন শাশ্বত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের মতে চৈতন্য আছে, তাহা ত আমরা উপলব্ধিই করিতেছি—কিন্তু চৈতন্যময় কেহ নাই—চৈতন্যময় একজন পুরুষ বা আত্মা রহিয়াছে বলিয়া আমাদের যে অনুভব হয় এটা ভ্রান্তি। বিখ্যাত "অনাত্মা লক্ষণ সুত্তে" (অনাত্মলক্ষণ সূত্র) বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ, দেহ অনাত্ম। যদি দেহে আত্মা থাকিত তাহা হইলে দেহ দুঃখময় হইত না। 'আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ ঐরূপ হউক' এ সম্ভাবনাও থাকিত। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু দেহ অনাত্ম, ইহা দুঃখময় এবং আমার দেহ এইরূপ হউক, আমার দেহ ঐরূপ হউক এ সম্ভাবনাও নাই।"

যেমন দেহ সম্বন্ধে তেমনিই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ

করা যায়—জগতের মূলে যদি কোন শাশ্বত আত্মা বা চৈতন্যময় পুরুষ বা ভগবান থাকিত তাহা হইলে জগৎ দুঃখময় হইত না, অনিত্য হইত না। দুঃখময় অনিত্য দেহ বা জগতের সহিত শাশ্বত, শান্তিময়, চৈতন্যময় আত্মার কোনরূপ সামঞ্জস্য করা যায় না, একই সঙ্গে দুইয়ের অস্তিত্ব অথবা এক হইতে অন্যের প্রকাশ বা উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই মতবাদ অগ্রাহ্য। আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধগণের এই মত পরবর্ত্তী সকল দর্শন ও ধর্ম্মকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

সাধারণ মানুষ এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। যাহারা এখনও নিম্নতম স্তরে রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে তামসিকতার প্রভাব সমধিক তাহারা জীবনে যাহা পাইয়াছে, জীবন যেমন চলিতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট—ইহার অধিক তাহারা কিছু পাইতে চায় না, হইতে চায় না, জানিতে চায় না। ইহাদের জীবন অনেকটা পশুর ন্যায়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য তাহারা নিত্য নূতন ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে, জগৎকে যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়—যেন তাহাদের ভোগের তৃপ্তি হয়। কিন্তু দেখা যায়, এ জগতে কোন ভোগেই তৃপ্তি নাই—শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ব্যর্থ ও হতাশ হইয়া এই জগতের সব কিছুই মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উপলব্ধি করে—

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'।

যাহাদের মধ্যে সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্য তাহারা বুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান করে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দেখে কোন সত্য সম্বন্ধেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। আজ যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে কাল তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জিত হইতেছে। এ জগতে প্রকৃত সুখ নাই, শান্তি নাই, সত্য নাই। এই ভাবেই শূন্যবাদ মায়াবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। আর আমাদের দেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি—বুদ্ধ ও শঙ্কর—এই মতটি বিশেষ শক্তির সহিত প্রচার করিয়াছেন। জগতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কত আন্দোলন, কত প্রয়াস যে হইয়া গিয়াছে তাহার অন্ত নাই, কিন্তু সংসারে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার এতটুকু লাঘব হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না—সংসারের উন্নতি করার সকল চেষ্টাই যেন কুকুরের লেজকে সোজা করিবার প্রয়াসের মতই ব্যর্থ। তাহা হইলে এই দুঃখময় সাংসারিক জীবন হইতে কোন রকমে মুক্তি লাভ করাই কি

মানুষের প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? বৌদ্ধগণ তাই নির্ব্বাণের পথ ও উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সকল দুঃখের নির্ব্বাণ ও অবসান—ইহাই মানুষের সকল চেষ্টা, সকল সাধনার চরম ও এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এই দুঃখময় জগৎ কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল? এ প্রশ্নের উত্তর তিন রকমের হইতে পারে। জড়বাদ, মায়াবাদ, সত্যবাদ। এক উত্তর হইতেছে জড়বাদীর—এই জগৎ জড়শক্তির সৃষ্টি, এখানে ঘটনাক্রমে যে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার এমন কোন সামর্থ্য নাই যে অন্ধ জড় শক্তির ক্রিয়াকে নিজ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে—অতএব এ জগতে দুঃখ, যন্ত্রণা, অপূর্ণতা অনিবার্য্য। যাহারা পরজন্মে বিশ্বাস করে না তাহাদের মতে মৃত্যুতেই এই দুঃখময় মানব জীবনের চিরনির্ব্বাণ, যতদিন বাঁচিয়া আছ এই জগতে যতটুকু ভোগসুখ আছে পূর্ণভাবেই ভোগ করিয়া লও।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

পাশ্চাত্য জগতে এই মতেরই প্রাধান্য। আমাদের দেশেও ইহা অতি প্রাচীন চার্ব্বাক মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু যাহারা পরজন্মে বিশ্বাস করে, তাহাদের মতে এইভাবে ভোগে আসক্ত হইলে কোন দিনই জীবনের অবসান হইবে না, মানুষ যেমন কর্ম্ম করিবে তেমনিই ফল ভোগ করিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আর জন্মের অর্থই হইতেছে জরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কবলে পতিত হওয়া—এ জগতে সুখ কেবল নাম মাত্র, দুঃখই সত্য। এই দুঃখ এড়াইতে হইলে যাহাতে আর জন্ম না হয় তাহাই করিতে হইবে, তাহাই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধগণ এই নির্ব্বাণ লাভেরই সাধনা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই সংসার মিথ্যা, আমাদের যে অহংবোধ ইহা মিথ্যা—সর্ব্বদা এই ধ্যান করিতে করিতেই আমাদের ভোগবাসনা ও আসক্তির ক্ষয় হয় এবং ইহার ফল স্বরূপ সকল পাপ হইতে আমরা মুক্ত হই, তখনই আমরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে সে সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, নির্ব্বাণের পর আর কিছুই থাকে না—সব সত্তার লোপ হইয়া যায়। কেহ বলেন, নির্ব্বাণে চৈতন্যেরই লোপ হয় এবং সেই সঙ্গে সুখদুঃখের লোপ হয়—কিন্তু যে জড়সত্তার মধ্যে এই চৈতন্যের উদ্ভব

হইয়াছে তাহা থাকিয়া যায়। এই মত একদিক দিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুরূপ, অন্য দিক দিয়া ভারতীয় সাংখ্য মতের অনুরূপ। সাংখ্য মতে এই জগৎ জড় প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি—তবে পাশ্চাত্য জড়বাদের সহিত সাংখ্যমতের প্রভেদ এই যে, এই জড় প্রকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া চৈতন্যের উদয় হইল জড়বাদ তাহার কোনই ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য জড় প্রকৃতির অতিরিক্ত চৈতন্যময় পুরুষের কল্পনা করিয়া ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি সক্রিয় হইয়া উঠে, পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিও চৈতন্যময় বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং পুরুষ প্রকৃতির সেই সকল ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে এবং এই ভাবেই হয় পুরুষের সংসারলীলা, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ বোধ। পুরুষ যখন নিজের এই ভ্রম বুঝিতে পারে, নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করে, প্রকৃতির ক্রিয়ায় আর সম্মতি না দেয়—তখনই প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়, পুরুষ তাহার শুদ্ধ চৈতন্য ফিরিয়া পায়, তাহার জীবনলীলার, সংসারলীলার অবসান হয়। বৌদ্ধগণের মতে ইহাই নির্ব্বাণ, তাঁহারা প্রকারান্তরে এই সাংখ্যমতই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণে চৈতন্যের লোপ হয়—তাহার পর থাকে প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, ক্রিয়াহীন, অভিব্যক্তিহীন জড় সত্তা। এই সত্তা সাংখ্যগণের অব্যক্ত প্রকৃতিরই অনুরূপ। পুরুষ মুক্ত হইলে প্রকৃতি যে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়—এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে তাহাই নির্ব্বাণ। কিন্তু বৌদ্ধগণ চৈতন্যময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না —অতএব তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণের পর থাকিবে শুধু চৈতন্যহীন জ্যোতিহীন কর্ম্মহীন অনন্ত মৃত্যু। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে এইটি হইতেছে বৌদ্ধ বৈভাসিক সম্প্রদায়ের মত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। বিজ্ঞানের মতে, এই বিরাট বিশ্ব প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে ঘন উত্তপ্ত বাষ্প (gas) রূপে বিদ্যমান ছিল। সেই বাষ্পরাশি যেমন অনন্ত আকাশে বিস্তৃত হইতে থাকে তেমনই তাহা বহু বিচ্ছিন্ন মেঘে পরিণত হয়, সেই মেঘগুলিই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হয়। আমাদের সূর্য্য এমনিই একটি নক্ষত্র। এই নক্ষত্রগুলি যেমন পরিমাণে সঙ্কুচিত হইতেছে তেমনই

অধিকতর উষ্ণ হইতেছে। এইভাবে আমাদের সূর্য্যও ক্রমশঃ উষ্ণতর হইতেছে। হঠাৎ এমন একদিন আসিবে যখন সূর্য্য তাহার পৃথিবী আদি গ্রহ সকলকে লইয়া জ্বলিয়া উঠিবে, আমাদের এই শস্যশ্যামলা পৃথিবী, তাহার জীবজন্তু, তাহার মানুষ, মানুষের সব কীর্ত্তি লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পরিণত হইবে। তাহার পর সূর্য্য খুব ক্ষুদ্র হইয়া ক্রমে একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। এইভাবে বিশ্বের সকল নক্ষত্র ও সূর্য্য একদিন নিভিয়া যাইবে, সকল আলোক, সকল গতি, সকল জীবন বিলুপ্ত হইবে—থাকিবে শুধু অনন্ত-প্রসারিত শূন্যগর্ভ এমন অন্ধকার যাহা কল্পনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ইহাকেই বিশ্বের পরিনির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর কি হইবে? আর ঐ যে উত্তপ্ত বাষ্পরূপে বিশ্বের জীবন আরম্ভ তাহাই বা কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিবে এ ভরসা করা যায় না।

বৌদ্ধগণের মতে অনন্ত শূন্যের মধ্যে কোন রকমে শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে, সেই শক্তির খেলা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎও লুপ্ত হইবে, অনন্ত শূন্যই চির বিরাজিত থাকিবে। এই শক্তির খেলাকেই তাহারা "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। গীতাও সৃষ্টিক্রিয়াকে "কর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছে, ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)। তবে গীতা শূন্যের উপর এই জগৎলীলাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই—গীতার মতে এই জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের মধ্যে অধ্যাত্ম-শক্তির ক্রিয়া, আর ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। বৌদ্ধগণ শূন্য বলিতে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বসত্তার অভাব বুঝেন নাই। নাগার্জ্জুন শূন্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে তাহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই নামান্তর। সম্ভবতঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতে শূন্য হইতেই জগতের উদ্ভব কল্পনা করা হইত, কিন্তু গীতার শিক্ষার প্রভাবে শূন্য সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বৌদ্ধ বৈভাসিকগণের মতে নির্ব্বাণের দ্বারা সর্ব্বসত্তার লোপ হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যের লোপ হয়—থাকে শুধু জড়সত্তা। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছে। এই দেহের মৃত্যুর পর যদি জীবের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবের চৈতন্য দেহের

অধীন নহে, দেহ ছাড়াও তাহা বিদ্যমান থাকে। তাহা হইলে জড়কেই পরম সত্তা বলা যায় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধগণ জড়বাদী নহেন, তাঁহারা চৈতন্যবাদী—তাঁহাদের মতে এই জগৎ চৈতন্যেরই লীলা।

স্থূল জড়বাদ হইতে জগৎ-ব্যাপারের সম্যক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের মন বুদ্ধির দ্বারাই আমরা জড়জগৎকে জানি—অতএব মন বুদ্ধির চৈতন্য জড়জগৎ অপেক্ষা কম সত্য নহে, আর এই চৈতন্যের স্বরূপ ও ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়া হইতে এত বিভিন্ন যে ইহাকে জড়েরই একটি ক্রিয়া বলিয়া ধারণা করা যায় না। জড়জগতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, এই জগতের মূলে এক চৈতন্যময় সত্তা রহিয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানও উত্তরোত্তর এইরূপ অভিমতের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের মূল প্রশ্নটির সমাধান কেমন করিয়া হয়? জগতের মূলে যদি চৈতন্য থাকে তাহা হইলে জগতে এত বিশৃঙ্খলা কেন, বিরোধ কেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তীব্র দুঃখ কেন? এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর সম্ভব। প্রথম উত্তর এই যে, জগৎ বলিয়া আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা ভ্রান্তি, মায়া; যতক্ষণ এই ভ্রান্তি আছে ততক্ষণই জগৎ আছে, সংসার আছে, সুখ-দুঃখ আছে—এই ভ্রান্তি দূর হইলেই সংসারের সহিত সকল সুখ-দুঃখের অবসান হয়,—চৈতন্য নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তির লেশ মাত্র নাই। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতকে এইটিই বুদ্ধের মত বলিয়া প্রচার করেন, "মায়া" শব্দটি এইরূপ ভ্রান্তি অর্থে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন আর শঙ্কর সেইটিই ঈষৎ ইতর-বিশেষ করিয়া অষ্টম শতকে গ্রহণ করেন। নাগার্জ্জুনের এই মত শূন্যবাদ বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু এই নাম হইতে ইহা বুঝা ভুল হইবে যে, তাঁহার মতে কোন শাশ্বত সত্তা নাই। তাঁহার মত হইতেছে, আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি, the phenomenal world, ইহাই ভ্রান্তি, মায়া—বুদ্ধ যে জগতের অনিত্যতা, অনাত্মতার কথা বলিয়াছেন তাহা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু এই ব্যবহারিক জগতের ঊর্দ্ধে এক শাশ্বত সত্তা আছে তাহা বাক্য মনের অগোচর, সেইজন্যই বুদ্ধ তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে সম্মত হন নাই। সেই সত্তা অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই নাগার্জ্জুন তাহাকে শূন্য শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন, আর তাহার বর্ণনা করিতে তিনি কতকগুলি

নেতি-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, অদাহ্য, অবিনাশী—এই শূন্যতার নামই বজ্র। মনে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না, অথচ উহা যে আছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নাগার্জ্জুন কেমন বৌদ্ধদর্শনকে বেদান্ত-দর্শনেরই সমরূপ করিয়া দিয়াছেন। গীতা বেদান্তের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহার দ্বারাই বৌদ্ধদর্শনের এইরূপ পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতাও আত্মতত্ত্বের বর্ণনা করিতে অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে (২।২৩,২৪)। এই শূন্যবাদের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা শাশ্বত সত্তাকে একেবারে শূন্য না বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়াছেন—তবে তাঁহাদের মতেও বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নাই, জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। এই মতও বেদান্তের অনুযায়ী—বেদান্ত ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়াছে। * বেদান্ত মতে ব্রহ্মের যে পরমতম সত্তা তাহা অনির্ব্বচনীয়; বৌদ্ধমতে ইহাই শূন্য। কিন্তু ব্রহ্ম যখন জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনিই হন সচ্চিদানন্দ; বৌদ্ধমতে ইহাই বিজ্ঞান। তবে বেদান্ত বৌদ্ধগণের ন্যায় জগৎকে কোথাও মিথ্যা মায়া বলে নাই—ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধগণের এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যদি সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কেন, দ্বন্দ্ব কেন, অপূর্ণতা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জগতের দুঃখময়তার ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধগণ যে মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই সমস্যার বস্তুতঃ কোন সমাধানই হয় না। শান্তিময়, আনন্দ-ময়, চৈতন্যময় নির্ব্বাণ, শূন্য বা বিজ্ঞানই যদি শাশ্বত সত্য হয় তাহার মধ্যে এই মায়ার আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল? বৌদ্ধগণ ব্যাখ্যা করেন যে, জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে আমাদের মনে যে-সব সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাই মায়া বা অবিদ্যারূপে জগৎ-ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই কর্ম্মের আরম্ভ কোথায় কখন কেমন করিয়া হইল? এ প্রশ্নের কোন উত্তর বৌদ্ধগণ দিতে পারেন না। শঙ্করও মায়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—উহা সৎও নহে, অসৎও নহে—উহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১

এইরূপ মায়াতত্ত্বের দ্বারা জগৎব্যাপারের বস্তুতঃ কোন ব্যাখ্যাই হয় না—কেবল কথার জাল বুনিয়া ব্যাখ্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। দার্শনিক মত হিসাবে ইহাই হইতেছে মায়াবাদের চরম দুর্ব্বলতা—জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ইহা সেটিকে শেষ পর্য্যন্ত অব্যাখ্যাত রহস্যরূপেই রাখিয়া দেয়।

আমরা দেখিলাম জড়বাদ বা মায়াবাদ কোনটির দ্বারাই জগৎতত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। বাকী থাকে ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য—এই সর্ব্বসত্যবাদ। বস্তুতঃ এইটিই উপনিষদ ও বেদান্তে প্রচারিত চরম সত্য এবং গীতায় এই মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যদি সত্য হয় এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি হয় তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কেন, অজ্ঞান কেন, অপূর্ণতা কেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান জগৎকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব এই দুঃখময় সংসারে আসিয়া দুঃখকে জয় করিবে, দুঃখকেই রূপান্তরিত করিয়া পরম অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উপাদানে পরিণত করিবে, এই মর্ত্ত্যলোকেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিবে। ভগবান আনন্দময়, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, তিনি আত্মানন্দ—আপনার আনন্দে আপনি বিভোর; তিনি একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ নাই, তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু; তিনি চৈতন্যময়—তাঁহার জ্ঞান নিজেরই জ্ঞান, তিনি নিজেই নিজের অনন্ত সত্তাকে জানেন—এইভাবে তিনি সচ্চিদানন্দ। মানব-মন পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধারণা আর কিছু করিতে পারে না। তাঁহার সত্তা অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, আনন্দ অনন্ত—নিজেকে তিনি বহু দিক দিয়া বহুভাবে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, নিজেকে তিনি বহু ভাবে উপভোগ করিতেছেন—ইহাই তাঁহার জগৎ-লীলা। দুঃখকে, অজ্ঞানকে, অপূর্ণতাকে জয় করার যে অপূর্ব্ব আনন্দ, বহু জীবরূপে তাহাই আস্বাদন করিবার জন্য নিজ মায়াশক্তি বলে তিনিই জীব-জগৎরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই মায়াশক্তি ভ্রান্তি-বিলাসিনী নহে, ইহা ভগবানেরই চিৎশক্তি, গীতায় ইহাকে পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জগতে মানুষ যে দুঃখ ভোগ করিতেছে—ইহা কেবল সাময়িক; এই দুঃখময় জগতে কর্ম্ম করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, সাধনা করিয়া ইহাকে জয় করিতে হইবে—এইখানেই সমৃদ্ধ রাজ্য, দিব্যজীবন ভোগ করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা। গীতা প্রথম দুইটি কথাতেই সংসারের স্বরূপ ব্যক্ত

করিয়াছে—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। এই সংসার এক বিরাট সংগ্রামক্ষেত্র—এখানে বিরুদ্ধ শক্তি সকলের সহিত সংগ্রাম করাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল শত্রুকে জয় করিয়া এই পৃথিবীতেই রাজ্যং সমৃদ্ধং, দিব্যজীবন ভোগ করাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য।

মূলতঃ ইহাই শ্রীঅরবিন্দের মত। তবে ভাগবত চৈতন্য কি প্রণালীতে নিজেকে জড়ে পরিণত করিল, এই জড়ের মধ্যে যে দিব্য জীবনের বিকাশ হইবে তাহার স্বরূপ কি—এ-সব প্রশ্নের সমাধান গীতায় বা অন্য কোন বৈদান্তিক গ্রন্থে নাই। এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়াই মায়াবাদের ন্যায় দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল; চৈতন্যময় ব্রহ্ম কখনই নিজেকে জড়ে পরিণত করিতে পারেন না অতএব এই জড় জগৎ মিথ্যা, ভ্রান্তি, মায়া—এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিব্য জীবনের দার্শনিক ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গীতার যুগে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সংসার অনিত্য ও দুঃখময় বলিয়া সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের আদর্শ বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচারিত হইতেছিল—গীতা সেই সমস্যারই সমাধান করিয়া বলিয়াছে যে, সংসার অনিত্য ও দুঃখময় হইলেও মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই সংসারেই দিব্য সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে এবং নির্ব্বাণ লাভের পরও সংসার থাকে, সংসারে কর্ম্ম থাকে। কি সাধনার দ্বারা মানুষ এইরূপ অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে পারে গীতা তাহারই কার্য্যকরী পন্থাটি, সাধনাটি দেখাইয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই শিক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। গীতারই প্রভাবে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযানে পরিণত হইয়াছিল। গীতার মতে নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র অহং ভাবের নির্ব্বাণ এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বাসনা কামনার নির্ব্বাণ। তখন মানুষ ভিতরে পায় অসীম উদারতা, অনন্ত শান্তি, সর্ব্বতোমুখী সমতা। সেই সমতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই গীতার আদর্শ। এইটিই যে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন, এই সংসার মূলতঃ কি তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই সংসারের মধ্যেই নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সংসার ছাড়িয়া

যাইতে হয় না, ন সংসারস্য নির্ব্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্ (মাধ্যমিক শাস্ত্র, ২৫।১৯)। ইহা গীতারই শিক্ষা।

ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন হইতেছে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। বৌদ্ধগণও নির্ব্বাণ বলিতে ইহাই বুঝিয়াছেন—চৈতন্যকে রাগদ্বেষাদি "ক্লেশ" হইতে মুক্ত করা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে জ্ঞান। প্রতিসংখ্যা (প্রজ্ঞা) বা উচ্চতম জ্ঞানের দ্বারা রাগাদি ক্লেশ ও অশুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া বৌদ্ধ বৈভাসিকগণ নির্ব্বাণের আর এক নাম দিয়াছেন—প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। গীতাও এখানে বলিতেছে, ঋষয়ঃ অর্থাৎ যাঁহারা সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকল পাপ ও মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। গীতা নির্ব্বাণ বলিতে একেবারে সত্তার বিলোপ বুঝে নাই—আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে, ব্রহ্মভূতঃ, এবং গীতার মতে তাহাই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধগণও সাধারণতঃ নির্ব্বাণ বলিতে সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ বুঝেন নাই—তাঁহাদের মতে নির্ব্বাণ হইতেছে নিত্য চিরস্থায়ী—তাহা ব্যাবহারিক জীবনের সকল ত্রুটি, পাপ, অপূর্ণতা হইতে মুক্ত—নিত্যঃ খলু প্রতিসংখ্যা-নিরোধঃ, তস্য কিং সভাগহেতুনা প্রয়োজনম্ (অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যা)। এই অবস্থা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সিদ্ধ পুরুষগণের আত্মোপলব্ধিতেই ইহা লব্ধ হয়। অতএব বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ আর বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তি একই।

বৌদ্ধগণের মতে যে পরম জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করা যায় তাহা হইতেছে নৈরাত্ম্যদর্শন, এবং এইটিই হইতেছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল কথা। অহং জ্ঞানই হইতেছে সংসারে সকল দুঃখ ও পাপের মূল; বস্তুতঃ অহং বলিয়া কিছুই নাই, ইহা মিথ্যা, মায়া—এই উপলব্ধিই নৈরাত্ম্যদর্শন। গীতাও এই মিথ্যা অহংজ্ঞান দূর করিবার শিক্ষা দিয়াছে—এই পঞ্চম অধ্যায়েই বলিয়াছে যোগিপুরুষ সকল কর্ম্ম করিয়াও "আমি" করিতেছি বা করাইতেছি এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। অন্যত্রও গীতা নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিতে, যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে। কিন্তু গীতা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই—আত্মাই আমাদের মূল শাশ্বত সত্তা, এই সত্তায় আমরা ব্রহ্মের সহিত, সর্ব্বভূতের সহিত এক—অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম

করি, সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞান দূর হইলে আমাদের মধ্যে সেই আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত হয় (৫।১৬)। বৌদ্ধগণ কি অহংয়ের অতিরিক্ত শাশ্বত সত্তা স্বরূপ এইরূপ কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন? বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্যদর্শন কথা হইতেই মনে হয় তাঁহারা আদৌ আত্মা বা কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু গীতা নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে—নৈরাত্ম্যদর্শনের প্রকৃত অর্থ হইতেছে অহং-ভ্রান্তি নিরসন। আমরা উপরে দেখিয়াছি—বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণকে নিত্য বলিয়াছেন, অতএব তাঁহারা কোন শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন নাই—এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? যাহাই হউক গীতা নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মতকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রবর্ত্তক বসুবন্ধু তাঁহার 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, বালবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অহংকে যে আত্মা বলিয়া মনে করে সেই কল্পনার আত্মা সম্বন্ধেই নৈরাত্ম্য বুঝিতে হইবে, বুদ্ধগণের উপলব্ধ অনির্ব্বচনীয় আত্মার পক্ষে কিন্তু নহে, ন তু অনভিলাপ্যেনাত্মনা যো বুদ্ধানাং বিষয়ঃ। গীতা আত্মাকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিয়াছে,

নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২।২৪

এই আত্মায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ ও মলিনতা ধৌত হইয়া যায় (৫।১৭)। মুণ্ডকোপনিষদের সহিত গীতার এই শ্লোকগুলির ভাবে ও ভাষায় বেশ মিল আছে। সেখানেও বলা হইয়াছে, দ্রষ্টা যখন সেই স্বর্ণকান্তি পুরুষকে দর্শন করেন তখন তিনি সকল পাপ-পুণ্যের উর্দ্ধে উঠেন, এই মরজীবনের কোন দোষ-গ্লানি আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পরম সমতা লাভ করেন,

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি

—মুণ্ডক, ৩।১।৩

সংসারের সকল পাপ ও কলুষতার নিবৃত্তি এবং এই পরম সাম্যাবস্থাই প্রকৃত নির্ব্বাণ—আত্মার দর্শন লাভ করিয়াই এই নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেজন্য সাধনার প্রয়োজন—সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ সকল

দ্বিধা ও সংশয় দূর হয়, সকল পাপ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখনই সংযমী পুরুষ আত্মার দর্শন লাভ করেন,

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সত্যজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

—মুণ্ডক, ৩।১।৫

"এই আত্মাকে সর্ব্বদা সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয়; সত্য ও সংযমের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান ও দিব্যভাবে জীবন যাপনের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায়, কারণ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আভ্যন্তরীণ দেহের মধ্যে বাস করেন, সাধকগণের মানবীয় দোষসকল ক্ষীণ হইলে তাঁহারা সেই আত্মাকে দর্শন করেন।"

আত্মজ্ঞানের দ্বারা সকল পাপ ক্ষয় হয়, আবার সকল পাপ ক্ষয় না হইলেও পূর্ণ আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন লাভ হয় না। গুরুমুখে ও শাস্ত্রবচন হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়, সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ও ধ্যান করিতে হয়, ক্রমশঃ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি পূর্ণ হয়—বেদান্ত তাই মোক্ষলাভের সাধনা বর্ণনা করিয়াছে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ইহা জ্ঞানযোগের সাধনা। বৌদ্ধগণও অনুরূপ সাধনার অনুসরণ করেন—শ্রুতিময় জ্ঞান, চিন্তাময় জ্ঞান এবং শেষে ভাবময় দর্শন। এই ভাবময় দর্শন হইতেই মানবজীবনের সকল পাপ ও কলুষ সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া যায়। গীতা এই জ্ঞানযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়াছে। এই শ্লোকেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তখন সব পাপ ও সংশয় সমূলে বিনষ্ট হয়, সাধক এই মর দেহেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন; তাহাই নির্ব্বাণ, তাহাই পরম আনন্দ, অমৃতত্ব। উপনিষদে অন্যত্র এই কথাই বলা হইয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—মুণ্ডক, ২।২।৯

"যখন মানুষ সেই পরাবর (যিনি ঊর্দ্ধের সত্তা এবং এই নিম্নতর সত্তা উভয়ই) ব্রহ্মকে দর্শন করে তখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার সকল সংশয় বিনষ্ট হয়, তাহার সকল কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কাম্য যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি॥

—বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭; কঠ ২।৩।১৪

"এই (মানব) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, যখন সেই সমুদয় কামনা সমূলে বিচ্যুত হয়, তখন মর্ত্ত্য মানব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানে, এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্ম উপভোগ করেন।"

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ।
অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ —কঠ ২।৩।১৫

"এখানে এই মানবজন্মেই যখন হৃদয়ের (রাগদ্বেষ ও অহংমমাদি) গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর মানব অমর হয়; ইহাই হইতেছে সমগ্র শাস্ত্রের শিক্ষা।"

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। গীতা অন্তর্মুখী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভের কথা যে ভাবে বলিয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে, গীতা সংসারত্যাগী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীরই প্রশংসা করিতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য গীতা বলিল, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। শুধু জীবনধারণের জন্য যতটুকু কর্ম্ম সন্ন্যাসীরা রাখিতে বলেন কেবল তাহাই নহে, অথবা শুধু পূজা, ধ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মও নহে, পরন্তু সর্ব্বভূতের হিতসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্মে রত থাকিয়াই সাধক ব্রহ্মলাভের যোগ্য হইয়া উঠে এবং ব্রহ্মে নির্ব্বাণলাভের পরও সে সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকে—ইহাই গীতার সুস্পষ্ট শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষা সন্ন্যাসবাদের অনুকূল নহে, তাই শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অহিংসা। গীতা যেখানে বিরাট কর্ম্মের বিধি দিয়াছে শঙ্কর সেটিকে কেবল একটি নিষেধে পরিণত করিয়াছেন—কাহারও হিংসা করিও না।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই অহিংসার নীতি ও আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। কাহারও অনিষ্ট না করা অতি উচ্চ আদর্শ এবং মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষের লক্ষণ—কিন্তু এমন যে পরম ধর্ম্ম অহিংসা, মানুষের অজ্ঞানের ফলে ইহাও কেমন করিয়া অধর্ম্মে পরিণত হয় ভারতেই তাহার নিদর্শন দেখা গিয়াছে। হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ কেমন নৃশংস হইয়া উঠে আধুনিক যুদ্ধে

আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। নিঃসহায় নিরস্ত্র জনগণকে বিনা দোষে দলে দলে হত্যা করা হইতেছে, এমন কি শিশু, রুগ্ন, স্ত্রীলোকরাও রক্ষা পাইতেছে না, তাহাদের উপর মর্ম্মন্তুদ অত্যাচার করা হইতেছে, তাহাদিগকেও অতি নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করা হইতেছে—হিংসার ভাব দমিত না হওয়ায় মানুষ অসুর ও রাক্ষসের ন্যায় রক্তপাতে পৈশাচিক আনন্দ পাইতেছে! অন্যপক্ষে অহিংসা মন্ত্র জপিয়া প্রতিকার-বিমুখ হইলে এই সব আসুরিক মানবের অত্যাচার বাড়িয়াই উঠিবে, এই পৃথিবী মানববাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে—অথচ ভারতে আজও সেই অহিংসামন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, ইহার জন্য বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এবং পরে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সন্ন্যাসিগণই দায়ী। অধুনা পাশ্চাত্য দেশ হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা আসিয়া এই প্রতিকার-বিমুখতায় ইন্ধন জোগাইতেছে। যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা—"কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার দিকে অন্য গালটি ফিরাইয়া দিবে।" খ্রীষ্টান ইউরোপ এই শিক্ষা বর্জ্জন করিয়াছে, কারণ সমাজে এই শিক্ষা অনুসরণ করিলে লৌকিক ব্যাপার অচল হইয়া পড়ে। জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শে বলিয়াছেন, অহিংসার এই ধর্মতত্ত্ব দাসত্বের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঘাতক-ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং এই ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে জাতি নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশ বহুদিনের তামসিকতায় একেই নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে—ইহার উপরে মহাত্মা গান্ধী আবার অতি জোরের সহিত এই খ্রীষ্টীয় অহিংসাতত্ত্ব ভারতে প্রচার করিতেছেন। অন্যপক্ষে রাজসিক ইউরোপে অহিংসা ঘাতক-ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় জার্ম্মান জাতি রক্তপিপাসু অসুরের ধর্ম্মকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে জগৎব্যাপী ধ্বংসলীলার সূচনা হইয়াছে।

এ-বিষয়ে প্রকৃত সমাধান কি? কেহ কেহ বলেন, সম্পূর্ণভাবে অহিংসা কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভব। সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে আততায়ী ও অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রয়োজন হইলে বল প্রয়োগ করিতেই হইবে তাহাতে কোন পাপ হয় না। এ-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে কোনরূপ সন্দেহের স্থান নাই। গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে দুষ্টের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে পরম ভক্ত প্রহ্লাদ সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন

তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা।

—(মহাভারত, বন, ২৮৷৮)।

—এই জন্যই পণ্ডিতগণ সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষমা করা নিন্দা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে পৃথুরাজা বলিয়াছেন,

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥ —১।১৩।৭৩

—"যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ।" মনুসংহিতায় বিধান আছে—"যদি কেহ তোমাকে বধ করিতে আইসে, সে ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে হত্যা করিলে তোমার কোন পাপই হইবে না।" মনু, ৮।৩৫০

আর হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎস বেদেও আমরা বলপ্রয়োগে শত্রুনিরোধের আদর্শ দেখিতে পাই। বিশ্বের মূলে যে শক্তি রহিয়াছেন তিনিই মানুষের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের প্রেরণা দেন—

"অহং রুদ্রায় ধনুষা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৫।৬

"(ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিণী) আমি ব্রাহ্মণদ্বেষিগণকে সংহার করিবার জন্য রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপ করি, আমি জনসকলকে বলদৃপ্ত করি, আমার দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত।"

রামায়ণ, মহাভারত এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের কাহিনীতে পূর্ণ। গীতাতে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, দুষ্ট জনকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অন্যপক্ষে অহিংসার আদর্শও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদেই অহিংসার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

অথ যত্তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।

৩।১৭।৪

গীতাও অনুরূপ ভাবে অহিংসার প্রশংসা করিয়াছে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে, "ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ"—ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্টা ক্রোধ করিবে না (মনু, ৬।৪৮)। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥

মহাভারত, উদ্যোগ ৩৮।৭৩,৭৪

"(অন্যের) ক্রোধ নিজ শান্তভাবের দ্বারা জয় করিবে, দুষ্টকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।" বৌদ্ধধর্ম্মীয় নীতিগ্রন্থে পালিভাষায় এই শ্লোকটি অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে,

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥—ধম্মপদ, ২৩৩।

ইহা যে অতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল মনুষ্যেরই এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে দুষ্ট আততায়ীকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত নিবারণ করা যায় না সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা কি অবশ্যকর্ত্তব্য নহে? আধুনিক অহিংসাবাদীরা বলেন, আততায়ীকে আঘাত না করিয়া আমরা যদি স্বেচ্ছায় তাহার আঘাত নিজদের মাথা পাতিয়া লই, তাহাকে যন্ত্রণা না দিয়া তাহার সম্মুখে যন্ত্রণা ভোগ করি—তাহা হইলেই তাহার হৃদয় গলিয়া যাইবে—সে হিংসার পথ বর্জ্জন করিবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, এই নীতি সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হয় না। মানুষ স্বার্থবুদ্ধির বশে, অথবা কাম-ক্রোধের উত্তেজনায় অথবা কোন বিকৃত আদর্শবাদের প্রেরণায় এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে যে, কোনরূপ নৃশংসতা বা নির্য্যাতন করিতে তাহাদের হৃদয় বা হস্ত এতটুকুও কম্পিত হয় না, হৃদয় বিগলিত হওয়া ত দূরের কথা। পিতামাতার চক্ষুর সম্মুখে যাহারা শিশু ও বালককে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিয়া কি ফল হইবে? নিঃসহায় নিরস্ত্র বন্দীগণকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া বেয়নেটের খোঁচায় অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়া যাহারা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে তাহাদের সম্মুখে নিজেকে বলিদান দিতে যাওয়া বৃথা আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার দ্বারা তাহাদিগকে সংশোধন করা বা নিবারণ করা অসম্ভব। একমাত্র বল প্রয়োগেই তাহাদিগকে নিবারণ করা যায় এবং তাহা না করিলে ব্যাপক হিংসা ও নৃশংসতাকে অবাধে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করিয়াছেন, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যে কলহ বিবাদ হয়, যুদ্ধের দ্বারা তাহার প্রতিকার এপর্য্যন্ত হয় নাই, হইতেও পারে না—অতএব মানুষকে যত নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহিতে হউক না কেন, অহিংস পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে বহু ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ অবলম্বিত হইয়াছে,

তাহাতেও জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যায় নাই। মানুষ স্বভাবতঃই ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ করিতে চায়, কোন্‌টা ন্যায় ও সত্য তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা সেই পন্থা অবলম্বন করিবে—এইরূপ ধারণার বশেই মহাত্মা গান্ধীর মত লোক অহিংস পন্থার উপদেশ দেন। কিন্তু বস্তুতঃ মানব-প্রকৃতি এত উন্নত নহে, তাহার মধ্যে এখনও অনেক অজ্ঞান ও বিকৃতি রহিয়াছে; সে-সব দূর করিতে না পারিলে তাহাদিগকে শুধু ন্যায় ও সত্যের পথ দেখাইয়া দিলে কোন ফলই হইবে না—চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। যুদ্ধের দ্বারাই যুদ্ধ বন্ধ হইবে না ইহা সত্য,চাই মানব-প্রকৃতির আমূল রূপান্তর। কিন্তু হিংসাপরায়ণ অত্যাচারী ব্যক্তিগণকে যদি বলপূর্ব্বক দমন না করা যায় তাহা হইলে সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে, মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল পরিস্থিতি পাইবে না, অতএব ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্য মানবসমাজ হইতে হিংসা ও যুদ্ধ বিগ্রহ উঠাইয়া দিবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমানে যুদ্ধের দ্বারাই বিরোধী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযুদ্ধ প্রশংসিত হইয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মপক্ষেই হউক আর অধর্ম্ম পক্ষেই হউক যুদ্ধ, নরহত্যা ও রক্তপাত করিলে কি মানুষের নৈতিক অধঃপতন হইবে না? সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, মূল সত্তায় সকল মানুষই এক—ইহাই আধ্যাত্মিকতার সার কথা। যুদ্ধ ও রক্তপাত কি এই অধ্যাত্ম আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে? সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিয়াই যদি অধ্যাত্মজীবন লাভ করা যায়, তাহা হইলে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণবধ করিয়া কেমন করিয়া সে জীবন লব্ধ হইবে? বিষ্ণু-পুরাণে বলা হইয়াছে, "অন্য কোন প্রাণীরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়" (৩.৮।১০)। তাই ভারতের হিন্দুগণ জীব-হত্যাকে মহাপাপ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। অথচ এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে হইলে, সমাজ ও সভ্যতা রক্ষা করিতে হইলে জীবহত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অপরিহার্য্য। এই সমস্যার দুই রকম সমাধান দেখা যায়। প্রথম, হিংসা যখন পাপ তখন কোন কারণেই তাহা করা উচিত নহে; হিংসাবর্জ্জন করিলে আপাততঃ ক্ষতি হইলেও পরিণামে তাহার ফল ভাল হইবেই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—হিংসা যেমন পাপ, ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা না করাও কম পাপ নহে, কারণ একজন আততায়ীকে বধ করিয়া আমি যদি

শতজন লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা না করিলে আমাকে ঐ শতজন লোকের প্রাণনাশরূপ পাপের ভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয় সমাধান হইতেছে এই যে, হিংসা পাপ হইলেও মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় যখন উহা অপরিহার্য্য তখন উহাকে যতদূর সম্ভব কম করিতে হইবে—আর যাঁহারা সম্পূর্ণ অহিংস হইয়া অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে আমরা এইরূপ সমাধানই পাই—সেখানে সম্পূর্ণ অহিংসা এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন চতুর্থ আশ্রমের জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে,

ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুষু॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসংঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ৩।৯।২৬-২৭

—"হে অবনীপতে! ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকল আসক্তি বর্জ্জন করিবেন।"

শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" বলিতে এইরূপ চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসিগণকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহা আদৌ গীতার শিক্ষা নহে—গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে হইলে সংসার বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, অনাসক্ত ভাবে যে-ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী (৬।১)। উপনিষদে অহিংসার যে বিধি আছে মীমাংসকগণ তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থে যে হিংসা করা হয় না অথবা যাহা শাস্ত্রবিগর্হিত তাহাই পাপ ও বর্জ্জনীয়। গীতাও বলিয়াছে,

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। ৩।৯

হিংসা বা অহিংসা যে কোন কর্ম্মই অহং-বুদ্ধিতে আসক্তি ও বাসনার বশে

না করিয়া যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে করা হয় তাহাতে পাপ বা বন্ধন হয় না। ইহাই হইতেছে গীতার সমাধান,

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

সন্ন্যাসিগণ যে সকল প্রকার কর্ম্ম ও হিংসা বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেন তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে, আর সেই অসম্ভব প্রয়াস করিতে গেলে শরীর রক্ষা হইবে না। জীবহিংসা ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না, প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা কোটি কোটি জীবকে হত্যা করিতেছি—ইহা বন্ধ হইলে জীবনেরই শেষ হইবে।

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানুষের আত্মবিকাশের জন্য এক অবস্থায় প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা দ্বারা জীবন ও কর্ম্ম-সমস্যার চরম সমাধান হয় না। মানুষ এখন যে মানসচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছে ইহার স্বরূপই হইতেছে অজ্ঞান, ইহা সকল সত্যকেই আংশিক ভাবে দেখে এবং এইভাবে সত্যকে অসত্যে, ধর্ম্মকে অধর্ম্মে পরিণত করিবার সম্ভাবনা ইহার মধ্যে রহিয়াছে। অহিংসা, জীবে দয়া পরম সত্য ও পরম ধর্ম্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন,
ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন।"

কিন্তু এই ধর্ম্মেরও অতিমাত্রায় মানুষ মানুষের জীবনের ক্ষতি করিয়া কীটপতঙ্গের, পশুপক্ষীর সেবা করিতে উদ্যত হয়! জৈনধর্ম্ম ইহার নিদর্শন। জৈন সাধকরা সর্ব্বদা নাকে একটী কাপড় বাঁধিয়া রাখেন যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কোন জীবহানি না হয়, এইভাবে তাঁহারা একটি পরম সত্য ও ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আবার যাঁহারা অহিংসার নামে আত্মরক্ষা, দেশরক্ষায় বলপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন—তাঁহারা অত্যাচারীর অত্যাচারকেই প্রশ্রয় দিয়া মানবসমাজের অশেষ অহিতসাধন করিতেছেন।* আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিলে কোন পাপ হয় না ইহা শাস্ত্রেরই

* কথিত আছে সেনাপতি সিংহ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা অন্যায় কি না বুদ্ধকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন—"যে শাস্তির যোগ্য তাহাকে শাস্তি দিতেই হইবে... তথাগতের শিক্ষা ইহা নহে যে, যাহারা শান্তিরক্ষার জন্য সকল চেষ্টায় বিফল হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহারা দোষের ভাগী হয়।"

বিধান। মনু বলিয়াছেন, আত্মানং সততং রক্ষেৎ। মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছেন,

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

(মহাভারত, আদি, ১১৫।৩৬)

লোকমান্য তিলক এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আত্ম শব্দ সাধারণ সর্ব্বনাম, ইহা হইতে আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রেরও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।" কিন্তু আবার এই "আত্ম"রক্ষার নীতিই কিরূপ দুষ্ট নীতিতে পরিণত হইতে পারে আধুনিক জার্ম্মান জাতি তাহার সুন্দর নিদর্শন। তাহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে জগতে জার্ম্মাণ জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাহাদের মতে অ-শ্বেত জাতিসমূহ শ্বেত-জাতির অধীনে কুলী মজুরের কার্য্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইতেছে সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে মহাপাপ —এ-কথা হিট্‌লার তাঁহার Mein Kampf গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। আর শ্বেতজাতির মধ্যে জার্ম্মাণ জাতিই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারা সংখ্যায় যত বর্দ্ধিত হইবে ততই জগতের পক্ষে কল্যাণকর—অতএব তাহাদের স্থান (Lebensraum) করিবার জন্য অন্য দেশ দখল করিয়া লওয়া, অন্য জাতিকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া—ইহাই হইতেছে ভগবানের অভিপ্রেত, ইহাতেই সর্ব্বভূতের প্রকৃত হিত সাধিত হইবে। বহুদিন হইতে জার্ম্মাণ জাতিকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তাহারা গত মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধেরও অবতারণা করিয়াছে —এবং যে ভাবে তাহারা লক্ষ লক্ষ অ-সামরিক নরনারীকে হত্যা করিতেছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অসুর ও রাক্ষস শক্তি তাহাদের উপর ভর করিয়াছে। অহং ও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত তাহা কোথায় দাঁড়ায়, জার্ম্মাণ জাতি হইতেছে আধুনিক জগতে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতএব হিংসার নীতি ও অহিংসার নীতি দুই-ই ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগী ও সমর্থনযোগ্য হইলেও এই সব বাহ্য নীতির দ্বারা মানবজীবনের সমস্যা-সমূহের চরম সমাধান হইবে না। আর চরম সমাধান দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য

হওয়ায় গীতা উভয়েরই উর্দ্ধে উঠিতে বলিয়াছে, উভে সুকৃত দুষ্কৃতে, এবং মানুষ কেমন করিয়া সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম অবস্থায় উঠিতে পারে তাহার ক্রমিক সাধনা দেখাইয়া দিয়াছে। গীতা যে অহিংসার শিক্ষা দিয়াছে তাহার কোথাও ব্যতিক্রম নাই—গীতা কোন অবস্থাতেই হিংসার সমর্থন করে নাই, হিংসার উপদেশ দেয় নাই, স্পষ্টভাবে জাতিধর্ম্ম শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের হিত সাধন করিতে বলিয়াছে। কিন্তু যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনই হিংসা ও অহিংসা বলিতে গীতা বাহিরের কোন কর্ম্ম বুঝে নাই—ভিতরের আভ্যন্তরীণ ভাবই বুঝিয়াছে।* কাহারও প্রতি কোন অবস্থায় হিংসার ভাব, বৈরভাব পোষণ করিবে না ইহাই গীতার শিক্ষা, নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে প্রয়োজন হইলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না, কাহাকেও আঘাত বা বধ করিবে না। যুদ্ধ করিবে হিংসার বশে নহে, বৈরভাব লইয়া নহে, পরন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায়। ইহাই প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়,—যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য—তিনি যুদ্ধে রক্তপাত করিলে তাঁহার পাপ হইবে না, বরঞ্চ তাহা না করিলে পাপ হইবে,

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ২।৩৩

কিন্তু ইহাতেও চরম সমাধান হয় না—কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিলে পাপ হয় না বুঝিলাম, কিন্তু কোন্‌টা আমার কর্ত্তব্য তাহা আমি নিঃসংশয়ে বুঝিব কেমন করিয়া? যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞাতিহত্যা, গুরুহত্যা-রূপ মহাপাপ কি কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে? এ-সংশয় আমার মনে উঠিলে তাহার সমাধান কেমন করিয়া হইবে? আমার মনে যদি হয় যে, কোন একটা কর্ম্ম পাপ তাহা হইলে সেটি করিবার কর্ত্তব্যবোধ আমার কেমন করিয়া আসিবে? অন্য পক্ষে দেখা যায় মানুষ অতি বড় অন্যায় কর্ম্মও কর্ত্তব্য বোধ লইয়া করে—ইহুদী জাতিকে, পোল জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া জর্ম্মাণ জাতির বর্দ্ধনের ব্যবস্থা করাই হিটলার তাঁহার পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছেন। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যতক্ষণ অহংভাব আছে ততক্ষণ সে

---

* যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৮।১৭

ঠিক ভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না—এই অবস্থায় শাস্ত্র কতকটা সহায় হইতে পারে। গীতা সে উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছে—শাস্ত্রবিধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে হইতে পারে, শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য। প্রকৃত সমাধান মিলিবে যখন মানুষ তাহার মধ্যে অহংভাব ও কামক্রোধ সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিবে। এই জন্যই গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতে নির্ব্বাণ-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে, এমন কি রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। যখন আমরা বাসনা কামনার বশ্যতা হইতে এবং তাহাদের মূল অহংভাব হইতে মুক্ত হইব, সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিব, তখনই ভগবানের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা এক হইবে, কেবল তখনই আমাদের সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের হিত সাধিত হইবে, এবং ইহাই গীতার আদর্শ। আততায়ীকে বধ করিলেই যে তাহার অহিত বা অনিষ্ট করা হয়, তাহা নহে। গীতা দেহের জীবনকে বড় স্থান দেয় নাই, আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা। অধ্যাত্মজীবনবিকাশের পথে এই দেহটা যদি বিঘ্নস্বরূপ হয় তবে ইহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আততায়ীকে বধ করিয়া যদি তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা যায় তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহার কল্যাণই সাধন করা হয়—ভগবান এই ভাব লইয়াই দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন করেন, পরন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার হিংসা বা বৈরভাব নাই—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। ৯।২৯

সর্ব্বভূতের প্রতিই তাঁহার সমভাব, কাহারও প্রতি তাহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। তথাপি জগৎকে তাহার লক্ষ্যের দিকে লইবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি ধ্বংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকসকলকে সংহার করেন, কালোঽহং লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তঃ। একদিকে তিনি রুদ্র, ধ্বংসরূপী মহাকাল, অন্যদিকে তিনিই আবার সর্ব্বভূতের সুহৃদ্; ধ্বংসের ভিতর দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া, সকল সুখদুঃখ, শোকতাপের ভিতর দিয়া তিনি সকলকেই অমৃতত্বের পরম শান্তি ও আনন্দের দিকে লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগকেও এই ভাব লাভ করিতে হইবে, আত্মায় ভগবানের সহিত ও সর্ব্বভূতের সহিত এক হইতে হইবে, আর আমাদের বাহ্যপ্রকৃতিকে, দেহ, প্রাণ, মনকে জগতে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের যন্ত্র, নিমিত্ত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহা

সহজে হয় না, ইহার জন্য অনেক সাধনার প্রয়োজন। সাধনার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে আমাদের অহংভাবের নির্ব্বাণ করিতে হইবে—তবেই আমরা আত্মায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হইতে পারিব, প্রকৃতভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিতে পারিব। পাশ্চাত্য কর্ম্মীর ন্যায় গীতার কর্ম্মযোগী দেশের হিত, সমাজের হিত, মানবজাতির হিত এমন কোন কামনা লইয়া কর্ম্ম করেন না, পরিবার, জাতি, দেশ, কাহারও প্রতি তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তব্য বা দায়িত্বের বন্ধন নাই—তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। এই সব আংশিক সত্যের উপর যে চরম সত্য, আত্মার সত্য, ভগবানের সত্য—তিনি সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করেন; তাঁহার সম্বন্ধ শুধু ভগবানের সহিত, কর্ত্তব্য শুধু ভগবানের প্রতি, দায়িত্ব শুধু ভগবানের নিকট—ভগবানের ইচ্ছা পালন ছাড়া তাঁহার জীবনের, তাঁহার কর্ম্মের আর কোন নীতি নাই। আর তিনি সকল অহংভাব ও বাসনা হইতে, কামক্রোধ আসক্তি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলিয়া তিনি তাঁহার অহংভাবাত্মক বাসনা কামনাকেই ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করেন না, তিনি অজ্ঞান অপূর্ণ মনবুদ্ধির যুক্তিতর্কের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না—তিনি শুধু নিজেকে ঊর্দ্ধের দিকে খুলিয়া রাখেন—ভাগবত শক্তি তাঁহার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়, তাঁহার কর্ম্ম সুচারুভাবে সম্পাদন করিয়া দেয়, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বভূতের যথার্থ হিত সাধন করে।

কিন্তু যতক্ষণ মানুষ এই মুক্ত অবস্থা লাভ না করিতেছে, এইভাবে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত না হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে কোন আংশিক সত্যকে স্বীকার করিয়াই চলিতে হইবে—নিজের ব্যক্তিগত বাসনা কামনা স্বার্থকে কোন মহত্তর জিনিষের অধীন করিয়া দিতে হইবে, পরিবার, দেশ, মানবজাতি এইরূপ কোন আদর্শের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহার আত্মবিকাশ যেমন বর্দ্ধিত হইবে, সকল বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে—কিন্তু এই মুক্তি তাহাকে সর্ব্বভূত হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবে না, কারণ সে সর্ব্বভূতের সহিত মূল সত্তায় নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিবে—যতক্ষণ না সকল মানব তাহার ন্যায় মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহার নিজের মুক্তি হইল না বলিয়াই সে অনুভব করিবে। সেইজন্য নিজে মুক্তি লাভ করিয়া সে সর্ব্বভূতের হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকিবে—ইহাই গীতার শিক্ষা।

বুদ্ধ নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন সকল মানবকে সেই পথ দেখাইয়া দিবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে নির্ব্বাণের মহান আহ্বান শুনিলেন, অন্যদিকে মানবের দুঃখে বিশেষতঃ দীনহীনদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, তিনি সকলের সহিত নিজ একত্ব অনুভব করিয়া সকলের সেবায় নিজকে নিযুক্ত করিলেন। ইহাই গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ,—ভিতরে নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাহিরে অতন্দ্রিতভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

মানবজাতি এখন উপলব্ধি করিতেছে যে, দেশের সেবা, জাতির সেবা এই সব আদর্শ যথেষ্ট নহে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মিস্ ক্যাভেল শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন, "Patriotism is not enough"—দেশপ্রেমই যথেষ্ট নহে। আজ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারে পরিণত হইয়াছে, এখন মানবসমাজের নূতন তন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে চাই সকল মানুষের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য বোধ, কিন্তু ইহা কোন মানসিক বা নৈতিক আদর্শ হইলে চলিবে না, গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গীতা মানবজাতির সম্মুখে সেই আদর্শই ধরিয়াছিল, তাহারও বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদে এই আদর্শ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে।

অনুবাদ। যে-সকল যত্নশীল সাধক কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাঁহাদের চারিদিকে থাকে (তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণের মধ্যেই বাস করেন), কারণ তাঁহারা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের উপর্য্যুপরি তিনটি শ্লোকে (২৪-২৬) নির্ব্বাণতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই বলা হইয়াছে, যে-যোগী নিজ অন্তরের মধ্যে সুখ, শান্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ

করেন (৫।২৪)। সাধারণ জীবনে আমরা "আমি" বলিয়া যাহা অনুভব করি তাহা আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, তাহা হইতেছে আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন লইয়া গঠিত, প্রকৃতির তিন গুণের অধীন—সেখানে প্রকৃত আত্মজয় নাই, আত্মজ্ঞান নাই। এই "আমি" নিজেকে জগতের আর সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করে এবং নিজের বাসনা কামনার বশে কর্ম্ম করা হইতেছে ইহার নীতি। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সকলের প্রতি আসক্তিই হইতেছে এই "আমি" বা অহংয়ের গ্রন্থি। এই "আমি"র জীবন দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তিতে পূর্ণ, ইহার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই—এখানে আমরা অবশভাবে প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা চালিত হই। কিন্তু আমাদের মধ্যে আর একটি উর্দ্ধতর সত্তা রহিয়াছে, তাহা আত্মা, অধ্যাত্ম সত্তা—জ্ঞান ও মুক্তি তাহার অন্তর্নিহিত, তাহা আপনার জ্যোতিঃ, শান্তি, আনন্দে পূর্ণ। নীচের অহংয়ের প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিয়া এই আত্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—ইহাই সকল প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ছিল এবং গীতাও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে আত্মাকে লাভ করার অর্থ হইতেছে, তখন আর আমরা ক্ষুদ্র অহং থাকি না, এই দেহ, প্রাণ ও মনের সীমাবদ্ধ জীবনকেই আমাদের সব সত্তা বলিয়া দেখি না, পরন্তু আমরা অনুভব করি যে, আমরা অজর অমর অনাদি অনন্ত আত্মা, এই এক আত্মাই সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে, এই আত্মাতেই সর্ব্বভূত রহিয়াছে—বস্তুতঃ এই আত্মাই ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তখন আমরা "আমি" ছাড়াইয়া ব্রহ্ম হই, ব্রহ্মভূতঃ, আর এই যে ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে "আমি"ত্বের নির্ব্বাণ বা লয়—গীতা ইহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিয়াছে। কিন্তু তখন কি আব এই দেহ, প্রাণ, মনের জীবন থাকিবে? তখন কি জীবচৈতন্য, জগৎচৈতন্য থাকিবে? প্রারব্ধের বশে যতদিন দেহটা থাকিবে ততদিন তাহার মধ্যে প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, আহার নিদ্রা ইত্যাদি চলিতে থাকিবে, কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষ আত্মচৈতন্যে সমাধিস্থ হইয়া থাকিবেন—দেহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সমস্ত খেলা শেষ হইয়া যাইবে, ব্রহ্মের মধ্যে জীবাত্মার সম্পূর্ণ লোপ হইবে—ইহাই মোক্ষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু গীতা যে এই আদর্শ গ্রহণ করে নাই পরের দুইটি শ্লোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে—যে সকল ঋষি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন

তাঁহারাই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে এইটিই নির্ব্বাণের অবস্থা, কিন্তু ইহা ত সাংসারিক জীবন ও কর্ম্মের বিলোপ নহে, ইহা শুধু পাপ ও অজ্ঞানের বিলোপ এবং এই জ্ঞানময় ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন। তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, এইটি হইতেছে নির্ব্বাণের সাধন, প্রকৃত নির্ব্বাণ নহে—যাঁহারা এইরূপ নিষ্পাপ ও সর্ব্বভূতহিতে রত তাঁহারাই নির্ব্বাণলাভের যোগ্য হইয়া উঠেন, নির্ব্বাণলাভের পর আর তাঁহাদের সংসার বা কর্ম্ম থাকে না, এইরূপ সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য গীতা পরের শ্লোকেই (৫।২৫) স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, যে-সব নিষ্পাপ সাধক আত্মাকে জানিয়াছেন, নির্ব্বাণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান—এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহারা নির্ব্বাণের মধ্যে বাস করেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে সংসার ও কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না। গীতার মতে অহং ভাব ছাড়াইয়া উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ব্রহ্ম হওয়া— ইহাই নির্ব্বাণ, আত্মাকে জানিয়াই এইরূপ ব্রহ্ম হওয়া যায় এবং তখন সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় না,—এই সমস্ত সংসার, সমস্ত জীব ও জগৎই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভূত হয়। উপনিষদও বলিয়াছে—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, তরতি শোকং, তরতি পাপ্মানং, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ (মুণ্ডক, ৩।২।৯)

—"যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে বিদিত হন তিনি ব্রহ্মই হন, তাঁহার বংশে কোন অব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করে না। তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ অতিক্রম করেন; তিনি হৃদয়গ্রন্থিসমূহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন।"

অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭ ; কঠ, ২।৩।১৫

"তখন মর্ত্ত্য জীব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানেই, এই দেহেই বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করেন।"

কামক্রোধবিযুক্তানাং। অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইবে—দিব্য জীবন ও দিব্য কর্ম্মের জন্য এইটিই হইতেছে প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের গণ্ডী

অতিক্রম করিয়া নির্ব্যক্তিক সত্তায় এবং সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের অহংয়ের প্রতি এবং অহংয়ের সকল সম্বন্ধের প্রতি আসক্ত থাকি। অহংয়ের প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি হইতেছে কাম অর্থাৎ বাসনা কামনা। বাসনার বশেই আমরা "আমি" "আমার" এইরূপ ভাব পোষণ করি, কিসে আমার এবং আমার আপন জন সকলের ভাল হইবে, ভোগসুখের বৃদ্ধি হইবে সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি, যাহা কিছু আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী বলিয়া মনে হয় সেই সবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হই, এবং এই দুরতিক্রম্য অহংভাব ও বাসনার জন্যই আমরা সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, জয় পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অধীন হই। কামনা সকল সময়েই আমাদের মনে বিভ্রম লইয়া আইসে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে, সকল জিনিষকে বিকৃতভাবে দেখায়, জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দেয় (৩।৩৯)। কামনা এবং ইহা হইতে উত্থিত ক্রোধাদি রিপু সকল হইতেছে সকল পাপ ও ভ্রান্তির মূল (৩।৩৭)। যতক্ষণ আমরা বাসনা কামনা পোষণ করি ততক্ষণ নির্ম্মল শান্তি, স্থির আলোক, শান্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হয় না। কামনা হইতেছে অধ্যাত্ম সত্তার বিকৃতি—যতক্ষণ আমরা ইহার অধীন থাকি আমরা অধ্যাত্ম সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি না, যথাযথ চিন্তা, যথাযথ কর্ম্ম, যথাযথ প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয় না। যে-কোন রূপে, যে-কোন অছিলায় কামনাকে থাকিতে দিলে তাহা বিজ্ঞতম ব্যক্তিরও চিরশত্রুরূপে বিরাজ করিবে, জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, এবং মনকে যত্নলব্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইতেও বিচ্যুত করিয়া দিবে (২।৬০)। বাসনা কামনাই হইতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির প্রধান শত্রু।

অতএব গীতার বাণী হইতেছে—"কামকে বধ কর; বাহ্য বস্তু যে ভোগ-সুখ আনয়ন করে তাহার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন কর। বাহির হইতে যে-সব স্পর্শ বা আকর্ষণ আইসে, মন ও ইন্দ্রিয়ের ভোগের বস্তু রূপে আইসে, সে-সব হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখ। কামক্রোধাদি রিপুর বেগকে সহ্য করা এবং বর্জ্জন করা অভ্যাস কর, যদিই তাহারা তোমার দেহ, প্রাণ, মনে বিক্ষোভ উৎপাদন করে তখনও তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা অভ্যাস কর, নিজেকে সে-সব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা অভ্যাস কর, শেষে আর তাহারা তোমার প্রকৃতির কোন অংশকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

এই ভাবে সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সহ্য কর, প্রকৃতি হইতে ঘৃণা, বিদ্বেষ নির্ম্মূল করিয়া দাও। কামোপভোগের সকল বস্তুর প্রতি একটা শান্ত উদাসীন ভাব হউক।

এই ভাবে তুমি পাইবে পূর্ণতম সমতা এবং অবিচল স্থিরতার শক্তি, ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতির বিচিত্র লীলার পশ্চাতে স্থির ও সমভাবে বিদ্যমান তুমিও সেই ভাব লাভ করিবে—কামক্রোধ হইতে বিযুক্ত জিতাত্মা যতচিত্ত হইবে। সমভাব লইয়া সব কিছুকে দেখ; যাহা কিছু তোমার কাছে আসে—জয় পরাজয়, মান অপমান, যশ নিন্দা, মানুষের ভালবাসা ও সমাদর অথবা ঘৃণা ও নির্য্যাতন, যে-কোন ঘটনা অপরের মধ্যে সুখের উদ্রেক করে বা দুঃখের উদ্রেক করে—সে-সবকে গ্রহণ কর হৃদয় ও মনে পূর্ণ সমতা লইয়া। সকল ব্যক্তির প্রতি, সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, শ্রেষ্ঠ মানব, ক্ষুদ্রতম জীব —সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখ। তোমার সহিত যাহার যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর সকলকে সমান ভাবে গ্রহণ কর। এ-সকল সম্বন্ধের কেন্দ্র হইতেছে অহং, আর তোমাকে হইতে হইবে অহং হইতে মুক্ত। এ-সব হইতেছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, আর তোমাকে গভীর নির্ব্যক্তিক ভাব লইয়া সব কিছুকে দেখিতে হইবে। এ-সব ভেদ বাহ্যিক, সাময়িক—তুমি এই ভেদ দেখিবে কিন্তু ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না; কারণ তোমাকে মন দিতে হইবে এই সব ভেদের উপরে নহে, পরন্তু যাহা সকলের মধ্যে এক, সকলে মূলতঃ যে এক আত্মা, সকল জীবের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাহার উপরেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, জগতের সকল বস্তু, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া এক ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে, তাহারই উপর তোমার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তখনও তোমার মধ্যে কর্ম্ম চলিবে, কারণ প্রকৃতির কর্ম্ম কখনই বন্ধ হয় না। কিন্তু তোমাকে অনুভব করিতে হইবে-যে, তোমার আত্মা কর্ত্তা নহে; কেবল দেখিয়া যাও, অবিচলিত থাকিয়া দেখিয়া যাও প্রকৃতি তোমার মধ্যে কেমন সব কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতির গুণসকল কিরূপ রহস্যময় ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ; তোমার চতুর্দ্দিকে কি ক্রিয়া চলিতেছে দেখ এবং বুঝ যে অপরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া চলিতেছে। দেখিবে তোমার বা তাহাদের কর্ম্মের পরিণাম অনেক সময়েই

এমন হইতেছে যাহা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর নাই বা আশা কর নাই—সে ফল নির্দ্ধারিত হইতেছে এক সর্ব্বজয়ী শক্তি দ্বারা। এমন কি তুমি যে কর্ম্মের সঙ্কল্প কর, তাহা বস্তুতঃ তোমার সঙ্কল্প নহে, তোমার অহংয়ের সঙ্কল্প, এবং সে অহং হইতেছে প্রকৃতিরই সৃষ্টি, তাহা তোমার প্রকৃত সত্তা নহে। তোমার এইবাহ্য প্রাকৃত সত্তা হইতে সরিয়া, তোমার নীরব নিশ্চল আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হও; তুমি দেখিতে পাইবে তুমি পুরুষ নিষ্ক্রিয়, পরন্তু প্রকৃতি সকল সময়েই তাহার গুণসকলের অনুসারে কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হও; নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না। প্রকৃতির খেলার ঊর্দ্ধে নিজের মধ্যে আসীন থাক, প্রকৃতির গুণসকলের বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া হইতে মুক্ত থাক, নির্ব্যক্তিক অধ্যাত্মসত্তার কলুষহীনতার মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া থাক, তোমার দেহ, প্রাণ, মনে যে-সব আবিল তরঙ্গ উঠিতেছে সে-সব যেন তোমাকে বিক্ষুব্ধ না করে।

যদি ইহা করিতে পার তাহা হইলে তুমি এক মহান মুক্তি, উদার স্বাধীনতা ও গভীর শান্তির মধ্যে উন্নীত হইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, অমৃত হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের অতীত তোমার চিরন্তন আত্মসত্তাকে লাভ করিবে, তোমার অধ্যাত্মসত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াসকল আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন তুমি তোমার সুখের জন্য, বাসনাতৃপ্তির জন্য কোন মর্ত্ত্য বা বাহ্য বা পার্থিব জিনিষের উপর নির্ভর করিবে না, পরন্তু শান্ত ও শাশ্বত আত্মার যে আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ তাহাই চিরতরে লাভ করিবে। তখন আর তুমি একটি মনোময় জীব থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অনন্ত আত্মা, তখন তুমি হইবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মভূতঃ।

যতীনাং যতচেতসাম্। গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ সাধনারই ইঙ্গিত দিয়াছে, এবং এইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে অহংভাবের লয় করিয়া ব্রহ্ম হওয়াকেই নির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। যাহারা যত্নের সহিত সাধনা করিয়া এইভাবে চেতনার রূপান্তর সাধন করে, যতীনাং যতচেতসাম্, নির্ব্বাণ তাহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এইরূপ সাধনা ও সিদ্ধিলাভ কি সংসারে থাকিয়া সম্ভব? শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাই তাঁহারা "যতি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রথমে স্পষ্টই কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা

হইয়াছে ; আবার ২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত থাকিয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। অতএব এখানে 'যতি' শব্দে যত্নশীল সাধকই বুঝিতে হইবে, সংসারত্যাগী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। তবে সাধারণ সাংসারিক জীবনে আত্মীয় স্বজনের সেবা করিতে করিতে এই সমুচ্চ সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই গীতা এখানে "যতি" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহিত যোগসাধনা করিয়া যাঁহারা আত্মজয়ের প্রয়াস করিতেছেন তাঁহারাই যতি, তাঁহারাই কাম-ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

সাধারণ সাংসারিক জীবনের মূলনীতি হইতেছে অহংয়ের বাসনা কামনার তৃপ্তি। সেখানে মানুষ কাম ও ক্রোধ হইতে বিযুক্ত নহে, মুক্ত নহে; পরন্তু যাহারা শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী সে-সবকে যতদূর সম্ভব সংযত করে তাহারাই হয় ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান। কিন্তু গীতার আদর্শ ইহা হইতে অনেক উর্দ্ধে—গীতা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত বলিয়াছে, কাম ক্রোধ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত না হইলে প্রকৃত মুক্তি নাই —শুধু কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করা নহে, প্রকৃতির এমন রূপান্তর সাধন করিতে হইবে যেন কাম ক্রোধ উৎপন্ন না হয়। কাম ও ক্রোধের বিয়োগ বলিতে তাহাদের অনুৎপত্তি বুঝায়। ইহা অনেক সাধনাসাপেক্ষ। বিষয়ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিয়া এ সাধনা হয় না। আবার সকল ভোগ্য-বিষয় হইতে সরিয়া নির্জ্জন বনে বা পর্ব্বতগুহায় থাকিয়াও এ-সাধনা হয় না, কারণ সেখানে কাম ক্রোধের নিমিত্তের অভাবে তাহাদের প্রকাশ না হইলেও প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের বীজ থাকিয়া যায়, সুযোগ পাইলেই তাহারা আত্মপ্রকাশ করে। কামিনী, কাঞ্চন, যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি—এ-সবের দিকে মানুষের প্রাণসত্তার প্রবল টান রহিয়াছে, এই টান দূর করিতে না পারিলে অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গণের আপন আপন ভোগ্য বিষয়ে রাগ দ্বেষ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত (৩।৩৪); যে-জিনিষটি ভাল লাগে সেইটিকে ধরিবার জন্য, পাইবার জন্য ইন্দ্রিয়সকল মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে, আর মন যদি তাহাতে সায় দেয় তাহা হইলেই মোহ উপস্থিত হয়, আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয় (২।৬৭)। সংসারে মানুষ স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বিষয় সম্পত্তি লইয়া জীবন যাপন করে—সেখানে তাহার চারিদিকে অহংয়ের তৃপ্তির,

কামনাতৃপ্তির দ্রব্য সকল সাজান রহিয়াছে—এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া সে অহংভাব জয় করিবে ইহা দুরাশা—কারণ এখানে জীবনের কেন্দ্রই হইতেছে অহং, অহংয়ের লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ, মান অপমান—এই সব লইয়াই মানুষের সাধারণ জীবন। এই অহংকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে, যাহা কিছুর সহিত অহংয়ের সম্বন্ধ আছে সে-সবকে একদিন নির্ম্মমভাবে ছাড়িতেই হইবে, অহংভাব লইয়া কোন কর্ম্ম করা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে—অতএব এই সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পক্ষে "সুখের সংসার" ছাড়িয়া যাইতেই হইবে—এ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষার সহিত গীতার শিক্ষার কোন অমিল নাই। গীতা নিজেই বলিয়াছে,

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮।৪৯

গীতা জ্ঞানের সাধন বলিয়াছে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংভাবশূন্যতা, সংসারের অনিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে আসক্তিশূন্য হওয়া, ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহাই হউক তাহাতে সমভাব রক্ষা করা, নির্জ্জন স্থানে থাকা, সর্ব্বদা অধ্যাত্ম বিষয়ে চিন্তা করা, তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করা (১৩।৮-১১)। সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এই সাধনা করা অতিশয় কঠিন। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল কথাগুলি খুবই মর্ম্মস্পর্শী। সংসার না ছাড়িলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, এ-কথা বলিলে লোকে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে তাই তিনি বলিতেন—"পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ কর। কিন্তু বড় কঠিন। যে ঘরে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরে বিকারের রোগী। কেমন করে রোগ সারবে ? আবার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার ও তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে ; ঐটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল।···চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায় সে মাটির ভিতর রাখ্‌তে পারে, জলের ভিতরও রাখ্‌তে পারে—সোনার কিছুই হয় না। আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। কাঁচা মনকে সংসারে রাখ্‌তে গেলে মন মলিন হয়ে যায় ; জ্ঞান লাভ করে তবে

সংসারে থাকতে হয়। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোনও গোল থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য—হলুদ।"

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদী নহেন—শঙ্করের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য লাভের পর আর সংসার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, জ্ঞান বৈরাগ্য লাভ না করিয়া লোকে সংসারে থাকে বলিয়াই দুঃখ পায়, নতুবা এই সংসারই হয় "বিদ্যার সংসার", শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ * এবং বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে গীতার শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তা হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ-সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের উপর খুব জোর দিয়াছেন—বলিয়াছেন, এই দুটি বিঘ্ন, ইহারা ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, তিনি বুঝি সংসারত্যাগেরই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার মত এই যে, যাহারা অজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, বিকারের রোগী, তাহাদের পক্ষেই তেঁতুল ও আচারের ন্যায় কামিনীকাঞ্চন অনিষ্টকর। "যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সেই মনের বার আনা মেয়েমানুষে নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দিবে?" একবার জ্ঞান হইলে, ঈশ্বরলাভ হইলে আর কামিনীকাঞ্চন হইতে কোন ভয় থাকে না—তখন স্ত্রীলোক কি বস্তু তাহা বোঝা যায়, টাকারও সদ্ব্যবহার করা যায়—এইরূপ দিব্য জীবন বা "বিদ্যার সংসারই" শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ † এবং এইটি গীতারও আদর্শ।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,

এই সংসার মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

† শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তলোয়ার ঘুরাতেন—একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।"

কিন্তু সাধারণ সাংসারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে লাভ করা অতিশয় কঠিন, এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। এইখানে সন্ন্যাসীদের শিক্ষার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার এবং গীতার শিক্ষারও বেশ মিল রহিয়াছে। "ভগবান লাভ কর্‌তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথের বিরুদ্ধ বলে বোধ হয়, তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী। ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। ঢিমে তেতালা হলে হবে না। যে ত্যাগ করবে, তার খুব মনের বল চাই।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী)। 'যতীনাং যতচেতসাম্' বলিতে গীতা এইরূপ যত্নশীল দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত সাধকই বুঝিয়াছে। এইরূপ বৈরাগ্যসাধনের জন্য সাধারণ সাংসারিক জীবন হইতে, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা নহে। দুই চারিজন লোকের প্রকৃতির পক্ষে এরূপ সন্ন্যাসের সাধনা উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি কষ্টকর পন্থা (৫:৬) এবং অধিকাংশের পক্ষেই উপযোগী নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'যে-কালে যুদ্ধ কর্‌তেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্ষিদে, তৃষ্ণা, এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়ত খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চল্‌লুম।' স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্‌লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল,' তোমরা ত্যাগ কর্‌বে কেন? বাড়ীতে বরং সুবিধা; আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না, শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছেই পাবে।"

কিন্তু সংসারে যেমন এই সব সুবিধা আছে, সেখানে সাধনার বিঘ্নও কম নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাহা হইলে উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উপায় আছে। তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাক্‌লে তবে ত ভগবানকে দেবে? মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ

দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।…মন কেমন জান? যেমন স্প্রীংয়ের গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে; আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ কর, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্ব্বভাব ধারণ করে।…… …বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না; সাধুসঙ্গ একদিন কর্‌লে হয় না, সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে।"

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যদি সত্য সত্যই ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হয়, ভগবানকে লাভ করিয়া এই অবিদ্যা ও অজ্ঞানের সংসারকে বিদ্যার সংসারে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব এই অবিদ্যার সংসারের প্রতি মায়া কাটাইতেই হইবে, যে-মন স্ত্রী পুত্র পরিজনের নিকট, কামিনী-কাঞ্চনের নিকট বন্ধক দিয়াছি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মন নানা ভোগ্যবস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইলে বিবেকরূপ ডাঙ্গস্ মারিয়া তাহাকে স্থির করিতে হইবে—আর এই কঠিন সাধনায় গুরুর সঙ্গ, গুরুর সাহায্য, গুরুর কৃপা অপরিহার্য্য। স্বগৃহ ছাড়িয়া সদ্‌গুরুর সাধন-আশ্রমে গিয়া বাস করিতে হইবে—কারণ সর্ব্বদাই গুরুরূপ বৈদ্যের সাহায্য প্রয়োজন, রোগ যে লাগিয়াই আছে। যে-মন লইয়া, কর্ম্মশক্তি লইয়া স্বার্থ চিন্তা করিতেছি, স্ত্রীপুত্রের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি—সে-সব শুধু ভগবদ্ চিন্তায় ও গুরুর আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত করিতে হইবে, আমার বলিতে ধনসম্পত্তি যাহা কিছু আছে, নিজের ভোগের জন্য না রাখিয়া গুরুর নির্দ্দেশ মত ভগবৎকার্য্যে উৎসর্গ করিতে হইবে, নিজের দেহ, প্রাণ, মন, সম্পত্তি সবই ভগবান জ্ঞানে গুরুকে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সাধন অবস্থায় ইহা প্রয়োজন, সিদ্ধি লাভের পর যেখানেই থাক আর যাহাই কর—তুমিও আর কখনও ভগবানকে ছাড়িবে না, ভগবানও আর কখনও তোমাকে ছাড়িবেন না,

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৬।৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ চারাগাছের দৃষ্টান্ত দিয়া এইরূপ সাধনারই ইঙ্গিত করিয়াছেন—"সংসারের ভিতর—বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির কর্‌তে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাথের গাছ। যখন চারাগাছ থাকে তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়,

শুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন শুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।"

অনেকেই আপত্তি করেন যে, এইভাবে স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিলে কর্ত্তব্যের হানি হয়; ভগবানের ইচ্ছাতেই আমরা স্ত্রীপুত্র পাইয়াছি সে-সব ছাড়িয়া গেলে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না কি? শ্রীরামকৃষ্ণ এই-সব অজ্ঞানপ্রসূত প্রশ্নের বেশ উত্তর দিয়াছেন—"সব্বাই সংসার ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ থুব্‌ড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা কোন্‌টা অনিচ্ছা সব কি জেনেছো? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বল্‌ছো। যখন স্ত্রী-পুত্র মরে, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন?"

বস্তুতঃ লোক স্ত্রীপুত্রের প্রতি আসক্তির বশে সংসার ছাড়িতে চায় না, কিন্তু মুখে বলে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছে। ভগবানের ইচ্ছাতেই আমরা সংসার পাতি এটা ঠিকই; ইহার ভিতর দিয়া আমাদের অভিজ্ঞতা হয়, আত্মবিকাশে সহায়তা হয়। আবার সংসারে আমরা যে অশেষ শোক দুঃখ পাই, এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া আমাদের "সুখের" সংসারকে শ্মশান করিয়া দিয়া যায় ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আমরা এইরূপ অজ্ঞানের সংসারে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকি—ইহাও ভগবানের অভিপ্রায় নহে। ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া—ইহাই মানব জীবনে ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায়, অনিত্যম্ অসুখম্ লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। যতদিন না আমরা স্বেচ্ছায় এই ভোগাসক্তি ছাড়িয়া ভগবানের দিকে ফিরিব, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সব কিছু বর্জ্জন করিব—ততদিন আমাদের শোক তাপ জরা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ নাই। আর যাহার মধ্যে ভগবানকে লাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তাহার সকল কর্ত্তব্যের শেষ হয়, সংসারের সকল ঋণ হইতে সে মুক্তি পায়—কারণ সংসারের সকল কর্ত্তব্যের বড় কর্ত্তব্য ভগবানকে লাভ করা। সকল কর্ত্তব্য, সকল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া যদি আমরা ভগবানের শরণাপন্ন হই, ভগবান নিজে আমাদিগকে সকল ঋণ, সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তাঁর জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মন বুদ্ধিকে আলোকিত করেন, তাঁর শক্তিতে আমাদের সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেন, তাঁর অনির্ব্বচনীয় প্রেমে

আমাদের সকল শোক তাপ বিদূরিত করিয়া আমাদের হৃদয়কে নিরতিশয় আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেন।

সকলের পক্ষে স্ত্রীপুত্র ও গৃহ ত্যাগ করিয়া এইরূপ "যতি" হওয়া, ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা সম্ভব নহে। তবে সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও নিজের মন প্রাণকে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য, ভগবান লাভের জন্য প্রস্তুত করা যায়—এবং সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংসারীদের সংসারধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য।* তবে তাহাদের বুঝা উচিত যে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে এবং গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই ভগবানকে লাভ করা যায় না, পাপ তাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায় না—ঐ সবের দ্বারা কেবল তামসিকতার কিছু উর্দ্ধে উঠা যায়। সংসারী লোকের জীবন হইতেছে সাধারণতঃ রাজসিক—অহং ও বাসনার বশ; সংসারের কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই যাহারা সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দেয়, সাত্ত্বিক ভাবকে বাড়াইয়া তোলে তাহারাই উচ্চতর গতির জন্য প্রস্তুত হয়—তখন সব ছাড়িয়া একান্তভাবে অধ্যাত্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল তাহাদের পক্ষে জোর করিয়া সব ছাড়া উচিত নহে—তাহাতে প্রকৃতিকে নিগ্রহ করা হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভোগ করিতে করিতেই বিচার করা যে, এ-সব অসার অনিত্য—প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ ইহাদের মধ্যে নাই, এ-সব ভোগ ছাড়িতেই হইবে। পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিবার সময় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে যে, "আমার" সংসার, "আমি পালন করিতেছি," "আমার কর্ত্তব্য"—এ-সব হইতেছে অজ্ঞানের কথা; এ-সংসারে কেহ কাহারও নহে, একমাত্র ভগবানই আমাদের আপন জন—তাঁহাকে পাইলে সংসারের সবাই আপনার হইয়া উঠিবে, তখন আর আপন-পর কোন ভেদ থাকিবে না—তখন শুধু একটি ক্ষুদ্র পরিবার নহে, পরন্তু আমাদের দ্বারা সর্ব্বভূতের হিত সাধিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "বাঘ যেমন কপ্ কপ্ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনিই 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না।" কিন্তু আবার কাম

* প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ইহাই লক্ষ্য ছিল।

ক্রোধাদি প্রবল থাকিলে ঈশ্বরে অনুরাগ হয় না—তাই অভ্যাস ও বিচারের দ্বারা তাহাদিগকে সংযত করিতে হয়। বাসনা কামনার মধ্যে আবার সবচেয়ে তীব্র কামনা হইতেছে কামিনী ও কাঞ্চনের কামনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না।...যে স্ত্রী-সুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎ-সুখ ত্যাগ করেছে, ঈশ্বর তার অতি নিকট।" "সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠ্‌বার জো নাই। বিশালাক্ষীর দ—যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না।" পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক যেমন সাধনার বিঘ্ন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষও তেম্নি সাধনার বিঘ্ন—যে স্ত্রীলোক অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে চায়, তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে কোন পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করা।

বস্তুতঃ স্ত্রী বা পুরুষ কেহই প্রকৃত শত্রু নহে, প্রকৃত শত্রু হইতেছে আমাদেরই ভিতরের কাম। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সহবাসে, পরস্পরের সহিত নানাপ্রকার রমণে যে সুখ পায় তাহার প্রতি তাহাদের প্রাণসত্তার আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা—বিচারের দ্বারা এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা এই সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে—কারণ ইহা মানুষকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হইতে বিমুখ করে। বিচার করিতে হইবে, "কি ভোগ সংসারে কর্‌বে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ—এই আছে, এই নাই। প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।" প্রাণ স্ত্রীসঙ্গের জন্য লালায়িত হইলেই যে তাহাতে সায় দিতে হইবে এমন কথা নাই। ছোট ছেলেরা কত জিনিষের জন্য আবদার করে, না পাইলে কাঁদে—অন্যায় অনিষ্টকর জিনিষের জন্য আবদার করিলে কি তাহাতে সায় দিতে হইবে? আমাদের অজ্ঞান প্রাণের কান্নাকে অজ্ঞান বালকের কান্নার মত বুঝাইয়া শান্ত করিতে হইবে। মেয়েদের মোহিনী শক্তি আছে, পুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে—সে আকর্ষণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোম্‌টা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌ না। সিক্‌নি ফেল্‌তে ফেল্‌তে কান্না! ভগবানেতে মন ঠিক রাখ্‌বি। যে বীরপুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ'।"

আর স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের প্রতি আমাদের যে স্নেহ ভালবাসা সেটিকেও অজ্ঞান মায়া বলিয়াই বিচার করিতে হইবে। মানুষ "আমার" "আমার" করে বলিয়াই সংসারে এত দুঃখ পায়। নিজের ছেলেকে যদি পরের ছেলের মত ভাবা অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সংসারী লোককে পুত্রশোকে এত ব্যথা পাইতে হয় না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াই কেমন করিয়া ভগবান লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়—গীতায় তাহার অনেক ইঙ্গিত আছে, তাহার একটু অভ্যাস করিতে পারিলেও অনেক লাভ হয়। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি খুবই পরিচিত, তথাপি বহুল প্রচারের জন্য তাহাদের কতকগুলি এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—কারণ সংসারী লোকের পক্ষে এই উপদেশগুলি বিশেষ সাহায্যপ্রদ।

"সংসারাসক্ত জীবের হুঁস্ নাই। তারা জালে পড়েই আছে। অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি এরূপ জ্ঞান নাই। যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, আবার তারা তাই করে। এদিকে ছেলে মারা গেছে শোকে কাতর, মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হলো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে। বলে, কি কর্‌বো অদৃষ্টে ছিল। তীর্থ কর্‌তে গেলেও ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না। কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধ জীব নিজের ও পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে' ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন, বদ্ধ জীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হবে?"

"তোমরা তো নিজে দেখ্‌ছো, সংসার অনিত্য। যাদের এত 'আমার' 'আমার' কর্‌ছো, চোক বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হল না! আমার হারুর কি হবে?" 'গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে।' গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য। তাঁকে জেনে সংসার কর্‌লে অনিত্য নয়।"

"সংসার কর না কেন? তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়ী, ঘর, পরিবার আমার নয়; এসব ঈশ্বরের; আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে

সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।" "তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয়, আর 'আমার' এই সব—স্ত্রীপুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপ মা, বাড়ী ঘর—এ সব 'আমার' বোধ হয়। সংসারাশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর কর্‌বে?"

"সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়, যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। তারা নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা কর্‌বে। বিচার কর্‌তে কর্‌তে সংসারের কোন বিষয়টা ভোগ কর্‌তে গেলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করবে এ-কথা নিশ্চিত। দু একটী ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাকবে। আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়সুখেতে মন না যায়।"

"সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয়, সেই রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়। যেমন কামারবাড়ীর নাইয়ের উপর কত জোর করে বড় হাতুড়ী পেটে, তবুও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যে যাই বলুক ও যাই করুক না কেন, সব সহ্য করে নেবে।"

"যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে বলে থাকে, মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখো আর ল্যাজটি দেখিও, তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে 'মা' বলে নমস্কার করবে তার তাদের মুখের দিকে না চেয়ে পায়ের দিকে চাইবে; তা হলে আর পতনের ভয় থাকবে না।" "স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে তো নারী নয়,—সাক্ষাৎ ভগবতী।"

"দেখ, অর্থ যার দাস সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়; মানুষের আকৃতি, কিন্তু পশুর ব্যবহার। 'বিদ্যার সংসারের' জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা করবে—কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।"

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

"তাঁকে চিন্তা যত কর্‌বে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আস্‌বে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে; পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব

আস্‌বে ; সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।" এই সবই হইতেছে গীতার শিক্ষার সার।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং—শঙ্কর "অভিতঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, অর্থাৎ যাঁহারা কাম ক্রোধ হইতে বিযুক্ত সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে উভয়তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।* এরূপ ব্যক্তি যে জীবন্মুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু "অভিতঃ" শব্দের এইরূপ "উভয়তঃ" অর্থ করা কষ্টকল্পনা কারণ ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে, চতুর্দ্দিকে। চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান থাকে—এ কথার তাৎপর্য্য কি ঠিক করিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাণ সুলভ ; রামানুজ বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ তাঁহার হস্তস্থিত। ইহারই অনুসরণে তিলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নির্ব্বাণ করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে! কিন্তু গীতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিলে এই সব কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না। গীতার মতে নির্ব্বাণ হইতেছে ব্রহ্মচৈতন্য ; ইহা লাভ করিতে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া, জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না, কারণ আমাদের মধ্যেই ইহা রহিয়াছে, আবার আমরা ইহার মধ্যে রহিয়াছি—অভিতঃ বর্ত্ততে †। ইহা যে আমাদের ছিল না, এখন লাভ হইবে তাহা নহে—ইহা নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কেবল অজ্ঞান অহংভাবের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়াছে—সেই আবরণ দূর হইলেই ইহা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়—আমরা তখন সেই দিব্য চৈতন্যের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করি, কর্ম্ম করি। আমাদের ভিতরে যে আত্মা রহিয়াছে, যাহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরম আত্মা তাহাই এই নির্ব্বাণ, আবার বিশ্বের যে পরম আত্মা, সর্ব্বভূতের পরম আত্মা তাহাও এই নির্ব্বাণ। সেই আত্মায় বাস করিয়া আমরা সকলের মধ্যে বাস করি, শুধু আর আমাদের অহংয়ের মধ্যে নহে ; সেই আত্মার সহিত এক হওয়ায় বিশ্বের সব কিছুর

---

* জীবিত অবস্থাতেই যদি তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে তবে আবার মৃত্যুর পর, উভয়তঃ, কি মোক্ষলাভ হইবে ?

† আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। ছান্দোগ্য—৭।২৫।২

সহিত অবিচল একত্ব আমাদের সত্তার স্বরূপ হইয়া উঠে, তাহাই হয় আমাদের কর্ম্মময় চৈতন্যের ভিত্তি এবং আমাদের সকল কর্ম্মের মূল প্রেরণা।

গীতা 'অভিতঃ' শব্দটির দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছে তাহার জন্য উপনিষদ 'সর্ব্বতঃ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে,

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥

—মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।২।৪,৫

—"তিনি এই সব উপায়ে প্রযত্ন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন; তাঁহার এই আত্মা তাহার পরম ধামে প্রবেশলাভ করে। বীতরাগ প্রশান্ত ঋষিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া, জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের অধ্যাত্ম সত্তাকে গঠন করিয়া, আত্মার সহিত যোগে সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বের মধ্যে প্রবেশ করেন।"

বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্। আত্মাকে জানা, আত্মাকে লাভ করাই হইতেছে গীতার মতে নির্ব্বাণে বর্ত্তমান থাকা। ইহা হইতেছে নির্ব্বাণ তত্ত্বের উদার প্রসারণ। বৌদ্ধগণের মধ্যে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মোটামুটি চারি প্রকার * মত দেখা যায়। প্রথম, নির্ব্বাণে সর্ব্বসত্তার লোপ হয়। নির্ব্বাণ শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতেই বোধ হয় এই মতের উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ নির্ব্বাণের পর কি থাকে না থাকে বুদ্ধ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, নির্ব্বাণে সকল চৈতন্যের লোপ হয়—শুধু প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, জড় সত্তা থাকে। তৃতীয় মতানুসারে নির্ব্বাণের পর যাহা থাকে তাহা অনির্ব্বচনীয়, সেই জন্যই বুদ্ধ সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। চতুর্থ মতানুসারে নির্ব্বাণে সুখদুঃখময় সাধারণ মানস চৈতন্যেরই লোপ হয়, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য বা বিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। সকল বৌদ্ধেরই মত যে, নির্ব্বাণে বাসনা, কামনা, অহংভাব, অজ্ঞানের লোপ হয়। গীতা দেখাইয়াছে, সাধনার দ্বারা এইরূপ অবস্থা লাভ

* পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিলে মানুষ আত্মাকে জানিতে পারে, আত্মাই হইয়া উঠে এবং তাহাই নির্ব্বাণ। তখন যে সংসার বা সংসারের কর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না—স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই তাহার প্রমাণ।* তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ জীবিতাবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ করেন নাই, নির্ব্বাণের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়া তিনি জীবের প্রতি করুণার বশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—অন্য সকল অজ্ঞানবদ্ধ জীবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার জন্য। যাহাই হউক, ইহা গীতার মত নহে; গীতার মতে সংসার ও সংসারের কর্ম্মের সহিত নির্ব্বাণের কোন বিরোধ নাই। "রিপুগণের সকল কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্ব্ব-ঐক্যসাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান—এই সব হইতেছে নির্ব্বাণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই-সবকে লইয়াই নির্ব্বাণ এবং ইহারাই নির্ব্বাণের সারবস্তু, গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝাযায়।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

অন্বয়—বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ মুনিঃ যঃ সঃ সদা মুক্তঃ এব।

অনুবাদ—বাহ্য স্পর্শসকল নিজের বাহিরে রাখিয়া, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া, নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ যে-মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জন করিয়াছেন তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত।

---

* বুদ্ধ বোধিলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন—এবং নানা স্থানে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও সংঘস্থাপন করিয়াছিলেন। আশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ কয়দিন পর্য্যন্ত তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান অতি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল। অথচ গীতার অনেক ব্যাখ্যাকার এই অধ্যায়টিকে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেন এই অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে! শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মসন্ন্যাসেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চান, সেই দৃষ্টি লইয়াই তাঁহারা এই অধ্যায়টিতে তাঁহাদের নিজ মতেরই সমর্থন খুঁজিয়াছেন এবং তদনুসারে শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কর্ম্মযোগের প্রশংসা প্রথমেই করিয়া গীতা যে ভাবে এই অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে গীতা কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকেই বড় বলিয়াছে, এবং সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস একই বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগকে পৃথক করিয়া দেখে নাই, এই অধ্যায়ের প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছে যে যাহারা বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি তাহারাই এই দুইটিকে পৃথক বলিয়া মনে করে (৫।৪)। গীতা এই অধ্যায়ে জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে তাহার কারণ আত্মজ্ঞান না হইলে কর্ম্মযোগ পূর্ণতা লাভ করে না। সাধারণতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস বলিতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ বুঝায়, শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ তাহাই বুঝিয়াছেন—কিন্তু গীতা এইরূপ বাহ্য কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই শ্রেয়ঃ বলিয়াছে। তবে গীতার মতে প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস হইতেছে আভ্যন্তরীণ—সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সংন্যস্ত করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা (৫।১০)—এবং ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ, যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং। পঞ্চম অধ্যায়ে এই ভাবে সন্ন্যাস ও যোগকে এক করা হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে। শঙ্কর কিন্তু গীতার এই সূক্ষ্ম সমন্বয়টি দেখেন নাই—তিনি এই অধ্যায়ে বাহ্য কর্ম্মত্যাগেরই শিক্ষা দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ের ২৭ ও ২৮ শ্লোক হইতে তিনি নিজ মতের সমর্থন পাইয়াছেন বলিয়া জোর দিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কর্ম্মযোগ হইতে ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা হইতে জ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ এবং তাহা দ্বারা মোক্ষ—এই কথা ভগবান পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন।" বস্তুতঃ এই কথা শঙ্করাচার্য্য নিজেই পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন, ভগবান গীতায় কুত্রাপিও এ-কথা বলেন নাই যে, জ্ঞান হইলেই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হয়

এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শঙ্করের মতটি প্রকৃতপক্ষে গীতার মত নহে পাছে পাঠকের মনে এই সন্দেহ হয় তাই তিনি এখানে জোর দিয়া বলিলেন—"ভগবান পদে পদে এই কথা বলিয়াছেন ও বলিবেন।"

আর এইরূপ জোর দিবার সুযোগও তিনি এই দুইটি শ্লোকে বেশ পাইয়াছেন। এখানে যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া সমাধির ভিতর দিয়া মোক্ষ লাভের প্রযত্ন করা। শঙ্করের যুক্তি এই যে, এতক্ষণ কর্ম্মযোগের কথা বলিয়া ভগবান এইবারে কর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলিতেছেন। প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর কর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানযোগ। কিন্তু বস্তুতঃ এই দুইটি শ্লোকে যেমন কর্ম্মযোগের কথা বলা হয় নাই, তেমনই জ্ঞান-যোগেরও কথাও বলা হয় নাই—এই দুইটি শ্লোকে যাহা সূচিত হইয়াছে তাহা হইতেছে খাঁটি রাজযোগ। জ্ঞানযোগের সাধনা হইতেছে শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং গভীরভাবে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, আত্ম অনাত্ম বিচার করিতে হইবে। কিন্তু এখানে বলা হইতেছে চিত্ত ও মনের সমস্ত ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে, এবং সেজন্য প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে। যদি বলা যায় যে, এইভাবে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব ইহা জ্ঞান যোগেরই একটি অন্তরঙ্গ সাধন—তাহা হইলে সমানভাবেই বলা যাইতে পারে যে, ইহা কর্ম্মযোগেরও অন্তরঙ্গ সাধন—কর্ম্মযোগকে পূর্ণ করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইতে হয়; কিন্তু মন যদি সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়ের দিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ধাবিত হয় তাহা হইলে এই নিষ্কামতা ও অনাসক্তি সম্ভব হয় না—তাই গীতা আত্মসংযমের একটি শক্তিশালী প্রণালী হিসাবে এখানে রাজযোগের উল্লেখ করিয়াছে। গীতা তৎকালে প্রচলিত কোন সাধনাকেই অবহেলা করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী উপযোগী হয়। সেই জন্য গীতা আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপে যেমন বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ সাধনার উল্লেখ করিয়াছে, তেমনি তদনুরূপ রাজযোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধেরও উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু এ-সবেরই লক্ষ্য হইতেছে কর্ম্মযোগকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা। গীতা পরের শ্লোকেই তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে এবং সেইটিই হইতেছে এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।

গীতার যুগে বৌদ্ধ সাধনা * এবং রা[illegible]গের সাধনা এই দুইটিই খুব প্রচলিত ছিল তাই সে সব হইতে যাহা সাহায্য পাওয়া [illegible]গীতা তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়াছে, কিন্তু গীতার যে নিজস্ব সাধনা তাহা হইতেছে ক[illegible] ও ভক্তিদ্বারা দেহ, প্রাণ, মনকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা যেন শেষ পর্য[illegible] ভগবানের নিকট পূর্ণ প্রেম ও ভক্তির সহিত আত্মসমর্পণ করা যায়। [illegible]র্ণভাবে যে-কোন অবস্থাতে যদি এই ভক্তি ও আত্মসমর্পণকে পূর্ণ করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এইটিই হইতেছে গীতার শেষ ও চরম কথা। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই শিক্ষা ভারতের পরবর্ত্তী অধ্যাত্ম সাধনাকে কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছে—বৌদ্ধ সাধনা, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ—সবই পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, ভক্তিযোগই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভাগবতপুরাণে গীতার পুরুষোত্তমতত্ত্বের অনুসরণে ভক্তিযোগের বিশিষ্ট বিকাশ হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যে এই ভক্তিযোগেরই পরাকাষ্ঠা, আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাও মূলতঃ ভক্তিযোগ। তিনি বলিয়াছেন—"কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে-সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? ...আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। এ-যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা, যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বৈরাগ্যের সাধনা, রাজযোগের সাধনা বর্ত্তমানের উপযোগী নহে—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়াও ভগবানের আনন্দ স্পর্শ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে-জন্য অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত, শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করা প্রয়োজন—সেজন্যই বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে আজও যে ঠিক রাজযোগের সেই অষ্টাঙ্গ সাধনা করিতে হইবে তাহা নহে, সকল যোগের শক্তির যাহা মূলতত্ত্ব সেইটিকে ধরিয়া একটা সমন্বয় করিতে পারিলে, অন্যান্য যোগের সর্ব্বাঙ্গ

* গীতা বুদ্ধের পরবর্ত্তী কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এইরূপই একটি অভিনব সমন্বয় হইয়াছে
সাধনার আর প্রয়োজন হয় ...র সমন্বয়ের পর বহু কাল অতীত হইয়াছে, গীতার
শ্রীঅরবিন্দের যোগে ... ইঙ্গিত ছিল সে-সবের বহু রহস্যময় বিকাশ হইয়াছে, অনেক
মধ্যেই যে-...র ধারা প্রকট হইয়াছে—সে-সবেরই সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দের যোগে যে-ভাবে
হইয়াছে তাহা মূলতঃ গীতার আত্ম-সমর্পণ যোগের সহিত এক হইলেও সমগ্রভাবে একটি নূতন অপূর্ব্ব সাধন প্রণালী। তাহার মধ্যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র, সবেরই সার নিহিত আছে। শ্রীঅরবিন্দের নিজ সাধনলব্ধ নূতন অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোকে সে-সব লইয়া এক নূতন যোগ প্রণালীর বিকাশ হইয়াছে। তবে গীতার ব্যাখ্যা করিতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিজ যোগের পরিচয় দেন নাই—The Life Divine, Synthesis of Yoga প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি নিজের দার্শনিক মত ও সাধন প্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইখানেই শঙ্করের ভাষ্য ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সহিত শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যার মূল পার্থক্য। শঙ্কর গীতার শ্লোকগুলিকে টানিয়া বুনিয়া এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে গীতা সাম্প্রদায়িক জ্ঞানযোগেরই শাস্ত্ররূপে প্রতিপন্ন হয়। শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য নিজের যোগের সমর্থন বা ব্যাখ্যা করা নহে, পরন্তু গীতার যোগটি বস্তুতঃ কি তাহা দেখাইয়া দেওয়া। গীতার যোগও পুরাতন যোগ—প্রাচীনকালেরই উপযোগী, তথাপি গীতার মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে এমন সব নির্দ্দেশ আছে যাহা সকল যুগের সকল মানুষেরই অধ্যাত্ম সাধনায় সহায় হইতে পারে।* এইগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দেওয়াই শ্রীঅরবিন্দের গীতা-ব্যাখ্যার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"Our object, then, in studying the Gita will not be a scholastic or academical scrutiny of its thought, not to place its philosophy in the history of metaphysical speculation, nor shall we deal with it in the manner of the analytical dialectician. We approach it for help and light and our aim must be to distinguish its essential and living message, that in it on which humanity has to seize for its perfection and its highest spiritual welfare."

অর্থাৎ, "পাণ্ডিত্যের সহিত গীতার দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করা অথবা দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে গীতার স্থান নির্দ্দেশ করা আমাদের গীতা পাঠের

* এই জন্যই গীতা দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর পরেও আজও নূতন রহিয়াছে—সকল মত, সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার শিক্ষার সমাদর করে।

লক্ষ্য নহে, আর আমরা ইহা লইয়া সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদেও প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আমরা গীতা হইতে চাই সাহায্য ও আলোক, অতএব গীতার যাহা মূল শিক্ষা ও জীবন্ত বাণী, মানবজাতির পূর্ণতা ও উচ্চতম অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য গীতার মধ্য হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতাপাঠের উদ্দেশ্য।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্—গীতা দুইটি শ্লোকে সংক্ষেপে সূত্রাকারে রাজযোগের সাধনা বর্ণনা করিয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে। পাতঞ্জল দর্শনে যোগ বলিতে বুঝায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমাধি ও কৈবল্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। এই দুইটি শ্লোকে "মোক্ষ-পরায়ণ" শব্দের দ্বারা বৈরাগ্য সূচিত হইয়াছে, এবং প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল দূরীভূত হইয়াছে—তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, অনুভব করেন যে তিনি মুক্ত, তাঁহার ভব বন্ধন শিথিল হইয়াছে, আর তাঁহাকে অবশভাবে জন্ম মৃত্যু চক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে না। আত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরবৈরাগ্য। এই পরবৈরাগ্য হইতে কৈবল্য বা মোক্ষ বেশী দূর নহে, এই বৈরাগ্যই কৈবল্যে উপনীত করে।

শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা চিত্তে প্রতিভাত হয়, চিত্ত ঐ সকল বাহ্য বিষয়ের আকার ধারণ করে, ইহাকেই চিত্তের "বৃত্তি" বলে। এই সকল বৃত্তি সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মিকা—এই সব হইতেই ইচ্ছা ক্রোধ ভয় ইত্যাদি বিক্ষোভের উদয় হয় এবং এই সমস্তই হইতেছে "ক্লেশ।" ইহাদিগের নিরোধে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তৎপরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় এবং শেষটি হইতে কৈবল্য লাভ হয়। চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবেরই সংযম অভ্যাস করিতে হয়। মন যদি ইন্দ্রিয় বিষয় ধ্যান করে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখী হইতে প্রশ্রয় পায়। আবার ইন্দ্রিয়ের সহিত যদি বিষয়ের সংযোগ হইতে থাকে তাহা হইলে স্বভাবতঃই মন সেই দিকে ধাবিত হয়। অতএব সংযম অভ্যাস করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাহাদের বিষয়ের সংযোগ দূর করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরের দিকে যাইতে না দিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই প্রত্যাহার বলে। পাতঞ্জল সূত্র—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।—২।৫৪

ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত না হইলে, ইহারা চিত্তেরই স্বরূপের অনুকরণ করে, অর্থাৎ চিত্তে কোন বৃত্তি উদয় না হইলে উহা যেমন স্বরূপে অবস্থান করে, তেমনিই বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণও চিত্তে বিলীন হইয়া চিত্তের সহিত যেন একতাপ্রাপ্ত হয়; ইহাকেই প্রত্যাহার বলা যায়। ইহার অর্থ নহে যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এই গুলিই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই সবের প্রতি যদি মনোযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদের বাহ্যস্পর্শ হইলেও তাহারা চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না—"বাহ্যস্পর্শ সকলকে বহিষ্কৃত করিয়া" বলিতে ইহাই বুঝান হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়ের দিকে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, মনের দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে ধ্যেয় বিষয় অবলম্বন করে, ইন্দ্রিয়গণ কেবল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ধ্যেয়কে অবলম্বন করে না, এইটি চিত্ত হইতে ইন্দ্রিয়গণের ভেদ—ইহা বুঝাইতেই উল্লিখিত সূত্রে "ইব" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে বিজিত হয়,

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্—পা ২।৫৫

ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে হইলে এইরূপে রাজ যোগ অনুযায়ী প্রত্যাহার অভ্যাস করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই—ভগবানে একান্ত আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে প্রাণায়াম প্রত্যাহার এ-সবের কোন প্রয়োজনই হয় না। তবে প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য প্রত্যাহার অভ্যাস করা খুবই সাহায্যপ্রদ। কোন বিষয়ে আসক্তি যখন খুব প্রবল—তখন ইন্দ্রিয় যাহাতে সেই বিষয়ে প্রযুক্ত না হয়, চিত্ত অন্তর্মুখী হয়, ভগবদ্মুখী হয় সর্ব্বদা সেই প্রয়াস করিতে হয়। কারণ বিষয় আসক্তি প্রবল থাকিলে ভগবানের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয় না।

চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ—চিত্তের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ কোন একটি তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না—তাহারা কেবল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। তবে চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট করিলে চিত্তের নিরোধ ও একাগ্রতায় সহায়তা হয়। চক্ষু সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত করিলে নিদ্রা আসিয়া ধ্যানের বিঘ্ন ঘটায়; আবার অত্যন্ত উন্মীলনে নানা বস্তু দেখিয়া চিত্তের বিক্ষেপ হয়—সেইজন্যই দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে রাখিতে হয়। যোগশাস্ত্রে ইহাকে খেচরীমুদ্রা বলে।

যাঁহারা রাজযোগের বিশিষ্ট প্রণালীতে সাধন করিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করাই প্রশস্ত। অনিদ্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম

অতিরিক্ত আহার প্রভৃতি অমিতাচারের দ্বারা তামসিকতা প্রশ্রয় পায়। তাই ধ্যানের সময় নিদ্রা আসিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারী হইয়া যোগ অভ্যাস করেন—তাঁহাদের মধ্যে তামসিকতা বৃদ্ধি পায় না (৬।১৭)।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা—শ্বাস ও প্রশ্বাস রূপে নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধ-অধোগতি নিরোধ দ্বারা সমান অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া অথবা প্রাণ যাহাতে বাহিরে না যায়, এবং অপান যাহাতে ভিতরে প্রবেশ না করে, কিন্তু উভয়েই নাসিকার মধ্যে সঞ্চরণ করে এরূপ ভাবে মৃদু উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস দ্বারা প্রাণাপান সমান করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে। ইহাই প্রাণায়াম। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বিবেকজ্ঞানের সমস্ত আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের ধারণা বিষয়ে সামর্থ্য জন্মে (২।৫২,৫৩)। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ শ্লোকে গীতা বলিয়াছে, যাঁহাদের কলুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ, এখানে রাজযোগের প্রাণায়ামের কথা বলা হইল। বৌদ্ধগণও পাতঞ্জল দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের ভাষা হইতেই প্রমাণিত হয়। নির্ব্বাণকে তাঁহারা নিরোধ নামে অভিহিত করিয়াছেন, নিত্যঃ খলু প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। পাতঞ্জল দর্শনেরই ন্যায় বৌদ্ধগণও রাগ, দ্বেষ আদি জ্ঞানের আবরক অশুদ্ধিকে "ক্লেশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাগাদি ক্লেশ ও অশুদ্ধি প্রতিসংখ্যা বা উচ্চতম জ্ঞানের দ্বারা "নিরুদ্ধ" হয় বলিয়া বৌদ্ধ বৈভাষিকগণ নির্ব্বাণের আর এক নাম দিয়াছেন—প্রতিসংখ্যানিরোধ। বৌদ্ধগণের যোগও পাতঞ্জল যোগেরই ন্যায় অষ্টাঙ্গিক তবে এই অষ্ট অঙ্গ উভয় সাধনায় সর্ব্বত্র এক নহে—কিছু ইতর বিশেষ আছে, বৌদ্ধগণ বহিরঙ্গ সাধনা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সাধনার উপরেই জোর দিয়াছেন। তবে আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পাতঞ্জলের মতেও প্রাণায়ামই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের একমাত্র উপায় নহে। সাধনপাদের ৫৩ সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে—প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব ; এখানে "এব" শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণায়াম ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে সমাধি হয় না এরূপ নহে, তবে প্রাণায়ামে নিশ্চয়ই সমাধি হয়।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—বুদ্ধি দ্বারা আমরা সত্য অসত্য শুভ অশুভ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করি—কি করিতে হইবে না হইবে সে বিষয়ে নিশ্চয় করি। মনের কাজ ইন্দ্রিয় বিষয় সকল গ্রহণ করা—মনই মূল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই দুই লইয়াই চিত্ত—যদিও সাধারণতঃ চিত্ত বুঝাইতে মনশব্দও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে প্রত্যাহার সাধিত হয়, মন সংযত হইলে ধারণা

অর্থাৎ চিত্তের এক বিষয়ে স্থিতি সিদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধি সংযত হইলে ধ্যান সিদ্ধ হয়। যে-বিষয়ে মন স্থির করা যায় সেই বিষয়াকারে বারবার চিত্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলা যায়। এই সব প্রণালীর দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয় এবং সমাধিলাভ করা যায়। এখানে রাজযোগের সব অঙ্গগুলিই সূত্রাকারে রহিয়াছে। তথাপি শঙ্করাদি ব্যাখ্যা-কারগণ কেহই এখানে রাজযোগের নামও উল্লেখ করেন নাই। শঙ্করের উদ্দেশ্য হইতেছে ইহাই প্রতিপন্ন করা যে, গীতা মুখ্যতঃ জ্ঞানযোগেরই শিক্ষা দিয়াছে—তাই তিনি এই দুইটি শ্লোককে রাজযোগ না বলিয়া জ্ঞানেরই অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যানযোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যকদর্শনস্যান্তরঙ্গং। রাজযোগে ধ্যান শব্দ এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা জ্ঞানযোগের নিদিধ্যাসন হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। আর এখানে যে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে বহিরঙ্গ সাধন; ধারণা, ধ্যান, সমাধি কেবল এইগুলিই অন্তরঙ্গ সাধনা।

মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ—সনৎসুজাতীয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, কেবল মৌনাবলম্বন করিলে বা অরণ্যে বাস করিলেই মুনি হয় না, মুনি হইতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দিকে মনকে একাগ্র করিতে হইবে। মৌন সহকারে যাঁহারা উপাসনা করেন, ইন্দ্রিয়ব্যাপার যাঁহাদের মনে স্থান পায় না তাঁহারাই প্রকৃত মুনি পদবাচ্য, তাঁহাদের মন আত্মাভিমুখী হয় এবং যথাকালে তাঁহারা আত্মজ্ঞান ও মোক্ষ বা পরম সিদ্ধি লাভ করেন (১৪।১২)।

এই মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাংখ্যমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মোক্ষ বা মুক্তি। গুণত্রয়ের অতীত হইলেই এই মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করা যায়। গীতা বলিয়াছে,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

যাহাদের মন বিষয় অভিমুখে ধাবিত হয় তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু জরা দুঃখ ভোগ করে, আর যাহাদের মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাভিমুখী হয় তাহারা মোক্ষপরায়ণ, তাঁহারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যথা কালে মুক্তি লাভ করেন। সংসারে আসক্ত লোকের সংখ্যাই বেশী। সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়াস করে এরূপ মানুষ খুবই কম *—মনুষ্যানাং সহস্রানাং কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

---

* দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥—বিবেকচূড়ামণি

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে ক্লেশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে—ইহারাই মানুষকে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং তাহার ফল হয় জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ ভোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ অভ্যাস করিলে—তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই মানুষ মুক্ত হয়, আর কোন দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইচ্ছা দ্বেষাদির মূল হইতেছে অস্মিতা বা অহং জ্ঞান, এবং এই অস্মিতারও মূল হইতেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অতএব অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নাশই মুক্তির উপায়। এইরূপ অবিদ্যা নাশ বৃত্তি-নিরোধাত্মক যোগের দ্বারা হইতে পারে বা বিচারাত্মক জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। প্রথমটি রাজযোগ, দ্বিতীয়টি জ্ঞানযোগ। সাধারণতঃ এই দুইটিকে আত্মজ্ঞান লাভের পৃথক পদ্ধতি বলিয়াই গণ্য করা হয়—কিন্তু গীতা একটিকে অপরটির সহায় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও এইরূপ সমন্বয় করা হইয়াছে। তবে গীতা যেমন সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে, তেমনই কর্ম্ম ও ভক্তির উপরও জোর দিয়াছে—সেই জন্যই গীতা সকল আশ্রমেই সমাদৃত হইয়াছে। আর অবিদ্যা নাশের উপায় স্বরূপ বৃত্তিনিরোধাত্মক যোগ ও বিচারাত্মক জ্ঞানের উপর মুখ্যভাবে জোর দেওয়ায় সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

যঃ সদা মুক্ত এব সঃ। মুক্তি বা মোক্ষের স্বরূপ কি তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বেদান্তের মতে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা উপলব্ধিই মোক্ষ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে চিত্তবৃত্তি সকলের যখন সম্পূর্ণ নিরোধ হয়, তাহারা আর পুরুষের দৃশ্যরূপে অবস্থান করে না, পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে তখনই হয় কৈবল্য বা মোক্ষ।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

যোগসূত্র ৪।৩৪

যখন গুণ সকল পুরুষার্থশূন্য হওয়াতে তাহাদিগের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয় (অর্থাৎ যখন তাহাদের পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্ত কার্য্যোন্মুখতা দূরীভূত হয়) তখন সেই অবস্থাকে কৈবল্য বলে। অথবা কৈবল্য শব্দে চিতিশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে অবস্থিতি বুঝায়। পুরুষ গুণসঙ্গ হইতে মুক্ত হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতির মতে ইহাই মোক্ষ বা মুক্তি। ইহাতে বেদান্তেরও বিরোধ নাই। কিন্তু জীব এইরূপ মোক্ষ লাভ করিলে তাহার পক্ষে আর সংসার থাকে কি না ?

সাধারণতঃ জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি এইরূপ ভেদ করা হয়। পাতঞ্জল দর্শনে কৈবল্যপাদের ৩০শ সূত্রে বলা হইয়াছে,

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ।

বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যক ভেদজ্ঞান হইতে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি উৎপন্ন হয়, তখন অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সমুদায়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইরূপে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই বিদ্বান তত্ত্বজ্ঞ যোগী জীবদ্দশাতেই মুক্ত হন। ইহার পর ৩৪ সূত্রে বিদেহ মুক্তি বা নির্ব্বাণের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। গীতাও কি এখানে এইভাবে মোক্ষলাভ করিয়া জগৎ ও সংসার হইতে সরিয়া গিয়া ব্রহ্ম বা পুরুষের বিশ্বাতীত কৈবল্যে লীন হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছে? গীতা যে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছে তাহা কি মানুষকে এই শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিবার প্রাথমিক সাধনা মাত্র? শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক পরের শ্লোকেই গীতা যাহা বলিয়াছে তাহাতে আর এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ঐ শ্লোকে পরম পুরুষকে বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্তারূপে বর্ণনা করা হয় নাই—বলা হইয়াছে তিনি সকল যজ্ঞকর্ম্মের ভোক্তা, সকল জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ। চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করিয়া এই পরম পুরুষেই মন ও বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করিতে হইবে, ময্যেব মন আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, ইহাই গীতার শিক্ষা। তাহা হইলে আমরা পুরুষোত্তমের সাধর্ম্ম্য লাভ করিব—গীতার মতে তাহাই প্রকৃত মুক্তি বা মোক্ষ, এইরূপ মোক্ষ যে লাভ করিয়াছে, পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়া সে দিব্য ভাবে জীবনলীলা করিবে ইহাই গীতার আদর্শ।

তাহা হইলে গীতা এখানে রাজযোগোক্ত সমাধি ও কৈবল্য লাভের সাধনা নির্দ্দেশ করিল কেন? মন অতিশয় চঞ্চল ও বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়গণ প্রবল—তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত করিতে না পারিলে পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হওয়া, তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করা সম্ভব হয় না, তাই আত্মসংযমের একটি শক্তিশালী উপায় রূপেই গীতা এখানে রাজযোগের অবতারণা করিয়াছে। সম্পূর্ণ ভাবে অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস না করিলেও—প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মসংযমে বিশেষ সাহায্য হয়। ইন্দ্রিয়গণকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাহিরের দিকে যাইতে না দিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া রাখা অভ্যাস করিতে হইবে, মনকে, বুদ্ধিকে বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া সর্ব্বদা আত্মচিন্তায়, ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সকল কর্ম্মের মধ্যেও ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতেছি এই ভাবটি বজায় রাখিতে হইবে—ইহাই গীতার উপদেশ।

যোগ অভ্যাসের ফলে যাহার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি "ক্লেশ" দূর হইয়াছে—তিনি সদা মুক্ত। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনি সাধন কালেই মুক্ত; এ ব্যাখ্যা সমীচীন হয় না, কারণ সাধনের পরিপক্বতা না হইলে কেহ সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে সদা মুক্ত এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ঐরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত, মুক্তির জন্য তাঁহাকে দেহ ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হয় না, আর তিনি যে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা হইতে আর কখনও পতন হয় না। প্রলয়কালে সকল জীবেরই সংসার বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আবার সৃষ্টির সময়ে নিজ নিজ সঞ্চিত কর্ম্মের ফলে তাহাদিগকে অবশ হইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যিনি পুরুষোত্তমের সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর কখনও জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ (১৪।২)

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

অন্বয়। [মানবঃ] মাং যজ্ঞতপসাম্ ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা শান্তিং ঋচ্ছতি।

অনুবাদ। মানুষ যখন আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল জীবের সুহৃৎ বলিয়া জানে তখনই সে শান্তি লাভ করে।

ব্যাখ্যা

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি দ্বারা রাজ-যোগের অভ্যাস করিয়া মানুষ চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ মোক্ষ বলিতে বুঝায় সমস্ত সাংসারিক জীবন ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিরুপাধি ব্রহ্মে লীন হওয়া। কিন্তু তাহার ঠিক পরে এই শ্লোকে ভগবানকে যে-ভাবে জানিবার কথা বলা হইল তাহা ত ভগবানের নির্গুণ স্বরূপ নহে। তাহা হইলে এই শ্লোকটি পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকের ঠিক পরে কেন আসিল এবং ইহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। শ্রীধর বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিলেই মুক্তি হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়—সেই জ্ঞানের কথাই এই শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া মধুসূদন সরস্বতীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যিনি এই প্রকারে যোগযুক্ত তিনি কোন্ তত্ত্ব জানিয়া মুক্ত হন"

তাহাই বলিতেছেন, ভোক্তারম্ ইত্যাদি।" কিন্তু পূর্ব্ব দুইটি শ্লোকে রাজযোগের দ্বারা মুক্তি বা কৈবল্য লাভের কথা আছে—যাঁহারা ঐ সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়াছেন এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধে নির্মূল করিয়াছেন তাহারা সদাই মুক্ত, তাহাদিগকে আর স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানযোগের সাধনা করিতে হয় না। রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই শেষ শ্লোকে গীতা কর্ম্মযোগেরই প্রশংসা করিয়াছে—কর্ম্মযোগের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলেই সহজে মুক্তি লাভ করা যায়। মধ্বাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্ব দুইটি শ্লোকে ধ্যানের প্রণালী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু কি ধ্যান করিতে হইবে তাহাই এই শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে। কিন্তু গীতা এই শেষ শ্লোকে ভগবানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা হইতেছে পুরুষোত্তমের বর্ণনা। পুরুষোত্তমকে ধ্যানের বস্তু করিতে হইবে—এমন কোন উপদেশ পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে নাই। আর শঙ্কর যে বলিয়াছেন, কি তত্ত্ব জানিয়া মুক্তি লাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারই মত হইতেছে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরুপাধি ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অথচ এই শ্লোকে গীতা ভগবানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা শঙ্করের বিজ্ঞেয় বস্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নহে।

বস্তুতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকটির সহিত কেবল যে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নহে—সমগ্র অধ্যায়টিতে যাহা বলা হইয়াছে, এই শেষ শ্লোকে তাহারই সার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং পুরুষোত্তম তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে ; এখানে শুধু জ্ঞানযোগ, শুধু কর্ম্মযোগ বা শুধু রাজযোগানুযায়ী ধ্যানের প্রশংসা করা হয় নাই। গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভের কথা বলিয়াছে তাহা শুধু নিরুপাধিক আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান নহে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটিকেই গীতা পূর্ণভাবে বিকাশ করিয়া তাহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়টিই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে—পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এই সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে ; এখানে যাহা বলা হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেইটিই আরও বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

গীতা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিক দিয়া ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের যে জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ তাহাতে আছে বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধারা—ভগবান সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন রকম অনুভূতি লাভ করিয়া সে সবের সমন্বয়ের দ্বারাই আমরা আমাদের জীবন ও কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিতে পারি। ভগবানকে তাঁহার সকল তত্ত্বে জানিতে হইবে, সকলভাবে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে—তবেই আমাদের মধ্যে ভাগবত জীবনের পূর্ণতা গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সত্তার পূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী

বিকাশ সাধিত হইবে। ভগবান যে শুদ্ধ আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, সর্ব্বভূত সেই আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, সর্ব্বভূতের মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছে, সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি (৬।২৯), এই উপলব্ধিই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। ইহা শুধু একটি দার্শনিক মতবাদ বা মনের ধারণা হইলে চলিবে না—সাক্ষাৎভাবে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং রাজযোগের প্রক্রিয়া এই উপলব্ধি লাভের একটি বিশিষ্ট সাধনা। আত্মা অজাত, নিত্য, শাশ্বত—তাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাহা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, যেমন সকলের মধ্যে তেমনিই আমারও মধ্যে এই একই আত্মা রহিয়াছে। আমার এই দেহের পতন হইলে আত্মার বিনাশ হইবে না, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অর্জ্জুনের শোককে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা এই আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছে—কারণ এই আত্ম-জ্ঞানই হইতেছে আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। পঞ্চম অধ্যায়ে এই আত্মতত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। যে-যোগী সর্ব্বভূতের এক আত্মাকে নিজের আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন—তিনি কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না (৫।৭)। যিনি আত্মতত্ত্ববিদ্ তিনি জানেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করিতেছে, ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত। এইভাবে সকল কর্ম্ম মনের দ্বারা সংন্যাস করায়, তিনি কর্ম্মের দ্বারা আর বদ্ধ হন না। ভগবানই দেহী আত্মা রূপে এই নবদ্বারযুক্ত দেহে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কিছু করেনও না করানও না, কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না, পাপও গ্রহণ করেন না—সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবগত হন, আত্মার সহিত যুক্ত হন, তিনি সকল বস্তু, সকল জীব, সকল ঘটনায় সমদর্শী হন—এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মে ক্ষুদ্র অহং ভাবের লয় করিয়া তিনি নির্ব্বাণ ও পরম শান্তিলাভ করেন। এই উপলব্ধি লাভেরই একটি শক্তিশালী সাধনা রূপে গীতা পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকে রাজযোগের বর্ণনা করিয়াছে এবং আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই আরও বিশদ করিয়াছে। কিন্তু ভগবানকে এইরূপ নির্ব্যক্তিক, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি আত্মা রূপে জানাই ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান নহে; গীতা মানুষকে যে পূর্ণতম সিদ্ধিলাভের পথ দেখাইয়াছে তাহার জন্য এই জ্ঞান প্রাথমিক প্রয়োজন হইলেও—ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। ভগবানকে যদি ব্যক্তিরূপে, সোপাধিরূপে, সগুণরূপে না জানি, তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারি তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের দ্বারা আমাদের মনকে তৃপ্ত করিতে পারিব কিন্তু আমাদের হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিবে না এবং তাহার পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হইবে না। প্রেম ও ভগবদ্ভক্তি যে-সব বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয় সে-সব হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। মন যে আত্ম-জ্ঞান চায় তাহা আমরা লাভ করিব, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর

দিয়া ভগবান সম্বন্ধে যে সমৃদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা আমরা পাইব না। মন ও হৃদয় উভয়েরই অতীত যে সত্য জ্ঞান তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার জ্ঞানই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একীভূত হইয়াছে। সেই জন্য গীতা বলিয়াছে ভগবানকে শুধু আত্মারূপেই জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে ঈশ্বররূপেও জানিতে হইবে, তাঁহার শুধু নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ভাব নহে, তাঁহার সগুণ ব্যক্তিভাবও উপলব্ধি করিতে হইবে, জানিতে হইবে। শেষ শ্লোকে ইহারই ইঙ্গিত দিয়া গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ করিয়াছে।

ভগবান শুধু নির্গুণ, নির্ব্যক্তিক, উদাসীন, সাক্ষী, নিষ্ক্রিয় আত্মারূপেই আমাদের মধ্যে নাই, তিনি আমাদের অতি আপনার জন রূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ. আমাদের হৃদয়-রথে চির বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণেরই বাহ্য নিদর্শন। ভগবানকে যদি আমরা মানুষ রূপে কল্পনা করি তাহাতে কোন ভুল হয় না, কারণ মানুষ ভগবান ছাড়া নহে,—ভগবানের মধ্যে মানুষ ভাবও আছে—তবে তিনি ঐ ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি অনন্ত। মানুষের সহিত আমরা যে-সব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, ভগবানের সহিতও আমরা সেই সব সম্বন্ধই স্থাপন করিতে পারি, বিশেষতঃ বন্ধুর সহিত বন্ধুর, প্রভুর সহিত ভৃত্যের, শিশুর সহিত পিতা-মাতার, পিতামাতার সহিত শিশুর এবং সর্ব্বোপরি প্রিয়ের সহিত প্রিয়ের যে অন্তরতম মধুরতম সম্বন্ধ—ভগবানের সহিত আমরা এই সব সম্বন্ধই স্থাপন করিতে পারি। ভারত যেমন ভগবানকে সকল ভাবে আপনার জন করিয়া উপাসনা করিয়াছে, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। গীতা এইরূপ ব্যক্তিভাবের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে (১২।১,২)। রাজযোগ প্রভৃতি দ্বারা যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সে-সবই অপেক্ষাকৃত সহজে লাভ করা যায়, তাহা ছাড়া এমন অনেক কিছু জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করা যায় সে-সব না লাভ করিলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, আমাদের সত্তার বিকাশ ও সিদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

অতএব ভগবানকে সর্ব্বভূতের স্বামী ও ঈশ্বর রূপে, সকলের বন্ধুরূপে, পূজ্য রূপে ধারণা করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে—সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং। আর এই যে আমাদের পরম আত্মীয়, পরম সুহৃদ ভগবান—ইনি শুধু নিজেই আমাদের সুহৃদ নহেন, সকল জীবের মধ্যেই তিনি আমাদের সুহৃদ রূপে বিরাজ করিতেছেন, সকলের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, সকলের ভিতর দিয়া, সকলের নিকট হইতে তাঁহারই ভালবাসা লাভ করিতে হইবে—এই ভাবে আমরা বহুর মধ্যে একত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে পারিব—বহুর সহিত বিচিত্র

সম্বন্ধ স্থাপন করিব, কিন্তু তাহার ভিত্তি হইবে এক মূলগত ঐক্য বোধ—তখনই এই সব সম্বন্ধ তাহাদের পূর্ণতা লাভ করিবে, মানবীয় সম্বন্ধ দিব্য সম্বন্ধে, দিব্য জীবনে পরিণত হইবে।

আবার ভগবানকে জগতের সহিত, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। ভগবানকে সুহৃদরূপে আত্মীয়রূপে জানা যেমন ভক্তিযোগের পক্ষে উপযোগী, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক আত্মারূপে জানা যেমন জ্ঞানযোগের পক্ষে উপযোগী, তেমনই ভগবানকে জগতের ঈশ্বররূপে জানা হইতেছে কর্ম্মযোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।

জগৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধেও ভগবানকে উদাসীন দ্রষ্টারূপে জানা যায়, আবার নিয়ন্তা ঈশ্বররূপেও জানা যায়। প্রথমভাবে ভগবানকে জানিয়া আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কেবল দেখিতেছে, অনুমতি দিতেছে, প্রকৃতির রূপ ও ক্রিয়া সকল সম্পূর্ণ উপভোগ করিতেছে, কিন্তু নিজে নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে। এইরূপ উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য রাজযোগের অভ্যাস হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল কর্ম্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরুষের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়—এই ভাবে আমরা ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে, বাসনা কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হই—এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছে,

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।

দ্বিতীয়ভাবে আমরা ভগবানকে জানি প্রকৃতির অধীশ্বররূপে, নিজ প্রকৃতির দ্বারা তিনিই এই সমুদয় জগৎকর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি অর্পণ করি, এবং নিজদিগকে তাঁহার বিশ্বকাজের যন্ত্র করি, নিমিত্ত করি। সে-কর্ম্ম আমরা করি, আমাদের নিজেদের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানেরই প্রতিনিধি রূপে, তাঁহারই ইচ্ছা পূরণের জন্য, সে কর্ম্মের প্রেরণা ঊর্দ্ধ হইতে আইসে, কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কামনা হইতে নহে।

এই যে ভগবানকে ব্যক্তিরূপে, পুরুষরূপে, ঈশ্বররূপে জানা, ভক্তি করা, কর্ম্মের দ্বারা উপাসনা করা—গীতা এই সাধনাটিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়াছে। অন্যান্য সব যোগ, সব সাধনার ফল অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিশ্চিতভাবে এই এক সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। এই যে ভগবানকে ঈশ্বররূপে জানা, ইহা সাধারণ ধর্ম্মের ব্যক্তিগত সগুণ ঈশ্বর নহে, মানুষের তুলনায় কল্পিত স্বর্গে অধিষ্ঠিত কোন পুরুষ নহে। তাঁহার অনন্ত গুণ ও রূপ আছে, তাই তিনি সগুণ, সাকার—আবার তিনি সকল গুণ, সকল রূপ ও আকারের অতীত, অতএব তিনি নির্গুণ, নিরাকার—তিনি কোন গুণ বা আকারে সীমাবদ্ধ নহেন বলিয়াই তিনি সকল গুণ ও আকার

গ্রহণ করিতে পারেন—তিনি বিশ্বের অতীত পরম অনির্ব্বচনীয় সত্তা, তিনি বিশ্বের আত্মা, সকলের মধ্যে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বপুরুষ, বিশ্বেশ্বর রূপে নিজ সত্তার মধ্যে এই বিশ্বকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, আবার তিনি ব্যষ্টিগত মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের সহিত সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন—নিজের দিব্য ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। ইহাকেই গীতা পরে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্। ভগবানকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা রূপে জানিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ এখানে যজ্ঞ বলিতে জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ এবং তপস্যা বলিতে কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি গীতা যজ্ঞ শব্দকে উদার অর্থে গ্রহণ করিয়াছে—গীতার মতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল কর্ম্মই হইতেছে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ, ভগবানই সে সকলের ভোক্তা। আমাদের প্রকৃতির যে-সব কর্ম্ম চলিতেছে সে-সবকে যখন আমরা সেই বিরাট বিশ্বযজ্ঞের অংশ বলিয়া মনে করি এবং সজ্ঞানে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করি—তখন আমাদের সকল কর্ম্মই হয় যজ্ঞ। ভগবান বলিয়াছেন,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ ৯।২৭

আমরা যদি কোন বস্তু দান করি, যাহাই দান করি এবং যাহাকেই দান করি, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা ভগবানকেই দিতেছি, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন, আমার ঐ দানে তিনিই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আমরা যখন ভোজন করি তখনও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে ভগবানই ভোজন করিতেছেন—আহারের দ্বারা আমরা শুধুই আমাদের রসনাতৃপ্তি করিতেছি না—ভগবানকেই তৃপ্ত করিতেছি।

তপস্যা বলিতে লোকে সাধারণতঃ কষ্টসাধ্য পীড়াদায়ক ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকে—কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তপস্যার মূল স্বরূপ নহে। গীতা যেমন ব্রহ্মকেই যজ্ঞ বলিয়াছে উপনিষদে তেমনি তপস্যাকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—তপো ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রীভূত প্রয়োগ তাহাই তপ বা তপস্যা। আমরাও যখন কোন কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করি, তখন তাহা হয় তপস্যা। তাহা যে পীড়াদায়ক হইবেই এমন কোন কথা নাই—অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কর্ম্মে শক্তি প্রয়োগ করিতে আমরা তীব্র আনন্দ পাই। মোট কথা কষ্টকরতাই তপস্যার লক্ষণ নহে, কোন কর্ম্মের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাই তপস্যা। সকল কর্ম্মের মধ্যেই কিছু না কিছু তপস্যা আছে, সকল কর্ম্মই যজ্ঞভাবে

অর্পণ করিতে হয়। অতএব যজ্ঞ ও তপস্যা বলিতে গীতা কোন বিশেষ সাধনা বা অনুষ্ঠান বুঝে নাই, সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভাব লইয়া করিতে হয় এবং সে সবই ভগবানে অর্পণ করিতে হয় কারণ যেখানে যে যাহাই করুক সবেরই মূল উৎস ভগবান এবং লক্ষ্যও ভগবান ইহাই গীতার শিক্ষা। যখন আমরা কোন মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হই, নিজেদের জন্য, অপরের জন্য বা নিখিল মানবের জন্য কোন সাধনা বা কঠিন প্রয়াসে ব্রতী হই, তখন আমাদিগকে নিজেদের কথা ভুলিতে হইবে, অপরের কথা বা নিখিল মানবের কথা ভুলিতে হইবে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আমরা যাহা করিতেছি তাহা হইতেছে সকলের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ—তিনি হইতেছেন অনন্ত, পরমতম, শুধু তাঁহার দ্বারাই সকল শ্রম, সকল মহদাকাঙ্ক্ষা সম্ভব হয়, তাঁহার জন্যই প্রকৃতি আমাদের নিকট হইতে সকল শ্রম ও মহদাকাঙ্ক্ষা আদায় করিয়া লয় এবং সে-সব তাঁহারই বেদী মূলে অর্পণ করে। এমন কি আমাদের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির ক্রিয়া বলিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, আমরা কেবল সাক্ষী মাত্র, সে-সব কর্ম্মেও ঐ একই স্মৃতি ও চৈতন্য রাখিতে হইবে, আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন এ-সবকেও ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ বলিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই ভাবও স্মৃতি লইয়া কর্ম্ম করিলে, সাধনা করিলে ইহারই দ্বারা আমাদের মধ্যে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ তিনেরই পূর্ণ বিকাশ হইবে এবং এই ভাবেই আমরা পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব। প্রথমে যদি ভক্তির ভাব নাও থাকে তথাপি সর্ব্বদা সকল বস্তুতে, সকল কর্ম্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সমগ্র জীবনকে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই সঙ্গেই সকল মনুষ্য, সকল জীব, ভগবানের সকল রূপের প্রতিই আমাদের সার্ব্বজনীন প্রেমের বিকাশ হইবে। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ ভক্তিযোগের পন্থা। আবার সকলের মধ্যে ভগবানকে, ভগবানের মধ্যে সকলকে স্মরণ করিতে করিতে শেষে আমাদের পূর্ণ উপলব্ধি হইবে যে, এক ভগবানই এই সব হইয়াছেন—আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শ্রবণ করি, যাহা কিছু অনুভব করি—সে সবে আমরা আর কাহাকেও বা কিছুকেই নহে—সেই এক ভগবানকেই দেখি, শ্রবণ করি, অনুভব করি। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ জ্ঞানযোগের পন্থা।

আবার এইরূপ যজ্ঞভাবে সকল কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের কর্ম্মে সকল অহংভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, কারণ সবই করা হয় ভগবানের জন্য, নিজেদের জন্য নহে, অপরের জন্যও নহে—প্রতিবেশী, বন্ধু, পরিবারবর্গ, দেশ, মানবজাতি বা অন্য

জীব ইহাদের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ইহাদের জন্য কর্ম্ম করিলে আমাদের অহংয়ের তৃপ্তি হয় বলিয়া কোন কর্ম্মই করা হয় না। এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এই উপলব্ধি না হইয়াই পারে ন' যে, সকল কর্ম্ম, সকল জীবনই হইতেছে এক মহাযজ্ঞ—ভগবান নিজের সত্তার মধ্যে নিজেই নিজেকে সকল জীবন ও কর্ম্ম যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতেছেন,—গীতার ভাষায় ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণা হুতম্। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ কর্ম্মযোগের পন্থা। এই তিনটি সমজাতীয় যোগ এখানে স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া একই সাধনায় পরিণত হইয়াছে।

সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। যে ভগবানকে আমাদের সকল জীবন ও কর্ম্ম যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতে হইবে তাঁহাকে সর্ব্বলোকের মহান ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে হইবে, জানিতে হইবে। মানুষ যে নানারূপ বাসনা কামনা সিদ্ধির জন্য অন্য দেবতা সকলের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, উপাসনা করে—তাহারা তাহাদের বাসনানুযায়ী ফল পায়, ঊর্দ্ধতন শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া মানুষের অহংভাব প্রশমিত হয়, দেবতাদের দান বলিয়া ভোগ্য বস্তু সকল গ্রহণ করিলে তাহাদের চিত্ত প্রসারিত হয়, আত্মবিকাশে সহায়তা হয়; কিন্তু এই সব ভোগ হইতেছে ক্ষণস্থায়ী, এবং এইভাবে আত্মবিকাশও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। "পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সর্ব্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে করা হয়, দেবগণ যাঁহার নিম্নতন রূপ ও শক্তি। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয় যখন মানুষ নিম্ন প্রকৃতির বাসনা কামনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে সকল কার্য্যের ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্য্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে তাহার একমাত্র তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ ও বিমল আনন্দ ভোগ করে।" শ্রীঅরবিন্দের গীতা

ভগবানকে শুধু সর্ব্বাধার নির্ব্যক্তিক সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত এক আত্মারূপে জানাই সব নহে, তাঁহাকে প্রকৃতির কার্য্যের দ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভোক্তারূপে জানাও সব নহে; তাঁহাকে ঈশ্বররূপে জানিতে হইবে অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি তাঁহার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হইয়া এই আশ্চর্য্যময় জগৎ তাঁহার অনন্ত সত্তা হইতে তাঁহারই সত্তার মধ্যে প্রকাশ করিতেছে। সাংখ্য পুরুষের যে কল্পনা করিয়াছে, তিনি তাহার অপেক্ষাও অধিক, বৃহৎ, পরম পুরুষ—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। গীতা—১৩৷২৩

উপনিষদেও বলা হইয়াছে এই পরম পুরুষকে জানিয়াই অমৃতত্বলাভ করা যায়, আর অন্য কোন পন্থা নাই—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।—শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

ঋষি বলিতেছেন,

"অন্ধকারের (অজ্ঞানের) অতীত আদিত্যবর্ণ (প্রকাশ স্বরূপ) মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই।"

সাধনার এক অবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ করা আবশ্যক, পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে—ইহার দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্ত হই এবং এইখানেই অধ্যাত্ম সাধনায় সাংখ্য জ্ঞানের উপযোগিতা। কিন্তু প্রকৃতি যদি চৈতন্যময় পুরুষ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র সত্তা হয়, অচেতন জড়মাত্র হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর সম্ভব হয় না, আর আমাদের যে দেহ, প্রাণ, মন প্রকৃতিরই অংশ তাহাদেরও দিব্য রূপান্তর সম্ভব হয় না, এই দেহে থাকিয়াই মৃত্যুকে জয় করা, এই মর্ত্ত্যজগতে স্বর্গের আনন্দ ভোগ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতি জড় নহে, তাহা হইতেছে সচ্চিদানন্দ ভগবানের শক্তি অতএব চিন্ময়ী, আনন্দময়ী—আমরা প্রকৃতির যে অচেতন জড়রূপ দেখিতেছি তাহা হইতেছে ভগবানের পরা শক্তির একটি নিম্নতন ক্রিয়া। অতএব ইহার রূপান্তর সম্ভব—এই মর্ত্ত্যজীবনেরও দিব্য রূপান্তর সম্ভব—তাহাই অমৃতত্ব, তাহার জন্য ভগবানকেই প্রকৃতির অধীশ্বর রূপে জানিতে হইবে। উপনিষদে তাহাই বলা হইয়াছে……

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

—শ্বেতাশ্বতর ৪।১০

"প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং মহেশ্বরকে মায়াবী বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহারই অবয়ব স্বরূপ জীব সকলের দ্বারা এই সমুদয় জগৎ পূর্ণ।" উপনিষদ এখানে "মায়া" শব্দে ভগবানের চিন্ময়ী পরা শক্তিকেই বুঝিয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর মায়া শব্দে যে মিথ্যা সৃজনকারিনী শক্তি বুঝিয়াছেন, বেদ, উপনিষদ বা গীতায় কোথাও "মায়া" শব্দের সে ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

ভগবানকেই সর্ব্বলোকের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা এই যে সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পূর্ণ মর্ত্ত্যলোকে বাস করিতেছি—ভগবানের সৃষ্টিতে ইহা ছাড়া, ইহার উর্দ্ধে আরও অনেক লোক, অনেক জগৎ আছে—সেখানে "নাইক মৃত্যু, নাইক জরা", সেখানকার জীব-সকল নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের মধ্যে বাস করে। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দময়—তাঁহার সৃষ্টিতে যে এইরূপ আনন্দময় শান্তিময় জগৎ থাকিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ এই সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের জগতের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য ইহাই আমাদের জীবনের চরম কথা নহে—অন্যান্য লোকের ন্যায় এখানেও ভগবান অভূতপূর্ব্ব আনন্দেরই বিকাশ করিতে চান—তবে এখানকার ধারা বিভিন্ন। অনন্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের একটি বৈচিত্র্য এখানে বিকাশ লাভ করিতেছে—অচেতনকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা, মৃত্যুকে অমৃতত্বে পরিণত করা, দুঃখকে পরম আনন্দের উপাদানে পরিণত করা—ইহাই হইতেছে মর্ত্ত্য লোকের নিগূঢ় রহস্য। এই রহস্য বুঝিতে হইলে, আমাদের অমৃতত্বলাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে হইলে—জানা প্রয়োজন যে, এই মর্ত্ত্যলোকই সৃষ্টির সব নহে ইহা ছাড়াও ভগবানের সৃষ্টিতে অন্যান্য অনেক লোক আছে। যোগ সাধনার দ্বারা সে-সব লোকের তত্ত্ব জানা যায় এবং জানিতে হয়। পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ। ৩।২৬

—সুষুম্না নাড়ীকে দ্বার করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে সমস্ত ভুবনের জ্ঞান লাভ করা যায়।

ভুবন সকলের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে সূর্য্য-দ্বারেই সংযম করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই—উহা কেবল একটি প্রণালী মাত্র। বস্তুতঃ আমাদের এখন যে ধারণা, এই জড় জগৎই সব, ইহার উর্দ্ধে বা বাহিরে আর কিছুই নাই—ইহা অজ্ঞান। আমাদের বাহ্য চৈতন্য চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যে বস্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে তাহার অস্তিত্বে উহা বিশ্বাস করিতে পারে না—এই ভাবেই জড়বাদের (Materialism) উৎপত্তি। কিন্তু, বাহ্য জগৎ হইতে চেতনাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আমরা যদি অন্তর্মুখী হই, আমাদের মধ্যে যে গভীরতর চৈতন্য রহিয়াছে তাহাতে প্রবেশ করি তাহা হইলেই আমরা সাক্ষাৎ ভাবে অন্যান্য লোকের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, কারণ আমাদের ঐ আভ্যন্তরীণ গভীরতর চৈতন্য চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের এই আভ্যন্তরীণ গভীরতর চৈতন্যময় সত্তাকে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে Subliminal being নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বেদে তিন লোকের কথা আছে—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। গীতাও তিন লোকের কথা বলিয়াছে—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥—১৫।১৭

সর্ব্বনিম্নে ভূলোক, তাহার উর্দ্ধে ভুবর্লোক; ইহার পরে স্বর্লোক, তাহা পাঁচ প্রকার। অতএব এই হিসাবে লোকসংখ্যা হইতেছে সপ্ত। পুরাণ তন্ত্রাদিতে সপ্তলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে—ভূলোক, ভুবর্লোক, মাহেন্দ্র নামক স্বর্গলোক তৃতীয়; তদূর্দ্ধে মহৎ নামে প্রাজাপত্য চতুর্থ লোক। তৎপরে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক যথা জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। পুরাণাদিতে এই সব লোকের ও তাহাদের অধিবাসীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা স্পষ্টই রূপকাত্মক ও কাল্পনিক। পৌরাণিক কাহিনী হইতে জানা যায় তৃতীয় স্বর্লোকে(মাহেন্দ্রলোকে)ছয়টি দেবজাতীয় জীব আছে, সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই উপভোগ করিতে সক্ষম। ইহারা ঔপপাদিক দেহ অর্থাৎ পিতামাতার শুক্রশোণিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণ্য ফলে দিব্য শরীরধারী। ইহারা কামভোগী (মৈথুনপ্রিয়), সর্ব্বদা সুন্দরী অপ্সরার সহিত বিহার করেন। অন্যান্য লোক সম্বন্ধেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। এই সব লৌকিক বর্ণনার মূলগত সত্য এই যে, মর্ত্ত্যের মানুষই ভুবনের শ্রেষ্ঠ জীব নহে, তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জীব অন্যান্য লোকে আছে—সে-সবই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত—যোগসাধনার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে সে-সবের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দ সপ্তলোকের সন্ধান দিয়াছেন—জড়লোক, প্রাণলোক, মানসলোক, বিজ্ঞান লোক এবং তাহাদের উর্দ্ধে আনন্দ, চিৎ ও সৎ এই তিন লোক। তাঁহার The Mother গ্রন্থে তিনি এই সকল লোকের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti of that system of worlds or universe, who is there as the cosmic Soul and Personality of the transcendent Mother. Each is something that she has seen in her vision, gathered into her heart of beauty and power and created in her Ananda. But there are many planes of her creation, many steps of the Divine Shakti. At the summit of this manifestation of which we are a part there are worlds of infinite existence, consciousness, force and bliss over which the Mother stands as the unveiled eternal Power. All beings there live and move in an ineffable

completeness and unalterable oneness, because she carries them safe in her arms for ever. Nearer to us are the worlds of a perfect supramental creation in which the Mother is the supramental Mahashakti, a Power of divine omniscient Will and omnipotent Knowledge always apparent in its unfailing works and spontaneously perfect in every process. There all movements are the steps of the Truth; there all beings are souls and powers and bodies of the divine Light; there all experiences are seas and floods and waves of an intense and absolute Ananda. But here where we dwell are the worlds of the Ignorance, worlds of mind and life and body separated in consciousness from their source, of which this earth is a significant centre and its evolution a crucial process. This too with all its obscurity and struggle and imperfection is upheld by the Universal Mother; this too is impelled and guided to its secret aim by the Mahashakti." (The Mother.)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক লোক বা ভুবন হইতেছে সেই লোকের মহাশক্তির একটি খেলা—সে মহাশক্তি হইতেছেন বিশ্ব মাঝে বিশ্বাতীতা আদ্যাশক্তিরই এক-একটি রূপ। প্রত্যেক ভুবন তিনি তাঁহার দিব্য দৃষ্টি লইয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি ও আনন্দে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে জগন্মাতার সৃষ্টিতে বহু লোক আছে, উচ্চ নিম্ন বহু স্তর আছে। আমরা যে বিশ্বের অন্তর্গত ইহার শিখরে রহিয়াছে সৎ, চিৎ ও আনন্দের লোক—জগন্মাতা সেখানে শাশ্বত শক্তিরূপে সাক্ষাৎ বিরাজমানা। সেখানকার অধিবাসীগণ এক অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতা ও অচ্ছেদ্য একত্বের মধ্যে বাস করে, বিহার করে। কারণ মা তাহাদিগকে চিরকাল নিজ অঙ্কে নির্ব্বিঘ্নে বহন করেন। আমাদের আরও নিকটে হইতেছে বিজ্ঞান লোক, সেখানে সব সৃষ্টি নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ, মা সেখানে বিজ্ঞানময়ী মহাশক্তি, দিব্য সর্ব্বদর্শী সঙ্কল্প এবং সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানের মূর্ত্তি, সে শক্তির সকল ক্রিয়া অভ্রান্ত, তাহার সকল প্রক্রিয়াই স্বতঃ নিখুঁত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সেখানকার সকল গতিই সত্যের পদক্ষেপ; সেখানকার সকল অধিবাসীই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরধারী, সকলেই দিব্য জ্যোতির জীবভূত রূপ ও শক্তি; সেখানকার সকল অনুভূতি উপলব্ধি হইতেছে গভীর ও নিরতিশয় আনন্দের সাগর, প্লাবন, তরঙ্গ। কিন্তু যেখানে আমাদের বাস এইটি হইতেছে অজ্ঞানের জগৎ, মনের, প্রাণের, দেহের জগৎ, তাহাদের উৎস হইতে চেতনায় বিচ্ছিন্ন—এই জগতের নিগূঢ় রহস্য পৃথিবীর ক্রমবিবর্ত্তন ধারায় প্রকট

হইতেছে। কিন্তু এই জগৎকেও তাহার সকল অজ্ঞান, দ্বন্দ্ব ও দোষ-ত্রুটি সহ জগন্মাতা ধরিয়া রহিয়াছেন, ইহাকেও ইহার নিগূঢ় লক্ষ্যের দিকে সেই মহাশক্তিই পরিচালিত করিতেছেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন মহাশক্তি জগন্মাতাই এই সকল জগৎকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, গীতা বলিয়াছে মহেশ্বরই ইহা করিতেছেন। ইহা কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ, মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। কারণ গীতাও বলিয়াছে যে, ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি বা শক্তিই এই জগৎ পরিচালনা করিতেছে (৯।১০), গীতায় ভগবান নিজেকে নিজের পরাশক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন—প্রকৃতিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছে, অথচ ভগবান বলিয়াছেন তিনিই এই সব করিতেছেন (৭।৬)। পুরুষ ও প্রকৃতি পরমতত্ত্বে অভিন্ন, বিশ্বলীলার জন্য এক ব্রহ্মই পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বয় তত্ত্ব হইয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষেরই নিজ শক্তি, স্বাম্ প্রকৃতিম্। তবে গীতার যোগে ঝোঁক হইতেছে পুরুষের উপর, পুরুষোত্তমই যোগেশ্বর; তন্ত্রে প্রকৃতি বা শক্তির উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে; শ্রীঅরবিন্দের যোগে এই দুই প্রণালীর অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে এবং ইহার সূচনা হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়। লোকসকলকে যিনি নিজশক্তি দ্বারা শাসন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই ঈশ্বর। উপনিষদে বলা হইয়াছে, য একো সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ (শ্বেতাশ্বতর ৩।১)। "ঈষনাভিঃ" অর্থাৎ নিজ পরম শক্তিসকলের দ্বারা "ঈশতে" অর্থাৎ শাসন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন। এই বিশ্বশাসন কর্ম্মে তিনি অনেক লোকপাল ও দেবতা নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তাঁহার অধীন, তাই তিনি মহেশ্বর,

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
—শ্বেঃ উ ৬।৭

তিনি শুধু উর্দ্ধে দেবগণকেই নহে, পরন্তু নিম্নে মানুষকে, কীটকে এবং মৃৎপিণ্ডকেও নিয়ন্ত্রিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন—তাই তিনি সর্ব্বলোকমহেশ্বর। যখন আমরা ভগবানকে এই ভাবে সর্ব্বনিয়ন্তারূপে জানি—তখন সকল ভয়, উদ্বেগ, অশান্তি হইতে আমরা চিরমুক্ত হই। কারণ দৃশ্যতঃ জগৎ ও সংসার যতই করাল রূপে, দুঃখময় রূপে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হউক না কেন, আমরা যদি বুঝি যে এক সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তিনি আমাদের সুহৃদ হিতকামী, তাহা হইলে সকল দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমরা সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিতে পারি।

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং। অনেক ধর্ম্মে ভগবানকে কল্পনা করা হয় কঠোর বিচারকরূপে, তিনি সূক্ষ্মভাবে জীবের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া কাহাকেও শাস্তি দিতেছেন, কাহাকেও পুরস্কৃত করিতেছেন। কিন্তু এসব হইতেছে অজ্ঞান-প্রসূত লৌকিক ধারণা—ইহাতে পার্থিব রাজা বা শাসনকর্ত্তারূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়। ভগবান জগৎকে শাসন করেন অর্থাৎ নিজশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহার এই নিয়ন্ত্রণের নিয়ম আছে, ধারা আছে—কিন্তু তিনি সে-সবের দ্বারা বদ্ধ বা বাধ্য নহেন। জগতের নিয়ম সকল হইতেছে ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র—আর সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সর্ব্বভূতের হিতসাধন। তিনি সকলেরই সুহৃদ। আমরা যত মন্দ, পাপী, অনাচারী হই না কেন—সেজন্য ভগবান আমাদিগকে দুঃখ দিবেন, শাস্তি দিবেন, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের জ্ঞান নাই, মানুষ আত্ম-বিস্মৃত, আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অজ্ঞানের বশে নানা ভুল ভ্রান্তি করিয়া নানা দুঃখ ও বিপদে পতিত হইতেছে। ভগবান সেজন্য আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হন না, সকল সময়ই তিনি আমাদের কাছে কাছে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় সেই পথে চালিত করেন। আমরা অজ্ঞানের বশে যেটাকে অশুভ বলিয়া মনে করি তাহার ভিতর দিয়াই ভগবান আমাদের কল্যাণ সাধন করেন। যাহারা ভগবানকে এইরূপ মঙ্গলময় পরম সুহৃদ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে তাহারা অতি বড় দুঃখ বিপদের মধ্যেও ধৈর্য্য হারায় না, সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই আভ্যন্তরীণ শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে।

জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। "জ্ঞাত্বা মাং" বলিতে ভগবান এখানে কি বলিতে চাহিয়াছেন সে-সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, অর্জ্জুন ভগবানকে সম্মুখে দেখিতেছেন তথাপি তিনি কেন মুক্ত হন নাই সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই এখানে ভগবানকে কি ভাবে জানিলে মুক্তি হয় তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। বস্তুতঃ সকল মনুষ্য সকল জীবই সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতেছে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, আমরা বিশ্ব সংসারে যাহা কিছু দেখি তাহা ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে—তথাপি লোকে সংসার বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে কেন? ইহার মূল কারণ অজ্ঞান—আমরা বস্তুতঃ নিজেরাই ভগবানের অংশ, ভগবান আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, আমরা ভগবানের মধ্যে রহিয়াছি—ভগবানের শক্তিতেই আমরা চলা ফেরা করি, কর্ম্ম করি, শ্বাস প্রশ্বাস করি—কিন্তু আমরা তাহা জানি না—এই অজ্ঞানকে দূর করাই সকল সাধনার লক্ষ্য। শুধু মন দিয়া জানিলেই হইবে না, বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেই হইবে না, আত্মার উপলব্ধিতে এই জ্ঞান লাভ করা চাই,

এই জ্ঞান অনুসারে আমাদের সমস্ত জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই, সমস্ত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করা চাই—তবেই প্রকৃত মুক্তি এবং তাহার আনুষঙ্গিক পরম শান্তি লাভ করা যায়। সেই জ্ঞান প্রথম শাস্ত্র হইতে ও গুরুমুখে শ্রবণ করিতে হয়, ধ্যান করিতে হয়, তদনুসারে সকল চিন্তা, অনুভব, কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। গীতা-শাস্ত্র এখানে সেই জ্ঞানেরই স্বরূপ বলিতেছে।

জ্ঞানলাভের সাধনায় সাধক প্রথম উপলব্ধি করে যে, সকল দেশ ও কালকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এক দিব্য নির্ব্যক্তিক সত্তা, সদ্ আত্মা, তাহাতে গতি নাই, ভেদ নাই, লক্ষণ নাই, শান্তম্ অলক্ষণম্। যাঁহারা এই উপলব্ধিতেই থামিয়া যান তাঁহাদের নিকটেই এই বৈচিত্র্যময়, কর্ম্মময়, গতিময় জগৎ মিথ্যা মায়া বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু জ্ঞানের পথে আরও অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, ঐ আত্মা শুধুই নির্ব্যক্তিক, নিষ্ক্রিয় নহে, উহা কেবল একটি বিভাব, aspect; ঐ আত্মার ব্যক্তিক ভাবও আছে, ঐ আত্মাই পুরুষ, ঐ আত্মাই ঈশ্বর, আত্মা নিজের মধ্যে সকল সৃষ্ট বস্তুকে শুধু ধারণ করিয়াই নাই পরন্তু উহাই আবার সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, সকলকে পূর্ণ করিতেছে—তখন সকল জগৎ, সকল নামরূপই ব্রহ্ম বলিয়া, বাসুদেব বলিয়া অনুভূত হয়—গীতা এই পূর্ণ জ্ঞানকেই মুক্তি ও শান্তিলাভের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও গীতা এই জ্ঞানকেই জীবনের আদর্শ নীতি করিতে বলিয়াছে, উত্তরোত্তর এই জ্ঞানেই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে।

"শান্তি" শব্দে শঙ্কর বুঝিয়াছেন, সর্ব্বসংসারোপরতি—সকল সংসার ও কর্ম্মের নিবৃত্তি। কিন্তু ইহা গীতার মত নহে—গীতার মতে, অহংভাবের নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ এবং তাহার দ্বারা যে পরম শান্তিলাভ করা যায় তাহাই হয় দিব্য জীবন ও দিব্য কর্ম্মের ভিত্তি। নির্ব্বাণের এই পরম শান্তি লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের উপাসনা প্রয়োজন। অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সন্ন্যাস বড় না কর্ম্মযোগ বড়, এই ভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ করিয়াছে। বাসনা কামনা তৃপ্তির জন্য দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সকল দেবতা যাঁহার নিম্নতন রূপ ও শক্তি সেই মহেশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সকল জীবন ও কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। আমি কর্ম্ম করিতেছি এই অহংভাব বর্জ্জন করিয়া প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমি ভোগ করিতেছি এই অহংভাব বর্জ্জন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে যে, পরমপুরুষ ভগবানই আমার ভিতর দিয়া সকল ভোগ গ্রহণ করিতেছেন—প্রকৃতির সকল কর্ম্মের তিনিই প্রকৃত ভোক্তা। তখন আর কোন ব্যক্তিগত ভোগের জন্য আমাদের লালসা থাকে না, ভগবানের মধ্যেই আমরা পাই সকল তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ, বিশুদ্ধ

আনন্দ। তখন আর কোন কিছু লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না—কারণ তখন আমরা আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত থাকি—তখন আমরা যে কর্ম্ম করি তাহা হয় বিশুদ্ধ যজ্ঞ, তাহা শুধু ভগবানের জন্যই করা হয়, তাহাতে আমাদের কোন আসক্তি বা কামনা থাকে না। এই ভাবে আমরা সমতা লাভ করি—প্রকৃতির গুণ সকল হইতে মুক্ত হই—নিস্ত্রৈগুণ্য; তখন আর আমরা প্রকৃতির চাঞ্চল্যের মধ্যে বাস করি না পরন্তু অক্ষর ব্রহ্মের পরম শান্তির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হই, বাহিরে প্রকৃতির কর্ম্ম চলিলেও আমাদের সেই আভ্যন্তরীণ শান্তি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না। এইভাবে কর্ম্মযোগই হয় পরম মুক্তি ও শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ।

———

উপসংহার

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা, সেই জন্য গীতা কোথাও কর্ম্মের উপর আবার কোথাও জ্ঞানের উপরেই জোর দিয়াছে। আবার কর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানের কথা আনিয়াছে, জ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে কর্ম্মেরও ইঙ্গিত দিয়াছে। প্রথম প্রথম অর্জ্জুনের পক্ষে এই সমন্বয় তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইয়াছিল। গীতার গুরু শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সংশয় সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়াছিলেন—কিন্তু গীতার ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে এই সংশয় আজিও দূর হয় নাই। তাই দেখিতে পাই কেহ গীতার শিক্ষাকে জ্ঞানযোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ ইহাকে কর্ম্মযোগ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে মানুষ স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া যে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছে, গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে—এইটিই গীতার শিক্ষা, গীতার কর্ম্মযোগীর আদর্শ বলিয়া আজকাল অনেকেই ব্যাখ্যা করিতেছেন; স্ত্রীপুত্র পালন কর, দেশের ও সমাজের হিতসাধন কর, মানবজাতির সেবা কর—ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, গীতার আদর্শ। ইহা যে আধুনিক আদর্শ, যুগধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু এই আদর্শের সমর্থন খুঁজিবার উদ্দেশ্য লইয়া যদি আমরা গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে গীতার নানা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ন্যায় গীতাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা আমাদের নিজেদের মতটিই প্রচার করিব—গীতার প্রকৃত শিক্ষা কি, মূল শিক্ষা কি তাহা ধরিতে পারিব না। আধুনিক আদর্শটি হইতেছে মূলতঃ পাশ্চাত্য আদর্শ, মানব-ধর্ম্মের আদর্শ—কিন্তু ইহার মধ্যে সত্য কতটুকু আছে, ইহার ত্রুটি কোথায় তাহা যদি আমরা বুঝিতে চাই এবং সেজন্য গীতার মহতী শিক্ষা হইতে সাহায্য ও আলোক লাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সকল মানসিক আদর্শ বা মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ খোলা মন লইয়া গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলে নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করা, সর্ব্বকর্ম্মাণি, গীতার আদর্শ—কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষ যে-ভাবে কর্ম্ম করে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজসিক বাসনা ও অহংভাব, ইহাই সংসারের সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব অশান্তির মূল। এই বাসনা ও অহংভাব নির্ম্মূল করাই গীতার শিক্ষা। এইখানে গীতার সহিত বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শিক্ষার বেশই মিল রহিয়াছে এবং গীতা এখানে পুনঃ পুনঃ "নির্ব্বাণ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে।

আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সম্পত্তি—এইরূপ বোধ যতদিন আমাদের মনে রহিয়াছে ততদিন আমরা গীতার আদর্শ হইতে বহুদূরে। লোকে বলে সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতেছি—ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, ইহাই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম সাধনা। কিন্তু ইহা হইতেছে আত্মপ্রতারণা। মানুষ স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা ও আসক্তির বশে তাহাদের জন্য কর্ম্ম করে, কেবল মুখে বলে যে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতেছি। যখন কোন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয় তখনই এই ভিতরের গলদটি বাহির হইয়া পড়ে—কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের প্রথমে তাহাই হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালনের জন্যই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন—কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নিজের ও ভ্রাতাদের জন্য রাজ্য কামনায়, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা কামনায়, নিজেদের ভোগ সুখ কামনায় যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন—তাই যখন তিনি দেখিলেন যে, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ত্তব্য করিতে হইলে তাঁহাকে নিজ হস্তে তাঁহার সকল স্নেহের বন্ধন, মমতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, আপনার জন সকলকে নিজ হস্তে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিতে হইবে, তখন তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সকল দুঃখের মূল এই অহং ভাবকে দূর করিতেই হইবে—নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইতে হইবে—আমরা যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছি, কর্ম্ম করিতেছি—এইটিকে ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আভ্যন্তরীণ সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক হইতে হইবে। সংসারে সকল বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করা সহজ নহে—নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া এইরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়, এর জন্য বর্ত্তমানে মানুষ যে-ভাবে সাংসারিক জীবন যাপন করিতেছে ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য—এখানে গীতার শিক্ষার সহিত সন্ন্যাসীদের শিক্ষার বেশ মিল রহিয়াছে—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

—১৮।৫১,৫২

তবে গীতা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যে অর্থ দিয়াছে তাহাতেই হইয়াছে গীতার সহিত সন্ন্যাসীদের প্রভেদ। গীতা বাহ্য বিষয়ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ প্রশংসা করে নাই—ভিতরে বাসনাত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছে এবং সর্ব্বদা নিষ্কাম ভাবে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। তবে এই সাধনার জন্য সাধারণ

সাংসারিক জীবন হইতে সরিয়া যাওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। যখন সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—সাধক অহংভাবের নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন তিনি সংসারের সকল কর্ম্মই করিতে পারেন। তখন তিনি নির্জ্জনে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া না থাকিয়া অতন্দ্রিত ভাবে সর্ব্বভূতের হিতের জন্য কর্ম্ম করিবেন—ইহাই গীতার শিক্ষা।

তবে এই সাধনার জন্য সাংসারিক জীবন ছাড়িয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, সকলেই ইহার যোগ্য নহে—এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে সংসার ত্যাগের কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা দিলে তাহাদের বুদ্ধিভেদ হইতে পারে—তাহারা উর্দ্ধের চৈতন্যে না উঠিয়া তামসিকতার মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে—সেইজন্যই গীতা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগের আদর্শ ধরিতে নিষেধ করিয়াছে। যে যে অবস্থায় আছে—সেই অবস্থানুযায়ী কর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে করিয়া যেন সে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—গীতা এই উপদেশই দিয়াছে এবং সেইজন্য প্রাচীন বর্ণধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম যজ্ঞভাবে করিতে বলিয়াছে। কিন্তু এইটি হইতেছে গীতার কর্ম্মযোগের প্রাথমিক অবস্থা—অথবা কর্ম্মযোগের জন্য মন, প্রাণ, হৃদয়কে তৈয়ারী করিবার সাধনা। গীতার শিক্ষায় এইরূপ স্তরভেদ আছে—গীতা সাধনায় কেমন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয় দেখাইয়া দিয়াছে—ইহা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব না—নিম্ন অধিকারীগণের পক্ষে গীতা যে উপদেশ দিয়াছে সেইটিকেই গীতার চরম শিক্ষা বলিয়া ভুল করিব।

আজকাল আমাদের দেশে দেশের জন্য, সমাজের জন্য কর্ম্ম করিবার একটা প্রবল প্রেরণা আসিয়াছে এবং ইহার বশে অনেকেই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবন-বিরোধী, কর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া নিন্দা করিতেছেন; আবার কেহ কেহ এই পাশ্চাত্য কর্ম্মপ্রবণতার আদর্শটিকেই গীতার শিক্ষা বলিয়া, ভারতের প্রকৃত অধ্যাত্ম শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কর্ম্মবিমুখ অবসাদগ্রস্ত ভারতে যাঁহারা এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মের প্রেরণা জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে অনেকে স্বামী বিবেকানন্দকে আজও ভুল বুঝিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"ফেলে দে নিজের মুক্তি, ফেলে দে ধ্যান,—মানুষ কি কথা, দেশের একটা কুকুর যতদিন অভুক্ত থাকিবে, ততদিন তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম, আর সব অধর্ম্ম।" এই সব বজ্রধ্বনির ভিতর দিয়াই ভারতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইয়াছে—আর এই বাণী আধুনিক যুবকদিগের প্রাণে যে সাড়া তুলিতেছে, ভারতের অধ্যাত্ম

আদর্শ তাহা তুলিতে পারে নাই। ইহার কারণ স্বামী বিবেকানন্দকে এবং ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শকে লোক এখনও ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীজী ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অভুক্ত থাকিলেও তিনি কোনদিন নিজে ধ্যান জপ পরিত্যাগ করেন নাই, আর অধ্যাত্ম সাধনা ছাড়িয়া দিয়া দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনেও প্রবৃত্ত হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন জনসেবার জন্য মিশন স্থাপন করিয়া নহে, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানগণই তাঁহার অগ্রগামী; তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম ছিল বেদান্ত ও অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ প্রচার, ইহার জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুবকগণকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়াছিলেন—অতএব তাঁহার দোহাই দিয়া অধ্যাত্ম সাধনাকে হেয় করা চলে না।

স্বামীজী ১৮৯৪ সালে সিকাগো হইতে লিখিত একখানি পত্রে নিজ জীবন-ব্রত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনো করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহাগুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। আর তাহা ছাড়া যে সকল যুবক বর্ত্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণ স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়াছে, তাহাদেরই বা কী অবস্থা হইত?...ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই, আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীরা তাহাদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়াপরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডীই যে কখনো অতিক্রম করিতে পারে না।...আমার সমাদর হউক আর না হউক, আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" (উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩৪৮)

ভারতবাসী ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অতি সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে যাইবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না—এই মারাত্মক অবসাদ দূর করিবার জন্যই তিনি জনসেবার আদর্শ বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। কিন্তু এই বাণী সকলের জন্য নহে। তিনি জনসাধারণের অন্নকষ্ট দূর করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই কষ্ট দূর হইলেই মানুষের সকল দুঃখ ঘুচিবে না, আর এই কার্য্যটিও করিতে হইলে চাই অধ্যাত্ম সাধনা সম্পন্ন কর্ম্মী এবং দেশব্যাপী অধ্যাত্ম আন্দোলন। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"So every improvement in India requires first of all an upheaval in religion. Before flooding India with socialistic or political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our Scriptures, in our Puranas must be brought out from the books··· and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country, from north to south, and east to west, from the Himalayas to Commorin, from Sind to the Brahmaputra." ("My plan of campaign" —Swami Vivekananda.)

অর্থাৎ "ভারতের কোন উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই অধ্যাত্ম আন্দোলন। ভারতকে সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভাসাইয়া দিবার পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ভাবধারার বন্যা বহাইয়া দাও। আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইতেছে আমাদের উপনিষদ আদি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য সত্য নিহিত রহিয়াছে সেই গুলিকে বাহির করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া, যেন সেই সকল সত্য আগুনের ন্যায় আসমুদ্রহিমালয় ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হয়।"

সকলেই সমুচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার অধিকারী নহে। যাহারা তমসাচ্ছন্ন অবসাদ-গ্রস্ত তাহাদিগকে বৈরাগ্যের বাণী না শুনাইয়া তাহাদের স্বভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে হইবে—ইহা গীতার শিক্ষা,

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥—৩।২৬

জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণকে কর্ম্মের আদর্শ দেখাইবার জন্য সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ভগবানের সহিত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া—তাঁহারই কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্মযোগ। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মযোগী হইতে হইলে চাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য,

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৬।৩৫

মানুষ এখন যেভাবে পত্নী পুত্র লইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না, তাই গীতার আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মযোগী হইতে হইলে এক অবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পত্নী পুত্রের মায়া কাটাইয়া "নির্ম্মম" হইয়া অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হইতে হয়। গীতা যে আত্মীয় স্বজনের প্রতি কিরূপ "নির্ম্মম" হইতে বলিয়াছে—অর্জ্জুনের দৃষ্টান্তে প্রথমেই

তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, অর্জ্জুনকে নিজ হস্তে আত্মীয় স্বজনকে বধ করিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মযোগী হইতে হইলে অনেক বৈরাগ্য সাধনার প্রয়োজন। অতএব রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,"

ইহাতে আর যাহাই হউক, গীতার আদর্শ, ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। আর রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি যে আধুনিক ভারতীয়-গণের মধ্যে অতিশয় প্রিয় হইয়াছে ইহাতে ভারতের উপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবই প্রমাণিত হয়। তবে সংসারে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইতে পারে—এবং এইখানেই হইতেছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীতার শিক্ষা, গীতার আদর্শের বহুল প্রচারের সার্থকতা। যে যে অবস্থাতেই থাকুক তাহারই উপযোগী শিক্ষা গীতার মধ্যে আছে, আর গীতার শিক্ষা একটুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিলেও অনেক লাভ হয়,

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২।৪০

"এই সাধনায় কোন সামান্য প্রয়াসও বৃথা হয় না, ইহাতে কোনই অনিষ্ট নাই, এই ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।" অতএব স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারে বাস করিয়াও যাহারা গীতার শিক্ষা অনুযায়ী কামক্রোধকে সংযত করা অভ্যাস করে, শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করে, সুখদুঃখ, মান অসম্মান, জয় পরাজয়ে সমভাব রক্ষা করে, সর্ব্বত্র সকল সময়ে ভগবানকে স্মরণ করে, সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করে—তাহাদের দোষত্রুটি সকল ক্রমশঃ দূর হয়, পাপ ক্ষীণ হইয়া আইসে—তখন তাহারা চরম সাধনার যোগ্য হইয়া উঠে। সেই চরম সাধনা হইতেছে সকল কর্ত্তব্য, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। সংসারে স্ত্রীপুত্র পরিজনবেষ্টিত থাকিয়া এ সমর্পণ হয় না। ইহার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করিতে হয় এবং এ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষার সহিত গীতার শিক্ষার বেশ মিল আছে, এবং ভারতে বহুকাল হইতেই এই ত্যাগের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। জাবাল উপনিষদে বলা হইয়াছে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ—যে-দিনই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

গৃহস্থাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥—ভাগবত ১১।১৭।১২

"আমার কটিদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, আমার হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও আমার বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আমার মস্তকে সন্ন্যাসাশ্রম অবস্থিত।"

পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে আজকাল আমাদের দেশে সন্ন্যাস নিন্দিত হইতেছে। যে সংসার-বিরাগী ভক্ত ঈশ্বর-লাভের অভিপ্রায়ে পত্নী পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

পত্নী ও পুত্রের মধ্যেও ভগবান আছেন সত্য, কিন্তু কয়জন তাহা দেখিতে পায়? সর্ব্বভূতের মধ্যে যাহারা এক আত্মা, এক ভগবান দেখেন, তাহারাই পত্নী ও পুত্রের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে পান—তাহাদের আত্ম-পর ভেদ দূর হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে মানুষ পত্নী ও পুত্রের মধ্যে ভগবান দেখে না, ভগবানের সেবা করে না, পরন্তু নিজ অহংএরই সেবা করে, "আমার" পত্নী "আমার" পুত্র—এই অহং-ভাবই তাহাদের সকল ব্যবহারের মূলে থাকে—এই অহংভাব দূর করিতে না পারিলে কেহই অধ্যাত্ম-জীবন বা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব স্ত্রীপুত্র গৃহ বিত্ত প্রভৃতি যে-সবকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অহংভাব পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় সে-সবকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিতেই হইবে। অহংভাব লইয়া সংসারে আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন তাহা আমাদিগকে এই দুঃখদ্বন্দ্বময় প্রাকৃত জীবনে বদ্ধ রাখিবে, তাই উপনিষদ অতি জোরের সহিতই বলিয়াছে,

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে
অমৃতত্বমানশুঃ। কৈবল্য ২ ; মহানারায়ণ ১০।৫

গীতা এই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে, তবে গীতা "ত্যাগ" শব্দের যে অর্থ দিয়াছে তাহাতেই সাধারণ সন্ন্যাসীদের সহিত গীতার শিক্ষার প্রভেদ হইয়াছে। গীতার শিক্ষায় কর্ম্ম ত্যাগের আদর্শ হইতেছে আসক্তিত্যাগ, কর্ম্মফল-কামনা ত্যাগ (৫।১১,১২)। তবে সাধারণ সাংসারিক জীবনে থাকিয়া এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ একরকম অসম্ভব। গীতা কোথাও বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ বা সন্ন্যাস আশ্রমের উপদেশ দেয় নাই, বলিয়াছে ইহা একটা পন্থা হইলেও দুর্গম পন্থা (৫।৬)। তথাপি গীতার যে উচ্চতর সাধনা, ব্রহ্মের মধ্যে অহংভাবের নির্ব্বাণ এবং পুরুষোত্তমের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহার অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাধারণ সাংসারিক জীবনে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে লাভ করা যায় না—সেখান হইতে সরিয়া অধ্যাত্মজীবনের

অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করা প্রয়োজন হয়—গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে, বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি (১৩।১১), বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ (১৮।৫২)। তবে ইহা সন্ন্যাস আশ্রম নহে—কারণ সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ দান তপস্যা এ-সব কর্ম্ম কখনই পরিত্যাজ্য নহে। নিজের জন্য বা নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বভূতের জন্য, ভগবানের জন্য কর্ম্ম করাই গীতার মতে প্রকৃত যজ্ঞ, দান, তপস্যা—এবং গীতার সাধনায় এইরূপ কর্ম্মের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সকল সময়েই স্বীকৃত হইয়াছে। আর গীতা যে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া কায়মন বাক্য সংযত করিয়া সাধনা করিতে বলিয়াছে—তাহাও কেবল সাধন অবস্থার জন্য, সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ যেখানেই থাকুন এবং যাহাই করুন তাহাতে তাহার আর কোন ক্ষতি হয় না এবং তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনে, জগতে ভগবানের ইচ্ছা সাধনে নিযুক্ত থাকেন।

কেবল নিজের বা আত্মীয় স্বজনের জন্য কর্ম্মে রত না থাকিয়া, সমাজের হিতের জন্য, দেশের হিতের জন্য কর্ম্ম করিলে তাহাতে ক্ষুদ্র অহংভাবের ক্ষয় হয়, মানুষ একটা উদারতা লাভ করে—এইজন্য অনেকে এইটিকেই গীতার কর্ম্মযোগ বলিয়া থাকেন। নিজের জন্যই হউক আর পরের জন্যই হউক যে কোন কর্ম্ম যদি যজ্ঞ ভাবে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া করা যায় তাহাই হয় কর্ম্মযোগের সূচনা, ইহার দ্বারা অহংভাবের ক্ষয় হইলে মানুষ ক্রমশ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যেভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজসিক—তাহাতে অহংভাবের একটু রূপান্তর হইলেও তাহা দূর হয় না, মানুষ নিজের দেশ বা সম্প্রদায়ের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, সেইটিই হয় তাহার পরিবর্দ্ধিত অহং এবং তাহার সেবার জন্য সে অন্যের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়—তাহা ছাড়া এই সব কাজের মধ্যে নাম যশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য মানুষ অস্থির-ভাবে কর্ম্ম করে। গীতার কর্ম্মযোগে ভিতরে যে শান্ত নিব্যক্তিক ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এইরূপ রাজসিক কর্ম্মের মধ্যে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারে না—অতএব এইরূপ কর্ম্ম অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল হয় না।

গীতা যেমন সন্ন্যাসীদের ন্যায় কর্ম্মত্যাগ অনুমোদন করে নাই, তেমনই যে তীব্র রাজসিক কর্ম্ম, activism, আধুনিক যুগের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও অনুমোদন করে নাই। তবে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা রাজসিক কর্ম্মে ক্ষতি হয় কম, যাহারা রাজসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত তাহারা আত্মবিকাশে অগ্রসর হইতে পারে না, অহংভাব ও বাসনার মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিলে মানুষ তামসিকতার মধ্যে পতিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য গীতা কর্ম্মত্যাগের

আদর্শ প্রচার করা বিপজ্জনক বলিয়াছে, উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম চেদহম্। সন্ন্যাসীদের কর্ম্মত্যাগের আদর্শের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গীতা কর্ম্মের উপর বেশী জোর দিয়াছে বলিয়াই ভুল হয় যে, গীতা বুঝি পাশ্চাত্য রাজসিক কর্ম্মেরই আদর্শ প্রচার করিয়াছে। গীতা অবশ্য বলিয়াছে যে তামসিকতা অপেক্ষা এইরূপ রাজসিক কর্ম্মও ভাল—কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ (৩।৮)। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মই যে গীতার আদর্শ কর্ম্মযোগ নহে গীতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দুইটি অনুধাবন করিলে সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহেই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

রাখোরে ধ্যান থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলো বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

এই কবিতায় আধুনিক মনোভাব অনুযায়ী শ্রমকে অত্যুচ্চ মর্য্যদা দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এখানে কর্ম্মযোগের যে ব্যাখ্যা দেওয় হইয়াছে তাহাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। ভগবান সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছেন, অতি তুচ্ছ কর্ম্মের ভিতর দিয়াও আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি, কিন্তু সে জন্য সাধনার প্রয়োজন, শুধু কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগ হয় না। অসংখ্য কুলী-মজুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অশ্রান্ত ভাবে কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা কি সকলেই কর্ম্মযোগী? ভগবান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, সকলের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানি না, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নাই—সাধারণতঃ আমরা জীবন যাপন করি, কর্ম্ম করি ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অহংভাবের বশে—এবং এইটিই হইতেছে সংসারের সকল দুঃখ ও অশান্তির মূল—এই মূলটি উচ্ছেদ করাই অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য—ইহার জন্য ধ্যান ও পূজার সার্থকতা আছে—তাই গীতা বলিয়াছে, ধ্যানযোগপরো নিত্যং। কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস, সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে, মামনুস্মর যুধ্য চ, অনুভব করিতে হইবে আমি কর্ম্ম করিতেছি না, আমার ভিতর দিয়া প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, সেই-সব কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে ভগবানকে উৎসর্গ করিতে হইবে, কর্ম্মের ফলের প্রতি এবং কর্ম্মের প্রতি আসক্তি ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে—তবেই আমরা কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হইতে পারিব—এবং ইহার জন্য ধ্যান করা, পত্রপুষ্প ফলজল দিয়া ভগবানের পূজা করার খুবই উপযোগিতা ও সার্থকতা আছে।

বর্ত্তমানে মানুষের সাংসারিক জীবন যে ভাবে চলিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া

এই কর্ম্মযোগের সাধনা করা এক রকম অসম্ভব। লোকের ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষার জোর নাই, উচ্চতর জীবন-লাভের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সংযমের একান্ত অভাব, নীচ ইন্দ্রিয় ভোগের জন্যই সকলে অস্থির ভাবে ধাবিত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ শত বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে—ইহার মধ্যে থাকিয়া গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণ কোনরকমে চলিতে পারে কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্মসাধনা, যোগসাধনা হয় না। রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন,

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি
ধরণীর ধূলি তাই লয়ে আছি,
পাই নি চরণ ধূলি হে।

অতএব দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন না করিয়া গীতার কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে হইলেও বর্ত্তমান সামাজিক জীবন হইতে শেষ পর্যন্ত সরিয়া যাইতেই হয়, এমন কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকিতে হয় যেখানে সাধক অহংশূন্য হইয়া প্রকৃত নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে এবং সকল সময়ে ভগবানে মন রাখিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে দেশসেবা, জনসেবা যে-ভাবে চলিতেছে—ইহার মধ্যে থাকিয়া অধ্যাত্ম জীবন গঠন করা যায় না, কারণ এখানে সাত্ত্বিকতার বিকাশ না হইয়া রাজসিকতাই বৃদ্ধি পাইতে পারে —তাহাতে এই নীচের জীবনের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া যায়।

কিন্তু এইরূপ অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য সকলেই প্রস্তুত নহে। তাহাদের পক্ষে সংসারে থাকিয়া আপন আপন প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারবর্গ প্রতিপালন, দেশসেবা, সমাজ সেবা প্রভৃতি কর্ম্মে ব্রতী থাকাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ কর্ম্মের মধ্যে তাহারা গীতার ভাব যতটা আনিতে পারিবে, অহং ও মমতা ও আসক্তিকে দমন করিয়া, সুখে দুঃখে লাভ লোকসান মান অপমানে সমভাবে থাকা অভ্যাস করিয়া, কাম ক্রোধের বেগ সংযত করিয়া, নিয়মিত গীতাপাঠ, ধ্যান ও পূজা করিয়া ক্রমশঃ তাহারা প্রকৃত কর্ম্মযোগ ও অধ্যাত্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে।

কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভের জন্য সাময়িক ভাবে সংসার হইতে সরিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ গীতার শিক্ষা নহে—এবং এইখানেই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সহিত গীতার মূল প্রভেদ। সন্ন্যাসীদের মতে সিদ্ধি ও জ্ঞানলাভের পর আর কর্ম্মের স্থান নাই। গীতার মতে সিদ্ধ পুরুষের কর্ম্মই দিব্য কর্ম্ম, তাঁহারাই কর্ম্মযোগী, কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল জানেন—তাঁহারা আসিয়া যখন সংসারের সকল কর্ম্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি

পরিচালন করিবেন—তখনই সমাজজীবনের প্রকৃত উন্নতি ও রূপান্তর সাধিত হইবে—তখনই সমাজ প্রকৃতভাবে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে—তখনই মানুষের গার্হস্থ্য জীবন হইবে প্রকৃত গার্হস্থ্য আশ্রম—তখন আর অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য, অধ্যাত্ম সাধনার জন্য কাহাকেও সংসার ও সমাজ হইতে সরিয়া যাইতে হইবে না।

সমাজকে এইরূপ অধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তোলাই ছিল প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আদর্শ। কিন্তু, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই—সেটা চিরকাল একটা সমুচ্চ আদর্শের মত থাকিয়া গিয়াছে—কার্য্যতঃ সমাজজীবনে অনেক গ্লানি থাকিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে সেই সব গ্লানি এমন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার জন্য ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং এইরূপ একটি সন্ধিক্ষণকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রের উপর সমাজ যে নিগ্রহ করিতেছিল, গীতা তাহার প্রতিবাদ করিয়া সাম্যের আদর্শ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে সকলের মধ্যেই, এমন কি নীচ পতিত চণ্ডালের মধ্যেও এক ব্রহ্ম সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন ; গতানুগতিক ভাবে জাতিগত বৃত্তি বা ব্যবসা অনুসরণ না করিয়া যাহাতে লোকে আপন আপন প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম্ম করে এবং সেই কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করে সেই শিক্ষা দিয়াছে, আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, আত্ম-পর সকলকেই সমান ভাবে দেখিয়া, সর্ব্বভূতের হিত সাধনে রত থাকিতে বলিয়াছে। ইহার জন্য বর্ত্তমান পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনকে যদি ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়—অন্ধ মায়া ও আসক্তির বশে তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবে না, ধ্বংসের ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টি ইহাই গীতার আদর্শ, তাই গীতা কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া তাহার শিক্ষার সূচনা করিয়াছে। মানুষ যখন অন্ধ মায়ার বশে পুরাতন গ্লানিময় জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়—তখন বিরাট ধ্বংসলীলা আসে প্রকৃতির বিধানে—এই ভাবেই সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রের অবতারণা হইয়াছিল—ইহার ভিতর দিয়াই মানবজাতির দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের সূচনা হইবে।

মানুষের সাংসারিক জীবন এখন যে-ভাবে চলিতেছে—ইহার মধ্যে থাকিয়া মানুষ প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিবে ইহা দুরাশা—গীতা বলিয়াছে,

অনিত্যং অসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। ৯।৩৩

এই সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র, এখানে শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া মানুষ ক্রমশঃ উর্দ্ধের জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে—কিন্তু সেই উচ্চতর জীবন লাভ করিতে হইলে একদিন এই দুঃখময় অনিত্য সংসারকে নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করিতেই হইবে,

মানুষের অতি আদরে সাজান ঘরকে ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে—কারণ ইহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞান অহং ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই এই শেষ ত্যাগের অধিকারী নহে, গীতা এই চরম শিক্ষা অল্প কয়েকজন ভগবানের একান্ত ভক্ত ও প্রিয়ের জন্যই দিয়াছে—

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ১৮।৬৪

গীতার শিক্ষা মুখ্যতঃ ব্যক্তিবিশেষের জন্য, তাহা সমাজের জন্য নহে—তবে একদিন সমাজও যে মুক্ত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারে গীতা সে ইঙ্গিতও দিয়াছে, বলিয়াছে সকলেই একান্তভাবে ভগবানের ভজনা করিলে উচ্চজীবন লাভ করিতে পারে। তবে সে আশা গীতার যুগেও সুদূরপরাহত ছিল—মানুষ তখনও সমষ্টিগতভাবে অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য, সমাজকে অধ্যাত্মভাবে গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই—তাই অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমাজ ছাড়িয়া যাইতে হইত, মুনি-ঋষিগণ সংসারের কোলাহল হইতে দূরে গিয়া নিজেদের শান্তিময় আশ্রম রচনা করিতেন। তবে গীতা যে উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ দিয়াছে তাহা বৌদ্ধ বা মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের আদর্শ নহে। সন্ন্যাসীগণের আদর্শ হইতেছে সাংসারিক জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তা ও জীবনের লোপ সাধন করিয়া ব্রহ্মে লীন হওয়া বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। গীতার আদর্শ এইরূপ ব্যক্তিগত সত্তার লোপ সাধন নহে, গীতার মতে জীব হইতেছে ভগবানের সনাতন অংশ, সে কখনই লুপ্ত হয় না; তবে আমরা যাহাকে অহং বলি সেইটিই জীব নহে, সেইটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, এই "অহং"কে লুপ্ত করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই সত্তায় আমরা ভগবানের অংশ, মূলতঃ ভগবানের সহিত এবং অন্যান্য মানবের সহিত এক। এই অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে হইবে—তাহাই হইবে দিব্য অধ্যাত্ম জীবন। তখন সংসারে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে—পরস্পরের সহিত প্রেমময় শান্তিময় আনন্দময় আদানপ্রদানই হইবে সমাজজীবনের ধারা। সে জীবনে কোন ভোগ ঐশ্বর্য্যই পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইবে না, কারণ আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ এ-সবই হইতেছে ভগবানের বিভূতি—ভাগবত জীবনের মধ্যে এই সবেরই স্থান আছে—তাই গীতার শিক্ষা হইতেছে, ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্। গীতা যে সব ইঙ্গিত বহুপূর্ব্বে দিয়াছে—তদনুযায়ী সমাজের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য মানুষ ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় এতদিনে প্রস্তুত হইয়াছে।

শুদ্ধিপত্র

৩য় খণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৩	সাংখ্যেরা	অনেকেই
১২	২	কর্ম্মত্যাগরূপ	কামনাত্যাগরূপ

৪র্থ খণ্ড

১২৯	১৮	তএব	অতএব
ঐ	২৭	দুস্পরণীয়	
১৫৪	২৩	ক্রশং	শক্রং
ঐ	২৫	কানও	কোনও
১৭৩	২৪	পড়িয়া	সরিয়া
১৭৫	২৭	করিতেছেন।	করিতেছেন,
১৭৬	১২	ধীয়ো যোনঃ	ধিয়ো যো নঃ
১৯৭	২০	চলিতে	চলিতে
২০৫	৭	উচ্ছৃঙ্খলা	উচ্ছৃঙ্খলতা
২১৮	১৪	সখ	সখা
২২২	৬	এইরূপ	বাহ্য
২২৭	১২	করিয়াছিল	করিয়া ছিল
২২৮	১৭	শূদ্রোঽজায়ত	শূদ্রো অজায়ত
২৪২	১২	যান	চান
২৪৭	৭	বিকর্ম্মের;	বিকর্ম্মের

৫ম খণ্ড

২৬০	২৯	বাসন	বাসনা
২৯৬	২	১।৪।১৭	১।৪।১
ঐ	১২	১।১৬	১।১।৬
৩১৭	৫	দেখাইয়াছে। যথা,	প্রকৃত সন্ন্যাস।
ঐ	৬	প্রকৃত সন্ন্যাস।	দেখাইয়াছে। যথা,
৩৫৪	২৯	ক্ষতিরণপূ	ক্ষতিপূরণ
৩৬৬	১২	এইগুলি	অজ্ঞান
৩৭৬	২২	এ	এই
৩৭৭	১৭	কর্ম্ম-সন্ন্যাস	কর্ম্ম সন্ন্যাস

৬ষ্ঠ খণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮১	১১	মদ্‌ভাবমাগতা	মদ্‌ভাবমাগতাঃ
৪০৮	১৫	ক্ষীণ হইয়াছে।	ক্ষীণ হইয়াছে,
৩৮৮	২৮	ক্ষুদ্রোঽপি	শূদ্রোঽপি
৩৮৯	১	স্থচিভির্দেবি	শুচিভির্দেবি
৪২৭	৫	একাগ্র	একান্ত
৪৩৩	৬	প্রাপ্যান	প্রাপ্য ন
৪৪৮	১৭	সুখমঅক্ষরমশ্নতে	সুখমক্ষয়মশ্নুতে
৪৬৩	১০	ধরিব	ডরিব
ঐ	১১	ডরিব	ধরিব
৪৭০	৯	স্বরূপতঃ ও	স্বরূপতঃও
৪৭২	২১	মনের	মন
৪৭৩	২৭	উপযোগীতা	উপযোগিতা

৭ম খণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯৪	১৭	হইতেছে ঐ করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগই	করিয়া ঐ নির্ম্মল সুখ ভোগই হইতেছে
৫২৩	২	শব্দের	শব্দে
৫২৪	২৪	স্তব্ধ	শুদ্ধ
৫২৮	২০	নহেন	নহেন ;
৫২৮	২৯	কর্ম্মে	কর্ম্মের
৫৪১	১	মানুষসুখের	মানুষ সুখের
৫৪৫	২৮	সর্ব্বভূতেবর্ভাতি	সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
৫৪৯	২২	তাঁহাদের	তাহাদের
৫৭১	২৫	নিরঞ্জনং	নিরঞ্জনঃ
৫৭২	৫	অন্তঃ শরীরে	অন্তঃশরীরে
ঐ	২৪	সর্ব্বসংশয়াঃ	সর্ব্বসংশয়াঃ।
৫৮৬	২৩	সমশ্নুত	সমশ্নুতে
ঐ	২৪	কঠ, ২।৩।১৫	কঠ, ২।৩।১৪
ঐ	১৭	ভবতি,	ভবতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতাপ্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট পোঃ আঃ, কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১

অন্বয়। যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি, স সংন্যাসী চ যোগী চ—ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ।

অনুবাদ। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী,—যে ব্যক্তি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না এবং কর্ম্ম করেন না তিনি নহেন।

ব্যাখ্যা

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং। সন্ন্যাস বলিতে গীতা যে বাহ্য কর্ম্ম-সন্ন্যাস বুঝে নাই, আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসই বুঝিয়াছে, এই শ্লোকে তাহা সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আদর্শ বেদেই প্রচারিত হইয়াছিল, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে। মানুষ নিম্নপ্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অনিত্য ও দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছে—ইহাই যে মানব-জীবনের সব নয়, ইহা কেবল একটি মধ্যবর্ত্তী সাময়িক অবস্থা, এই অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিয়া মানুষকে দিব্য অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইবে—এইটিই ভারতের সনাতন শিক্ষা, বেদে ইহা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। বেদের মন্ত্র—

ঊর্ধ্বো ভব প্রতিবিধ্যাস্মদাবিষ্কৃণুষ দৈব্যান্যগ্নে। —ঋগ্বেদ ৯।৪।৫

"হে অগ্নি! উত্থিত হও, সকল আবরণ ভেদ কর, আমাদের মধ্যে দিব্য সম্পদ-সমূহ প্রকট করিয়া দাও।"

মানুষ একেবারে এই দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে না। ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়, তাহারই সুবিধার জন্য বেদে চারি আশ্রম বিভাগ করা হইয়াছিল, মানুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সনাতন আদর্শে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে ধর্ম্মানুযায়ী অর্থ ও কাম অনুসরণ করিবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ মোক্ষের জন্য, দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। কার্য্যতঃ ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা দেওয়া

হইয়াছিল। কিন্তু খুব কম লোকই শেষ পর্য্যন্ত সংসার ছাড়িয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিত। তথাপি মোক্ষকেই জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করায় ভারতবাসীর সমস্ত জীবনই অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়াছিল—বহুকাল এই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করায় জীবনকে অধ্যাত্মভাবে রূপান্তরিত করিতে ভারতে যেরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে জগতে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু মোক্ষকে উচ্চতম স্থান দেওয়ায় ভারতবাসীর সাধারণ জীবনে শৈথিল্য আসিয়াছিল। বেদে যে-সন্ন্যাসকে শেষ অবস্থা বলা হইয়াছে উপনিষদে সেইটিকেই যতশীঘ্র সম্ভব অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যখনই বৈরাগ্য উদয় হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, উপনিষদে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্‌ বা (জাবাল ৪)। কিন্তু এই ভাবে বৈদিক আদর্শের সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়ায় সাংসারিক জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে—এই আশঙ্কা করিয়া গীতা শিক্ষা দিয়াছে যে, বৈদিক আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য কাহারও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রয়োজন নাই—ফল কামনা ত্যাগ করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস—ইহার দ্বারাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা দিব্য অধ্যাত্মজীবন প্রকৃষ্টভাবে লাভ করা যায়। গীতার শিক্ষার প্রভাবে এবং সামাজিক জীবন বিকাশের জন্য জ্ঞানী মুক্ত পুরুষদের সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম ও নেতৃত্ব করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় ভারতে সন্ন্যাসাশ্রম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কলিযুগে যে-সকল বিষয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। এ-সম্বন্ধে স্মৃতিবচন নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে কলিবর্জ্য প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

অগ্নিহোত্রং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরায় সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

আবার,

সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

কিন্তু শঙ্করাচর্য্য এই বিধান অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় সন্ন্যাস আশ্রম প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং এবিষয়ে তিনি বৌদ্ধ ও জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধ মত শঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিলেও জৈন ও বৌদ্ধেরা যে সন্ন্যাসধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাই শ্রৌতস্মার্ত্ত সন্ন্যাস বলিয়া তিনি বজায় রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই সন্ন্যাসধর্ম্মই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনিই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে গীতার কিরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির উপর তাঁহার বিস্তৃত ভাষ্য তাহার একটি সুন্দর নিদর্শন।

মোক্ষলাভের দুইটি পন্থা যে প্রচলিত আছে গীতা তাহা বলিয়াছে। সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ইহাই গীতার সুস্পষ্ট অভিমত (৫।২)। শুধু তাহাই নহে, গীতা বলিল প্রকৃত যে সন্ন্যাস যাহা বেদ উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে তাহা কর্ম্মযোগের মধ্যে আছে, কর্ম্মত্যাগে নহে, যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যে যজ্ঞ করে না এবং কর্ম্ম করে না সে নহে। এখন দেখা যাউক শঙ্কর গীতার মত উড়াইয়া দিবার কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে যে কর্ম্মযোগীকেই সন্ন্যাসী বলা হইল এটা শুধু কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিবার জন্য ; কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে মানুষ সন্ন্যাসের যোগ্যতা লাভ করে, সেই জন্যই গীতা এখানে কর্ম্মযোগীকে সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মত্যাগ না করিলে কাহাকেও সন্ন্যাসী বলা যায় না। গীতা যে স্পষ্ট বলিয়াছে, ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ, "নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহে"—শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিলেন, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি ত সন্ন্যাসী বটেই, তবে কেবল তাহারাই সন্ন্যাসী নহে, কর্ম্মযোগীকেও প্রশংসার জন্য সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। এই ভাবে গীতার স্পষ্ট কথাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা সম্বন্ধে লোকমান্য তিলক বেশ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"স্মার্ত্ত কিম্বা সন্ন্যাস ধর্ম্মই যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মান্য ছিল, অন্য সমস্ত মার্গ তিনি অজ্ঞানমূলক মনে করিতেন, এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইজন্যই গীতার ভাবার্থও তাহাই হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না ; গীতার সিদ্ধান্ত তোমার মান্য না হয়, তুমি তাহা স্বীকার করিও না। কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য গীতা সন্ন্যাসকেই একমাত্র প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ মার্গ বলিয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে।"

কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। গীতা সন্ন্যাস আদর্শকে অস্বীকার করে নাই, কিন্তু গীতা যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্যরূপটিকে স্বীকার করে নাই, তাহার ভিতরের সার বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, তেমনিইই গীতা চারি আশ্রম বিভাগেরও বাহ্যরূপটি স্বীকার করে নাই, গার্হস্থ্য আশ্রম ছাড়িয়া শেষকালে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা মুক্তি বা মোক্ষ নাই—এ-মত গ্রহণ করে নাই, গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে, প্রকৃত যে সন্ন্যাস তাহা বাহিরের জিনিষ নহে। তাহা হইতেছে ভিতরের ত্যাগ, ফল কামনা ত্যাগ, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যবোধে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। তবে এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম সহজ জিনিষ নহে, অনেক সাধনা সাপেক্ষ। অনেকেই সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া থাকিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিয়া মনে করেন কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন—এবং তাহাই

গীতার শিক্ষা। কিন্তু তাঁহারা যদি সততার সহিত নিজেদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বস্তুতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতার বশে, আসক্তির বশেই সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন, কর্ত্তব্য বোধে নহে। "আমার" ছেলে "আমার" স্ত্রী—"আমি" কর্ম্ম করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিব—এই ভাব লইয়াই লোকে কর্ম্ম করে এবং তাহাতে তাহাদের অহং তৃপ্তি লাভ করে—এইরূপ কর্ম্ম অজ্ঞানমূলক, ইহা প্রকৃত কর্ম্মযোগ নহে। কারণ "আমি কর্ম্ম করি" ইহা অজ্ঞান, আর আমি আমার কর্ম্মের দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি, কোন ফল লাভ করিতে পারি ইহাও অজ্ঞান। সংসারে লোকে পদে পদে ব্যর্থকাম হইয়াও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে না। এক বিশ্বশক্তি সংসারে সকল কাজ করিয়া যাইতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত বাসনা কামনা দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না—এই জ্ঞান যখন আমাদের হইবে তখনই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম না করিয়া, মমতা বা আসক্তির বশে কর্ম্ম না করিয়া নিজদিগকে সেই বিশ্বশক্তির সজ্ঞান যন্ত্র করিয়া দিব, এবং ইহাই গীতার শিক্ষা।

কিন্তু সাধনার প্রথম অবস্থাতেই "আমি করিতেছি" এই অহংভাব দূর হয় না। তখন "আমার জন্য" "আমার বাসনা কামনা তৃপ্তির জন্য" "আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য" কর্ম্ম করিতেছি এই ভাব না রাখিয়া "যাহা আমার কার্য্য, কর্ত্তব্য তাহাই করিতেছি" এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগের আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ অহংভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া কর্ম্মযোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু কোন্‌টা আমার কার্য্য, আমার কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিব কেমন করিয়া? গীতার ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ কার্য্য বা কর্ত্তব্য বলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই বুঝিয়াছেন—আপন আপন বর্ণের বিহিত কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু গীতা এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করে নাই। গীতার মতে, যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাই কার্য্য, কর্ত্তব্য। ভগবান আমাদের নিকট যে কর্ম্ম চান তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে, তাহাই আমাদের কার্য্য, কর্ত্তব্য। যোগ-সাধনার দ্বারা ভগবানের সহিত আমাদের এরূপ সাক্ষাৎ নিবিড় সজ্ঞান সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যে, কোন্‌টা করিতে হইবে, না হইবে, সে-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা হৃদিস্থিত হৃষীকেশের নিকট হইতেই লাভ করিতে পারি—অর্জ্জুন যেমন তাঁহার সারথিরূপে অবতীর্ণ ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ লাভ করিয়াছিলেন আমরাও তেমনি আমাদের হৃদয়-রথে চিরসারথিরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লাভ করিতে পারি। কিন্তু ইহা বহু সাধনা সাপেক্ষ—অন্তর হইতে সমস্ত আসক্তি দূর

করিয়া দিতে হয়, নতুবা অজ্ঞান ও মায়ার বশে যেটা আমাদের ভাল মনে হইবে সেইটিকেই আমরা ভগবানের নির্দ্দেশ বলিয়া ভুল করিব। যতদিন না একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতেছে ততদিন নিজেদের বুদ্ধি বিচারের দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়, এবং এইরূপ বিচারে শাস্ত্র আমাদের সহায় হয় (১৬।২৪)

"কার্য্যং কর্ম্ম" বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কলিকালে অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। অনেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি প্রভৃতি বর্ণের যাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম তাহাই কার্য্য বা কর্ত্তব্য এবং সেইরূপ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিলেই পরম গতি লাভ করা যায়। কিন্তু কলিযুগে সেই প্রাচীন বর্ণ বিভাগও বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে —সমাজের অবস্থা অনুসারে সকল জাতির লোককেই সকল জাতির কর্ম্ম করিতে হইতেছে—তাহা হইলে কোনটা কাহার কার্য্য বা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারিত হইবে কেমন করিয়া? বস্তুতঃ কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে না হইবে গীতা তাহার উপর দৃষ্টি দেয় নাই, যে কর্ম্মই কর না কেন ভিতরে কি ভাব লইয়া করিতে হইবে গীতা সেইটিকেই মূল প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া ধরিয়াছে এবং এই ভাবেই গীতার শিক্ষা হইয়াছে সকল দেশ, সকল সমাজ, সকল কালের উপযোগী। ব্রাহ্মণ যদি দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার প্রেরণা পায়, ক্ষত্রিয় যদি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে কৃষি বা বাণিজ্য করিবার প্রেরণা পায় এবং সেই কার্য্য তাহাদের জন্মগত প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুযায়ী হয়—গীতার মতে তাহাই হইবে কার্য্যং কর্ম্ম। আর কোন ব্যক্তিগত বাসনার বশে সে কর্ম্ম না করিয়া ভগবানের আরাধনারূপে, যজ্ঞরূপে সে কর্ম্ম যদি করা যায়, ফল যাহাই হউক সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া কর্ম্মটি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় সেই প্রযত্ন করা হয়—তাহা হইলে গীতার মতে তাহাই হয় কর্ম্মযোগ।

যে যে-বংশে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সাধারণতঃ সেই বংশ বা জাতির কর্ম্মে সে আকৃষ্ট বা আসক্ত হয়, সেই কর্ম্মটি ভাল লাগে, তাহার দ্বারা তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ হয় তাই সে সেই কর্ম্মটি উৎসাহের সহিত করে। অনেকে বলেন, এইভাবে আপন আপন জাতিগত কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ এবং শুধু ইহার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে গীতার কর্ম্মযোগের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। ঐ ভাবে কর্ম্ম করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ বা সমাজের সেবা করা তামসিকতা অপেক্ষা ভাল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু উহার দ্বারাই অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ হইবে, ভগবান লাভ হইবে, ইহা দুরাশা। সিদ্ধিলাভ

করিতে হইলে জ্ঞান প্রয়োজন এবং সেজন্য ঐরূপ কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা প্রয়োজন—শঙ্করাচার্য্যের এই মত যে গীতারও প্রকৃত শিক্ষা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শঙ্কর কাম্য কর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, গীতা কামনা পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্মই করিতে বলিয়াছে। কিন্তু কামনা পরিত্যাগ সহজ নহে, স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিতে করিতে কামনা ত্যাগ হইবে, ইহা আত্ম-প্রতারণা। * যে-ব্যক্তি সকল সংসার বন্ধন, সমাজ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেবল তিনিই কামনা হইতে মুক্ত হইতে পারেন এবং তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। ত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ, ভগবান লাভ অসম্ভব—

ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ (কৈবল্য উপনিষদ—১, ২, নারায়ণ উপনিষদ ১২, ৩, ৭৮) কর্ম্মের দ্বারা অথবা সন্তান সন্ততির দ্বারা অথবা ধনের দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্জ্জন করা যায়। তবে শঙ্কর কর্ম্ম ও সংসার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, গীতা ভিতরে ত্যাগের সহিত সংসার ও সকল কর্ম্মই করিতে বলিয়াছে। প্রথমে ত্যাগ চাই তারপর সেই ত্যাগের ভিত্তিতে ভোগ—তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়াই মানুষ অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এবং এ-বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা গীতার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেন,

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ (১৮।৪৫)। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রথমতঃ গীতা স্বকর্ম্ম বলিতে জাতিগত কর্ম্ম বুঝে নাই, সহজ কর্ম্ম, স্বভাবনিয়ত কর্ম্মই বুঝিয়াছে (১৮।৪৭, ৪৮)। যে যেরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তদনুযায়ী কর্ম্মই তাহার স্বকর্ম্ম, স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও লোকে যে ব্রাহ্মণের স্বভাব পায় না, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, এমনকি শূদ্রের স্বভাব ও প্রকৃতিই পাইয়া থাকে—সংসারে এইরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই গীতা বাহ্য জাতিবিভাগের উপর দৃষ্টি না দিয়া প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ-স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সেই কর্ম্মের দ্বারাই যে মানুষ সিদ্ধিলাভ করিবে তাহাও গীতার মন্তব্য নহে। কি ভাবে স্বকর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় গীতা সঙ্গে সঙ্গে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছে,

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৫,৪৬

যদি মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লইয়া ভগবানের উপাসনারূপে যজ্ঞরূপে

কর্ম্ম করে কেবল তাহা হইলেই সেই কর্ম্মের দ্বারা সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, কারণ তাহার দ্বারা তাহার সমস্ত জীবনই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন, জানিতে হইবে যে, ভগবান সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বিরাজিত রহিয়াছেন, মানুষের সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছে। এই ভগবদ্জ্ঞান সহজলভ্য নহে, ইহার জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া অনেক সাধনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই অন্তর হইতে সকল বাসনা, কামনা, আসক্তি নির্ম্মূল করিতে হইবে, কারণ এই কামনা হইতেছে জ্ঞানের চিরশত্রু (৩।৩৯)।

এই কামনাকে নির্ম্মূল করিবার জন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ আমাদের জীবনের অধিকাংশই হইতেছে কর্ম্ম, এবং কামনা লইয়া কর্ম্ম করাই মানুষের অভ্যাস। কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলেই মানুষ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়, তাহার সমস্ত প্রকৃতি, চরিত্র, চৈতন্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জীবনই রূপান্তরিত হইয়া যায়—এই জন্যই গীতা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সকল কর্ম্মই নিষ্কামভাবে করিবার উপর এত জোর দিয়াছে। কি কর্ম্ম করিতে হইবে না হইবে তাহার উপর গীতার জোর নাই—তোমার স্বভাব অনুযায়ী, তোমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তোমার যে কর্ম্ম ভাল মনে হয় তাহাই করিতে পার, তাহাই তোমার কার্য্য, কর্ম্ম। কিন্তু যে কর্ম্মই করিতে হউক না কেন, সেইটি নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

সংসারের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস করা সুকঠিন। কারণ মানুষ এখন যে ভাবে সংসার করিতেছে ইহা হইতেছে অজ্ঞানের সংসার, মায়ার সংসার। ইহার মূলে রহিয়াছে "আমি" "আমার" ভাব এবং আসক্তি। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের বিষাদে ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুন বর্ণাশ্রমোচিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই পালন করিতেন, তিনি ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয়বীর, কিন্তু তিনি অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আত্মীয়স্বজনকে বধ করিতে হইবে দেখিয়া তিনি মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ভগবদ্নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, ঐ সব দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে, নিজ হস্তে সকল স্নেহের বন্ধন, সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, তবেই সে অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভের যোগ্য হইবে।

অতএব সংসারে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়া নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের স্বার্থের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেই মানুষ অধ্যাত্মসিদ্ধিলাভ করিবে, ভগবানকে লাভ করিবে—ইহা আত্ম-প্রতারণা

চাই ত্যাগ; নিজের যশ মান প্রতিপত্তির জন্য, অথবা পরিবারবর্গের বা দেশের বা জগতের স্বার্থসিদ্ধির কামনা লইয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনেরই সৃষ্টি করিবে। কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, যতক্ষণ ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে সে নির্দ্দেশ লাভ করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ গুরুর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত কর্ম্ম করিতে হইবে—তবেই প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস হইবে।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ। নিষ্কামভাবে যিনি কর্ম্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই। গীতার ব্যাখ্যাকারেরা শঙ্করের অনুসরণ করিয়া এখানে সন্ন্যাসী ও যোগীর লক্ষণের প্রভেদ করিয়াছেন। যিনি ত্যাগ করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসী এবং পাতঞ্জল সূত্র অনুযায়ী যাহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, চিত্তের সকল বিক্ষেপ দূর হইয়াছে তিনিই যোগী। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে এই দুই অবস্থাই লাভ করা যায় সেইজন্যই এখানে গীতা নিষ্কাম কর্ম্মীকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত এবং গীতার স্পষ্ট উদ্দেশ্যের বিরোধী। প্রথমতঃ গীতা যোগ বলিতে পাতঞ্জলের যোগ বুঝে নাই, যদিও চিত্তবিক্ষেপকে শান্ত করিবার জন্য এবং ইন্দ্রিয়সংযম করিবার জন্য পাতঞ্জল-বর্ণিত রাজযোগ প্রক্রিয়ার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। গীতা এখানে যোগ বলিতে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্, এবং বলিয়াছে যে, ফলকামনা ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই যোগী এবং তাঁহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ সন্ন্যাসের অর্থ ত্যাগ, কিন্তু যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, যিনি এই সব কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, পরন্তু ফলকামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, অতএব সন্ন্যাসী ও যোগী এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদই নাই।

কিন্তু শঙ্করাদি সন্ন্যাসীগণের মত এই যে, বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে সন্ন্যাসী হইতেই পারে না। তাই তাঁহারা নিজেদের মনের মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী নহে, তবে সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা সে ভাল এবং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ সন্ন্যাসের যোগ্যতা লাভ করে সেই জন্যই প্রশংসার জন্য এখানে কর্ম্মযোগীকে সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে। এই ভাবে তাঁহারা গীতার মূল শিক্ষাটিকেই বিকৃত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর যুক্তি দিয়াছেন, "নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী ইহা শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, ভগবান ইহা প্রতিষেধ করিতেছেন ইহা সম্ভবপর নহে, এই প্রকার নিষেধ করিলে, তাহা তাঁহার নিজের বচনের সহিতই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।" ইহার উত্তর এই যে, গীতা বেদাদি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে নাই,

তবে শঙ্কর সেই শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা গীতার অভিমত নহে, প্রকৃত সন্ন্যাস বলিতে কি বুঝায় গীতা এখানে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং এই ব্যাখার সহিত গীতার অন্য কোন বচনের বিরুদ্ধতা আছে এমন কেহই দেখাইতে পারিবেন না।

ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহে, গীতার এই স্পষ্ট কথাকে বিকৃত করিবার অনেক প্রায়াস হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয় হইলেই সন্নাসী হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে জ্ঞান, সংযম ইত্যাদি থাকা চাই। শঙ্কর বলিয়াছেন নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি ত সন্ন্যাসী বটেনই, তবে শুধু তাঁহারাই সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত হন না, কর্ম্মযোগীকেও প্রশংসা করিবার জন্য সন্ন্যাসী বলা হইয়া থাকে। রামানুজ বলিয়াছেন নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি শুধু সন্ন্যাসী, তিনি যোগী নহেন—পরন্তু যিনি ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনি একাধারে সন্ন্যাসী এবং যোগী। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি গীতা সন্ন্যাসী ও যোগীর মধ্যে কোন প্রভেদ করে নাই—পরের শ্লোকেই সেটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে। ভিতরের ত্যাগই যে সন্ন্যাসের মূল কথা, বাহিরের কর্ম্মত্যাগ নহে তাহা বুঝাইবার জন্যই গীতা এখানে বলিল, নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি সন্নাসী নহে। সন্নাসের অর্থ হইতেছে সংকল্প সন্ন্যাস, কামনা ত্যাগ—বাহিরের কর্ম্ম-ত্যাগের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—কর্ম্মযোগীর মধ্যে যখন সেই ভিতরের ত্যাগ আছে তখন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। যিনি কর্ম্মত্যাগী তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যে প্রথা আছে গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই—তবে গীতা এই আদর্শ প্রচারের বিরোধী কারণ কর্ম্ম করিতে করিতে ভিতরে ত্যাগ অভ্যাস করাই দেহধারী মানবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দমন করিতে যাইলে অনেক দুঃখ পাইতে হয় এবং সে দুস্কর সাধনায় যে ব্রহ্মকে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র লাভ করা যায় তাহাও নহে (৫।৬)। নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহে, গীতার এই কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া মধুসূদন সরস্বতী এই স্থানটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নিষ্কাম কর্ম্মী নিরগ্নি নহেন, অক্রিয়ও নহেন, তথাপি তাঁহার মুখ্য সন্ন্যাস অবশ্যই হইবে সেই জন্যই তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মী যে অক্রিয় নহেন তাহা ত বলাই বাহুল্য, গীতা এখানে এমন একটা নিরর্থক কথা বলিতে যাইবে কেন? বস্তুত মধুসূদন নিজেও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া আর একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্মীকে নিরগ্নি ও অক্রিয় সন্ন্যাসী না বলিয়া সাগ্নি ও সক্রিয় সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইভাবে নানা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া সন্ন্যাসীগণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে নিরগ্নি ও

অক্রিয় ব্যক্তিই মুখ্য ও প্রকৃত সন্ন্যাসী—অথচ ইহা হইতেছে গীতার স্পষ্ট কথার বিপরীত!

"নিরগ্নি" ও "অক্রিয়" এই দুইটি কথা ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। "অক্রিয়" শব্দের অর্থ যিনি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন—তাহা হইলে তিনি ত অগ্নিসাধ্য বৈদিক যজ্ঞাদিও ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব তিনি নিরগ্নি—তাহা হইলে স্বতন্ত্রভাবে নিরগ্নি শব্দটি উল্লেখ করা হইল কেন? মধুসূদন সরস্বতী গীতার কোন কথাই অব্যাখ্যাত, কোন সন্দেহই অমীমাংসিত রাখিবেন না—এই সঙ্কল্প লইয়াই গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাই সন্দেহস্থলে তিনি একাধিক ব্যাখ্যা দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই—ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু গীতার সঠিক শিক্ষাটি বুঝিতে সর্ব্বত্র বিশেষ সাহায্য হয় না। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অগ্নিকে সকল কর্ম্মের জ্ঞাপক বলিয়া নিরগ্নি শব্দের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসী বুঝিতে হইবে, আর ক্রিয়া শব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তি উপলক্ষিত হইয়াছে বুঝিয়া অক্রিয় শব্দে "যিনি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়াছেন তাদৃশ যোগী" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মী নিরগ্নি সন্ন্যাসী নহেন, অক্রিয় যোগী নহেন, তিনি সাগ্নি সন্ন্যাসী এবং সক্রিয় যোগী—অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন তবে তিনি সেজন্য প্রস্তুত হইতেছেন; নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিতেছেন বলিয়া প্রশংসা স্বরূপ তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলা যায়। ইহাই মধুসূদনের ব্যাখ্যা!

গীতা ক্রিয়া শব্দে শুধু চিত্তবৃত্তি বুঝিয়াছে, বাহ্য কর্ম্ম বুঝে নাই—ইহা কষ্ট কল্পনা, তাহা ছাড়া গীতা যোগ শব্দে চিত্তবৃত্তি নিরোধও বুঝে নাই। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কর্ম্মের সাধন অগ্নিত্রয় যাঁহার নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মসাধন অগ্নিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে নিরগ্নি বলা যায়। অগ্নিদ্বারা যাহাদের সাধন না হয়, এই প্রকার তপঃ দান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যিনি না করেন তাঁহাকে অক্রিয় বলা যায়।" কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সঙ্গত নহে—কারণ ক্রিয়া শব্দে শুধু দান ও তপঃ বুঝায় না, যজ্ঞও বুঝায়, যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম। গীতা বলিয়াছে এই সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ত্যাগ উচিত নহে (১৮।৭), অতএব যিনি এই সব কর্ম্ম ত্যাগ করেন তিনি সন্ন্যাসী নহেন। কিন্তু অক্রিয় শব্দের দ্বারাই ত সকল কর্ম্মের ত্যাগ বুঝায়, তাহা হইলে গীতা আবার নিরগ্নি শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করিল কেন?

সন্ন্যাসী হইতে হইলে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিতে হয় বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত এই মতেরই প্রতিবাদ করিতে গীতা এখানে সাধারণভাবে "অক্রিয়" কথাটি ছাড়াও

বিশেষভাবে "নিরগ্নি" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে—কারণ অগ্নিরক্ষা হইতেছে গার্হস্থ্য আশ্রমের বিশিষ্ট লক্ষণ। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শেষে সমাবর্ত্তনের পর গৃহস্থ হইয়া শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাকে যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিতে হয়। পরে যে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা এই আহিত অগ্নিতেই করিতে হয়। কর্ম্ম বলিতে উপনিষদে সাধারণতঃ এই সকল শ্রৌত কর্ম্মই বুঝাইত, এবং এই কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করা বিধেয় কিনা ইহা লইয়া যে মতভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইতেই পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এই দুইটি বিখ্যাত মতবাদের সৃষ্টি হয়। গীতা এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় করিয়া বলিয়াছে যে, জ্ঞানের জন্য ত্যাগ বা সন্ন্যাস অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তাহা বাহিরের ত্যাগ নহে, ভিতরের ত্যাগ, বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ।

গৃহস্থাশ্রমে অগ্নি রাখিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হয়; কিন্তু যে সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে উহার এই প্রকার অগ্নি রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে সে "নিরগ্নি" হইয়া যায়, তবে সে ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে, (মনুঃ ৬।২৫ ইত্যাদি) সেজন্য সে "অক্রিয়" নহে। গীতা স্পষ্ট বলিল যে, সন্ন্যাসী হইতে হইলে এরূপ "নিরগ্নি" হইবার প্রয়োজন নাই। এখানে গীতা স্পষ্টভাবেই মনুস্মৃতির বিরোধিতা করিয়াছে। শঙ্কর এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন যে, স্মৃতিতে যাহা আছে তাহা ত শ্রুতিরই অনুযায়ী, গীতায় ভগবান শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কথা বলিবেন ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই যে, প্রচলিত মনুস্মৃতি মনুর দ্বারা কথিত বা রচিত এ কথা গীতা স্বীকার করে নাই। বেদে অবশ্য উক্ত হইয়াছে যে, যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২-২-৪-২); মৈত্রায়ণীয় সংহিতা ১-১-৫ ; কথাকা ১১-৫ ; তণ্ড্য ব্রাহ্মণ ২৩-১৬-৭)—"মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধতুল্য"। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ—তাঁহাদের কৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২-১-১৬ ; ২-১-২) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মনু পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, মনু যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কালবশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৪।১, ২); ভগবান গীতাতেই সেই মনুর শিক্ষা প্রচার করিতেছেন—অতএব গীতাতেই ভেষজতুল্য মনুর বচন পাওয়া যায়, প্রচলিত মনুসংহিতাতে নহে।

গীতা বলিয়াছে, নিরগ্নি ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, ইহা হইতে বুঝা ভুল হইবে যে গীতা বৈদিক অগ্নিসাধ্য যাগযজ্ঞাদিরই সমর্থন করিতেছে। গীতা কেবল সন্ন্যাস

আশ্রমের অনুপযোগিতা বর্ণনা করিবার জন্য নিরগ্নি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। বস্তুতঃ গীতা ক্রিয়াবিশেষবহুল বৈদিক যাগযজ্ঞাদির নিন্দাই করিয়াছে (২।৪২-৪৫)। গীতা বেদের নিন্দা করে নাই, পরন্তু লোকে সাধারণতঃ বেদের যে অর্থ করে সেইটিকেই বেদবাদ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে; গীতার মতে প্রকৃত যজ্ঞের অগ্নি ভিতরের জিনিষ, বাহিরের অগ্নি নহে। ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্—ইহাই বেদের নিগূঢ় শিক্ষা। বেদ ভারতে চিরপূজিত হইলেও ভারতবাসী বস্তুতঃ আর বেদের শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, বেদের শিক্ষা বেদের অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বেদের নাম দিয়া নানা আধুনিক শাস্ত্রই গ্রাহ্য হইয়াছে এবং এই ভাবে সনাতন ধর্ম্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে। এই গ্লানি দূর করিবার জন্যই গীতায় ভগবান প্রকৃত বেদের শিক্ষা পুনরায় প্রচার করিলেন এবং তিনিই যে প্রকৃত বেদের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাহা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ অহমেব বেদ্যঃ বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্। অতএব গীতায় ভগবান বেদবিরোধী কথা বলিতেছেন এরূপ আপত্তি তোলা সঙ্গত নহে; যদি কোথাও এইরূপ বিরোধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বেদের অর্থ বুঝিতেই আমাদের ভুল হইতেছে, গীতার সহিত মিলাইয়া বেদের যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত বেদের শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান গীতাতে বেদের চরম ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমানে হিন্দুর পক্ষে গীতাই হইতেছে বেদ-তুল্য। প্রচলিত বৈদিক ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই বুঝায়, বড় জোর গৃহ্যসূত্রে বিহিত কর্ম্মও কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু গীতা কর্ম্ম শব্দকে এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে নাই, গীতা কর্ম্ম বলিতে সকল কর্ম্মই বুঝিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি; আর কর্ম্ম যজ্ঞে বা কর্ম্মযোগে পরিণত হয় বাহ্যিক কোন শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া নহে পরন্তু ভিতরে সকল কামনা, আসক্তি বর্জ্জন করিয়া এবং ভগবানে সকল কর্ম্ম উৎসর্গ করিয়া। ভিতর হইতে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে, নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে (১৮।৭), গীতা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত এই কথা বলিয়াছে, কিন্তু শঙ্করাদি সন্ন্যাসিগণের স্বকপোলকল্পিত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যার ফলে গীতার এই শিক্ষা আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

অন্বয়। হে পাণ্ডব! যং সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ যোগং তং বিদ্ধি, হি অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি।

অনুবাদ। হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, জানিবে যে যোগ তাহাই ; কারণ সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হয় না।

ব্যাখ্যা

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ। এখানে যোগ শব্দে গীতা বুঝিয়াছে কর্ম্মযোগ, কিন্তু কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানিবে—গীতার এই স্পষ্ট কথা শঙ্কর গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে বস্তুতঃ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস কখনও এক হইতে পারে না, তবে উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া কর্ম্মযোগকে গৌণভাবে সন্ন্যাস বলা হইয়াছে। যিনি নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহার "এই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব গৌণ, মুখ্য সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব এ স্থলের অভিপ্রেত নহে।" পরমার্থ সন্ন্যাসী কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল-কামনা ত্যাগ করেন, নিষ্কাম কর্ম্মী ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন। উভয়ের মধ্যেই ফল-কামনা ত্যাগ রহিয়াছে, এই সাদৃশ্য থাকার জন্য কর্ম্মযোগের স্তুতি করিতে এখানে গীতা সেইটিকে সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

কিন্তু গীতার এই শ্লোকটির সহজ অর্থ হইতেছে এই যে, যাহার মধ্যে সন্ন্যাস আছে তাহাকেই সন্ন্যাসী বলা হয়, কর্ম্মযোগীর মধ্যে সন্ন্যাস রহিয়াছে, সঙ্কল্পের সন্ন্যাস না করিলে কেহ কর্ম্মযোগী হয় না—অতএব কর্ম্মযোগকেও সন্ন্যাস বলিয়াই জানিতে হইবে—ইহাই গীতার মত, গীতা এখানে মুখ্য ও গৌণ সন্ন্যাসের কোন প্রভেদই করে নাই, কর্ম্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী এই কথা বলাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোকের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে সন্ন্যাসীরাও কর্ম্ম করেন, দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে কর্ম্মযোগীরাও সন্ন্যাস করেন। সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগীর মধ্যে সাধারণতঃ যে প্রভেদ করা হয়, সেটি সমীচীন নহে ইহা বলাই গীতার উদ্দেশ্য, কিন্তু কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা সেই প্রভেদের উপরেই জোর দিয়া শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ গীতার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম্মীকে কেন যোগী বলা হয় তাহার কারণ দেখাইতে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা ধ্যানযোগের যোগ্যতা লাভ করা যায় এবং সঙ্কল্প ত্যাগ করায় চিত্তবিক্ষেপের হেতু বিদূরিত হয় বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মীকে গৌণভাবে যোগী বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মী কখনও যোগী বা সন্ন্যাসী নহে—"শ্রুতি স্মৃতি এবং যোগশাস্ত্রে নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিরই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব প্রসিদ্ধ আছে; সাগ্নিক ও সক্রিয় ব্যক্তির সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব অপ্রসিদ্ধ"। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গীতা শ্রুতি স্মৃতির এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নাই—শঙ্কর জোর করিয়া উহা চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

শঙ্করের অনুসরণে গীতার ব্যাখ্যাকারগণ এখানে যোগ শব্দে পাতঞ্জল বর্ণিত চিত্তবৃত্তি নিরোধই বুঝিয়াছেন। এইরূপ নিরোধ বা সমাধির জন্য শেষ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতা যোগ বলিতে পতঞ্জলির যোগ বা সমাধি বুঝে নাই—এইটি না বুঝিয়া ব্যাখ্যাকারগণ গীতার ব্যাখ্যায় অনেক গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতা যোগ বলিতে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে। অবশ্য গীতার যোগ শুধু কর্ম্মযোগ নহে, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি সমান ভাবেই স্থান পাইয়াছে—কিন্তু গীতা তাহা পরে পরিস্ফুট করিবে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা যোগের কর্ম্মের দিকটাই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে এবং স্পষ্টভাবেই যোগকে কর্ম্মযোগ নামে অভিহিত করিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন সন্ন্যাস ও যোগ এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় জানিতে চাহিলেন—তাহার উত্তরে ভগবান বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই শ্রেয় লাভ করা যায়। অর্জ্জুন যোগ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে ভগবান কর্ম্মযোগ শব্দটি ব্যবহার করিয়া জানাইয়া দিলেন যে যোগ বলিতে তিনি কর্ম্মযোগই বুঝেন, পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা সমাধি নহে। ব্রহ্মের সহিত বা ভগবনের সহিত যুক্ত হওয়াই গীতার মতে প্রকৃত যোগ—যজ্ঞরূপে সম্পাদিত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মানুষ ভগবানের সহিত যুক্ত হয় সেই জন্যই উহা কর্ম্মযোগ নামে অভিহিত। এবং ইহার মধ্যে যখন সন্ন্যাস রহিয়াছে, সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাস, তখন ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। যাহারা যোগ শব্দে পাতঞ্জলের যোগ বুঝেন, তাহারা সন্ন্যাসী ও যোগী এতদুভয়ের প্রভেদ করেন। যাহারা বেদান্তের অনুসরণ করেন তাহারাই সন্ন্যাসী এবং যাহারা পাতঞ্জল যোগদর্শনের অনুসরণ করেন তাহারাই যোগী। বশিষ্ঠ বলেন—"যোগ ও জ্ঞান ভেদে চিত্তনাশের দুইটি উপায়। বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ এবং সম্যগবেক্ষণ বা বিচারের নাম জ্ঞান। কাহারও পক্ষে যোগ সম্ভব এবং কাহারও পক্ষে তত্ত্বনিশ্চয় সম্ভব বলিয়া পরম শিব এই দুইটিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন।" কেহ কেহ মনে করেন যে এই দুইটি পন্থা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ—কারণ যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের অনুসরণ করিয়া জগতের পরমার্থতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসীগণ যে বেদান্তমতের অনুসরণ করেন তদনুসারে জগৎ সত্য নহে, মিথ্যা। তবে তত্ত্ব বিষয়ে এইরূপ মূলগত প্রভেদ থাকিলেও—সাধনায় কার্য্যতঃ এই দুইটি পন্থা পরস্পরের সহায় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কারণ যোগদর্শনে যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তত্ত্ববিচারের দ্বারা মন তাহার জন্য প্রস্তুত হয়, আবার যোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে শান্ত করিলে তাহাতে তত্ত্ববিচারে সহায়তা হয়। যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালীর

দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়া তত্ত্বমসি, সোঽহম্ প্রভৃতি বেদবাক্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে অবগত হইতে হয়—জ্ঞানযোগ বলিতে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায় এবং আচার্য্য শঙ্করও এইরূপ জ্ঞানযোগকেই প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম বলিয়াছেন। "শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যন্তরে আত্মার উপলব্ধি করিবে" এই জাতীয় শ্রুতির আদেশ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য শমদমাদিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধনবিশেষ বলিয়াছেন—অতএব তাঁহার মতে সমাধি বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ব্রহ্মবিচারণার পূর্ব্ববৃত্ত। অন্যপক্ষে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিষয়ে কতক মানসিক সংস্কার থাকিলে যোগসাধনার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে অনেক সহায়তা হয় —এই ভাবে সনৎসুজাত সন্ন্যাস (বা জ্ঞানমার্গ) ও যোগমার্গের সমন্বয় করিয়াছেন।

গীতার সমন্বয় আরও উদার ও ব্যাপক। গীতা সাংখ্য বলিতে সন্ন্যাস বা জ্ঞানমার্গই বুঝিয়াছে, কিন্তু যোগ বলিতে পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা সমাধি বুঝে নাই—তবে গীতা ইহাকে যোগের একটি সাধন বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। গীতার মতে যোগ হইতেছে প্রথমতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়, পরে জ্ঞান ও কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় এবং এই ত্রয়ী সাধনার দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া। প্রথমে গীতা ফলকামনাকে দূর করিয়া কর্ম্ম করিবার উপরেই জোর দিয়াছে। যাহার যেমন প্রবৃত্তি বা স্বভাব কেহ জ্ঞানবিচারের পথ ধরিয়া, কেহ বা কর্ম্মের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যখন সাধক নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন তখন তিনিই হন একাধারে প্রকৃত যোগী এবং জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী।

গীতা বলিয়াছে "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহু"—অর্থাৎ যাহাকে তাঁহারা সন্ন্যাস বলেন। কাহারা বলেন? শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন, গীতা এখানে শ্রুতিকেই লক্ষ্য করিয়াছে এবং মধুসূদন সরস্বতী বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২)—জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুত্রকামনা, বিত্ত কামনা এবং স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। উপনিষদের যে অংশে এই বাক্যটি আছে তাহার সমুদয়টি তুলিয়া না দিয়া কতকটুকু তুলিয়া দেওয়ায় মনে হইতে পারে যে উপনিষদ বুঝি সন্ন্যাসগ্রহণের বিধান দিতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে—উপনিষদ উহার পূর্ব্বেই বলিয়াছে—

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। অর্থাৎ

"ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া আত্মাকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, যজ্ঞ, দান ও অনাশক তপস্যার দ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হইয়া লোকে মুনি হয়; এই আত্মতত্ত্ব লাভের জন্যই সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" এখানে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপনিষদ বেদের উপরেই নির্ভর করিয়াছে, বেদানুবচনেন, এবং বেদে যে কর্ম্মের বিধি আছে তাহাকেই আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়াছে। বেদে যে কর্ম্মের উপর, ইহজীবনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল বৃহদারণ্যকের ন্যায় প্রাচীন উপনিষদে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। অন্য পক্ষে বেদ যে শুধু বাহ্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেরই শাস্ত্র নহে, বেদ হইতে লোক আত্মজ্ঞানলাভের প্রেরণা পায় এবং বেদোক্ত সাধনার দ্বারা মানুষ ব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুনি হয় তাহাও বলা হইয়াছে। সেই সঙ্গে যে সন্ন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে সেটা বিধি হিসাবে নহে—উপনিষদ এমন কথা বলে নাই যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই হইবে—কেবল আত্মজ্ঞানের মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন লোক সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, প্রব্রজন্তি, ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। কিন্তু সন্ন্যাসের যে মূল কথা তাহা সংসার ত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ নহে, তাহা হইতেছে কামনা ত্যাগ, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ—যিনি এইরূপ কামনা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার কর্ম্ম করিলেও কোন ক্ষতি হয় না, না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না—নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ। গীতাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছে, নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন (৩।১৮)। তবে গীতা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম করা বা না করায় তাহার নিজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না থাকিলেও তাহার কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য কারণ তাহার দ্বারা লোকশিক্ষা হয়, জগতের হিতসাধন করা হয়—আর ভগবান যখন নিজে জগৎ হিতের জন্য কর্ম্ম করেন তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্ণভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন তিনিও জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই করিবেন। যে ব্যক্তি পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ কোন কিছু কামনা না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী—গীতার এই মতের ভিত্তি বেদ ও উপনিষদের মধ্যেই রহিয়াছে।

যোগং তং বিদ্ধি। গীতার উদ্দেশ্য হইতেছে যোগ ও সন্ন্যাসের সমন্বয় করা, কিন্তু গীতার ব্যাখ্যাকারগণ এই দুইটির প্রভেদের উপরেই জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাস ও যোগ বিভিন্ন জিনিষ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গীতা বলিয়াছে "যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই যোগ বলিয়া

জানিবে।" মধুসূদন সরস্বতী যোগ শব্দে পাতঞ্জলের রাজযোগ বুঝিয়া তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ—বৃত্তি আবার প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে। যথা, বিপর্য্যয় অথবা মিথ্যাজ্ঞান পাঁচ প্রকার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। "এই প্রকারের যে সকল চিত্তবৃত্তি আছে সেইগুলির সমস্তেরই যদি নিরোধ হয় তবে তাহাকে 'যোগ' অথবা সমাধি বলা হয়। আর রাগ নামক যে ফলসঙ্কল্প অর্থাৎ ফল কামনা তাহা বিপর্য্যয়েরই তৃতীয় ভেদ বিশেষ; কেবলমাত্র তাহারই যে নিরোধ তাহাকেও গৌণীবৃত্তি অনুসারে যোগ অথবা সন্ন্যাস বলা হয়।" অর্থাৎ সকল বৃত্তির নিরোধ না হইলে যোগী হয় না, তবে যাহারা মাত্র রাগরূপ বৃত্তি বিশেষের নিরোধ করিয়াছেন তাহাদিগকেও গৌণভাবে যোগী বলা যাইতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্মী ফল কামনা ত্যাগ করেন, অতএব তাঁহাকে গৌণভাবে যোগী বলা যায়। তেমনই সন্ন্যাসী হইতে হইলে সব কিছু ত্যাগ করিতে হয়, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, সাংসারিক জীবন সব ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্মী এরূপ ত্যাগী নহেন, অতএব তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, তবে তাহার মধ্যেও কিছু ত্যাগ রহিয়াছে। ফল কামনা ত্যাগ—তাই গৌণভাবে তাহাকে সন্ন্যাসীও বলা যায়।

কিন্তু ইহা অতি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা, গীতা নিষ্কামকর্ম্মীকে প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়াছে, গৌণভাবে নহে—নিষ্কাম কর্ম্মের উপর জোর দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য। উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয় না, কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না—এইটিই গীতার মূল শিক্ষা। অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে হইলে সাধারণতঃ মানুষ যে অহংভাবাপন্ন কামনাময় সাংসারিক জীবন যাপন করে তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে—এ-বিষয়ে সন্ন্যাসীদের সহিত গীতার কোন মতভেদ নাই। তবে সন্ন্যাসীরা যে কর্ম্ম ও সংসার ত্যাগ করিতে বলেন, গীতা তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না, গীতার মতে কামনা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায়। আর কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত যোগ, কর্ম্মযোগ। এই ভাবেই গীতা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সন্ন্যাস ও যোগে সাধারণতঃ প্রভেদ করা হইলেও মূলতঃ তাহারা একই জিনিষ।

ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ। সঙ্কল্প শব্দে শঙ্কর বুঝিয়াছেন ফল-সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা। অসংন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সঙ্কল্পোঽভিসন্ধির্যেন—যে ব্যক্তি ফলবিষয়ে সঙ্কল্প (অভিসন্ধি) পরিত্যাগ করে না সে যোগী অর্থাৎ সমাহিত-চেতা হয় না। কারণ ফলসঙ্কল্প হইতেছে চিত্তবিক্ষেপের হেতু। যে-কোন কর্ম্মী

কর্ম্মফলের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি সমাহিতচেতা (অর্থাৎ) অবিক্ষিপ্ত চিত্ত হন। নিষ্কামভাবে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, গীতার মতে সেই প্রকৃত যোগী হয়। আর নিষ্কাম হইতে হইলে সর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয় কারণ সঙ্কল্প হইতেই কামনার উৎপত্তি—সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ (৬।২৪)। মন যখন কোন জিনিষ পাইতে চায় —মনের সেই ক্রিয়াকেই সঙ্কল্প বলে। মনের এই ক্রিয়ার ফলে প্রাণে বাসনা কামনার বেগ উত্থিত হয়। যতক্ষণ আমাদের মন স্ত্রীসংসর্গের সুখ, কাঞ্চনের সুখ, প্রভাব প্রতিপত্তির সুখ ভোগ করিতে চাহিবে ততক্ষণ কামনার হস্ত হইতে মুক্তি নাই। অতএব প্রথমে মনের এই চাওয়া বন্ধ করিতেই হইবে, মন যখন ভগবান ছাড়া আর কিছুই চাহিবে না তখনই সম্পূর্ণ ভাবে কামনা হইতে মুক্ত হওয়া যায়—তখনই প্রকৃতভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়। এইরূপ সকল চাওয়া যাহার শেষ হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তাহারই ভগবানের সহিত যোগ সিদ্ধ হয়—তাই তিনিই প্রকৃত যোগী ও সন্ন্যাসী। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"কাম কাঞ্চনে আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না; তা গেরস্থই হোক্—আর সন্ন্যাসীই হোক্। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জান্‌বি ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আস্‌বে না।"

সকল রকম কামনা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই যোগ ও অধ্যাত্মসাধনার মূল কথা। কিন্তু কামনা ত্যাগ করিতে হয় কেন? সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, প্রতিপত্তি আদি ইহলোকের ভোগসুখ এবং পরলোকে যত স্বর্গসুখ আছে সে-সবই হইতেছে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখজনক অতএব তাহাদের কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই সন্ন্যাসীদের সংসার ও কর্ম্মত্যাগের পক্ষে যুক্তি। কিন্তু গীতা এই যুক্তি গ্রহণ করে নাই—গীতা ভোগসুখ ত্যাগ করিতে বলে নাই—গীতার মতে এই বিশ্ব জগতে যেখানে যাহা কিছু আছে সবই ভগবান, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। তাহা হইলে ত্যাগ করিব কাহাকে? কোন জিনিষকে? কোন কর্ম্মকে? উপনিষদ বলিয়াছে, এই জগৎ আনন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আনন্দেই বিধৃত রহিয়াছে, আনন্দ হইতে আনন্দের দিকে চলিয়াছে—অতএব বস্তুতঃ জগৎ দুঃখময় নহে, জগৎ আনন্দময়, সৌন্দর্য্যময়, প্রেমময়—

তোমারই বিশ্ব আনন্দময় শোভাসুখ পূর্ণ,
(আমি) আপন দোষে দুঃখ পাই হে বাসনা-অনুগামী।

অহংভাব ও বাসনার দ্বারা আমাদের চিত্তে যে বিক্ষোভ ও বিকৃতি উপস্থিত হয় তাহাতেই বিশ্বব্যাপী দিব্য আনন্দ বিকৃত হইয়া আমাদের নিকট শুভ অশুভ, সুখদুঃখের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। কামনার মূল হইতেছে অজ্ঞান অহংভাব, এই

অহংভাবের বশে আমরা বিশ্বের সব কিছুকে আমাদের হইতে ভিন্ন ও পৃথক মনে করিয়া ব্যগ্র ভাবে ধরিতে যাই, অধিকার করিতে যাই—এই ভাবে আমাদের মনে প্রাণে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই কামনা—ইহা হইতেছে দিব্য আনন্দের বিকৃতি। এই অহংভাব ও কামনাকে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই আমরা সকল সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া শাশ্বত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইব এবং তাহাই অমৃতত্ব। অতএব ত্যাগ করিতে হইবে অহংকে, কামনাকে, কোন বিষয়কে নহে, সংসারকে নহে—তাই প্রকৃত যোগী বলেন,

এই সংসার মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

যোগী ভবতি কশ্চন। গীতার ব্যাখাকারগণ প্রায় সকলেই যোগ বলিতে পাতঞ্জল দর্শনের চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ রাজযোগ বুঝিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনার জন্মভূমি ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বহুপ্রকার যোগসাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, রাজযোগ কেবল তাহাদের মধ্যে একটি। ভারতে প্রবর্ত্তিত যোগসাধনা-গুলিকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। একটি পদ্ধতি হইতেছে যোগকে সাধারণ ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা—শিবপ্রোক্ত ও হিরণ্যগর্ভপ্রোক্ত। শিবপ্রোক্ত যোগকে শৈবযোগ বলে। ইহা চারিপ্রকার—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, শিবশক্তি সমাযোগ (অর্থাৎ ষট্‌চক্রের ভেদ দ্বারা শিবশক্তির মিলন) এবং লয়যোগ। আর হিরণ্যগর্ভ-প্রোক্ত যোগ হইতেছে পাতঞ্জলে বর্ণিত রাজযোগ। বিভিন্নপ্রকার যোগের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধি লাভ হয় ; আর, একজন লোকের পক্ষে এক জীবনে সকল প্রকার যোগ সাধনা করিয়া সকল সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যোগ-সকলের বাহ্য প্রক্রিয়া গুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ না করিয়া যদি তাহাদের যে মূল তত্ত্ব, যাহাতে সকলের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে সেইটি ধরা যায় এবং সেই তত্ত্বটি ধরিয়া এমন এক যোগের বিকাশ করা যায় যাহাতে অন্যান্য যোগের প্রক্রিয়াগুলি যথাসম্ভব গৃহীত হয় এবং সকলযোগের যে মূল শক্তি তাহারই অনুশীলন করা হয়—তাহা হইলে এই একটি যোগের দ্বারাই সকল যোগের ফললাভ করা যায় এবং মানব এক জন্মেই তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গীতায় এইরূপই এক মহান যোগ সমন্বয়ের প্রয়াস করা হইয়াছে—অতএব গীতার যোগকে কেবল রাজযোগ বলিয়া বুঝিলে ভুল করা হইবে।

গীতা বিভিন্ন স্থানে যোগের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই, গীতা একই সমন্বয়মূলক যোগকে বিভিন্ন দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে সন্ন্যাসী হইতে হইলে যোগী হইতে হয় (৫।৬ দ্রষ্টব্য) ; দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যোগী হইতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে

হয়। সকল প্রকার সঙ্কল্প ও কামনা সন্ন্যাস বা ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হয় না। এখানে গীতা যোগ বলিতে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে; কিন্তু গীতা অন্যত্র দেখাইয়াছে যে ইহার মধ্যে জ্ঞানও রহিয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিয়াছেন—উক্ত লক্ষণে কর্ম্মযোগে জ্ঞানমপ্যস্তি। তবে তিনি এখানে সঙ্কল্প ত্যাগকেই জ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছেন, কারণ তাহার মতে দেহ বা প্রকৃতিকে যে আত্মা বলিয়া মনে করা হয় তাহাকেই সঙ্কল্প বলা যায়—এই সঙ্কল্প যিনি ত্যাগ না করিয়াছেন তিনি যোগী নহেন। দেহ, প্রাণ ও মন হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্গত, এইগুলি আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, আমাদের প্রকৃত সত্তা হইতেছে পুরুষ বা আত্মা—ইহাই সাংখ্য জ্ঞান, গীতাও জ্ঞানযোগ বলিতে এইরূপ পুরুষ প্রকৃতি ভেদজ্ঞান বুঝিয়াছে। এই ভেদজ্ঞান না হইলে আমাদের কর্ম্ম পূর্ণভাবে নিষ্কাম হয় না, আমরা সঙ্কল্প ও কামনা হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারি না—অতএব রামানুজ যে বলিয়াছেন জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগের অন্তর্ভুক্ত তাহা যথার্থ। তথাপি সঙ্কল্প বলিতে দেহাত্মবুদ্ধি বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের মনের মধ্যে যে নানারূপ বাসনা কামনার উদ্ভব হয় সেইগুলিই সঙ্কল্প। তবে এ-সবের মূল হইতেছে দেহাত্মবুদ্ধি ও অহং সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোগসাধনা অনেক প্রকার আছে—কিন্তু সে-সবেরই সাধারণ লক্ষ্য হইতেছে মানুষ বর্ত্তমানে যে অহংভাবময় অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে ইহাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—আমরা যে ক্ষুদ্র অহং নই, আমাদের মূল সত্তায় যে আমরা ভগবানের সহিত এবং সকল জীবের সহিত এক ইহা উপলব্ধি করা এবং আমাদের বাহ্য-চৈতন্য ও কর্ম্মেও সকল সময়ে সাক্ষাৎভাবে আমাদের হৃদিস্থিত ভগবানের সহিত যুক্ত থাকা—যুক্ত আসীত মৎপরঃ (২।৬১)। গীতার মতে ইহাই যোগের মূল কথা *—এইরূপ যোগ-চৈতন্যলাভ করিলে মানুষ সকল দুঃখকে অতিক্রম করে, প্রকৃতির সকল নিম্নতন প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া সর্ব্বদা আত্মার পরম শান্তি ও আনন্দের মধ্যে বাস করে—তাই গীতা যোগের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে এই ষষ্ঠ অধ্যায়েই বলিয়াছে—তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। প্রকৃত যোগ-চৈতন্য লব্ধ হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা হইতেছে সমতা, তাই অন্যত্র গীতা সমতাকেই যোগ বলিয়াছে—সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)। অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া যোগীর লক্ষণ বলিয়াছে,

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬।৭-৮

---

* ইহার মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনটি মিলিয়া এক হইয়াছে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥'

অন্বয়। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে ; যোগারূঢ়স্য তস্য শমঃ এব কারণং উচ্যতে।

অনুবাদ। যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকে কারণ বলা যায় এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন তাহার পক্ষে শমই কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

ব্যাখ্যা

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং। গীতা এখানে কর্ম্মের প্রশংসা করিতে যোগসাধনাকে শৈল আরোহণের সহিত তুলনা করিয়াছে। শৈল আরোহণ করিতে হইলে আমাদিগকে যেমন নিম্নমুখা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করিয়া উপরের দিকে উঠিতে হয়, যোগের সাধককেও তেমনি প্রকৃতির সকল প্রকার নিম্নমুখী গতির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, এবং এই সাধনায় কর্ম্ম হয় বিশেষ সহায় ও সাধন। তাহার কারণ, প্রকৃতির মধ্যে যে তমোগুণ রহিয়াছে, কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে জয় করা যায় ; আর কর্ম্ম যদি নিষ্কামভাবে করা যায় তাহা হইলে সেই কর্ম্মের দ্বারা রজো গুণকেও জয় করা যায়, কারণ রজোগুণের মূল লক্ষণ হইতেছে কামনা। এইভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ প্রশমিত হয়, ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। এই অবস্থায় সত্ত্বগুণ ও জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং তাহার সাহায্যে সাধক প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া আত্মচৈতন্যে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হন ; তখনই সাধক যোগ শৈলের শিখর দেশে আরোহণ করেন। এইভাবে কর্ম্মই হয় যোগসিদ্ধি লাভের কারণ।

কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। কিন্তু কর্ম্ম এইরূপ সিদ্ধিলাভের কারণ হয় এ-কথা সন্ন্যাসীরা স্বীকার করিতে পারেন না, তাই তাঁহাদিগকে এই শ্লোকের নানা অপব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। যোগ শব্দে যোগসাধনা বুঝায়, এবং যোগসিদ্ধিও বুঝায়। এই দ্ব্যর্থের সুযোগ লইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা যোগসাধনার যোগ্যতা লাভ করা যায়, যোগপথে আরোহণ করা যায়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইলে আর কর্মের প্রয়োজন থাকে না, তখন কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কর্ম্ম সহায় হয় বলিয়া পরবর্ত্তী অবস্থায় তাহা ত্যাগ না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না—সন্ন্যাসীদের এই কথা গীতা কোথাও স্বীকার করে নাই।

গীতা এখানে শৈল আরোহণের সহিত যে যোগসাধনার তুলনা করিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে গীতা এখানে যোগে আরোহণ বলিতে যোগশৈলের শিখর

দেশে উঠা বা সিদ্ধিলাভই বুঝিয়াছে এবং কর্ম্মকে তাহার কারণ বা সাধন বলিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এখানে যোগ বলিতে কেবল বৈরাগ্য বুঝিয়াছেন—"যোগম্ অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে যিনি আরোহণ করিতে (অবলম্বন করিতে) ইচ্ছুক হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে আরোহণ করেন নাই এতাদৃশ যে ভবিষ্যৎ (ভাবী) মুনি (অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলের তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এখন না হউন পরে মুনি হইবেন) তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম যদি ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কারণম্ অর্থাৎ যোগারোহণের সাধন বলিয়া কথিত হয়, বেদমুখে ভগবান কর্ত্তৃকই তাহা কথিত হয় অর্থাৎ বেদই ভগবানের মুখস্বরূপ।"

শঙ্কর যোগ শব্দে ধ্যানযোগ বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ব্ব দুইটি শ্লোকে নিষ্কাম কর্ম্মকে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধনরূপে সন্ন্যাস বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে; এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে কর্ম্মযোগ কেবল সাধন মাত্র। যাহারা যোগে আরুরুক্ষ অর্থাৎ ধ্যানযোগে অবস্থান করিতে অসমর্থ কিন্তু তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষেই কর্ম্মযোগ ব্যবস্থা—কিন্তু যোগারূঢ় হইলে আর কর্ম্ম সাধন থাকে না। তখন কর্ম্মত্যাগই হয় সাধনা। কিন্তু যোগ শৈলে আরোহণ অবস্থায় কর্ম্মকে কারণ বলা হইয়াছে—শুধু ইহা হইতেই এ অর্থ করা যায় না যে শিখরে উঠিলেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সজ্ঞান সংস্পর্শ, কর্ম্মের দ্বারাই তাহা লাভ করা যায় নতুবা নিষ্কাম কর্ম্মকে যোগ বলিয়া অভিহিত করিবার কোন অর্থই থাকে না। গীতা কর্ম্মকে যোগাভ্যাসের প্রথম অবস্থার সাধনা বলিয়াছে, কারণ যতক্ষণ অহং ভাব থাকে, আমি কর্ত্তা ভাব থাকে ততক্ষণই এই উপদেশ দেওয়া যায় যে, কর্ম্ম কর, কর্ম্মই তোমার সাধনা। কিন্তু যখন সাধকের এই জ্ঞান হয় যে অহং প্রকৃত কর্ত্তা নহে; প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে (৩।২৭), তখন আর কর্ম্ম করিতে বলার কোন অর্থ ই থাকে না, তখন সাধক কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম, অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখেন—তখন তিনি উপলব্ধি করেন তাঁহার সকল কর্ম্ম বা কর্ম্মহীনতা তাঁহার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া, তিনি তাঁহার মূল সত্তায় শান্ত, নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা পুরুষ। ইহাই মুক্তি, সিদ্ধি, ব্রাহ্মী স্থিতি। গীতা কর্ম্মকে এই মুক্তি ও সিদ্ধিলাভেরই কারণ বা সাধন বলিয়াছে—কারণ যদি কর্ম্ম করা যায় এবং সেই সঙ্গে নিরন্তর আভ্যন্তরীণ ত্যাগ ও নিষ্কামতা অভ্যাস করা যায় তাহা হইলেই কামনাত্মক অহংভাব দূর হয়, নিম্নপ্রকৃতির প্রেরণা সকলকে জয় করা যায়, সাধক যোগ-সিদ্ধি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

আরুরুক্ষঃ শব্দের অর্থ আরোহণ করিতে ইচ্ছুক। কিসে আরোহণ করিতে? যোগপথে না যোগশিখরে? গীতা যখন কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়াছে, কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই উচ্চস্থান দিয়াছে তখন কর্ম্মকে কেবল যোগপথে আরোহণ করিবার কারণ বলা কখনই গীতার অভিপ্রেত নহে, কর্ম্মকে যোগ-সিদ্ধিলাভের কারণ বলাই গীতার অভিপ্রায়। এতএব এখানে যোগে আরোহণ বলিতে যোগশিখরে আরোহণই বুঝিতে হইবে—যাহারা যোগের পথ ধরিয়াছেন, যোগসাধনা করিতেছেন, কর্ম্ম তাহাদের সিদ্ধিলাভ কারণ হয়, সহায় হয় ইহাই গীতার বক্তব্য। গীতা "মুনি" শব্দের ব্যবহার করায় এই অর্থটিরই সমর্থন হইয়াছে। কারণ যে-ব্যক্তি এখনও যোগমার্গে উঠে নাই তাহাকে মুনি বলা যায় না। যে মুনি যোগসাধনা করিতেছেন তিনি শীঘ্রই ব্রহ্মলাভ করেন এ-কথা গীতা পূর্ব্বেই বলিয়াছে (৫।৬)।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব। যোগারূঢ় বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন যে-ব্যক্তি সমাধি লাভ করিয়াছেন—এখানে শঙ্কর যোগ বলিতে ধ্যানযোগ অর্থাৎ পাতঞ্জলের রাজযোগই বুঝিয়াছেন। ঐ যোগের লক্ষ্য হইতেছে সমাধি এবং তাহা লাভ করিবার সাধন হইতেছে শম বা কর্ম্মত্যাগ—ইহাই শঙ্করের ব্যাখ্যা। তাঁহার কথা "যেমন যেমন কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তেমন তেমন নিরায়াস ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত সমাহিত হয়, এইরূপ হইলে সে শীঘ্র যোগারূঢ় হইয়া থাকে।" অতএব শঙ্করের মতে শম অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তি হইতেছে যোগারূঢ়ত্বের কারণ। কিন্তু গীতা এখানে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, যোগারূঢ় ব্যক্তির শমই কারণ হয়, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি যোগারূঢ় হইয়াছে "শম" তাহারই কারণ হয়—সুতরাং "শম"কে যোগারূঢ়ত্বের কারণ বলা যাইতে পারে না। গীতা এই শ্লোকের প্রথম পাদেই কর্ম্মকে যোগারূঢ়ত্বের কারণ বলিয়াছে। পরের শ্লোকেও যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী,—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস করিয়া যে-ব্যক্তি সকল কামনা ও সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হন তিনিই যোগারূঢ়। দ্বিতীয় পাদে বলা হইল যে, সেইরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে "শম"ই কারণ হয়। কিসের কারণ? আত্মজ্ঞানে, ব্রাহ্মীস্থিতিতে, পূর্ণ সমতাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠার কারণ—সিদ্ধযোগীর সর্ব্ব কর্ম্ম এইরূপ সমতাতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, পরের শ্লোকেই তাহা উক্ত হইয়াছে।

শমঃ কারণমুচ্যতে। এখানে "শম" শব্দে শঙ্কর বুঝিয়াছেন সকল কর্ম্মত্যাগ, শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তি। কিন্তু "শম" শব্দের এই অর্থ কেবল জোর করিয়া করা হইয়াছে। "শম" শব্দের অর্থ শান্তি, শান্তভাব; কর্ম্মের

মধ্যেও যোগী এই শান্তভাব রক্ষা করেন—অতএব "শম" শব্দে কর্ম্মত্যাগ বুঝিবার কোনই সার্থকতা নাই। যতক্ষণ যোগশিখরে উঠা যায় নাই ততক্ষণ কর্ম্মই সেখানে উঠিবার কারণ হয়, তাহার পর কর্ম্ম আর কারণ থাকে না, কর্ম্মের দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-জয়ের শান্তিলাভ করা যায় তখন তাহাই হয় অধ্যাত্মচৈতন্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠার কারণ। তখনও কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় না, ঐ শান্তির ভিত্তিতে সকল কর্ম্ম করা হয়—ইহাই যোগারূঢ়ের লক্ষণ।

শঙ্করের অনুসরণ করিয়া রামানুজ, মধুসূদন, শ্রীধর প্রভৃতি গীতার প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই শম শব্দে সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি বুঝিয়াছেন এবং ইহাকে জ্ঞানের পরিপক্কতার কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানের পরিপক্কতার জন্য কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন হয়—এইরূপ মত গীতা কোথাও বলে নাই। তাহা ছাড়া গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে গীতা শম বলিতে কর্ম্মত্যাগ বুঝে নাই,

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ১৮।৪২

গীতা এখানে শমকে ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়াছে, ব্রাহ্মণকে যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হইতে হয় একথা বলা নিশ্চয়ই গীতার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু গীতা প্রত্যেক বর্ণেরই আপন আপন স্বভাব অনুযায়ী উপযোগী কর্ম্ম কি তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। তবে ব্রাহ্মণের বাহ্য কর্ম্মের উপরে গীতা জোর দেয় নাই, তাহার আভ্যন্তরীণ সংযম, শান্তভাব, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপরেই জোর দিয়াছে। সনৎসুজাতীয় শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণের দ্বাদশ মহাব্রত বলা হইয়াছে—

জ্ঞানং চ সত্যং চ দমং শ্রুতঞ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতি শমশ্চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥ ২।১৯

যজ্ঞ ও দান প্রভৃতি কর্ম্মের সহিত শম প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সদ্‌গুণ অভ্যাস করা ব্রাহ্মণের মহাব্রত। শঙ্করাচার্য্য নিজেই অন্যত্র শম শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে তাহার দ্বারা কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না, ভিতরে বাসনা ত্যাগই বুঝায়—অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,

সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতাঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তিনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥

শম ও দম এই উভয়ের প্রভেদ এই যে, অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম শম এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম। কুৎসিৎ কর্ম্মের আচরণার্থ যে মানসিক প্রবৃত্তি হয়

তাহার নিবারণই দম। আর অন্তরের মধ্যে মান অপমান, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়ে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, বাসনা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগের দ্বারা তাহার উপশমই শম শব্দের প্রকৃত অর্থ। ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়, সেই জন্যই গীতা যোগারূঢ়ের পক্ষে শমকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এইরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তি কিরূপ আভ্যন্তরীণ ভাব লইয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন পরের শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে। মুক্ত ব্যক্তির সকল কর্ম্ম পূর্ণতম সমতার সহিত সম্পাদিত হয় এবং শম বা প্রশান্তভাবের দ্বারাই এইরূপ সমতা লাভ করা যায়। শম শব্দের দ্বারা যে কর্ম্মত্যাগ বুঝাইতেছে না, আভ্যন্তরীণ প্রশান্তভাবই বুঝাইতেছে তাহা পরবর্ত্তী সপ্তম শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, *

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা দ্বারা নিম্নতন প্রকৃতির বাসনা কামনা সমূহ জয় করিলে যে প্রশান্তভাব লাভ করা যায় তাহাতেই যোগে প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪

অন্বয়। হি যদা (নরঃ) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসী তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

অনুবাদ। কারণ যখন মানব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত হয় না এবং সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে তখনই তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

ব্যাখ্যা

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু। পূর্ব্বশ্লোকে গীতা শম বা শান্তভাবকে যোগারূঢ় ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মচৈতন্যে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ বলিয়াছে। এই শ্লোকে সেই শম বা শান্তভাবের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যিনি যোগ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তিনি আর কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হন না, কোন কর্ম্মেও আসক্ত হন না। তিনি যে বিষয় পরিত্যাগ করেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তাহা নহে, তিনি শুধু এইসবে সাধারণ মানুষের ন্যায় আসক্ত হইয়া পড়েন না, ইহা বলাই গীতার উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ আসক্তির বশ, তাই তাহার চিত্ত চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়—ভোগ্যবস্তু সম্মুখে আসিলে তাহাকে ধরিবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া

* এই অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকও দ্রষ্টব্য

উঠে, সর্ব্বদা কোন না কোন কর্ম্ম করিবার জন্য সে ব্যগ্র হয়—এই ভাবে সর্ব্বদা চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ থাকায় সে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পরন্তু যোগী সকল প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সকল প্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নিজের ভোগের জন্য কোন জিনিষ চান না, নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করিবার কোন ব্যগ্রতা তাহার নাই তাই তিনি প্রশান্ত, সর্ব্বদা গভীর শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাহাতেই জ্ঞানের পরিপক্বতা, যোগের দৃঢ়তা হয়।

কর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করেন বলিলে বুঝায় যে তিনি বস্তুতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু শঙ্কর এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার মতে কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হয় না। তাই তিনি এখানে "অনুষজ্জতে" শব্দের দ্বারা আসক্তি বুঝেন নাই। গীতার অন্য সকল ব্যাখ্যাকারই "ন অনুষজ্জতে" বলিতে আসক্ত হন না এই সহজ স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করিলে তাঁহার নিজ মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে কুশাগ্র বুদ্ধিতে তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি এই কথার একটি স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম অর্থ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নানুষজ্জতে অনুসঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতি ইত্যর্থে। অর্থাৎ কর্ম্মে যাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই, অতএব যিনি কর্ম্ম করেন না,—ইহাই শঙ্করের ব্যাখ্যা। কিন্তু বস্তুতঃ আসক্তি বলিতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বুঝায় না, বরং আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম করাই গীতার মতে প্রকৃত কর্ম্মযোগ। অন্যত্র গীতা বলিয়াছে,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥৩।১৯

তাহা ছাড়া এই শ্লোকে শুধু কর্ম্মে অনুষঙ্গ ত্যাগের কথা বলা হয় নাই, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েও অনুষঙ্গ ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বিষয়ে কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি ত্যাগ—এরূপ অদ্ভুত কথা বলা নিশ্চয়ই গীতার উদ্দেশ্য নহে, অতএব এখানে অনুষঙ্গ বলিতে আসক্তিই বুঝিতে হইবে—বাহ্য বিষয় বা কর্ম্ম ত্যাগ নহে, পরন্তু এই সব জিনিষে আসক্তি ত্যাগই গীতার শিক্ষা।

শঙ্কর আসক্তি ত্যাগ ও কর্ম্ম ত্যাগ এবং সংসার ত্যাগ একই বলিয়াছেন, আসক্তি ত্যাগ করার অর্থই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া। গীতার যে ব্যাখ্যা শঙ্কর দিয়াছেন তাহাকেই গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়া আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই গীতার শিক্ষার প্রতি বিরূপ। তাহারা বলেন, গীতার মধ্যে কিছু ভাল কথা থাকিলেও উহা বিরোধে পূর্ণ এবং মানব সমাজের পক্ষে

কল্যাণকর নহে। সম্প্রতি এইরূপ একজন বিখ্যাত লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"গীতা গ্রন্থের ঈশ্বরবাদ লোভনীয় হলেও, তার ভিতর অনেক বিরোধী তত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। বৈরাগ্যবাদ অনাসক্তিবাদ ও সন্ন্যাসবাদ পূর্ণতর ও ব্যাপকতর জীবনের সহায়ক নহে। ভারতের অধোগতির মূলে আছে এই সংক্রামক বৈরাগ্যবাদ। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ প্রভৃতি এর একটি অবশ্যম্ভাবী ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। তন্ত্রে নারীকে এবং দেবীকেই শক্তিস্থানীয় বলা হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও হিন্দুবাদ এক মুহূর্ত্তে সমগ্র এশিয়াকে অধ্বস্ত করে। মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদের সহিত ভোগ বা শক্তিবাদের যোগ চলে না। বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন মায়াবাদ—ঠাকুর রামকৃষ্ণও কামিনীকাঞ্চনের প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে শক্তিরূপিনী নগ্না শিবসংযুক্তা তান্ত্রিক মহাদেবীকেই তিনি আরাধনা করেছেন। এতে এসে পড়েছে অবশ্যভাবী আত্মবিরোধ, অস্পষ্ট প্রতীতি এবং সত্যের অবগুণ্ঠিত মূর্ত্তির ধ্যান। কুলার্ণবতন্ত্রের 'ভোগো যোগায়তে সম্যক্' ও 'মোক্ষায়তে চ সংসার' অধ্যাত্মপুরীর যে দ্বার উদঘাটন করে—বিংশশতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত এদেশ তার পাশ কাটিয়ে চলেছে।"

লেখক এখানে বৈারাগ্য ও অনাসক্তিকে শঙ্করের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ-মূলক সন্ন্যাসের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেইজন্যই তিনি গীতার মধ্যে বিরোধ দেখিয়াছেন—কারণ গীতা বৈরাগ্য ও অনাসক্তির উপর যেমন জোর দিয়াছে, কর্ম্মের উপরও তেমনই জোর দিয়াছে—কর্ম্মত্যাগ করার প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করিতে বলিয়াছে, মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি। শঙ্কর-প্রচারিত সংক্রামক সন্ন্যাসবাদ যে ভারতের অধোগতির মূলে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা ঐরূপ সন্ন্যাসবাদ প্রচার করে নাই—গীতা যে বৈরাগ্য, অনাসক্তি, সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছে তাহার সহিত জীবনের বা সাংসারিক কর্ম্মের, এমন কি যুদ্ধরূপী ঘোর কর্ম্মেরও বিরোধ নাই—গীতার আদর্শ ভগবান বলিলেন,

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩।৩০

এখানে গীতা সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস করিতে বলিতেছে অথচ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিতেছে। এখানে সংন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে, সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করা, অর্পণ করা। আমি কর্ত্তা নহি, প্রকৃতিই ভগবানের আদেশে আমার স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম্ম করিতেছে এই উপলব্ধি হইলেই সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা সিদ্ধ হয় এবং ইহাই হইতেছে গভীর ও পূর্ণ মুক্তি। ইহার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার অহংভাব কামনা আসক্তি বর্জ্জন করা।

পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শঙ্করের সহিত এক মত হইয়াছেন কারণ তাহাদের মতে কামনা, আসক্তি, অহংভাব না থাকিলে কর্ম্ম সম্ভব নহে, এমনকি সমস্ত জীবনই শূন্য হইয়া যায়, অতএব আসক্তি প্রভৃতি ত্যাগ করা এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া একই কথা। কিন্তু গীতা পুনঃপুনঃ ঠিক এই মতটিরই প্রতিবাদ করিয়াছে। গীতার এই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আমাদিগকে অনেক সময়ই অনেক বিষয়ের পুনরুক্তি করিতে হইতেছে, কিন্তু ইহা গীতারই পদ্ধতি, গীতা একই কথা বার বার বলিয়াছে যাহাতে তাহা শিষ্যের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অর্জ্জুনও মুগ্ধ হইয়া বার বার শুনিতে চাহিয়াছেন,

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূল শিক্ষাগুলি পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করা, আলোচনা করা জ্ঞান-যোগের অঙ্গ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্মতত্ত্ব শব্দস্পর্শাদির ন্যায় স্থূল ইন্দ্রিয় বোধনের বিষয় নহে, সেই জন্য সর্ব্বদা চিন্তা, ধ্যান, আলোচনার দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়।

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে,

তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং সুস্থিতায়াময়ং পুমান্।
জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সাদরঞ্চাভ্যস্যমানে সর্ব্বথৈব নিবর্ত্ততে॥

১৩।৮০-৮২

"অভ্যাস দ্বারা সেই অধ্যাত্মজ্ঞান সুস্থির হয়, তখন পুরুষ জীবন্মুক্ত হন, তাঁহার দেহ যেরূপ থাকুক, তাহাতে আর কোন হানি হয় না। পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা ও তদ্বিষয়ে কথোপকথন এবং অন্যান্যকে তাহা উপদেশ করা আর তাহাতেই একাগ্র-চিত্ত হওয়া, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বলা যায়। দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত এইরূপ অভ্যাস থাকিলে বহুকালব্যাপী বিষয় বাসনা সকলও নিবৃত্ত হইয়া যায়।"

গীতাও বলিয়াছে,

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥১০।৯

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাসনা ও আসক্তির বশ অহংভাবময় জীবনকেই জীবন বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। ইহা যে জীবন

তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতেই জীবনের পূর্ণতা নহে, ইহা মানুষকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ সুখভোগে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, এই জীবনের সহিত জরা ব্যাধি মৃত্যু, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সকল প্রকার দুঃখ এমন ভাবে জড়িত যে ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এই জীবনকে মৃত্যুতুল্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। এই জীবনকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হওয়া, ইহাই সন্ন্যাসীদের শিক্ষা। কিন্তু আসক্তি বর্জ্জন করিয়া এই জীবনকে রূপান্তরিত করা, এই ক্ষুদ্র জড় মানবদেহের মধ্যেই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, আনন্দ প্রকট করা—ইহাতেই মানবজীবনের প্রকৃত পূর্ণতা, ইহাই মানবজন্মের প্রকৃত লক্ষ্য। বেদ, উপনিষদ, গীতায় আমরা এইরূপ পূর্ণ অমৃত দিব্য জীবনেরই ইঙ্গিত পাই। যুগ যুগান্তরের অভিজ্ঞতা ও সাধনার দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে এইরূপ দিব্য জীবনের জন্যই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে এবং কার্য্যতঃ ইহাকে সুসিদ্ধ করিয়া তোলাই হইয়াছে বর্ত্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দের মহান জীবন-ব্রত।

ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিতেই হইবে। অমুক ভোগ্য বিষয়টি আমার চাই-ই, ঐটি না হইলে চলিবেই না—এইরূপ ভাবই হইতেছে আসক্তি। ইহা দুঃখের মূল—কারণ সংসারে কোন্ জিনিষটি আমরা পাইব, না পাইব, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ভগবদিচ্ছাতেই সংসারের সকল ব্যাপার ব্যবস্থিত হয়। অতএব যিনি কোন জিনিষের উপর আসক্ত না হইয়া ভগবানের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে যুক্ত করেন, মিলিত করেন, ভক্তির সহিত বলিতে পারেন,

সুখদুঃখ সব তুচ্ছ করিব
প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা দিবে আমায়
মাথায় তুলিয়া লব।

—তিনিই প্রকৃত সংসারের রহস্য বুঝিয়াছেন, সকল বস্তুতে, সকল ঘটনাতে তাঁহার সমান আনন্দ, সকল বস্তুর স্পর্শেই তিনি পরম প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন সুখ উপভোগ করেন। কোন বাহ্যবস্তুকে সুখের আকর, সুখের কারণ মনে করা হইতেছে অজ্ঞান। বস্তুতঃ সকল আনন্দের উৎস সচ্চিদানন্দ আত্মা বা ভগবান আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছেন, আমরা মূল সত্তায় তাঁহার সহিত এক—বাহ্যবস্তুতে সকল প্রকার আসক্তি বর্জ্জন করা অভ্যাস করিলে আমরা আমাদের অন্তরে এই অনন্ত আনন্দের উৎসের সন্ধান পাই, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবনই আনন্দময় হইয়া উঠে, আর ভিতরে আমরা যে আত্মা ও ভগবানের সন্ধান পাই বাহিরে বিচিত্র বস্তু ও

ঘটনার মধ্যে, সকল জীবের, সকল মানুষের মধ্যেই আমরা সেই একই সচ্চিদানন্দকে দেখি, স্পর্শ করি, তাঁহার প্রেম অনুভব করি—ইহা অপেক্ষা পূর্ণতর, ব্যাপকতর জীবন আর কি হইতে পারে? যতক্ষণ আমরা বাসনা ও আসক্তির বশ ততক্ষণ আমরা তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখের মধ্যেই নিজদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি—সে সুখ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, সে সুখ অর্জ্জনে দুঃখ, ভোগে দুঃখ, অন্তে মধ্যে শেষে তাহার সহিত দুঃখ ওতঃপ্রোত, অতএব অধ্যাত্মশাস্ত্র অনুসারে তাহা দুঃখেরই সামিল। আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং সকল আসক্তি ও বাসনার মূল ক্ষুদ্র অহংভাব ত্যাগ করিয়া আমরা এই ব্যাপক দুঃখের মূল উচ্ছেদ করি। তখন আর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না, ইন্দ্রিয়গণও রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাহাদের অভিনব শক্তির বিকাশ হয়, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই তন্ত্র শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, ভোগো যোগায়তে সম্যক্। গীতাও বলিয়াছে,

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। শুধু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ নহে, কর্ম্মে আসক্তিও ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ বলিতে বস্তুতঃ কি বুঝায় তাহা ধারণা করা আধুনিক মানবের পক্ষে কঠিন—কারণ আধুনিক মানব পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবিত, আর পাশ্চাত্যের আদর্শই হইতেছে কর্ম্মবাদ, activism, dynamism. অনবরত অশ্রান্তভাবে কর্ম্ম করা—ইহাই পাশ্চাত্য শিক্ষা; আসক্তির সহিত, আগ্রহের সহিত কর্ম্ম করাই পাশ্চাত্য মতে প্রকৃত জীবন। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা গীতার মধ্যেও এই অর্থই বাহির করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে গীতা পাশ্চাত্য কর্ম্মবাদ বা activismএরই শিক্ষা দিয়াছে। গীতা যে অনাসক্তির কথা বলিয়াছে তাহা হইতেছে কর্ম্মফলে আসক্তি বর্জ্জন, Duty for the sake of duty. মহাত্মা গান্ধী তাঁহার গীতাভাষ্যে গীতার অনাসক্তির এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন, এবং গীতার যোগকে অনাসক্তিযোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যে-মানুষ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে সে বহুবার কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়। তাহার ভিতর অধীরতা আসে, তাহা হইতে সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং পরে যাহা করা উচিত নহে তাহা করিয়া থাকে।......ফলাসক্তির এই রকম কটু পরিণাম হইতে গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া জগতের নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন।"

গীতা যে কর্ম্মের ফল ত্যাগের শিক্ষা দিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতা বলিয়াছে,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ২।৪৭

কিন্তু সাধারণতঃ যেমন মনে করা হয় যে, এইটিই গীতার মহাবাক্য বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, আর গীতার অনাসক্তি কেবল কর্ম্মফলে অনাসক্তি নহে, তাহা আরও গভীর ও ব্যাপক। গীতা যে বলিয়াছে "তোমার কর্ম্মে অধিকার আছে" একথাটি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মনের কাছে খুবই আদরনীয় হইলেও এইটিই গীতার চরম কথা নহে—এটি কেবল গীতার কর্ম্মযোগের প্রথম অবস্থার উপযোগী উপদেশ। ক্রমশঃ সাধককে এই অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে যে বস্তুতঃ কর্ম্মে তাহার অধিকার নাই, "আমি কর্ম্ম করি" এরূপ ধারণা অজ্ঞানপ্রসূত, প্রকৃতিই সত্ত্বাদি গুণসকলের ভিতর দিয়া আমাদের কর্ম্ম করিতেছে। যখন এই সত্য উপলব্ধি হয় তখন শুধু কর্ম্মফলে আসক্তি নহে, কর্ম্মে আসক্তিও বর্জ্জিত হয়—তখনই সাধক হয় প্রকৃত মুক্ত, যোগারূঢ়। তখনও তাহার মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্ম চলিতে পারে এবং চলিতে থাকে—কিন্তু সে কর্ম্ম আর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া বা বন্ধনের সৃষ্টি করে না—অতএব তখন আর কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে না। তাহার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও মুক্তপুরুষ জগতের হিতের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য যে কার্য্য করা প্রয়োজন, কর্ত্তব্য, তাহা সুচারুভাবেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্ত স্বাধীনভাবে তাহার প্রকৃতিকে সেই কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, প্রকৃতির বশে চালিত হইয়া সে কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়েন না। ইহাই কর্ম্মে অনাসক্তি। কিন্তু শঙ্কর কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ বলিতে একেবারে সকলপ্রকার কর্ম্মত্যাগই বুঝিয়াছেন—তাঁহার মতে ঐরূপ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই প্রকৃত যোগারূঢ়। আধুনিক মানব শঙ্করের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই, কর্ম্ম তাহাদের চাই-ই, তাই তাহারা বলেন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মহান হইলেও, তাঁহার সন্ন্যাসবাদ বর্জ্জনীয়। তাঁহারা দেখেন না যে একটিকে ধরিলে আর একটিকে স্বীকার করিতেই হয় নতুবা সঙ্গতি থাকে না। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার গীতাভাষ্যে এই সমস্যার এক সমাধান করিয়াছেন যে, সকল কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, পরন্তু "যে কর্ম্ম আসক্তি ছাড়া হইতে পারে না তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য।" তাঁহার মতে যুদ্ধ, হিংসা, রক্তপাত প্রভৃতি কার্য্য আসক্তি ভিন্ন হইতে পারে না অতএব এইসব কর্ম্ম ত্যাগ করাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু অনাসক্তভাবে যে হত্যা করা যায় একথা গীতা স্পষ্টভাবে বলিয়াছে। গীতাও অহিংসার শিক্ষা দিয়াছে—কিন্তু তাহা আভ্যন্তরীণ, বাহ্য নহে—

অনাসক্তির সহিত যে যুদ্ধ করা যায়, হত্যা করা যায় তাহা বস্তুতঃ হিংসা নহে, অহিংসা।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

গীতা যে বাহ্য যুদ্ধেরও উপদেশ দিয়াছে তাহা এত স্পষ্ট যে অহিংসাবাদী মহাত্মা গান্ধীও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, গীতাকার নিজের কথার অর্থ নিজেই বুঝিতে পারেন নাই কারণ মহাত্মার ৪০ বৎসরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে অনাসক্ত ও কর্ম্মফলত্যাগী হইতে হইলে যুদ্ধের ন্যায় ঘোর প্রচণ্ড কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। গীতাকারের ভ্রান্তি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"কবি মহত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল জগতের সম্মুখে রাখেন। তাহা হইতেই একথা বলা যায় না যে, তিনি সকল সময়েই নিজের মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, অথবা জানিয়া পরে তাহা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই কাব্য ও কবির মহিমা।……এইজন্য গীতার মহাশব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে ও বিস্তার পাইতেছে।" বস্তুতঃ গীতাকারের কোন ভ্রান্তিই হয় নাই, যুদ্ধ যে মানুষের ধর্ম্ম হইতে পারে ইহা হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন শিক্ষা—বৈদিক যুগ হইতে যুদ্ধকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং যুদ্ধব্রতী ক্ষত্রিয়কে সমাজে খুবই উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুমতে অবতারেরা সকলে আসিয়াই দুষ্টের দমনের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। জগন্মাতা স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুর দলন করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ মধুসূদন, অরিনিসূদন প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসা আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহা হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা নহে, তাহা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা, বিশেষতঃ রুশিয়ার মনীষী টলষ্টয়ের শিক্ষা। সে শিক্ষা বর্ত্তমান মানব সমাজের পক্ষে উপযোগী নহে।

ইহার অর্থ নহে যে যুদ্ধ কোনদিনই মানব সমাজ হইতে দূর হইবে না অথবা লোককে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে বলাই গীতার শিক্ষা। যুদ্ধ অতি ঘোর কর্ম্ম; তবে যতদিন জগতে আসুরিকভাবাপন্ন মনুষ্যের অত্যাচার থাকিবে ততদিন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তব্য থাকিবে। গীতাকার যুদ্ধের উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন শুধু ইহা দেখাইবার জন্য যে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম, এমন কি যুদ্ধের ন্যায় এমন ঘোর কর্ম্মও ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্তভাবে ভগবদ-প্রেরিত কর্ত্তব্য কর্ম্মবোধে সম্পন্ন করা যায় এবং এইভাবে যুদ্ধ করিলে তাহাতে যে কোন পাপ বা বন্ধন হয় না শুধু তাহাই নহে, এইরূপ নিষ্কাম অনাসক্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ অধ্যাত্মসিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

অন্যপক্ষে লোকে যে সব কর্ম্মকে সাধারণতঃ ভাল কর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া থাকে সে সব কর্ম্মেও আসক্তি থাকিতে পারে এবং সাধারণতঃ মানুষ ঐ সকল কর্ম্ম বাসনা ও আসক্তির সহিত করে বলিয়াই অধ্যাত্মজীবনে তাহারা উন্নতিলাভ করিতে পারে না। কর্ম্মে এই আসক্তি আইসে রজোগুণ হইতে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশের যে কর্ম্মবাদ বা activism তাহা রজোগুণাত্মক—তাহার ভিতরে রহিয়াছে অহংভাব ও আসক্তি এবং এইরূপ কর্ম্ম মানুষকে দুঃখ হইতে দুঃখেই লইয়া যায়, মানব সমাজের হিতসাধন ইহার প্রকাশ্য লক্ষ্য হইলেও সে লক্ষ্য বস্তুতঃ সিদ্ধ হয় না। বরঞ্চ এই রাজসিক প্রেরণা যখন প্রবল হয় তখনই মানুষ অসুরভাবাপন্ন হইয়া উঠে—ইহার দৃষ্টান্ত আধুনিক জার্ম্মাণী। জার্ম্মান জাতি যেরূপ কর্ম্মশক্তির বিকাশ করিয়াছে জগতে আর কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না, কিন্তু ইহার পিছনে অধ্যাত্ম জ্ঞান ও প্রেরণা না থাকায় এই বিরাট কর্ম্মশক্তি জগৎ ধ্বংসে নিয়োজিত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীকে জার্ম্মানজাতির বাসভবনে পরিণত করিতে হইবে, অন্যান্য সকল জাতিকে দাসজাতিতে পরিণত করিয়া জার্ম্মান জাতির সেবার জন্য ভারবাহী পশুর কার্য্যে লাগাইতে হইবে—এই ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া জার্ম্মানী বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবতারনা করিয়াছিল। রাজসিক অহংভাবমূলক ফলকামনা-মূলক কর্ম্মের ইহাই চরম পরিণতি—আশা করা যায় এই চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়া মানুষের চক্ষু খুলিবে, মানুষ এতদিনে গীতার অধ্যাত্ম শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী জীবনকে গঠন করিতে, জগতে সত্য সত্যই এক নূতন সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইবে।

মানুষ যে কেবল অসৎকর্ম্মই আসক্তির সহিত করে তাহা নহে, সৎকর্ম্মেও আসক্তি হয় এবং তাহা দূর করা আরও কঠিন। দেশের সেবা, সমাজের সেবা এবং সাধারণতঃ জনহিতকর কর্ম্ম মানুষকে নেশার মত পাইয়া বসে, মানুষ ইচ্ছা করিলেও তাহা ছাড়িতে পারে না। তাহার কারণ ঐসব কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে অহংভাব, আমি দেশের সেবা করিতেছি ইত্যাদি অহঙ্কার এবং সূক্ষ্মভাবে থাকে যশ, মান, প্রভাব প্রতিপত্তির কামনা। স্বার্থত্যাগী মহামান্য নেতারাও এইরূপ আসক্তির বশ থাকেন, অনেক সময়ে নিজেরা তাহা ধরিতে পারেন না, আর তাহাদের চিত্ত এইরূপ রাজসিকভাবে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহারা সত্যপথ ঠিকমত দেখিতে পান না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ভুল করেন, এইভাবে তাঁহারা ভাল করিতে যাইয়া অসংখ্য নরনারীর অশেষ অমঙ্গলের কারণ হন। গীতা রাজসী বুদ্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছে,

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮।৩১

এইরূপ অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া আসক্তির বশে কর্ম্ম করা গীতার শিক্ষা নহে, গীতার কর্ম্ম জ্ঞানীর কর্ম্ম, যোগীর কর্ম্ম, তাহার জন্য অনেক সাধনা করিতে হয়। বিপদ এই যে এই সব তথাকথিত নেতা রাজসিক অহঙ্কারের বশ এবং অজ্ঞানের অধীন থাকিলেও নিজেদিগকে খুব জ্ঞানী বলিয়া মনে করেন, নিজেরা অন্ধ হইয়াও পরকে পথ দেখাইতে অগ্রসর হন, ফলে মানবজাতির দুঃখলাঞ্ছনাও বাড়িয়া চলে। উপনিষদ এই সব লোক সম্বন্ধে বলিয়াছে,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।৮

সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা যত্নের সহিত যোগসাধনা অধ্যাত্ম-সাধনা করিতেছেন তাঁহারাও এইরূপ রাজসিক অহঙ্কার ও আসক্তির কবলে পতিত হন—নিম্ন প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এইরূপ সাধক মনে করেন আমি এত বড় সাধক, আমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, ভগবান আমাকে তাঁহার মহান কর্ম্মসাধনের যন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহারা যেটাকে ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন সেইটিতে আসক্ত হইয়া পড়েন, সেইটি করিবার জন্য তাঁহাদের ব্যস্ততার ও ব্যগ্রতার অন্ত থাকে না, কিন্তু এইভাবে ভগবদ কর্ম্ম করাও গীতার শিক্ষা নহে—গীতার যোগী শান্ত সমাহিত, তাঁহার ব্যস্ততা নাই, তিনি জানেন ভগবানের কাজ ভগবান নিজেই করিয়া লইবেন, কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে না, তাঁহার নিজের যাহা করিবার, ভগবান তাঁহার ভিতর দিয়া যাহা করাইতে চান শান্ত বুদ্ধির সহিত তাহা অবগত হইয়া ধীর শান্তভাবে তিনি তাহা সম্পাদন করেন। অনেকে এমন আছেন তাঁহারা নিজেদের মনের আদর্শ ও ধারণা অনুযায়ী অথবা প্রাণের নানা বাসনা কামনা অনুযায়ী কর্ম্ম করেন অথচ মনে করেন যে ভগবান তাঁহাদের ভিতর দিয়া ঐ কর্ম্ম করাইতেছেন—ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই। এরূপ ভ্রান্তি হয়, কারণ তাঁহারা ভগবানের যন্ত্র হইয়া নিষ্কামভাবে অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করার আদর্শটি শুধু মন দিয়াই বুঝিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র মন, প্রাণ, চৈতন্যকে তাহার জন্য প্রস্তুত করেন নাই। যতক্ষণ না আমাদের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে যত সূক্ষ্মভাবেই হউক 'ব্যক্তিগত বাসনা কামনার লেশ থাকিবে—ততক্ষণ আমরা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণা-সকলকেই ভগবানের বাণী ভগবানের প্রেরণা বলিয়া ভুল করিব। সকল সময়

সর্ব্বত্র ভগবানকে স্মরণ করা, সকল প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা কামনা, যশ মান প্রভাব প্রতিপত্তির কামনা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আধার হইতে দূর করা, আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া কি ভাবে চলিতেছে সর্ব্বদা যত্নের সহিত তাহা লক্ষ্য করা—একান্ত নিষ্ঠার সহিত এই সাধনার প্রয়োজন যতক্ষণ না ভগবান ভিতর হইতে আত্মজ্ঞানের পূর্ণ জ্যোতিতে, জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, সকল ভ্রান্তি ও আত্ম-প্রতারণার সম্ভাবনা দূর করিয়া দেন।

• **সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী**। গীতা বলিয়াছে যে-ব্যক্তি সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, সকল আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত যোগারূঢ়। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে কোন কর্ম্মই সম্ভব নহে, ন হি সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ, অতএব গীতা যে সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগের কথা বলিয়াছে তাহাতেই সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে গীতা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিল না কেন? বস্তুতঃ গীতার শিক্ষাই হইতেছে সঙ্কল্পত্যাগ করা কিন্তু কর্ম্মত্যাগ নহে; সাধারণতঃ লোকে সঙ্কল্পের বশেই কর্ম্ম করে তাহা সত্য, কিন্তু যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মের প্রেরণা আসে ঊর্দ্ধতর উৎস হইতে; সকল সঙ্কল্প ও সকল ব্যক্তিগত বাসনাকামনা ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস করিলে, তবেই সেই উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়—সেই জন্য যোগী হইতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হয়। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ যে মূলতঃ একই এই কথাটি গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে, অথচ শঙ্কর নিজ মত চালাইবার জন্য নানাভাবে এই কথাটি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করের যুক্তি এই—সঙ্কল্প হইতে সকল কামনার উৎপত্তি, কামনা না থাকিলে কোন কর্ম্ম সম্ভব নহে, সর্ব্বকামপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস সিদ্ধো ভবতি, অতএব সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে সকল কর্ম্ম আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ফল-কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কামনা ত্যাগ করিলেই কর্ম্ম ত্যক্ত হয় এই যুক্তির দুর্ব্বলতা বুঝিয়া শঙ্কর কর্ম্মত্যাগের সমর্থন করিতে অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা মহাভারতে ব্যাসবাক্য,

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥

—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৭৫।৩৭

অর্থাৎ "ঐক্যানুভূতি, সমতা, সত্যব্যবহার, শীল, স্থৈর্য্য, অহিংসা, সারল্য এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ানিচয় হইতে উপরতি, এই কয়টির ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য কোন ধন নাই।" আধুনিক মানবের ন্যায় রাজসিকতার বশে কর্ম্মের পর কর্ম্ম বাড়াইয়া

চর্য্যা যে ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শ নহে তাহা বলাই বাহুল্য এবং এইরূপ শাস্ত্রবাক্য অনেকই উদ্ধৃত করা যায়। গীতা নিজেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকে আদর্শ বলিয়াছে এবং স্পষ্ট বলিয়াছে যে, মানুষের মধ্যে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রজোগুণকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে মানুষ অসুরে পরিণত হয়, উগ্রকর্ম্মা হইয়া জগতের অশেষ অহিত সাধন করে (১৬।৯)। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে, ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে তিনি নিজে যদি অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম না করেন তাহা হইলে লোক তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কর্ম্ম বন্ধ করিবে, তামসিকতার কবলে পড়িয়া সমাজ উচ্ছন্ন যাইবে। গীতার শিক্ষার এই যে আর একটা দিক আছে শঙ্কর সেটিকে চাপা দিয়াছিলেন—ফলে সমগ্র ভারত আজ এমন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে আত্মরক্ষার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই তামসিকতা হইতে ভারতকে তুলিয়া আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে হইলে ব্যাপকভাবে রাজসিকতা প্রচারের খুবই সার্থকতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ রাজসিক কর্ম্মকেই যদি আমরা পাশ্চাত্য মতানুযায়ী মানবতার চরম আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে জগৎকে যে আলোক দেখাইতে ভারত যুগ যুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, ভারত স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। গীতায় সেই আদর্শের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে একদিকে শঙ্করের মায়াবাদমূলক ব্যাখ্যায়, অন্যদিকে আধুনিক ব্যাখ্যাকার-গণের পাশ্চাত্যভাবমূলক ব্যাখ্যায় তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছিল—শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব সাধনালব্ধ দিব্য দৃষ্টি লইয়া গীতার সেই অমৃতময়ী শিক্ষা আবার জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং নিজের অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে গীতার শিক্ষাকে গভীরতর পূর্ণতর রূপ প্রদান করিয়াছেন।

মহাভারতে যেমন কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা আছে, তেমনিই আবার কর্ম্মেরও প্রশংসা আছে। মহাভারত নিজেই এই দ্বন্দ্বের মীমাংসাও করিয়া দিয়াছে—

তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।

তস্মাদ্ধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥ বনপর্ব্ব ২।৭৪

অর্থাৎ "কর্ম্ম কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর, উভয়ই বেদাজ্ঞা। সেই হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে।"

তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহো যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ। অশ্বমেধপর্ব্ব ৫১।৩২

"অতএব যাহারা পারদর্শী তাহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

ভারতের এই সনাতন কর্ম্মযোগের আদর্শটি গীতা যে ভাবে প্রকট করিয়াছে এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আসক্তি ত্যাগ করিলেই কর্ম্মত্যাগ

হয়—ইহা কুত্রাপি গীতার শিক্ষা নহে, গীতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হইবে (যথা ২।৬৪, ৩।৭, ৯, ১৯; ৪।১৮—২৩, ১৮।৬, ১১, ২৩, ২৬ ইত্যাদি)।

কিন্তু এইরূপ আসক্তিত্যাগ সহজ নহে, অনেক সাধনা সাপেক্ষ। অনেকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতে মনে করেন যে তাহারা অনাসক্ত ভাবে জনকরাজার ন্যায় সংসারে আছেন। কিন্তু যখনই কোন বিপদ, শোক, পরাজয়, অপমান আসিয়া পড়ে তখনই তাহাদের পরীক্ষা হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে রাখিতে হইবে, "ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা অনেক দিন নির্জ্জনে তপস্যা করেছিলেন।" আবার অনেকে মনে করেন সাধারণের কাজ করা, রাজনীতিক কাজ করা, সমাজসেবা করা এই সবই গীতার কর্ম্মযোগ। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই সব কর্ম্মের পিছনে থাকে ঘোর আসক্তি, তাই দেখা যায় অনেকেই ইচ্ছা করিলেও রাজনীতিক ধরণের কার্য্য ছাড়িতে পারেন না। মানুষের অহং যাহা খুবই তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে—যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি—এ সব জিনিষ রাজনীতিক কর্ম্মের ভিতর দিয়া যেমন লাভ করা যায় তেমন আর অন্য কোন ক্ষেত্রে সম্ভব নহে, তাই রাজসিক প্রকৃতির লোক এই সব কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া পড়েন, এইরূপ কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলা আত্মপ্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি যেমন আমাদের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তেমনই কর্ম্মের প্রতি আসক্তিও রাজসিক প্রকৃতিতে বদ্ধমূল রহিয়াছে। স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ওকালতী করিতেছিলেন—তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে বলেন, "আপনার ত যশ, মান, অর্থ কিছুরই অভাব নাই—এইবার অবসর গ্রহণ করুন না কেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"সে সাধ্য আমার নাই—I work chained like a galley slave"। পুরাকালে ক্রীতদাসগণকে যেমন শিকলে বদ্ধ করিয়া দাঁড় টানান হইত—ইচ্ছা করিলেও সে কর্ম্ম তাহারা ছাড়িতে পারিত না, রজোগুণ মানুষকে সেইরূপ দৃঢ়ভাবে কর্ম্মে বদ্ধ করিয়া রাখে—

লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখত লিখে নিয়েছে তায়।

তাই যে ব্যক্তি এই বাঁধন কাটাইয়াছেন গীতা তাহাকেই যোগারূঢ় বলিয়াছে। প্রথম প্রথম ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে এই সব আসক্তি বর্জ্জন করা অভ্যাস করিতে হয়—কিন্তু যোগ সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে ইহা কখনই পূর্ণ হয় না।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

অন্বয়। আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন তু অবসাদয়েৎ ; হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ।

যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ ; অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্তেত।

অনুবাদ। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিও না ; কেননা আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।

যে মানব আত্মার দ্বারা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সে ব্যক্তির আত্মাই তাহার বন্ধু হয়, পরন্তু যে ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করে নাই তাহার পক্ষে আত্মা শত্রুবৎ হয় এবং শত্রুবৎ আচরণ করে।

ব্যাখ্যা

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং। আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধারসাধন করিবে, গীতা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়াছে (২।৬৪, ৩।৪৩, ৫।২১ ইত্যাদি), ইহাই আত্মসংযম, সকল অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম কথা। এখানে গীতা যে সাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন নহে। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু—"দোষ কারু নয় গো, মা, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" যে মানুষ নিজেকে কামক্রোধাদি রিপুর হস্তে ছাড়িয়া দেয় সে নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করে, আর যে যত্নের সহিত ইংন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম অভ্যাস করে সে অধ্যাত্ম জীবনের পরম সুখ ও শান্তির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু এই নির্দ্দেশের পিছনে যে দার্শনিক তত্ত্বটি রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তত সহজ নহে। আত্মা এক বই আর দুই নহে, আত্মা কখনও বদ্ধ হয় না, তাহা চিরমুক্ত—তাহা হইলে কে কোন্ আত্মার দ্বারা কোন আত্মার উদ্ধার সাধন করিবে? আত্মা বলিতে গীতা এখানে কি বুঝিয়াছে? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, আত্মা মনঃ আত্মনো জীবস্য, মনই জীবের বন্ধু। অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অনাসক্ত মনের দ্বারা, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আত্মার বা জীবের উদ্ধারসাধন করিবে। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ", বিষয়াসক্ত মনই জীবের বন্ধনের কারণ

এবং বিষয়বিমুক্ত মনই তাহার মোক্ষের কারণ। শঙ্কর এই শ্লোকে আত্মা শব্দের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, নিজেই নিজের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে, সাধারণভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তবে পরের শ্লোকে আত্মৈবাত্মনা জিতঃ ব্যাখ্যা করিতে তিনি বলিয়াছেন আত্মা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ যেন বশীকৃতঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ ইত্যর্থ, এখানে তিনি আত্মা শব্দে কার্য্যকারণসংঘাতরূপ দেহেন্দ্রিয়দিগকেই বুঝিয়াছেন। পরিব্রাজক ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভাবে প্রকাশিত এই শরীররূপ আত্মা বশীভূত হয় সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু।" শ্রীধর বলিয়াছেন, "আত্মাই মনের সঙ্গ (কামনা) হইতে উপরত (নিবৃত্ত) হইয়া আত্মার অর্থাৎ নিজের (আত্মনঃ স্বস্য) বন্ধু হয়।"

আত্মা শব্দ সংস্কৃত ভাষায় এবং বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মা শব্দে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল অধ্যাত্ম সত্তা বুঝায়, তাহাতে সে ভগবানের সহিত এবং সকল মানুষের সহিত এক। আত্মা শব্দে মন বুঝায়, আত্মা শব্দে দেহও বুঝায়। আবার সাধারণভাবে আত্মা শব্দে বুঝায়, "আমি স্বয়ং"। একজন বাঙ্গালী প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—"দেহ মন ও আত্মা লইয়া মানুষ। ইহার কোন একটির অপূর্ণতা থাকিলে মানুষের প্রকৃত বিকাশ হয় না।" কিন্তু আত্মা ত ব্রহ্মের সহিত এক, চিরপূর্ণ, তাহার আবার অপূর্ণতা কি? এখানে স্পষ্টতঃ আত্মা শব্দে ঐ মূল আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝাইতেছে—লেখকের পরবর্ত্তী বক্তব্য হইতেই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে—"যাহাদের শরীর ও মন এইরূপ অবিকশিত, প্রকৃত ধর্ম্মভাব, আত্মার প্রকৃত বিকাশ তাহাদের মধ্যে কতটুকু হইতে পারে?" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আত্মারও বিকাশ হয় এবং সেই বিকাশের অর্থ ধর্ম্মভাবের বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং তাহা শরীর ও মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে।

অতএব আমরা দেখিতেছি "আত্মা" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং গীতা যেন এখানে ইচ্ছা করিয়াই বিভিন্ন জিনিস বুঝাইতে এক "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে এবং এইভাবে নানারূপ অর্থের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, মনের ও বুদ্ধির স্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে গেলে অধ্যাত্ম সত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, তাহার নানা ব্যঞ্জনা ও ভাবকে ঠিক মত প্রকাশ করা যায় না, তাই আভাস; ইঙ্গিত, রূপক প্রভৃতির সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে হয়। উপরে যে নানারকম বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সবের মধ্যেই কিছু সত্য আছে, এবং সেই সত্যকে ধরিয়াই সাধনায় কার্য্যতঃ অগ্রসর হওয়া যায় এবং তাহাই গীতার উদ্দেশ্য। তথাপি গীতার নিজস্ব একটা

দার্শনিক তত্ত্ব আছে এবং সেটি বুঝিতে পারিলে গীতার সাধনার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করার সুবিধা হয়। সাধারণতঃ মানুষের জীবন আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, ইহা হইতেছে দেহ, প্রাণ ও মন লইয়া গঠিত, দেহ ও প্রাণের বাসনা কামনা লইয়াই মানুষের অধিকাংশ জীবন এবং ইহাতে সে পশুর সহিত সমধর্ম্মী, তবে তাহার মধ্যে মন বুদ্ধির কিছু ক্রিয়া আছে সেইজন্য সে শুধুই আহার, নিদ্রা, মৈথুনেই আবদ্ধ থাকে না—আর এই সব শারীরিক ও প্রাণিক কাজকেও বুদ্ধির দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত করে সেই জন্য তাহার জীবন পশুর স্তরের কিছু উর্দ্ধে উঠে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, এ-সব লইয়া হইতেছে তাহার প্রাকৃত সত্তা, natural being. ইহাদের অতিরিক্ত তাহার আত্মা আছে, মানুষ তাহাকে জানে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার এই বাহ্য প্রাকৃত জীবন ঐ নিগূঢ় আত্মারই আংশিক অভিব্যক্তি। গীতা অনেকটা সাংখ্যদর্শনের অনুসরণ করিয়া মানুষের এই আভ্যন্তরীণ জীবনের বর্ণনা দিয়াছে। (অন্য ভাবেও এই দার্শনিক বর্ণনা দেওয়া যায়—পঞ্চম অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যের অনুসরণ করিয়া গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ করিয়াছে—পুরুষ জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অনুমন্তা, আর প্রকৃতি কর্ম্ম করে—দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করে। সাংখ্যের পুরুষ যখন বদ্ধ তখন সে প্রকৃতির এই সব ক্রিয়ায় সায় দেয়, দেহ প্রাণ মনের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এই সবের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধির বিকাশে বুদ্ধি যখন এই ভ্রান্তি বুঝিতে পারে, পুরুষকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন পুরুষ প্রকৃতির ক্রিয়ায় আর সম্মতি দেয় না, তখন প্রকৃতির আর কোন প্রেরণা থাকে না, প্রকৃতির সকল ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষের চৈতন্যে আর প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া সংসারের সৃষ্টি করে না, পুরুষের সেই শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থিতিই মুক্তি, কৈবল্য। সাংখ্য মতে পুরুষের বদ্ধ অবস্থার পরে মুক্ত অবস্থা হয়। কিন্তু গীতার মতে একই সঙ্গে এই দুই অবস্থা থাকে—মানুষের মধ্যে ঐ মুক্ত পুরুষও রহিয়াছে, প্রথমটিকে গীতা বলিয়াছে অক্ষর পুরুষ, দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছে ক্ষর পুরুষ। ঐ দুই পুরুষ বস্তুতঃ একই আত্মার দুইটি ভাব বা পরস্থিতি। এক ভাবে আত্মা অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার উর্দ্ধে, প্রকৃতির কোন ক্রিয়াতে তাহার স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও মুক্তি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না। আর একভাবে আত্মা দেহ, প্রাণ, মনের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে, প্রকৃতির সহিত এক হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই যে দ্বিতীয় ভাব—এইটিই ব্যষ্টিগত পুরুষ, এইটিই চলিয়াছে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, বিকাশের ভিতর দিয়া। এই ব্যষ্টিগত পুরুষ যখন প্রকৃতির

যে গুণের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, যে গুণের ক্রিয়ায় সম্মতি দেয়, তখন মানুষের মধ্যে সেই গুণই প্রশ্রয় পায়, মানুষ প্রধানতঃ সেই গুণাত্মকই হইয়া উঠে—এই ভাবেই মানুষ হয় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। এই সকল অবস্থাই হইতেছে মানুষের প্রাকৃত জীবন। কিন্তু ঐ ব্যষ্টিগত পুরুষ বুদ্ধির বিকাশে যখন নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করে, তাহার মধ্যে যে অচল, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী আত্মা রহিয়াছে তাহাকেই নিজ স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করে তখন আর সে প্রকৃতির কোন গুণে আসক্ত হয় না, সে হয় গুণাতীত, মুক্ত। সাংখ্য মতে তখন প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতার মতে তখনই প্রকৃতির যে ঊর্দ্ধতর ক্রিয়া তাহার বিকাশ হয় এবং তাহাই অধ্যাত্ম জীবন। অতএব আত্মা বলিতে আমরা অক্ষর পুরুষ বুঝিতে পারি, ব্যষ্টিগত ক্ষর পুরুষ বুঝিতে পারি, আর যে দেহ প্রাণ মনের সহিত ব্যষ্টিগত পুরুষ অহঙ্কারের বশে নিজেকে এক করিয়া দেখে তাহাও বুঝিতে পারি—বস্তুতঃ আত্মা শব্দ এই সকল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইতেছে তাহার বর্ত্তমান প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে উঠা। তাহার মধ্যে যে ঊর্দ্ধতর জিনিষ রহিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার নিম্নতর জিনিষগুলিকে বশীভূত নিয়ন্ত্রিত করিয়াই মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতর অধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—তাহার পর ঐ সত্ত্বগুণেরই সাহায্যে গুণত্রয়ের ঊর্দ্ধে উঠিয়া অক্ষর পুরুষের দিব্য নিশ্চলতা ও শান্তি ও জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার সাধন করার ইহাই অর্থ।

আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে কোথা হইতে? কিসের মধ্যে আত্মা নিমগ্ন বা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে? শঙ্কর বলিয়াছেন, সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনা আত্মানং উৎ ঊর্দ্ধং হরেদুদ্ধরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, সংসারনিমগ্ন আত্মাকে আত্মার সাহায্যেই সেই সংসার হইতে ঊর্দ্ধে উঠাইবে অর্থাৎ ধ্যানযোগে আরূঢ় থাকিবে। শঙ্করের মতে গীতা এখানে সংসার ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সমাধিতে লীন থাকিবারই উপদেশ দিতেছে। কিন্তু আত্মাকে যদি সংসার হইতে অর্থাৎ এই দেহ, প্রাণ, মনের জীবন হইতে সরিয়াই যাইতে হইবে তাহা হইলে এই সংসারের সৃষ্টিই বা হইল কেন, আর চৈতন্যময় জ্ঞানময় আত্মা তাহার মধ্যে আসিলই বা কেন, বদ্ধ হইল কেন? শঙ্করের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর সহজ,—সংসার কোন দিনই সৃষ্ট হয় নাই, দেহ প্রাণ মন এ-সবই ভ্রান্তি, মায়া; মরীচিকায় জলের ন্যায় ইহাদের কোন বাস্তব সত্তা বা অস্তিত্ব নাই, আত্মার বন্ধনও ভ্রান্তি, এই ভ্রান্তি দূর করিলেই সংসারের শেষ হয়, আত্মা তাহার নিত্য মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ইহাতেও সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। সংসার যদি ভ্রান্তি, মায়া, তাহা হইলে চৈতন্যময় আত্মা এই ভ্রান্তির মধ্যে, অজ্ঞানের মধ্যে কেমন করিয়া পতিত হইল? শঙ্কর ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না; তিনি বলেন যে, এই রকমই হয়, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, জীব মায়ায় বদ্ধ হইয়া সংসারের মিথ্যা সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে—জ্ঞানলাভ করিলেই ইহা হইতে মুক্তি পায়, অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মায়া কি, কেমন করিয়া সে আত্মাকে বিভ্রান্ত করে সে-সব ব্যাপার মানববুদ্ধির অতীত, সে তত্ত্ব প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

ইহাই মূলতঃ শঙ্করের মায়াবাদ। দর্শনশাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য—জীব, জগৎ, ভগবান এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের যুক্তিযুক্ত সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া, মায়াবাদ তাহা দিতে পারে না, সব ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালী বলিয়া রাখিয়া দেয়, দার্শনিক মতবাদ হিসাবে এইটিই হইতেছে মায়াবাদের চরম দুর্ব্বলতা। গীতার এই দুর্ব্বলতা নাই। গীতা যে দার্শনিক মত অনুসরণ করিয়াছে তাহাতে জগতের একটা যুক্তিসঙ্গত সন্তোষজনক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই জন্য গীতা অনেকটা সাংখ্যদর্শনেরই অনুসরণ করিয়াছে; সাংখ্যমতে এই জগৎ মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে, ইহা প্রকৃতির ক্রিয়া; আর যেমন পুরুষ সত্য, অনাদি, অনন্ত ঠিক তেমনিই প্রকৃতিও সত্য, অনাদি, অনন্ত—ইহাদের কোনটি মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে অথবা সদসৎ, একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ, আছে এবং নাই এইরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ নহে। উভয়েই সৎ, উভয়েই চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকিবে (গীতা ১৩।১৯-২৩)। তবে সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি বিভিন্ন পদার্থ, কোন রকমে দুইয়ের যখন সংযোগ হয় তখনই এই সংসারের উদ্ভব হয়, প্রকৃতি এই পঞ্চভূতাত্মক জড়জগৎ এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধিসহ অন্তর্জ্জগত বিকাশ করে—প্রকৃতির এই সব ক্রিয়া পুরুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়, তাহাতে পুরুষের চৈতন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না, তথাপি পুরুষ ঐ সংসারলীলা উপভোগ করে। যখন পুরুষ আর ঐ খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে না, প্রকৃতির খেলায় সম্মতি দেয় না, তখনই সংসারের শেষ হয়, প্রকৃতি আপনার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে এমন ত দেখা যায় না। দুই চারি জন মানুষ সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিলেও সংসার, জগৎ, যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকে, তাই সাংখ্য বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, পুরুষ এক নহে বহু, কোন পুরুষের নিকট প্রকৃতির সংসারলীলা বন্ধ হইলেও, অন্যের নিকট চলিতে থাকে।

গীতা যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের চরম ভেদ স্বীকার করে নাই তেমনই পুরুষের চরম বহুত্বও স্বীকার করে নাই। গীতা বলিয়াছে সাংখ্য যে বর্ণনা দিয়াছে জগৎ দৃশ্যতঃ সেইরূপই বটে কিন্তু উহাই সব নহে, চরম তত্ত্ব নহে, উহা অপেক্ষাও চরম তত্ত্ব আছে এবং তাহার মধ্যে এমন সব বিরোধেরই মীমাংসা হইয়াছে যাহাদের মীমাংসা সাংখ্যদর্শনের গণ্ডীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই ভাবে সাংখ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গীতা বেদান্তের ভিত্তিতে এক উদার মহান দার্শনিক সমন্বয় সিদ্ধ করিয়াছে এবং তাহার উপর এক অতি উদার ও মহান পূর্ণযোগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গীতার মীমাংসা হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে দুইটি আত্মা, দুইটি পুরুষ একই সঙ্গে রহিয়াছে—একটি নির্ব্যক্তিক বিশ্বাত্মক চিরমুক্ত, অচল অটল অক্ষর; আর একটি ব্যক্তিক, ব্যষ্টিগত, প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করিয়া প্রকৃতিকে উপভোগ করিতেছে। উপনিষদে একই বৃক্ষে দুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে (৫ম অধ্যায় ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)—নীচের পক্ষীটি একটি স্বতন্ত্র সত্তা নহে, উর্দ্ধের পক্ষীটিরই একটি ভাব; প্রথম পক্ষীটি যখন ইহা উপলব্ধি করে তখনই সে অন্য পক্ষীটিরই ন্যায় মুক্ত হয়—কিন্তু তখনও তাহার সংসার ভোগ দূর হয় না, কেবল পূর্ব্বে সে নিজেকে প্রকৃতির বশ করিয়া দিয়াছিল, এখন সে প্রকৃতির প্রভুরূপে সংসারকে উপভোগ করে। আর ইহা সম্ভব হয় কারণ এই দুইটি পুরুষ দুইটি বিভিন্ন সত্তা নহে, একই পুরুষের দুইটি দিক, দুইটি ভাব, একই সঙ্গে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি এই দুইয়েরই অতীত, তাই তাঁহাকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করা হইয়াছে (১৫।১৮)। এইটিই গীতার গুহ্যতমং শাস্ত্রং।

তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এই যে ব্যষ্টিগত আত্মা এইটিরই বন্ধন ও মুক্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয়—বস্তুতঃ ইহা কখনই বদ্ধ হয় না, তবে প্রকৃতির সহিত ইহার যেরূপ ব্যবহার তাহাকে মন বুদ্ধির ভাষায় বন্ধন ও মুক্তি বলা যাইতে পারে এবং সাধারণতঃ বলা হইয়াও থাকে। ক্ষর-পুরুষই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহার ব্যষ্টিগত আত্মা হইয়াছেন, তাহার ব্যক্তিক সত্তার বিকাশ করিতেছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি।

মনে রাখিতে হইবে যে ক্ষর পুরুষই জীব বা জীবাত্মা নহে। ক্ষর পুরুষ স্বয়ং ভগবানই। ভগবানের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে এবং বহুত্বও রহিয়াছে। তিনি একই সঙ্গে এক এবং বহু, বহু হইয়াও তাঁহার একত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না, যেমন স্বর্ণ বহু অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করিলেও সেই একই স্বর্ণ থাকে। বহুর ভিতর দিয়া সেই একেরই প্রকাশ হয়। ভগবানের যে একত্বের দিক সেইটিই অক্ষর পুরুষ, তাঁহার

যে বহুত্বের দিক সেইটিই ক্ষর পুরুষ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা রহিয়াছে, তাহা ভগবানেরই অংশ, জীবলোকে জীব হইয়াছে (১৫।৭)। জীব যখন নিজকে দেহ প্রাণ মনের সহিত এক করিয়া দেখে, অন্যান্য জীব হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে, বহু জীবের মধ্যে একটি জীব বলিয়া মনে করে সেইটি হয় তাহার ক্ষরভাব। আর যখন সে উপলব্ধি করে যে মূল সত্তায় সে ভগবানের সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত এক, তখনই হয় তাহার অক্ষর ভাব। জীব যখন তাহার ভিতরের এই অক্ষরভাবকে ভুলিয়া যায়, ক্ষরভাবেই আসক্ত হইয়া পড়ে তখনই হয় তাহার বন্ধন।

এই বন্ধনও বৃথা নহে, জীব ইচ্ছা করিয়াই এই বন্ধনে বাঁধা পড়ে কারণ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে ভগবানের অংশরূপে জীবালোকে আবির্ভূত হইয়াছে—এই বন্ধনের ভিতর দিয়াই তাহা সিদ্ধ হয়। সে উদ্দেশ্য কি? সে উদ্দেশ্য হইতেছে, এই প্রাকৃত জড় জগতে সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, সান্তের মধ্যে অনন্তকে প্রকট করিবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। সেইজন্যই তাহাকে সান্ত দেহ, প্রাণ, মন গঠন করিয়া এই জড়জগতেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের আধার সৃষ্টি করিতে হয়, ঈশা বাস্যম্। মানুষ যেমন পৃথিবী হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার বাসের গৃহ নির্ম্মাণ করে, জীবাত্মা তেমনিই প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে (১৫।৭)। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এই সবই জড় নিশ্চেতন প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে—প্রাচীনকালে সাংখ্য দর্শন এই মত প্রচার করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানও এই তথ্যে উপনীত হইয়াছে—ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে জড় প্রকৃতি হইতে ক্রমশ উদ্ভিদ্, জন্তু এবং শেষে মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু জড় নিশ্চেতন প্রকৃতি কেমন করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য বিকাশধারায় অগ্রসর হইয়াছ, কে তাহাকে নিশ্চিতভাবে এই মহান কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। সাংখ্য সে সন্ধান দিয়াছে। পুরুষের সংস্পর্শেই প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হইয়াছে—ইহার জন্য পুরুষকে প্রকৃতিতে আসক্ত হইতে হইয়াছে, প্রকৃতি-স্থ হইতে হইয়াছে, প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতে হইয়াছে। ইহাই পুরুষের নিমজ্জন, তাহার সংসার বন্ধন (৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু এইখানেই বিবর্ত্তনের শেষ হয় নাই, দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশে মানবের আবির্ভাব হইয়াছে বটে কিন্তু সেই মানবীয় আধারে এখনও সচ্চিদানন্দের প্রকাশ হয় নাই, ইহার জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্ম শক্তিতে দেহ, প্রাণ, মনের অধ্যাত্ম রূপান্তর

সাধন করা। এবং ইহার জন্য মানুষের অন্তঃপুরুষকে প্রকৃতির বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, সে মূলতঃ যে আত্মা তাহাকে লাভ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহাই হইতেছে পুরুষের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি, তাহার উদ্ধার সাধন। ইহার জন্য মানুষকে জানিতে হইবে যে, সে ভগবানের অংশ, আর ভগবান শুধুই ক্ষর নহেন, শুধুই অক্ষরও নহেন আবার শুধুই বিশ্বের অতীত, সকল সম্বন্ধের অতীত অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় সত্তা নহেন—তিনি একই সঙ্গে এই সব। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া মানুষকে তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে—তখন তাহার এই মর্ত্ত্য দেহ প্রাণ মনই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়া উঠিবে।

অতএব আমরা যে বলি আত্মার বিকাশ হইতেছে, আত্মার উন্নতি হইতেছে অবনতি হইতেছে, জিতাত্মা, নষ্টাত্মা (১৬।৯) ইহা আমাদের প্রকৃত আত্মা বা অধ্যাত্ম সত্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা আত্মার যে পরিচয় দিয়াছে, আমাদের এই দেহের মধ্যে যে দেহী বা অন্তঃপুরুষ বাস করিতেছে তাহার যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছে তাহাতে তাহার কখনও বিনাশ নাই, ব্যয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, বিকার নাই (২।১৬ – ৩০)। পরিবর্ত্তন চলিতেছে প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে। কিন্তু অজ্ঞানের বশে আমাদের মন ও বুদ্ধি আমাদের এই বাহ্য প্রাকৃত সত্তাকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করে—এই ভ্রমাত্মক আত্মাকে নীচের আত্মা, প্রাকৃত আত্মা, আভাস আত্মা বলা যাইতে পারে। এই প্রভেদটুকু মনে রাখিলে গীতায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে আত্মা শব্দের ব্যবহারে কোন গোলমাল হইবার আশঙ্কা থাকিবে না, কোথায় আত্মা কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে কোন্ জিনিষটিকে বুঝাইতেছে পূর্ব্বাপর বক্তব্য হইতে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। আর এই প্রাকৃত আত্মাকে আত্মা বলা একেবারেই যে ভ্রম তাহাও নহে, কারণ ইহা হইতেছে প্রকৃতির মধ্যে আত্মারই রূপ, প্রকাশ, প্রতিফলন। বাইবেলে বলা হইয়াছে, Man is made in the image of God, মানুষ ভগবানেরই একটি রূপ। আমাদের দেহ, প্রাণ, মন আত্মা নহে—কিন্তু ইহারা সকলেই আপনভাবে আত্মার অনন্ত সচ্চিদানন্দ সত্তাকে সীমার মধ্যে প্রকট করিতেছে। এই প্রকাশ বা প্রকটনই চলিতেছে বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। জড়ের মধ্যে সচ্চিনানন্দ ভগবানের প্রকাশ কিছুই নাই বলিয়া মনে হয়—উহা যেন একেবারে ভগবানের বিপরীত, উহাতে যেন চৈতন্যের লেশ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ জড়ের মধ্যে চৈতন্য দেখিতে না পাওয়া যাইলেও, সেখানেও চৈতন্য রহিয়াছে ভিতরে সুপ্ত, বাহিরে প্রকাশ পাইবার মত উপযুক্ত সংগঠন (organisation) সেখানে নই। জড়ের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাবের পর সেই সংগঠন দেখা দিয়াছে। তাই বলা যাইতে পারে প্রাণী বা

পশুর মধ্যেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ, প্রথম রূপ—তাই বলা হয় মৎস্য অবতারই ভগবানের প্রথম অবতার। ক্রমশঃ যেমন এই প্রাণ সংগঠনের বিকাশ হইয়াছে, প্রাণের মধ্যে মন দেখা দিয়াছে তখন সেখানে ভাগবত জ্যোতিরও প্রকাশ হইয়াছে অধিক এবং এই হিসাবে এ-পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যেই হইয়াছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, ভগবানের নর অবতারই হইয়াছে এ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবতার। মানুষ মানুষ থাকিয়াই তাহার ভাগবতভাবের বিকাশ কতটা করিতে পারে' রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আসিয়া তাহা মানবজাতিকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শে, তাঁহাদের শিক্ষা ও প্রভাবে মানুষ তাহার অধ্যাত্ম দিব্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু মানুষের বিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—দুই চার জন মানুষ অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিয়া তাহার সম্ভাবনা মানুষকে দেখাইয়া দিলেও জাতি হিসাবে মানুষ এখনও পশুর স্তরের খুব বেশী উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। তাহার মধ্যে যে মন বুদ্ধির খেলা লইয়া তাহার মানবত্ব তাহা তাহার দেহ ও প্রাণের অশুদ্ধ অসংস্কৃত ক্রিয়ায় এখনও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে—এই অবস্থা হইতে তাহাকে উর্দ্ধে অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে উত্তোলন করাই মানবজাতির প্রকৃত উদ্ধার সাধন, তখনই মানব সমাজের, মানবজীবনের সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে এবং আজ সেই সমাধানেরই দিন আসিতেছে—মানবজাতি আঘাতের পর আঘাত পাইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে যে এই নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিলে আর চলিবে না।

মানবজাতির এই সাধারণ উদ্ধার সাধন প্রথম প্রথম ব্যক্তির ভিতর দিয়াই আরম্ভ হয়, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে পথ দেখান ইতরজন তাহারই অনুসরণ করে (৩।২১)। শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে কিরূপ সাধনা করিতে হইবে—গীতা আদর্শ মানুষ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই শিক্ষা দিয়াছে।

কিন্তু মানুষ কি করিবে না করিবে সে-বিষয়ে কি তাহার স্বাধীনতা আছে? মানুষ যদি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির বশ হয়, তাহা হইলে সে নিজের চেষ্টায় কেমন করিয়া নিজেকে উদ্ধার করিবে? সকল নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র ধরিয়া লয় যে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গঠন করে, নতুবা নীতি উপদেশের, অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে উপদেশের কোন সার্থকতাই থাকে না। অথচ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মানুষ যে মনে করে সে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করে এটা ভ্রম। পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা মানুষের প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র যে-ভাবে গঠিত হইয়াছে, মানুষ বাধ্য হইয়া সেইভাবে কর্ম্ম করে—সে ইচ্ছা করিলেও তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। গীতাও অতি স্পষ্টভাষায় প্রকৃতির নিকট মানুষের এই বশ্যতার কথা বলিয়াছে।

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহে নাই, কিন্তু ভগবান বলিলেন, "তোমার এ সঙ্কল্প বৃথা," অর্জ্জুন। তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ১৮।৬০

কিন্তু তাহার পরেই বলিলেন, "আমি তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান উপদেশ দিলাম; এখন ইহা বিবেচনা করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর"—

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু। ১৮।৬৩

কিন্তু মানুষ কি ইচ্ছা করিবে না করিবে সে বিষয়ে যদি তাহার কোন স্বাধীনতা না থাকে, পূর্ব্ব কর্ম্ম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্ঘ্যভাবে যদি তাহার ইচ্ছা নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর"—একথা বলিবার সার্থকতা কি? গীতা একদিকে মানুষের উপর প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভুত্বের কথা বলিয়াছে (৩।৩৩, ২৭ ইত্যাদি) অথচ কি করিতে হইবে না হইবে সে-বিষয়ে অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মানুষকে বলপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করান হইলে তাহার জন্য সে দায়ী বা দোষী হয় না; কিন্তু স্বেচ্ছায় সে যে কর্ম্ম করে তাহার জন্য সে দায়ী। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, মানুষ কি ইচ্ছা করিবে সে বিষয়ে তাহার কোন স্বাধীনতা আছে কি না। কি করিবে না করিবে এটা যদি মানুষ নিজে নির্ণয় করিতে পারে তাহা হইলেই বলিতে পারা যায় সে স্বাধীন। মানুষের এইরূপ স্বাধীনতা আছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুইটি। প্রথম, সকল মানুষই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম করিবার সময়ে বোধ করে যে সে স্বাধীনভাবেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে; দ্বিতীয়তঃ, মানুষ তাহার সকল স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। ইহা হইতেই মানুষের মধ্যে পাপ পুণ্যের বোধ আসে—তাহার মধ্যে স্বভাবতঃ যে বিবেক (Conscience) আছে তাহা তাহাকে পাপ করিতে নিষেধ করে, পুণ্য করিতে প্রেরণা দেয়। মানুষ যদি এই নির্দ্দেশ অবহেলা করে বা ইহার বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে তাহাকে বিবেকের দংশন অনুভব করিতে হয়, এবং মানবজীবনের অনেক দুঃখ ও বেদনার উৎপত্তি এইভাবেই হইয়া থাকে। আর মানুষের মধ্যে এই যে পাপপুণ্যের বোধ ইহার দ্বারা মানুষ অসৎ ও অশুভ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সৎ ও শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এইভাবে একদিকে যেমন সমাজে সুশৃঙ্খলা বজায় থাকে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের আত্মবিকাশে সহায়তা হয়। সেইজন্য প্রাচীনকাল হইতেই দার্শনিকগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পাপপুণ্যের বোধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম, নীতিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান নানাভাবে ইহার সমর্থন করিয়াছে। ধর্ম্ম

পরকালে স্বর্গের আশা, নরকের ভয় দেখাইয়া ইহার সমর্থন করিয়াছে, সমাজ প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা মানুষকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত, অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত করিয়াছে। রাষ্ট্র পুরস্কার ও দণ্ডের দ্বারা ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর হইতে শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানবজীবন, মানবসমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ দূর হয় নাই, এবং সংসারে যত অশুভ ও অমঙ্গল আছে, পাপের মত এমন অশুভ আর কিছুই নাই, পাপের দ্বারা যে শুধু অপরের অনিষ্ট করা হয় তাহাই নহে, যে ব্যক্তি পাপ করে সে নিজেই নিজের অনিষ্টাচরণ করে। সকলকেই আপন আপন পাপের ফল ভোগ করিতে হয়, পাপের ফলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এবং সে দুঃখ অনেক সময় যে-পাপ করা হইয়াছে তাহার তুলনায় মাত্রায় অনেক অধিক হইয়া পড়ে।

তবে মানুষ পাপ করে কেন? মানুষকে কে যেন জোর করিয়া পাপ করায়। অর্জ্জুন ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩।৩৬

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, পাপেই মানুষের জন্ম, মানবজীবনের সহিত পাপ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, এ জীবন পরিত্যাগ না করিলে পাপ হইতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ভারতের মায়াবাদের শিক্ষাও ইহার অনুরূপ—মায়া হইতে এই সংসারের সৃষ্টি, মায়া হইতেছে মূলতঃ মিথ্যা, অসৎ, অতএব এই সংসারও মিথ্যা, অসৎ, অশুভ—এই অশুভ সংসার হইতে সরিয়া যাওয়া, সন্ন্যাসী হওয়াই হইতেছে সংসারের সকল দুঃখ ও পাপ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র পন্থা। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, পাপ যদি মানুষের মজ্জাগত, প্রকৃতি যদি মানুষকে জোর করিয়া পাপে প্রবৃত্ত করায়, তাহা হইলে তাহাকে পাপময় সংসার ত্যাগ করিতে বলার সার্থকতা কি, তাহার স্বাধীনতা কোথায় যে সে এই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে? মায়াবাদ এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই।

কিন্তু গীতা সমস্ত সংসারকে সমস্ত মানবজীবনকেই এই ভাবে মিথ্যা, অশুভ, পাপময় বলে নাই। মানুষের মধ্যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে এমন কোন জিনিষ রহিয়াছে যাহা যেন জোর করিয়াই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়, গীতা তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে এবং যাহারা শ্রেয় চায়, কল্যাণ চায় তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই পরম শত্রুটিকে বধ করিতে উপদেশ দিয়াছে,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭

কিন্তু কাম ক্রোধ যে মানবপ্রকৃতিতে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা হইলে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই। এটা ঠিকই যে মানুষ কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সেটা করিবে কিনা বুদ্ধির দ্বারা তাহা বিচার করে এবং কয়েকটি পথের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লয়, এই জন্যই মনে হয় যে সে স্বাধীনভাবেই কর্ম্ম করিতেছে—কিন্তু এই স্বাধীনতা একটা ভ্রম, মানুষ কোন্ পথটা বাছিয়া লইবে তাহা নানা কারণের উপর নির্ভর করে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপরে নহে, যেমন কারণ হইবে মানুষ সেইরূপই নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য। অতএব যেমন প্রাকৃত জগতে অলঙ্ঘ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা রহিয়াছে, মনোজগতেও ঠিক সেইরকম রহিয়াছে, মানুষের ইচ্ছা তাহার সংস্কার, অভ্যাস, শিক্ষা দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা অলঙ্ঘ্য ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, সে ইচ্ছার বস্তুতঃ কোনই স্বাধীনতা নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলিয়াছেন—"Honestly I cannot understand what people mean when they talk about the freedom of the human will." গীতাও প্রায় আইনষ্টাইনের ভাষাতেই বলিয়াছে যে, প্রকৃতির গুণ-সকলই সব কর্ম্ম করে, অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া মানুষ মনে করে যে তাহার "অহং" বুঝি কর্ম্ম করিতেছে।

দেখা যায় একই পারিপর্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে কর্ম্ম করে। ক্ষুধার তাড়নায় একজন লোক চুরি করে, কিন্তু আর একজন না খাইয়া মরে তথাপি চুরি করিতে অগ্রসর হয় না। এখানে বলিতে পারা যায় মানুষ ক্ষুধারূপ কারণের দ্বারা একইভাবে যে চালিত হয় না, তাহার কারণ তাহার একটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় লোকটি বাল্যাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে, প্রথমটিও যদি ঠিক সেইরূপ পাইত তাহা হইলে সেও চুরি করিত না, পাপ করা অপেক্ষা না খাইয়া মরাকেও শ্রেয় জ্ঞান করিত। এক জন্মের শিক্ষা দীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। হিন্দুমতে পূর্ব্ব জন্ম আছে, পূর্ব্ব জন্মে আমরা যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, এ-জন্মে আমাদের প্রকৃতি, আমাদের স্বভাব সেইভাবে গঠিত হয়, এবং আমাদের জীবন ও কর্ম্মের ধারা তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানুষের বাস্তবিক যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোনই দায়িত্ব থাকে না। ব্যাঘ্র ক্ষুধার বশে জীব হত্যা করিলে আমরা যেমন তাহাকে পাপী বলি না, তেমনই কাম ক্রোধের বশে মানুষ যদি কোন কর্ম্ম করে আমরা কেন তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করি, তাহাকে পাপী বলিয়া অভিহিত করি? এইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিলে, নৈতিকতার পাপপুণ্য ভেদের

ভিত্তি ধ্বংস হইয়া যায়, নৈতিক উপদেশের কোনই সার্থকতা থাকে না সেই জন্য প্রাচীনকালে প্রায় সকল দার্শনিকই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে এবং নৈতিকতার সমর্থন করিয়াছে ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মানুষের মনোভাব বিভিন্ন, পাপপুণ্যের প্রভেদকে তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় মূল্য দেয় না। তাহারা এমন পর্য্যন্ত বলে যে, নৈতিকতার দ্বারা মানব জীবনকে ক্লিষ্ট করা হইয়াছে, মানুষের দুঃখ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—পাপ বলিয়া কিছু নাই, মানুষ যাহা করে, স্বভাবের বশেই করে অতএব সে জন্য তাহাকে নিন্দা করার কোনই সার্থকতা নাই। পাপ করিলে নরকে যাইতে হইবে, পুণ্য করিলে স্বর্গে যাইতে হইবে—এ-সব কথায় আধুনিক মানব বিশ্বাস করে না—পাপ পুণ্যকে তাহারা একেবারে উড়াইয়া দিতে চায়।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যদেশের অধিকাংশ মনীষীই Free-will, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করেন, তাঁহারা Determinism of Nature, প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘ্যতারই পক্ষপাতী। জড়বিজ্ঞানে Law of Causationএর রাজত্ব, কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার কড়াকড়ি দেখিয়াই তাঁহারা এইরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। অধ্যাপক হাক্সলে বলেন, "The conception of constancy of the order of Nature has become the dominant idea of modern thought." অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের নিয়মবদ্ধতাই হইতেছে আধুনিক চিন্তাধারার বিশিষ্ট লক্ষণ। আর আমরা যদি প্রকৃতির এই কড়া নিয়ম স্বীকার করি তাহা হইলে মানুষ যে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারে তাহা মানা চলে না। জড়জগতের ন্যায় মনোজগতেও যে ঐ একই কার্য্য-কারণ নীতি কার্য্য করিতেছেঃ ফ্রয়েড প্রভৃতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মনোবিকলনের দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চত্য দার্শনিক ক্যাণ্ট স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন indirectly, পরোক্ষভাবে—স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলে Morality বা নৈতিকতা সম্ভব হয় না, মানুষকে আর তাহার কোন কর্ম্মের জন্য দায়ী করা চলে না ; নৈতিকতা ও দায়িত্ব মানিতেই হইবে, অতএব স্বাধীন ইচ্ছাও মানিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান দেখাইতেছে free-will স্বাধীন ইচ্ছা কেবল একটা illusion, মিথ্যা ধারণা—এই মতবাদের ফলে Morality নৈতিকতাও illusion বা মিথ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গীতার মত এই আধুনিক মতেরই অনুরূপ—গীতা নৈতিকতাকে, পাপ পুণ্যকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। গীতা বলিয়াছে, যোগ সাধনার দ্বারা যাহারা ঊর্দ্ধের চৈতন্য লাভ করে তাহারা পাপপুণ্য উভয়েরই ঊর্দ্ধে চলিয়া যায় (২।৫০)।

ঊর্দ্ধতর ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে পাপপুণ্যের স্থান নাই। মানুষ এখন অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে তাই তাহার মধ্যে পাপপুণ্যের বোধ রহিয়াছে (৫।১৫)। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে, ততক্ষণ পাপপুণ্য তাহার নিকট সত্য, তখন যদি সে এই বোধকে অবহেলা করে তবে তাহার ঊর্দ্ধগতি বিপর্য্যস্ত হয়, যাহারা দুষ্কর্ম্মে রত থাকে তাহারা কখনই ঊর্দ্ধের ভাগবত চৈতন্যের শান্তি, শক্তি, জ্যোতি আনন্দের মধ্যে উঠিতে পারে না, ভগবানকে লাভ করিতে পারে না (৭।১৫)। এইখানেই হইয়াছে গীতার সহিত আধুনিক চিন্তাধারার মূলগত প্রভেদ—আধুনিক মানব ভগবান বা ভাগবত চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না, মানুষের বর্ত্তমান অজ্ঞানতার মধ্যে থাকিয়াই পাপ পুণ্যকে উড়াইয়া দিতে চায়, প্রকৃতির বশে মানুষ যাহা করে তাহাতে কোন পাপ হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চায়। কিন্তু ইহা মানবসমাজ, মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের দিকেই লইয়া যাইবে। মানুষের প্রকৃতিতে এমন অনেক জিনিষ রহিয়াছে যাহা তাহার বিকাশ ও উন্নতির পরিপন্থী ও ধ্বংসমুখী—মানুষের প্রকৃতি হইতে এই সব অশুভ জিনিষগুলিকে দূর করিতেই হইবে, এইগুলিই হইতেছে সকল পাপের মূল—ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিতেই হইবে।

কিন্তু মানুষের যদি বাস্তবিক কোন স্বাধীনতা না থাকে, মানুষ যাহা করে সবই প্রকৃতির বশে করে, তাহা হইলে সে কেমন করিয়া তাহার প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে যাইবে, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যাণ্ট এই প্রশ্নের যে সমাধান দিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য—তিনি বলেন যে মানুষের যে প্রাকৃত জীবন তাহাই তাহার সব নহে, তাহার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় জীবন রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য—মানুষ একই সঙ্গে দুই জগতের অধিবাসী, ইন্দ্রিয়ময় জগৎ (Sensuous world) এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ (Supersensuous world)। মানুষ যতখানি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অধিবাসী, অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বাসনা কামনা লইয়া তাহার যে জীবন তাহাতে সে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মের অধীন, তাহার ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু সে যতখানি বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের অধিবাসী ততখানি সে মুক্ত, সেখানে সে ভিতর হইতে নিজেই স্বাধীনভাবে নিজেকে চালিত করে। কিন্তু এই যে একটা অতীন্দ্রিয়জগৎ যেখানে মানুষ মুক্ত, যেখানে সে প্রকৃতির বা ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে—ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ক্যাণ্ট বলেন যুক্তিতর্কের দ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে স্বাধীনতার বোধ রহিয়াছে, পাপপুণ্যের বোধ রহিয়াছে, বিবেক রহিয়াছে ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, একটা অতীন্দ্রিয় জীবন আছে যেখানে মানুষ স্বাধীন—মানুষ যদি ইন্দ্রিয়ভোগে যে সুখ আছে তাহার অনুসরণ না করে, তাহার শুদ্ধবুদ্ধি

যে কর্ত্তব্যের প্রেরণা দেয়, আপাতদুঃখকর হইলেও তাহা অনুসরণ করে তাহা হইলে মানুষ এই প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া ঐ অতীন্দ্রিয় জীবনের অধিকারী হয়। সেখানে প্রাকৃতজীবনের ন্যায় কর্ত্তব্যপালন ও সুখ এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই—মানুষ বুদ্ধিগত জীবনেই পরম আনন্দ লাভ করে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ক্যাণ্ট এই যে মানুষের দুই রকম প্রকৃতির বিভেদ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ময় ও অতীন্দ্রিয় জীবনের প্রভেদ করিয়াছেন—ইহা ভারতীয় অধ্যাত্ম শিক্ষার, বিশেষতঃ গীতার শিক্ষারই অনুরূপ এবং অধুনা বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয় দার্শনিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূল প্রভেদটি বুঝা যাইবে এবং গীতার মূলশিক্ষাটিও পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমেই বলা যাইতে পারে, ক্যাণ্ট যে অধ্যাত্ম জগৎ ও প্রাকৃত জগতের প্রভেদ করিয়াছেন, যে প্রভেদের উপর তাহার নৈতিকতার ভিত্তি, তাহার সমগ্র দর্শনের ভিত্তি, পাশ্চাত্য জাতিসকল আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাহা গ্রহণ করে নাই। ইন্দ্রিয়গত জীবন বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ বুদ্ধিগত নৈতিকতার জীবন যাপন করা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুযায়ী শিক্ষা হইলেও, খ্রীষ্টান জাতিগণের উপর তাহার প্রভাব কার্য্যতঃ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ক্যাণ্ট যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, আধুনিক মানুষের নিকট তাহা সন্তোষজনক নহে। আধুনিক মানব সকল জিনিষই যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত করিতে চাহে, জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য্যময় সাফল্য এই মনোভাবকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে—অথচ ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, ভগবান, আত্মা, অমরত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ব যুক্তিতর্কের বিষয় নহে—যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সব প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না। তাঁহার মতে এ-সব হইতেছে বিশ্বাসের জিনিষ, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর"। ক্যাণ্ট বলেন, মানুষের অন্তরের মধ্যে স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস আছে, পাপপুণ্য বোধ আছে, দায়িত্ব জ্ঞান আছে—তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের স্বাধীনতা সত্য। কিন্তু প্রাকৃত জগতে মানুষের স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব নিশ্চয়ই একটা জগৎ আছে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা আছে, সেইটি অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়জগৎ। মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে এই দুইটি জগৎ রহিয়াছে, এইটি মানুষের বৈশিষ্ট্য যে, সে একই সঙ্গে দুই জগতের অধিবাসী। কিন্তু আধুনিক বিশ্লেষণ দেখাইতেছে যে, মানুষের মধ্যে ঐ যে স্বাধীনতার বোধ, পাপপুণ্যের বোধ—ঐটা একটা ভ্রম (Illusion); সমাজ নিজ সুবিধার জন্য বিধিনিষেধের রচনা করিয়াছে, শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা মানুষকে ঐ সব বিধিনিষেধ

পালন করিতে বাধ্য করিয়াছে, ধর্ম্মের পরিকল্পনার দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছে—এই ভাবেই মানুষের মধ্যে পাপপুণ্য বোধের সৃষ্টি হইয়াছে। এই একটা ভ্রান্তির উপর যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত তাহার কোন মূল্যই নাই। অতএব আমরা দেখিতেছি ক্যাণ্ট যুক্তিবাদীদের আক্রমণ হইতে অধ্যাত্ম জগৎকে রক্ষা করিতে গিয়া কার্য্যতঃ যুক্তি - বাদীদের নাস্তিকতাকেই সমর্থন করিয়াছেন—আধুনিক মানবের নাস্তিকতাকেই তিনি দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। এই সব জিনিষ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না ইহা দেখাইয়া দিয়া তিনি আর একরকম যুক্তির দ্বারা এই সবকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; তাহার সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, তিনি ভগবানকে সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া খিড়কীদরজা দিয়া ভিতরে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই—পাশ্চাত্য জগৎ যে ভগবানকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বিদায় দিয়াছে তিনি আপনভাবে সেইটিরই সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ভগবানকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আধুনিক মানবের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। আধুনিক মানব ঐ সব বিশ্বাসকে মানব জাতির পক্ষে পরম অনিষ্টকর কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে।

ভারত হৃদয়ের বিশ্বাসকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়াছে, অধ্যাত্ম সাধনায় মানুষকে এই হৃদ্‌গত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। তবে এই বিশ্বাস যাহাতে নাস্তিকতার দ্বারা নষ্ট না হয় সেজন্য একদিকে শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তিতর্কের দ্বারা ইহাকে সমর্থন করিয়াছে। এই জন্যই ভারতে ধর্ম্ম বিশ্বাস এত দৃঢ়, আধুনিক সকল প্রকার আক্রমণ সত্ত্বেও ভারত তাহার অধ্যাত্ম শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই, এবং এই ভাবে জগৎব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

ক্যাণ্ট যে অধ্যাত্ম জগৎ ও প্রাকৃত জগতের প্রভেদ করিয়াছেন, এইটি তিনি পাইয়াছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নিকট হইতে এবং প্লেটো এইটি পাইয়াছিলেন ভারতের উপনিষদ ও দর্শন হইতে। ক্যাণ্ট ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বটি পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে এক নূতন রূপ দিয়াছেন—তাহাতে ভ্রম হয় যে ক্যাণ্ট বুঝি ভারতীয় আদর্শটিই প্রচার করিতেছেন—তাই অনেকে বলিয়া থাকেন যে ক্যাণ্টের শিক্ষা এবং গীতার শিক্ষা মূলতঃ এক। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা একেবারে মূলগত। ক্যাণ্ট অধ্যাত্মজগতের কথা বলিলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে সে জগতের সাক্ষাৎ সন্ধান পান নাই—খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেই তিনি এক নূতন ধরণের যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ক্যাণ্ট ইন্দ্রিয়ের অতীত বুদ্ধিগত নীতিগত জীবনকেই অধ্যাত্মজীবন বলিয়াছেন—যাহারা

ইন্দ্রিয় প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধির প্রেরণা অনুসরণ করিয়া চলে, বুদ্ধির দ্বারা যে সকল নীতি বা শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হয় সেই সবের অনুসরণ করিয়া চলে, ফলাফলের দিকে কোন দৃষ্টি দেয় না, নৈতিক নিয়ম সকলকে কর্ত্তব্যবোধে অনুসরণ করে ক্যাণ্ট তাহাদিগকেই স্বাধীন মুক্ত পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মতে এইরূপ মানব মুক্তিপথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও প্রকৃত মুক্ত পুরুষ নহেন, তিনি হইতেছেন কেবল সাত্ত্বিক মানব,

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ১৮।২৩
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ১৮।২৬

ক্যাণ্ট বলিয়াছেন অন্তর্জ্জগতের পশ্চাতে এবং বহির্জ্জগতের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে, সে সব কেবল বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে—এবং আমাদের মধ্যে যে স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাই ঐ বিশ্বাসের মূল, ঐ বিশ্বাসের সমর্থক। বস্তুতঃ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সংস্কারের বশে ক্যাণ্টের মধ্যে ঐ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, ঐ বিশ্বাসকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতের পদ্ধতি ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের ঋষিগণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আত্মা ও জগতের সত্য দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সত্যই হইতেছে ভারতের সকল দর্শন-শাস্ত্রের মূল ভিত্তি—সেই সত্যগুলি যেমন শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে তাহা মানিয়া লইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্রহ্ম, জীব, জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই ক্যাণ্ট অধ্যাত্মজগৎ ও প্রাকৃত জগতের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছেন, ভারতীয় প্রভেদ হইতে তাহা বিভিন্ন। ক্যাণ্ট যে শুদ্ধ বুদ্ধিকে অধ্যাত্ম জগতের বস্তু বলিয়াছেন, যাহা থাকার জন্য মানুষকে তিনি একাংশে অধ্যাত্ম জগতের লোক বলিয়াছেন, he is intelligible character, ভারতীয় মতে তাহা হইতেছে প্রাকৃত জগতের জিনিষ, তাহা সত্ত্বগুণের ক্রিয়া এবং সত্ত্বগুণ হইতেছে প্রকৃতির তিনগুণের এক গুণ। প্রকৃতি যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ দিয়া গঠিত ক্যাণ্ট এই তত্ত্বের সন্ধান পান নাই। তাঁহার মতে মানুষের মধ্যে দুই রকম প্রবৃত্তি—এক হইতেছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রবৃত্তি এবং অপরটি হইতেছে বুদ্ধিনির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যপালনের প্রবৃত্তি। মানুষ সুখ চায়, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে সে সুখ পাওয়া যায় না, বরং তাহাতে দুঃখই পাইতে হয়—তবে ঐ কর্ত্তব্যপালনের দুঃখকেই সুখ বলিয়া ধরিয়া লওয়া মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সুখভোগের প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহা কি একেবারেই নিরর্থক? কর্ত্তব্যপালনে এ-জগতে সুখ পাওয়া যায় না—অতএব ক্যাণ্ট ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমান জীবনের ঊর্দ্ধে এক অতীন্দ্রিয় জগৎ ও জীবন আছে—যেখানে মানুষ প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। আর এই যে কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা পরকালে আনন্দ লাভ করা যায়, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে এ জগৎ ধর্ম্মের রাজ্য এবং ইহার একজন পরম বুদ্ধিমান কর্ত্তা আছেন, তিনিই ভগবান। এইভাবে ক্যাণ্ট খৃষ্টানধর্ম্মের বিশ্বাস ও নীতিগুলিকে আধুনিক মনোভাবাপন্ন নাস্তিকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে প্রয়াস সফল হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য; যে যুক্তিতর্কের কল্যাণে আধুনিক মানব নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ক্যাণ্ট প্রকারান্তরে সেই যুক্তিবাদেরই অনুসরণ ও সমর্থন করিয়াছেন, যুগের প্রভাব তিনিও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আর আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত দার্শনিকেরা আজ পর্য্যন্ত ঐ পাশ্চাত্য আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন। এমন কি ক্যাণ্ট ও হেগেলের বুদ্ধিপরতাকে তাহারা উপনিষদ ও গীতার উপরে, শঙ্কর ও রামানুজেরও ঊর্দ্ধে স্থান দিতেছেন। বাংলার একজন বিখ্যাত দার্শনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্যাণ্ট, হেগেল, বার্ক্‌লে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রণালীতে তাহাদের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, উপনিষদের ঋষিগণও সেই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন তবে কোন কারণে সেটা উপনিষদে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এইভাবে ঋষিগণকে ক্যাণ্ট-ও হেগেলের সমপর্য্যায় ফেলিয়া তিনি ঋষিদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! তিনি পাশ্চাত্য বিশ্লেষণ প্রণালীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই প্রণালীতে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ্ লেখকেরা, যারা স্পষ্টতঃই শোনা কথা লিখেছেন, তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।"

যোগ সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয় উপনিষদ ও দর্শনের আলোচনা করিতে গেলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে জগতের সকল তত্ত্বের সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে চান। আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনে সেরূপ প্রয়াস দেখিতে না পাইয়া পাশ্চাত্য দার্শণিকগণের শরণাপন্ন হন, সেখানে তাহাদের সে আশা তৃপ্ত হয়, তখন তাহারা ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সকলেরই সন্ধান পাইতেছেন মনে করিয়া আত্মগৌরব লাভ করেন—উপনিষদ, গীতায় তাহারা যে অর্থ পান তাহা বস্তুতঃ তাহাদের নিজেদেরই পাশ্চাত্য

হইতে ধার করা চিন্তাধারা—নিজেদের এই ভ্রান্তি ধরা তাহাদের পক্ষে সহজ হয় না। উল্লিখিত বাঙ্গালী দার্শনিক লিখিয়াছেন—"অনেকবার বলেছি যে দেশীয় দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যায়নে নিবিষ্টচিত্ত হলাম এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন। তখন ভারতীয় দর্শনাধ্যয়নে ফিরে গিয়ে উপনিষদ ও তন্মূলক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়লাম। পড়ে দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর Dialectical Method (হেগেল ও তাঁর ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ দর্শন স্থাপন করেছেন), পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়, যাদ্বারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না। দেখলাম যে শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রমাণ করবার জন্য কিছুই ব্যস্ত নন, শ্রুতির দোহাই দিয়েই সন্তুষ্ট। তাঁরা যুক্তি যা দেন, তা তখনকার বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের সন্তোষকর হয়ে থাকতে পারে, এখনকার সন্দেহ-প্রবণ এবং বিজ্ঞান দর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা কিছুই সন্তোষকর নহে।"

আমরা বিস্তৃতভাবে এখানে এই অভিমতটি উদ্ধৃত করিলাম কারণ ভারতের আধুনিক দার্শনিক অধ্যাপকগণ অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন এবং তাহাদের উপরই আমাদের তরুণ সমাজের শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকায় তাহাদের মনে ভারতের অধ্যাত্ম শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন ভারতীয়গণ যুক্তিতর্ক করিতে পারিতেন না, শুধুই শ্রুতির দোহাই দিতেন ইহা সত্য নহে। এক শঙ্করের মায়াবাদ লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ যে সূক্ষ্ম তর্কবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, জগতে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই। তবে ব্রহ্মকে যে তর্কবুদ্ধির দ্বারা, যুক্তি প্রণালীর দ্বারা প্রমাণিত করা যায়, ভারতীয়গণ কখনও তাহা স্বীকার করেন নাই, এইখানেই প্রাচ্য দর্শনের সহিত প্রতীচ্য দর্শনের মূল প্রভেদ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে ক্যাণ্ট এই সত্যটি যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন আর কেহও পারেন নাই—ব্রহ্ম, মুক্তি, অমৃতত্ব এ সবকে তিনি বিশ্বাসের বিষয় বলিয়াছেন, জ্ঞানের বিষয় নহে। জ্ঞান বলিতে ক্যাণ্ট শুধু মনবুদ্ধি যুক্তিতর্কের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই বুঝিয়াছিলেন—সে জ্ঞানের দ্বারা যে ব্রহ্মকে, সদ্বস্তুকে জানা যায় না তাহা ভারতীয় দর্শনেরও মত, নৈষা তর্কেণ মতিরাপণীয়া। তবে আমাদের মধ্যে মনবুদ্ধি ব্যতীত, মন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে অন্য সত্তা রহিয়াছে। তাহাই

আত্মা, যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। সেই আত্মার নিকট অজ্ঞাত কিছুই নাই, কারণ সেই আত্মা স্বয়ংই পরম সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম—ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন। অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা আমরা যখন আমাদের মূল সত্তায় এই ব্রহ্মের সহিত এক হই—তখন আমাদের সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সকল জ্ঞান, সকল সত্য প্রতিভাত হয়, ঋষিগণ এইরূপ সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময় শক্তিময় ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া কথিত হন—শ্রুতি হইতেছে সেই সব মন্ত্রের গ্রন্থ, তাই ভারতে তাহাদের এত সমাদর। শুধু পুঁথিতে লেখা আছে বলিয়াই ভারতীয়গণ তাহাদের সমাদর করে না, সাধনার দ্বারা সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সাক্ষাৎভাবে সে-সব সত্য দর্শন করিতে পারেন; সেগুলি কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নহে। চক্ষু কর্ণ দিয়া আমরা যে-সব বস্তু প্রত্যক্ষ করি সেগুলি যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, অধ্যাত্ম অনুভূতিতে আমরা যে তথ্য প্রত্যক্ষ করি তাহা তদপেক্ষা কম সত্য বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয়গণ অন্ধভাবে শাস্ত্রবিশ্বাস করিতে বলে নাই, নিজেদের হৃদয়ের আলোকে সব শাস্ত্র যাচাই করিয়া লইতে বলিয়াছে। গীতা বলিয়াছে, জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে, যাহারা যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকেও অতিক্রম করিয়া যায়। যুক্তিতর্কের কসরতের দ্বারা নহে, পরন্তু সাধনার দ্বারা, সত্য পথের অনুসরণের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় এ কথা উপনিষদে বার বার বলা হইয়াছে,

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥
—মুণ্ডকোপনিষদ—৩।১।৫

"এই আত্মাকে সত্য ও তপস্যার দ্বারা লাভ করিতে হয়, পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়; কারণ তিনি এই শরীরের মধ্যেই রহিয়াছেন, তিনি উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, যত্নশীল সাধকগণ মানবীয় কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন।"

শঙ্কর, রামানুজ, ভারতের সকল দার্শনিকই নিজ নিজ অধ্যাত্ম সাধনা ও অনুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, যুক্তিতর্কের উপর নহে—তবে তাঁহাদের ঐ অনুভূতি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহারা যুক্তিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং

সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস উদ্রেক করাইবার জন্য এবং নিজেদের অনুভূতিরও সমর্থনের জন্য তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন—কারণ শ্রুতি হইতেছে প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বাক্য,

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।

বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের মধ্যে, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকের মধ্যে যে পার্থক্য ও মতভেদ দেখা যায়, তাহার কারণ তাহারা পূর্ণ সত্যের এক একটি দিকের উপরেই সমধিক জোর দিয়াছেন, কারণ তাহাদের অনুভূতিতে সেই দিকটাই সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব পার্থক্য ও মতভেদের সমন্বয় যুক্তিতর্কের দ্বারা হয় না, গভীরতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা সত্যকে সমগ্রভাবে দর্শন করিয়াই এই সব বিরোধের সমন্বয় ও সমাধান হইতে পারে।

ভারতের দার্শনিকগণ অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সত্যের যতটুকু দর্শন করিয়াছেন তাহারই উপর তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা মানসিক বুদ্ধিবিচারকে কাজে লাগাইয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্ম অনুভূতিকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য। আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধির দ্বারাই সত্যকে জানিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা আত্মার আলোকে সত্যকে সাক্ষাৎভাবে না দেখিয়া মনবুদ্ধির মধ্যে সেই সত্যের যে ছায়া পতিত হইয়াছে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাও সত্যের আভাস কিছু পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, ছায়া দেখিয়াও মূলবস্তুর স্বরূপ কতকটা বুঝা যায়, কিন্তু তাহা অতি ক্ষীণ, অপূর্ণ এবং অনেক সময়েই বিকৃত পরিচয়। তাই দেখা যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ খুবই সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিলেও তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ মানুষের অধ্যাত্ম জীবন গঠনে বিশেষ সহায় হয় নাই, পাশ্চাত্য জাতি দর্শন শাস্ত্রকে চিন্তাবিলাসীর স্বপ্ন বলিয়া জীবন হইতে বাদ দিয়াছে। অন্যপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা, ভারতীয় জীবন মূলতঃ ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই ভাবেই ভারতবাসীর মন প্রাণ অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য যেমন প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে এমনটি জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে বুদ্ধির সাহায্যে পরম তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সাধারণ বুদ্ধি নহে, তাহা একটা উচ্চতর শক্তি। বুদ্ধির যে নানা স্তর আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানী অজ্ঞানী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু অসাধু সকলেরই বুদ্ধি আছে, সকলেই বিচার করে, তর্ক করে—কিন্তু সকলের বুদ্ধি সমান নহে। বুদ্ধি বিচারে সাধারণ লোক কত ভুল করে,

তর্ক শাস্ত্র (Logic) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা দেখাইয়া দেয়। বুদ্ধিবিচারে যাহাতে এইসব ভুল না হয় সেজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাই সাধারণ মানুষের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে এত তফাৎ হয়, এবং এই জন্যই বিজ্ঞান সমর্থ বুদ্ধির সাহায্যে প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে এত তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেমন করিয়া যথাযথ ভাবে বুদ্ধি চালনা করিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়—এ-বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন না করিয়া যাহারা তর্কযুক্তি খাটাইতে যায় তাহারা পদে পদে ভুল করে, শুভকে অশুভ বলিয়া অশুভকে শুভ বলিয়া গ্রহণ করে, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এইভাবে মানুষের জীবন বিপর্য্যস্ত। আমাদের দেশে এককালে এই শিক্ষাদীক্ষা খুবই উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল—কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে ভারতের যে খুবই অবনতি হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে পাশ্চাত্য দেশ তর্কশক্তির বিকাশে অমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভারত এখন জীবন সংগ্রামের তীব্র প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাজিত হইতেছে। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধ বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তা-শক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিকাশ। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে।··· য়ুরোপে দেখ—দেখবে দুটি জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে, সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পেরেছে, আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত—যাঁদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত।···তারপর ভারত দেখ—কয়েকজন solitary giant (বড় লোক), আর সর্ব্বত্র সোজা মানুষ অর্থাৎ average man—যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার কিছুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারত চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপ চায় গভীর চিন্তা গভীর কথা।"

জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এই চিন্তাশক্তির হ্রাস, এইরূপ অজ্ঞান-অশক্তির বিকাশ কেমন করিয়া হইল, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। কেহ কেহ বলেন আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার দিকে অত্যধিক ঝোঁকের ফলেই ভারতের এই অবনতি। কিন্তু চিরকালই ভারতের ঐ দিকে ঝোঁক, ভারতীয় সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য, তাহা সত্ত্বেও ভারত পুরাকালে অপূর্ব্ব চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ করিয়াছিল—অতএব এ

ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেহ বলেন, ভারতবাসী সর্ব্বদা শ্রুতির দোহাই দিয়াছে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা সত্যের সন্ধান করে নাই, সেইজন্যই তাহাদের চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু পুরাকালেও ত ভারতের এই অভ্যাস ছিল, যোগী ঋষির কথা তাহারা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে, বেদ উপনিষদের সত্যকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে—তথাপি তাহারা চিন্তাশক্তি হারায় নাই। চিন্তাশক্তির যথার্থ কার্য্য কি, উপযোগিতা কি, প্রাচীন ভারতীয়েরা তাহা স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বাহ্য জগতের ব্যবহারিক জ্ঞান চিন্তাশক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। বাহ্য জগতের জ্ঞান অর্জ্জনে তাঁহারা মন বুদ্ধি দ্বারা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তর্ক, অনুমানকে অগ্রাহ্য করেন নাই, এ-সবেরও যথাসম্ভব পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলেন, এবং এইভাবে জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানেও তাঁহারা যেরূপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তৎকালীন জগতের অন্য কোন জাতির কৃতিত্বের তুলনায় তাহা হীন ছিল না। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তাঁহারা বহু তথ্যের আবিষ্কার করিয়া মানবীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান এই প্রণালীতে লাভ করা যায় না, সে সত্যের সম্মুখে মনবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল হইতে হয়, চিত্তবৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ করিতে হয়, তখন পরম সত্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আপনার আলোকেই আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হন। যেমন প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যকে খুঁজিতে হয় না, তেমনিই মনবুদ্ধির আলোকে আত্মার সন্ধান করিতে হয় না।

তখনও মনবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায় না, তবে তাহার কাজ স্বতন্ত্র। আত্মা যখন নিজ আলোকে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হন, তাহার কিছু ইঙ্গিত আভাস বুদ্ধির সাহায্যে আমরা অপরকে দিতে পারি—সে আভাস কখনই সম্পূর্ণ হয় না, তথাপি তাহার দ্বারা অপরের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, তাহারা নিজেদের মধ্যে আত্মাকে জানিবার, আত্মাকে পাইবার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই আত্মা সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে,

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্‌বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২।২৯

যে- বুদ্ধির দ্বারা "আশ্চর্য্যবৎ" আত্মার কিছু আভাস পাওয়া যায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি নহে, যে যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধির সাহায্যে আমরা সসীম বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করি তাহার দ্বারা শাশ্বত, অসীম পূর্ণ আত্মা বা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যায় না, সেজন্য

উচ্চতর যুক্তি প্রণালীর প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই রূপ উচ্চতর যুক্তিপ্রণালীকে Logic of the Infinite বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্ট ইহাকে বলিয়াছেন Transcendental Logic। এইরূপ যুক্তিপ্রয়োগে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাই যাঁহারা শুধু বুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতে চান—এবং আধুনিক মানব তাহাই চায়—তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনেই সমধিক তৃপ্তিলাভ করেন, ভারতীয় দর্শন অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য হয়—মনে হয় ইহার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে, অপূর্ণতা রহিয়াছে। কিন্তু এই ত্রুটি শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা কখনই সংশোধন করা যায় না, ইহার জন্য সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে মনে করেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পরমতত্ত্ব সকলের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বর্ণনা দিয়াছেন—সেটা মনের ভ্রান্তি, কাণ্ট এই ভ্রান্তিকে Transcendental Illusion বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা যে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে জানা যায় না, এই তত্ত্বটি কাণ্ট দৃঢ়ভাবেই ধরিয়াছিলেন এবং এইখানে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাঁহার মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু ঐসকলের জন্য তিনি যে চলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্টান dogmatismই অনুসরণ করিয়াছিলেন—এইখানে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাঁহার মূলগত প্রভেদ। ভারতীয় দর্শনে চলিত মতকে অন্ধভাবে ধরিয়া লইবার মত dogmatism কোথাও নাই—সেখানে সর্ব্বত্র আছে সূক্ষ্ম ও গভীর যুক্তি এবং সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং এই দুইটির সমর্থনের জন্য শ্রুতির প্রমাণ।

জ্ঞানের দেশ ভারতবর্ষে চিন্তার দৈন্য কেমন করিয়া আসিল তাহার মূল কারণ হইতেছে এই যে, কালক্রমে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নহে, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট সর্ব্বত্রই ঐ শক্তিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়—বহুশত বৎসর ধরিয়া এই সকল ক্ষেত্রেই প্রচুর সৃষ্টিশক্তি, কর্ম্মশক্তি দেখাইয়া ভারতবাসী সাময়িকভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকল সভ্যতার ইতিহাসেই এইরূপ উত্থান পতন দেখা যায়, তবে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার পতন কখনই অন্যান্য বহু প্রচীন সভ্যতার ন্যায় এতদূর অগ্রসর হয় নাই যাহাতে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বেদ উপনিষদের মধ্যে যে অমৃতধারা সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাহা পান করিয়া মৃতকল্প ভারতীয় সভ্যতা পুনঃ পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানেও আমাদের চক্ষের সম্মুখে আমরা ভারতের এইরূপই এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী নব অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই অভ্যুদয় যাহাতে ঠিকপথে পরিচালিত হয়, তাহার ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয় সেজন্য আমাদের আজ স্পষ্টভাবে বুঝা দরকার কেন ভারতবাসীর এত অধঃপতন হইয়াছিল, পুরাকালে ভারতবাসী জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে প্রচুর জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িল কোন্ কারণের বশে। এই কারণ অনুসন্ধান করিলে দুইটি কথা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। প্রথমতঃ শঙ্কর-প্রচারিত মায়াবাদ ভারতবাসীকে জীবনে বিমুখ, কর্ম্মে বিমুখ করিয়াছে। অবশ্য সকল ভারতবাসীই মায়াবাদের দার্শনিক মর্ম্ম বুঝে নাই অথবা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হয় নাই—তথাপি সংসার অনিত্য ও দুঃখময়, ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া, নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ গতি এই শিক্ষা বিস্তৃতভাবে নানা কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ভারতবাসী জীবন ও কর্ম্মে আস্থা হারাইয়াছে, উৎসাহ হারাইয়াছে। মায়াবাদ ভারতবাসীর Will to live বা জীবন-স্পৃহার মূলে আঘাত করিয়া তাহাদের জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়াছে।

ভারতবাসীর জীবনীক্তি হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ, সামাজিক বিধিনিষেধের অত্যধিক কড়াকড়ি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে, তাহা ভগবানের অংশ, সেই আত্মাই ভিতর হইতে মানুষকে তাহার শ্রেয়ের পথে লইয়া চলিয়াছে—এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে কোন্ জিনিষ কোন্ কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে বা গ্রহণ করিতে হইবে আত্মাই তাহার নির্দ্দেশ দিতেছে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রয়োজন বিভিন্ন, সামর্থ্য বিভিন্ন—বাহির হইতে কড়াকড়ি সাধারণ নিয়মের বন্ধনে মানুষকে বাঁধিতে গেলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ বিপর্য্যস্ত হয়। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভিতরের আত্মার আলোক সাক্ষাৎ ভাবে, পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারে না, তাহার বাহ্য দেহ, প্রাণ মনের ত্রুটি ও অপূর্ণতার জন্য অন্তরের বহ্নি আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ বাহিরের নির্দ্দেশ তাহার সহায় স্বরূপ হইতে পারে—এইখানেই সকল সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সার্থকতা। মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে শুভ অশুভ পাপপুণ্য সম্বন্ধে যে-সব মানদণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়াছে, অজ্ঞান মানব তাহা হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিতে পারে। তথাপি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি হইতেছে তাহার মধ্যে ভগবৎ জ্যোতির কণা স্বরূপ যে আত্মা রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করা, তাহার নির্দ্দেশ মত নিজ জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করা এবং ইহার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই আপন পথে চলিবার জন্য, এমনকি ভুল করিবার জন্য, পাপ করিবার জন্যও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন—অনেক জিনিষই মানুষকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়, অন্যভাবে তাহা

শিক্ষা করা সম্ভব নহে। অতএব সেই সমাজই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণময় যেখানে মানুষকে আপনার পথে চলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ভারতের প্রাচীন সমাজে এইরূপ স্বাধীনতা ছিল, তাই সেখানে সমাজ-জীবনে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়—ইহার এক চরম দৃষ্টান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। কালক্রমে ভারতে সামাজিক বিধি বন্ধন অত্যধিক কঠোর হইয়া উঠে—মানুষের প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার নানা চেষ্টা হয়—ইহার ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আশঙ্কা করিয়াই গীতা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে—"নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে—আত্মাকে অবসন্ন করিও না। প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ ?" গীতার এই কল্যাণময় শিক্ষা ভারতবাসী সামাজিক জীবনে অনুসরণ করিতে পারে নাই।

ভারতের অধঃপতনের আর একটি কারণ হইতেছে এই যে, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ভারতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত মন্ত্রী ভারতে বেশী আবির্ভূত হয় নাই। নতুবা ভারতের ভাগ্যে দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার অভিশাপ ঘটিত না, এবং পরাধীনতা ভারতবাসীর জীবনকে সকল দিক দিয়া খর্ব্ব করিয়া দিত না। যাহাই হউক, এই সব অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের জীবনে পরাস্ত ও অবনত হওয়ায়, ভারত অন্তর্জীবনের উপর মন দিবার যে প্রেরণা ও সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে--ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা যে শুধুই ভারতকে নূতন জীবন, নূতন শক্তি প্রদান করিবে তাহাই নহে, আজ সমগ্র জগৎ অধ্যাত্ম আলোকের জন্য ভারতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—বিভ্রান্ত জগৎকে আজ পরম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারতই প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইতে পারে।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের শিক্ষার সহিত আমরা গীতার মহতী অধ্যাত্ম শিক্ষার তুলনা করিতেছিলাম। কাণ্টের শিক্ষা হইতেছে, Duty for the sake of duty, কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য সাধন —এবং এইটিই হইতেছে পাশ্চাত্য নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কোনরূপ ভোগসুখ চাহিয়া কর্ম্ম করিও না, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিও না, তোমার কর্ত্তব্য কি, তোমাকে কি করিতে হইবে শুধু সেইটি দেখিয়া কর্ম্ম কর। এ পর্য্যন্ত কাণ্টের শিক্ষার সহিত গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু কোনটা আমার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিব কেমন করিয়া ? সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন ত এইটিই। গীতায় অর্জ্জুন এই প্রশ্নটিই তুলিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্য করিতে তিনি উন্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন্‌টা কর্ত্তব্য সেইটিই তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই—হিংসা না অহিংসা? নীতি-শাস্ত্র যে দুই রকমই বিধান দেয়; Reason বা বুদ্ধির দ্বারা দুইটিরই সমর্থন সমানভাবে করা যায়। অতএব কাণ্ট যে বলিয়াছেন, বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে, সাধারণতঃ এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলা যায় বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা কর্ত্তব্য-সমস্যার চরম মীমাংসা হয় না, এবং সেইরূপ মীমাংসা দেওয়াই হইতেছে গীতার লক্ষ্য।

কোনও অবস্থায় কাহারও কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করা, হিংসা না করা যেমন উচ্চ আদর্শ, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য বলপ্রয়োগে অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, এমন কি তাহাকে নিহত করাও তেমনই উচ্চ আদর্শ। মানুষ কোন্‌টার অনুসরণ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরেই কাণ্টের সহিত গীতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়াছে। কাণ্ট বলিয়াছেন—"Act as if the maxim from which you act were to become through your will a universal law of Nature." অর্থাৎ "এমন ভাবে কর্ম্ম করিবে যেন তোমার আপন কর্ম্মের নিয়ম অপর সকল বুদ্ধিময় জীব উহাদের আপন আপন কর্ম্মের নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করে, তোমার কর্ম্মের নিয়ম যেন তোমার ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে এক সার্ব্বভৌম নিয়মে পরিণত হয়। কর্ম্ম করিবার সময় দেখিবে তুমি এমন ইচ্ছা করিতে পার কি না যেন তোমার কর্ম্মের বিধি এক সার্ব্বভৌম নিয়ম হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিয়মকে আপন কর্ম্মের নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" কাণ্টের এই হেঁয়ালীপূর্ণ কথা হইতে সন্ধিকালে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে কে কতটা সাহায্য পাইবে জানি না, কিন্তু তিনি নিজে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যে নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নৈতিকতার যাহাতে চরম উৎকর্ষ, সেগুলি মূলতঃ হইতেছে খ্রীষ্টধর্ম্মের নৈতিক আদেশেরই রূপান্তর। কিসে সুখলাভ হইবে এ হিসাব করিয়া কর্ম্ম করিবে না, কারণ "সুখলাভের নিয়মগুলি আপন আপন অবস্থা, দেশ ও কাল অনুসারে বিভিন্ন হইবেই। সুখলাভের নিয়মগুলি নৈতিক নিয়মের ন্যায় অনপেক্ষ ও সুনিশ্চিত (catagorical imperative) হইতে পারে না। নৈতিক নিয়ম সার্ব্বভৌম, উহা সকল ব্যক্তিতে, সকল কালে ও সকল দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। সত্য কথা বলিবে, চুরি করিবে না, পরদারগমন করিবে না, এ-সব নিয়ম দেশ কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয় না। এই নৈতিক নিয়মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও সহজ, অভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না। ইহা শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য সহজ জ্ঞান।" কাণ্ট বলিয়াছেন যাহারা ইন্দ্রিয়-প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধি-প্রসূত এই সব নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে তাহারাই free, মুক্ত পুরুষ।

মুক্তি সম্বন্ধে এই মতের সহিত প্লেটো, স্পিনোজা প্রভৃতি অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের ঐক্য রহিয়াছে।

কিন্তু Reason বা বুদ্ধি এমন নীতি দিতে পারে যাহা সার্ব্বভৌম (universally valid) হইবে, সুনিশ্চিত নির্দেশ হইবে, সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে, গীতা তাহা স্বীকার করে না, বস্তুতঃ গীতা এইরূপ নৈতিক বিধিনিষেধের শাস্ত্র নহে। ক্যাণ্টের মতে ইন্দ্রিয়সুখের অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধির অনুসরণে কর্ম্ম করাই প্রকৃত নৈতিকতা। কিন্তু Reason বা বুদ্ধির অনুসরণ করিলেই যে ফলকামনা ত্যাগ করিতে হয় তাহা নহে। দেশের মুক্তির জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম তাহা সকাম কর্ম্ম এবং সম্পূর্ণভাবেই reasonable, যুক্তিযুক্ত, বুদ্ধিসম্মত। গীতা স্বীকার করিয়াছে যে মানুষের নিম্নতন প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়গত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে, তাহার ক্ষুদ্র অহংভাবকে দমন করিতে এই সব বুদ্ধিসম্মত নীতির ও নীতিশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে, ইন্দ্রিয়-প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া, কাম, ক্রোধ, লোভকে সংযত করিয়া বুদ্ধিগত কোন নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে নিম্নতন প্রকৃতির বিক্ষোভ শান্ত হয়, মানুষ উর্দ্ধতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। কিন্তু এইটিই উচ্চতম মুক্তির জীবন নহে, ইহা সাত্ত্বিক জীবন, বুদ্ধির অনুসরণ হইতেছে সত্ত্বগুণের অনুসরণ এবং সত্ত্বগুণও বন্ধন করে—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪।৬

তাহা ছাড়া বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া যে আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম তাহার স্থিরতা নাই। যে-কোন্ মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় রজোগুণের তাড়নায় সে সংযমের বাঁধ ভাসিয়া যাইতে পারে, এইভাবে কত পণ্ডিত, কত চরিত্রবান মানুষের যে পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই (২।৬০)।

মহাত্মা গান্ধী যে-অধ্যাত্ম আদর্শ ধরিয়াছেন তাহাও বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাপ্ত নৈতিক-আদর্শ। তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্য, সত্যভাষণ প্রভৃতি কয়েকটি নীতির অনুসরণ করিয়া জীবনকে গঠন করাই তাঁহার আদর্শ। কিন্তু তাঁহার আজীবন পরীক্ষার পর তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য গুরু টলষ্টয়ের ন্যায়ই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মানুষ যতদিন দেহের মধ্যে আছে ততদিন তাহার মুক্তি নাই, কবরে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত যে-কোন মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মানুষের পতন হইতে পারে—অতএব সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া নিজের উপর পাহারা দিতে হইবে।' ক্যাণ্টও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই পার্থিব

দেহের মধ্যে থাকিয়া মানুষ কখনই ইন্দ্রিয়প্রেরণাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে পারে না, পূর্ণভাবে নৈতিক-নিয়মের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে অনন্ত-জীবন প্রয়োজন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্যাণ্ট বলিয়াছেন ভগবানের কৃপায় মানুষ পরকালে এক নূতন জীবন, নবজন্ম লাভ করিতে পারে। কিন্তু গীতার মতে মানুষকে এই জীবনে এই মরদেহেই পূর্ণ-মুক্তি লাভ করিতে হইবে, নিম্নতন প্রকৃতির সকল প্রেরণাকে জয় করিয়া অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে নবজন্ম লাভ করিতে হইবে, ইহৈব, প্রাক্‌শরীর-বিমোক্ষণাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, সত্ত্বগুণ হইতেছে সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চধাপ—এই ধাপও ছাড়াইয়া উঠিলে তবে আমরা ছাদে উঠিতে পারি এবং তাহাই প্রকৃত মুক্তির অবস্থা। যোগ-সাধনা এই মুক্তিলাভের পন্থা। এই শ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের জন্যই গীতা শেষ পর্য্যন্ত মন-বুদ্ধির সকল আদর্শ, নীতি, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণ লইতে বলিয়াছে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। গীতার এই পরম-বাক্যের কোন আভাস ক্যাণ্টের মধ্যে পাওয়া যায় না। ক্যাণ্ট শুধু এইটুকু বলিয়াছেন যে, তিনি যে-গুলিকে Categorical Imperatives বা সুনিশ্চিত নৈতিক নির্দ্দেশ বলিতেছেন সেইগুলিকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, সাক্ষাৎভাবে ভগবানের আদেশ লাভ করিয়া, কেমনে দিব্য-কর্ম্মের কর্ম্মী হইতে পারা যায়, সেই সাধনার নির্দ্দেশ দেওয়াই হইতেছে গীতার প্রকৃত শিক্ষা। দিব্য-গুরু অর্জ্জুনকে কোন অবশ্য-পালনীয় নীতি (Categorical Imperative) দেন নাই, তিনি তাঁহাকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, বলিলেন—এখন ধ্বংস করাই হইতেছে আমার ইচ্ছা, অতএব তুমি সকল সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশে ধ্বংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, জগতে আমার ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হও। গীতা যুদ্ধের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইয়াছে যে, হিংসার ন্যায় নীতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মও ভগবানের ইচ্ছার অনুযায়ী হইতে পারে। গীতার মুক্ত পুরুষ কোনও সূত্রবদ্ধ নীতি বা ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না, তিনি অন্তরাত্মায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহার শুদ্ধ রূপান্তরিত প্রকৃতি হয় জগতে ভগবানের ইচ্ছা-পূরণের যন্ত্র, তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের দিব্য শক্তিই সাক্ষাৎভাবে কর্ম্ম করে, তাঁহার কেবল থাকে ভগবানের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র হইবার পরম আত্ম-গৌরব এবং ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনের নিরতিশয় আনন্দ।

ক্যাণ্ট কর্ত্তব্য পালনে যে সুখের কথা বলিয়াছেন তাহা এই গভীর অধ্যাত্ম আনন্দ নহে, তাহা হইতেছে শুষ্ক বুদ্ধিগত আনন্দ। ক্যাণ্ট বলেন, "কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মের সহিত কামনার বিরোধভাব জন্য কর্ত্তব্যপালন দুঃখপ্রদ; সকল কামনাকে

দমন করিয়া নৈতিক-নিয়মের অনুবর্ত্তন সুখকর হইতে পারে না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার এই বশ্যতা স্বাধীন ইচ্ছাকৃত। আবার যে-নৈতিক-নিয়মের বশ্যতা ইচ্ছা স্বীকার ও মান্য করে, সে-নিয়ম বাহিরের কোনও বস্তুর প্রদত্ত নহে ; উহা আত্মারই প্রদত্ত, এবং এই কারণে কর্ত্তব্য পালনে মানুষ এত আত্মগৌরব অনুভব করে। ক্যাণ্টের এই আত্মগৌরবের সহিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের, এপিকটিটাস প্রভৃতি কঠোরতা-বাদীদিগের আত্ম-গৌরব তুলনা করা যাইতে পারে।" (নীতি-বিজ্ঞান—শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ)। বলা বাহুল্য যে গীতা এইরূপ কঠোরতাবাদী নহে, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের আনন্দই গীতার পরম লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়সংযমে কঠোরতা এই পরম অধ্যাত্ম-আনন্দ লাভের প্রাথমিক সাময়িক অন্যতম সাধনামাত্র।

ক্যাণ্ট মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। তবে মুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা, Freedom এবং Free-will এই দুইটি এক জিনিষ নহে। পাপী পাপ করে স্বাধীন ইচ্ছার বশেই, কিন্তু তাই বলিয়া সে মুক্ত পুরুষ নহে। ইন্দ্রিয়প্রেরণাকে সংযত করিয়াই মানুষ মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে—কিন্তু মানুষ এই মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে, না, ইন্দ্রিয়গত জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে সেটা তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে—এবং এই জন্যই গীতা বলিয়াছে, নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে, নিজেকে অধোগামী করিও না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষের স্বাধীনতা কতটুকু? বাস্তবিকই কি মানুষ স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করিতে পারে? এই প্রশ্ন লইয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে তর্কের অন্ত নাই। এ-বিষয়ে ইংরাজ কবি মিল্টনের কথাগুলি বিখ্যাত—

Men reasoned high
Of Providence, foreknowledge, will and fate—
Fixed fate, free will, foreknowledge absolute—
And found no end in wandering mazes lost.

তথাপি সাধারণভাবে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক মনীষীগণ অধিকাংশই Free-will বা স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। জড়-বিজ্ঞান প্রাকৃত জগতে যে সুনিশ্চিত নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহার ফলেই এই মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে। গীতা যেমন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিয়াছে, অর্জ্জুনকে বলিয়াছে বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, তেমনি জোরের সহিতই Determinism of Nature বা প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতাও ঘোষণা করিয়াছে,

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

৩।৩৩

গীতা এই দুইয়ের যে গভীর সমন্বয় করিয়াছে তাহার ভিত্তি হইতেছে সাংখ্যের বিশ্লেষণ। মানুষের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির সত্ত্বাদি তিনগুণের কর্ম্ম, ইহাই প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতা। শুধু গুণত্রয়ের কর্ম্ম দেখিলে আমরা পাইব কড়াকড়ি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা বা অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে তাহা প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে, কোন বিষয়ে তাহা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, প্রকৃতি তাহার অধীন, তাহার অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। মানুষ যতদিন প্রাকৃত জীবনে আসক্ত, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে ততক্ষণ তাহার কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যখন সে নিজের গভীর অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান পাইয়া সেই আত্মার চৈতন্যে, পুরুষের চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে হয় মুক্ত, তখন সে ইচ্ছামত প্রকৃতির কার্য্যকে পরিচালিত করিতে পারে। এইরূপই একটা প্রভেদ, অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত জীবনের প্রভেদ ক্যাণ্টেরও সকল দার্শনিকতা ও নৈতিকতার ভিত্তি এবং তাহার এই প্রভেদ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা বলিয়াছি ক্যাণ্ট এই প্রভেদ পাইয়াছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নিকট হইতে- এবং প্লেটো ইহা পাইয়াছিলেন ভারত হইতে। গ্রীক দেশে প্রবল কিম্বদন্তী এই যে, প্লেটো ভারতে আসিয়াছিলেন, এবং কাশীতে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নিকট ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের দর্শন ও উপনিষদের সহিত যে তাঁহার পরিচয় ছিল, তাঁহার লিখিত পুস্তক সকল হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ক্যাণ্ট যে sensuous world বা ইন্দ্রিয়ময় জগত এবং super-sensuous world বা অতীন্দ্রিয় জগৎ এতদুভয়ের প্রভেদ করিয়াছেন তাহা সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদেরই অনুরূপ। পুরুষের চৈতন্যে প্রকৃতি যেরূপ প্রতিফলিত হইতেছে তাহাই পরিদৃশ্যমান জগৎ, the world of phenomena, কিন্তু পুরুষ ইহা হইতে বিভিন্ন, the world of things-in-themselves. এই দুইটি জগৎ বিপরীত অথচ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটি মানুষের মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—কারণ মানুষ দুই জগতেরই, মানুষ আত্মা এবং প্রকৃতি দুই-ই, প্রকৃতি হিসাবে সে প্রকৃতির কার্য্যকারণশৃঙ্খলার অধীন, সাংখ্যের ভাষায় গুণত্রয়ের অধীন, তাহার কোন স্বাধীনতাই নাই, কিন্তু পুরুষ হিসাবে সে চির-

মুক্ত। মানুষ প্রাকৃত জীবনের মধ্যে থাকিয়াও যে নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করে, তাহার বিবেক আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে—ইহার মূল হইতেছে পুরুষ বা আত্মা হিসাবে তাহার স্বাধীনতা। এই পর্য্যন্ত সাংখ্যের বিশ্লেষণের সহিত ক্যাণ্টের বেশ মিল রহিয়াছে। কিন্তু ঐ আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ ও চৈতন্য লইয়াই হইয়াছে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন ঐ আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ কি তাহা আমরা কখনই জানিতে পারি না, তাহা thing-in-itself, তাহা কখনই মানবীয় জ্ঞানের গোচর হয় না। অথচ তিনি স্বাধীনতা ও নৈতিকতার আলোচনা করিতে গিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে ঐ আত্মার চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে Reason বা বুদ্ধি। ক্যাণ্টের অনুবর্ত্তী হেগেল (Hegel) আত্মার বা ব্রহ্মের (Absolute Spirit) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহই থাকে না যে, মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ বুদ্ধিই হইতেছে উহার স্বরূপ। হেগেল Spirit এবং Mind, আত্মা এবং মন—এই দুইয়ের কোন প্রভেদ করেন নাই। বস্তুতঃ জার্ম্মান ভাষায় আত্মা ও মন বুঝাইতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয় —Geist, হেগেল মানুষের মনের উপমাতেই (analogy) Absolute বা ব্রহ্মের পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমরা যেমন তর্কের সময় বাদ, প্রতিবাদ, সমন্বয়, এই ভাবে অগ্রসর হই, তেমনই Absolute হইতে এই জগতের বিকাশ thesis, anti-thesis, synthesis এই ধারায় চলিয়াছে। ইহাই হেগেলের Logic বা Dialectic Method এবং ক্যাণ্টের Logic বা বুদ্ধি মূলতঃ এই একই জিনিষ। জার্ম্মান দার্শনিক Dr, Windelband ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে বলিয়াছেন,

"This (Hegel's) metaphysical logic is of course not formal logic, but in its determining principle is properly Kant's transcendental logic. The only difference is that the 'phenomena' is for Kant a human mode of representation, for Hegel an objective externalising of the Absolute Spirit."

অর্থাৎ, ক্যাণ্ট ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ক্যাণ্টের মতে আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ (phenomenal world), ইহা কেবল মানুষের দেখিবার ধারা মাত্র, জগৎ (thing-in-itself) বস্তুতঃ এইরূপ নহে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়-সংবেদন সেই জগৎ হইতে আসিতেছে বটে কিন্তু আমাদের বুদ্ধি সে-সবকে নিজের ভাবে সাজাইয়া পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিতেছে। আর হেগেলের মতে, Absolute Spirit বা ব্রহ্ম নিজেকে বাহ্য জগতে এইরূপেই প্রকট

করিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতের সহিত যেমন সাংখ্য মতের মিল রহিয়াছে, তেমনই হেগেলের মতের সহিত বেদান্তের মতের মিল রহিয়াছে—আর সমস্ত পাশ্চাত্য Idealism বা চৈতন্যবাদের মূল এইখানে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সকলেই ক্যাণ্ট ও হেগেলের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের চৈতন্যকে মানুষের মন বুদ্ধির চৈতন্যের উপমাতেই পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক Green স্পষ্ট ভাষাতেই Absolute (ব্রহ্ম)-কে Universal Mind (বিশ্বাত্মক মন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, মানুষের মন হইতেছে সেই বিশ্ব-মনেরই খণ্ডরূপ, ব্যাষ্টির মধ্যে বিশ্বমনের প্রকাশ। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম, আত্মা বা পুরুষ মন নহে, মনের অতীত বস্তু, গীতার ভাষায়, যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। সুষুপ্তি অবস্থায় যখন মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তখনও যে পরা-চৈতন্য থাকে তাহাই ব্রহ্ম-চৈতন্য—মনের চৈতন্য হইতেছে তাহারই একটি নীচের রূপায়ন। দেহ, প্রাণ, মন—এই তিন লইয়াই হইতেছে মানুষের সাধারণ প্রাকৃত জীবন। মনের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে বিজ্ঞান, তাহার ঊর্দ্ধে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দ, এই আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা চৈতন্যময়, আনন্দময় একমাত্র সদ্বস্তু। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপে নিজেকে জগৎমাঝে প্রকট করিতেছেন তাহা বুঝিতে হইলে শুধু মনের বিশ্লেষণ করিলেই চলিবে না, মন ব্রহ্মকে ধরিতে পারে না, কেবল তাহার কিছু ইঙ্গিত বা আভাষ মাত্র দিতে পারে। মনের ঊর্দ্ধে যে অতি-মানস চৈতন্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে উঠিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারিলেই আমরা এই জগৎলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। নিজেকে যেমন আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি, যুক্তিতর্কের দ্বারা নহে, তেমনই ব্রহ্মকেও সাক্ষাৎভাবে জানি—কারণ আমাদের যে মূল আত্মা তাহা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। উপনিষদ এই অতি-মানস চৈতন্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ।
—তৈত্তীরিয়—২।৪।১

অর্থাৎ, "বাক্য মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যে লাভ করিয়াছে, সে আর কোন কিছু হইতেই ভয় পায় না। এই মনোময় হইতে ভিন্ন অন্তর-আত্মা বিজ্ঞানময়, উহা দ্বারাই ইহা পূর্ণ।" পাশ্চাত্য দর্শনে মনবুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় ব্রহ্মের কোন সন্ধান নাই, যাহাকে জানিলে মানুষ সকল ভয় হইতে মুক্ত হয়,

যারে জানি, যার পানে চাহি',
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।

সাংখ্যের মতে Reason বা বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, পুরুষের শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যে উঠিতে হইলে সত্ত্বগুণের সাহায্যেই এই সত্ত্বগুণকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। কাণ্টের মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে বুদ্ধি কর্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে কর্ম্ম করা।* সাংখ্য মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে বুদ্ধি দ্বারা এই বিচার করা যে, প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী। গীতা সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করিয়াছে,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭

প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কিছুই করে না, এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, গীতার মতে তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত :—

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বুদ্ধি যখন অহংভাবের বশে প্রকৃতির ক্রিয়াকেই পুরুষের ক্রিয়া বলিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয়গত বাহ্য জীবনে আসক্ত থাকে ততক্ষণই মানুষের বন্ধন।* পরে যখন বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝিতে পারে, উপলব্ধি করে যে অন্তঃপুরুষ এই ক্রিয়ায় আসক্তি দ্বারা জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনই অন্তঃপুরুষ তাহার মূল মুক্ত ও অক্ষর সত্তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়। অতএব দেখা যাইতেছে বুদ্ধির ক্রিয়াতেই মানুষ বদ্ধ হয়, আবার তাহার দ্বারাই মুক্ত হয়, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। উপনিষদ একবৃক্ষে দুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করিয়াছে। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজদিগকে এক করি, তাই তাহার ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করি, কিন্তু আমাদের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে—তাহা চিরমুক্ত, অক্ষর, আপনাতে আপনি পূর্ণ, আনন্দময় ; বুদ্ধির বিকাশে যখন আমরা এই আত্মাকে দেখিতে পাই তখনই আমরা মুক্ত হই, সকল সুখ দুঃখের অতীত হই, তখন আর কোন বন্ধনের ভয় থাকে না,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বি ন বিভেতি কদাচনেতি। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা হইতেছে বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বিকশিত করা, যেন সে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করে। মানুষের বুদ্ধি রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই ভেদ বুঝিতে পারে না, সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই মোহ দূর হয়—অতএব মুক্তি-পথের

সাধককে সর্ব্বদা সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়াকে দমন করিতে হইবে।

কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন উঠিতেছে, মানুষের মধ্যে কোন্ গুণ প্রাধান্য করিবে সে বিষয়ে কি মানুষের কোন স্বাধীনতা আছে? গুণসকল ত আপনারাই আপনাদের উপর কর্ম্ম করিতেছে—কখনও একটি বর্দ্ধিত হইতেছে, কখনও আর একটি বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহাতে আমাদের কি হাত আছে, কি করিবার আছে? বস্তুতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই করিবার নাই, প্রকৃতিই যেমন বন্ধন করে, তেমনি প্রকৃতিই মুক্ত করিয়া দিবে। বলা হয় যে, জগন্মাতা দ্বার ছাড়িয়া না দিলে কোন জীবই মুক্ত হইতে পারে না। এ-কথা এক হিসাবে, এক দিক দিয়া সত্য। কিন্তু ইহা হইতে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষের কিছু করিবার নাই, প্রকৃতির হস্তে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়াই মানুষের কাজ, তাহা হইলে ভুল-করা হইবে—আমাদের মধ্যে এখন যে নিম্নতন গুণগুলি প্রবল রহিয়াছে, তাহাদের হস্তে, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপুর হস্তে নিজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আত্মাকে অবসন্ন করা হইবে, নিজেই নিজের শত্রুতা করা হইবে—গীতা ঠিক এইটিই অতি স্পষ্টভাষায় নিষেধ করিয়াছে। প্রকৃতির গুণ-সকলই সকল কর্ম্ম করিতেছে এ-কথা সত্য, কিন্তু তাহারা পুরুষের সম্মতি না পাইলে কিছু করিতে পারে না, পুরুষ শুধুই সাক্ষী নহে, পুরুষ অনুমন্তা। এই পুরুষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে প্রকৃতির শুভ অশুভ, ভাল মন্দ ক্রিয়ার বিচার করিতে হইবে, শুভটিকে সমর্থন করিতে হইবে, অশুভটি হইতে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে।

আবার সেই একই প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রকৃতির কোন্ ক্রিয়াটিতে আমরা অনুমতি দিব বা প্রত্যাহার করিব সে-বিষয়ে কি আমাদের কোন স্বাধীনতা আছে? এইখানে যে "আমাদের" বলিতেছি, এই "অহং" ত প্রকৃতিরই সৃষ্টি, প্রকৃতিরই যন্ত্রস্বরূপ বুদ্ধির একটি ক্রিয়া, বুদ্ধির বিকাশে এই অহংভাবের দূর হইলে পুরুষের মুক্তি হইবে, কিন্তু এই বুদ্ধির বিকাশ ত প্রকৃতিই করিয়া দিবে। এ-কথা ঠিকই যে "অহং" প্রকৃতির অধীন, উহার কোনই স্বাধীনতা নাই—তথাপি প্রকৃতির নিয়ম এই যে, "অহং" যে কর্ম্ম করিবে তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতে হইবে—"অহং"য়ের যে একটা দায়িত্ববোধ আছে তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রকৃতিই তাহাকে এই দায়িত্ববোধ দিয়াছে, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তাহাকে দিয়াছে—এই দায়িত্ব-বোধ লইয়া যে-কর্ম্ম সে করিবে, তাহার ফল সে এড়াইতে পারে না। বলিতে পারা যায় যে, এটা বড় অন্যায়, অবিচার—অহংয়ের কোনই স্বাধীনতা নাই, প্রকৃতি যেমন চালাইবে তেমনই তাহাকে চলিতে হইবে, অথচ

এই একটা ভ্রান্ত দায়িত্ববোধ তাহার মধ্যে আছে বলিয়া তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে! জীব একটা ফাঁদে পড়িয়াছে, একটা কঠিন মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে—ইহা সত্য, কিন্তু এই ফাঁদ জীব নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে, এই জালে সে ইচ্ছা করিয়াই জড়াইয়া পড়িয়াছে—

পায়ে পায়ে বাজে আমার আপন হাতের গড়া শিকল।

আবার এই শিকল তাহাকে নিজ হস্তেই খুলিতে হইবে, অন্য পন্থা নাই।

পুরুষ প্রকৃতির খেলার মধ্যে আসিয়াছে, প্রকৃতির মধ্য হইতে দেহ, প্রাণ, মন বিকাশের জন্য, যেন এই প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিকাশ করিতে পারে। এই কর্মধারাতেই তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হয়, প্রকৃতির বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যখন এই বিকাশ সম্পূর্ণ হয় তখন সে আপনিই এই বন্ধন ছাড়াইয়া উঠে, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং। এইটি হইল জীব বা জীবাত্মার দিক দিয়া, সবই তাহার স্বাধীন, স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া—তাহার বন্ধনও স্বেচ্ছায়, মুক্তিও স্বেচ্ছায়—অর্থাৎ তাহার বন্ধনটা সত্য নহে বাহ্যিক, ঐটা কেবল তাহার জগৎ-মাঝে আত্মপ্রকাশের একটা কৌশল। কিন্তু অহংয়ের পক্ষে ব্যপারটি ঠিক এই রকম নহে, অহং জীব নহে, অহং হইতেছে ঐ কৌশলেরই একটা অংশ। আমাদের অহংয়ের যে দায়িত্ববোধ, ভালমন্দ বিচারের শক্তি—প্রকৃতিই তাহা আমাদিগকে দিয়াছে—প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে বিচার করে, প্রকৃতিই আমাদের এই ধারণা উৎপন্ন করে যে আমরা স্বাধীন ভাবে কর্ম করিতেছি—এই ভাবেই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃত আত্মার, স্বাধীন আত্মার সন্ধান পাই, তাহার মুক্ত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সব কাজটিই হইতেছে প্রকৃতির। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, সাধারণ মানুষের যে স্বাধীনতাবোধ, এটা একটা ভ্রান্তি। ইহা গীতারও মত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও মত। আইনষ্টাইনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছিলেন,—"দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতায় আমি স্পষ্ট অবিশ্বাসী। প্রত্যেকেই যে শুধু বাইরের চাপেই কাজ করে তা নয়' পরন্তু একটা আভ্যন্তরীণ অনিবার্য্য প্রেরণার বশেও কাজ করে" ("The world as I see it")। কিন্তু দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেই যে নৈতিকতার, দায়িত্বের লোপ হইবে তাহাও ঠিক নহে। প্রকৃতি মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে শুভকে গ্রহণ করিতে, অশুভকে বর্জ্জন করিতে—শুভ অশুভ যদি স্পষ্টভাবে মানুষের সম্মুখে ধরা যায় তাহা হইলে প্রকৃতির প্রেরণার বশেই সে শুভটাকে গ্রহণ করে, অশুভ বর্জ্জন করে। এই জন্য মানুষকে সৎশিক্ষা দিলে তাহার নিশ্চয়ই ফল আছে—শাস্ত্র, নৈতিক

উপদেশ, সৎসঙ্গ এ-সব কিছুই বৃথা নহে। মানুষকে যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রকৃতির বশেই সে সেইরূপই হয়—অতএব প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ামকতা স্বীকার করিলেও পাপ পুণ্য ভালমন্দ, বিচার বিবেক দূর হয় না—কেবল বলিতে হয় যে এ-সবই হইতেছে মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া, এবং ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্র ঠিক এই কথাই বলিয়াছে, বলিয়াছে যে যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠে তাহারা পাপ পুণ্যের অতীত হইয়া যায়, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। আর প্রকৃতিই মানুষকে এই আত্ম-জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়—প্রাকৃত ক্রমবিবর্ত্তনের বশে যেমন ক্রমশঃ জড়, প্রাণ, মনের বিকাশ হইয়া পৃথিবীতে মানবের অবির্ভাব হইয়াছে, তেমনই এই বিকাশ ধারারই চরম পরিণতিতে মানুষ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই মর্ত্ত্যদেহেই দিব্যজীবন লাভ করিবে।

তবে প্রকৃতির এই ক্রিয়া স্বাধীন নহে, ইহা পুরুষের অধীন। এই পুরুষের সন্ধান আইনষ্টাইনের দার্শনিক মতের মধ্যে নাই। তিনি বলেন, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শুভ প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার বশেই মানুষ উন্নত জীবন লাভ করিবে।* অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দ্বারাই মানুষ দুরাচার পাপী হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু খ্রীষ্টান মতবাদের বিপরীত। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-মত হইতেছে এই যে, প্রকৃতির মূল প্রেরণা অশুভ, পাপ মানুষের মজ্জাগত—মানুষ শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা নিজেকে কতকটা সংযত, শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত কখনই মানুষ নিজের চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। গীতার মধ্যে এই-সব বিরোধী মতের সমন্বয় হইয়াছে। বিবর্ত্তনের ক্রমে মানুষ পশুস্তর হইতে উঠিয়াছে। প্রকৃতি-দত্ত যে কাম ক্রোধের সহায়ে পশু আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা করে, মানুষ একরকম উত্তরাধিকার সূত্রেই সেইগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সেগুলি এখনও খুব প্রবল। তাহা ছাড়া মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে অহংভাবের বিকাশ হইয়াছে—এই অহংভাব অন্যান্য মানুষের সহিত যে বিরোধের সৃষ্টি করে তাহাই হইতেছে মানুষের সকল অশুভ ও পাপের মূল। অহংভাবও প্রকৃতি মানুষকে দিয়াছে যাহাতে সে তাহার ব্যষ্টিত্বকে গড়িয়া

*"এসব সত্ত্বেও কিন্তু আমার মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা যে আমি বিশ্বাস করি যে স্কুল আর ছাপাখানার ভিতর দিয়ে কর্ম্মকরী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক স্বার্থগুলি যদি জাতিগুলির সুস্থ বুদ্ধিকে ময়লা না করে দিত তাহা হলেই পিশাচ অনেক দিন পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়ে যেত।" ("The World as I see it" by Albert Einstein.)

তুলিতে পারে, তাহার মধ্যে যে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তা বা জীবাত্মা রহিয়াছে, তাহা আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত আধার পায়, সুযোগ পায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষের চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশের ধারাতেই পাপ ও অশুভ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে শুধু জন্ম হইতেই পিতামাতার নিকট হইতে পাপের প্রবৃত্তি পায় তাহা নহে, মানবজাতি যখন পশুজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তখন হইতেই সে পাপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই হিসাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে মানুষের Original Sin বা জন্মগত পাপ, আদিম পাপের কথা বলে তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে। তবে মানুষ যেমন অশুভ প্রেরণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই শুভ প্রেরণা ও প্রবৃত্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় মানুষের মধ্যে যে মনের বিকাশ হইয়াছে—তাহাতে একদিকে যেমন অহংভাব রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ভালমন্দ, পাপ পুণ্য বিচার করিবার শক্তি রহিয়াছে এবং অশুভকে বর্জ্জন করিয়া শুভকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং ইহাও তাহার প্রকৃতির অন্তর্গত। দার্শনিক ভাষায় পাপ ও অশুভ যেমন রজোগুণ ও তমোগুণের ক্রিয়া, তেমনই তাহাদের বর্জ্জন, শুভ ও পুণ্যের অনুসরণ হইতেছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যে যেমন এই সত্ত্বগুণের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় তেমনই সে জ্ঞানে ও পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তথাপি সত্ত্বগুণ কখনও সম্পূর্ণভাবে রজোগুণের ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পায় না, এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহারাই মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করিতে পারে।

অতএব খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে বলিয়াছে ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত মানুষ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ইহাও সত্য। গীতাও বলিয়াছে, প্রকৃতির যে গুণময়ী খেলা (ইহাকেই গীতা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছে) ইহাকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন, যাহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়া গুণত্রয়ের অতীত হইতে পারে,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলেই মানুষ পাপ ও অশুভ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। ইহার অর্থ নহে যে, কেবল পুণ্যবান ব্যক্তিই ভগাবানকে চায়—সাধারণতঃ ইহা সত্য বটে। কিন্তু এমনও ঘটে যে অতি দুরাচার ব্যক্তি, পাপের মধ্যে যে ডুবিয়া রহিয়াছে, সহসা সে একদিন তাহার অভ্যস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়—আর সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রকৃতির রূপান্তর

ঘোরস্ত হয়, সে রক্ষা পায় (৯।৩০)। ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয় না যে, মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ রহিয়াছে যাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অধীন নহে? সাধারণতঃ মানুষ তাহার অভ্যস্ত প্রবৃত্তির বশে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কর্ম্ম করে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই—এবং এই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সামাজিক ব্যবস্থা-সকলের প্রবর্ত্তন করা হয়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। একটা জড় বস্তু যেমন অপরিহার্য্যভাবে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা অনুসারে কর্ম্ম করে—মানুষ ঠিক সেইভাবে কর্ম্ম করে বলিয়া মনে হয় না। একই শ্রেণীর মানুষ একই অবস্থার মধ্যে সকল সময়ে যে একই ভাবে কর্ম্ম করিবে সে-বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। এইটিকেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে না কি? চুরি করিতে যে অভ্যস্ত হইয়াছে সে সুযোগ পাইলেই চুরি করে—ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ তাহার প্রকৃতির বশ। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ হইলেও, সহসা একদিন সে সকল প্রলোভনকে জয় করিয়া নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারে, এবং এইটিকেই বলা যায় পুরুষকার। তাহার ভিতরে যে আত্মা রহিয়াছে, পুরুষ রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতির খেলায় সায় দেয়, ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃতির সঙ্গে চলে, তাই মনে হয় প্রকৃতিই তাহাকে চালাইতেছে, প্রকৃতিতে সে বদ্ধ। কিন্তু বস্তুতঃ সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রভু এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার প্রভুত্ব প্রয়োগ করিতে পারে। কথিত আছে স্বর্গীয় লালাবাবু অসীম ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন—সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি ধনীর পক্ষে যাহা ব্যবহার তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা একদিন শুনিলেন, হাট হইতে ফিরিবার সময় কে বলিল, "বেলা যে পড়ে এল!" অমনি তাঁহার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হইল, তিনি সব ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলকে বেশ্যা যখন বলিল, "আমি বেশ্যা, যে মন তুমি আমাতে দিয়াছ, সেই মন যদি ভগবানের উপর দিতে ত তোমার কাজ হইত।"—অমনি বিল্বমঙ্গলের নেশা ছুটিয়া গেল, সে সব ছাড়িয়া ভগবানকে লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। এ-সব সাধারণ ঘটনা নহে, তথাপি এইরূপ ঘটিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ একেবারে প্রকৃতির অধীন নয়, সে ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতির সকল বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। কাহারও সেই ইচ্ছা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে—ভিতরের অন্তঃপুরুষের প্রেরণায়, কিন্তু ইহার জন্য সৎসঙ্গ, শাস্ত্রোপদেশ এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহায় হয়।

আমাদের অহং প্রকৃতিরই সৃষ্টি, সম্পূর্ণভাবে সে প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয়, সে যে পাপ পুণ্য বিচার করে, সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া তাহার রজোগুণ ও তমো-

গুণকে দমিত করে এ-সবই প্রকৃতির খেলা। তথাপি মানুষ যে নিজেকে স্বাধীন মনে করে তাহার কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা ও পুরুষ রহিয়াছে, যাহা তাহার নিজেরই উচ্চতর, গভীরতর সত্তা, তাহা বাস্তবিকই স্বাধীন—সেই স্বাধীনতার আভাষ কিছু "অহং" পায় তাই সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ক্যাণ্ট যে বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে স্বাধীন আত্মা আছে বলিয়াই আমাদের দায়িত্ববোধ আছে একথা ঠিকই—তবে ঐ দায়িত্ব-বোধ হইতেই তিনি যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এইখানেই তাহার ভুল হইয়াছে, এইখানে তিনি নিজেই নিজের দার্শনিক চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়াছেন—কারণ বস্তুতঃ এইরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। মানুষের দায়িত্ববোধ আছে সত্য, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই দায়িত্ববোধের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় ইহাও সত্য, তথাপি এই দায়িত্ববোধ হইতে আত্মা প্রমাণিত হয় না, কেবল তাহা একটি legitimate hypothesis, যুক্তি-সঙ্গত ধারণাই হইয়া থাকে—এইরূপ ধারণাকে ক্যাণ্ট নিজেই Transcendental Illusion বা দার্শনিক ভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আত্মাকে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাবে রজঃ ও তমোগুণের মলিনতা দূর হইলে স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা স্বীয় জ্যোতিতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন আর যুক্তি-তর্কের স্থান থাকে না; প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয় না।

তাহা হইলে এই বিষয়ে এইটিই হইতেছে গীতার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। মানুষের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির সত্ত্বাদি তিন গুণের কর্ম্ম, ইহাই Determinism of Nature, প্রকৃতির নিয়ামকতা। শুধু গুণত্রয়ের কর্ম্ম দেখিলে আমরা পাইব কড়াকড়ি কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা—যেমন বাহ্যজগতে, তেমনই মানুষেরও অন্তঃর্জগতে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা বা অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে সে নিজে কোন কর্ম্ম না করিলেও তাহার অনুমতি বা সায় ভিন্ন প্রকৃতি কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের কোন্ গুণ কতটা প্রাধান্য করিবে তাহা মানুষের অন্তঃপুরুষের অনুমতির উপরেই নির্ভর করে। এইখানেই মানুষের স্বাধীনতা। যাহারা এই অন্তঃপুরুষের সন্ধান পায় নাই, শুধু প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়াটুকুই দেখে, কেবল তাহারাই Free-will বা স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ বুঝিতে পারে না। মানুষের অহং সর্ব্বতোভাবেই প্রকৃতির গুণ-ত্রয়ের দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু অন্তঃপুরুষ যখন অহংকে প্রভাবিত করে তখন অহংয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন অহং সম্পূর্ণভাবে এই অন্তঃপুরুষের সহিত এক হইবে, উহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে তখনই মানুষ হইবে স্বরাট, সম্রাট—তখনই তাহার প্রকৃত মুক্তি। প্রকৃতির কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়াও তাহার

টুপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার গতি ফিরান যায়, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা স্বীকার করিয়াছে, প্রকৃতির তথাকথিত Determinismএর মধ্যেই একটা Indeterminismএর, অনিশ্চয়তারও সন্ধান পাইয়াছে। একই সামাজিক স্তরের মানুষ একই অবস্থায় পতিত হইলে সমান শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা অনুযায়ী প্রায় সকলেই একই ভাবে কার্য্য করে এবং ইহা হইতে মোটামুটি একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে ঐভাবে কার্য্য করিবে এমন কোন স্থিরতা নাই, দুই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের মধ্যে একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যেও এইরূপ একটা অনিশ্চয়তা দেখিতেছে—বহু অণুপরমাণু মোটের উপর একই ভাবে কার্য্য করে, এবং বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতেছে তাহা ঐরূপ "মোটের উপর" নিয়ম, কিন্তু প্রত্যেক অণুপরমাণু কখন্ কিভাবে কার্য্য করিবে তাহা কোন অলঙ্ঘ্য নিয়ম বা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। * মনে হয় যেন অণুপরমাণুর পশ্চাতে একটা স্বাধীন ইচ্ছা কাজ করিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতের সহিত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অণুর পিছনে যে আত্মা রহিয়াছে, মানুষের মধ্যেও সেই আত্মা রহিয়াছে—সেই আত্মা প্রকৃতির বশ নহে, প্রকৃতি বাঁধা নিয়মের বশে চলিলেও সেই আত্মা প্রয়োজনমত হস্তক্ষেপ করিয়া প্রকৃতির গতি ফিরাইয়া দিতে পারে এবং দেয় এবং এই ভাবেই প্রকৃতি ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় জড়, প্রাণ, মনের বিকাশ করিয়া ক্রমশঃ অতিমানস ও অতিমানবের বিকাশে অগ্রসর হইয়াছে।

---

* We still see the action of the vast crowds of molecules or particles conforming to determinism—this is of course the determinism we observe in our every day life, the basis of the so-called law of uniformity of Nature. But no determinism has so far been found in the motions of separate individuals, on the contrary, the phenomena of radio-activity and radiation rather suggest that these do not move as they are pushed and pulled by inexorable forces; so long as we perceive them as in time and space, their future appears to be undetermined and uncertain at every step. They may go one way or another if nothing intervenes to direct their paths: they are not controlled by predetermined forces,

নাত্মানমবসাদয়েৎ—আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। অধ্যাত্ম সাধনায় ইহা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা বোধ হয় আর কিছুই নাই। নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে, ব্রহ্মকে, ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, অতএব যাহাতে শক্তির অপচয় হয়, দেহ, প্রাণ, মন দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এমন কোন কাজ করিতে নাই। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ন আত্মানমবসাদয়েন্নাধোনয়েন্নধোগময়েৎ, আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না, অধোগামী করিবে না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারেরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, নিজেকে অবসন্ন করা উচিত নহে অর্থাৎ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করা উচিত নহে।" কিন্তু "উদ্ধরেৎ" শব্দটির দ্বারাই ত এই অর্থটি ব্যক্ত হইয়াছে—অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে "অবসাদয়েৎ" কথাটি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতে এই "অবসাদয়েৎ" কথাটির প্রকৃত সার্থকতা বুঝা যায়—নিজেই যখন নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, তখন এমন পন্থা অনুসরণ করা উচিত নহে যাহাতে শক্তির অপচয় হয়, আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ লোকে যে-ভাবে আত্মাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে, সাধনা করে তাহাতে অনেক সময়েই বিপরীত ফল হয়, সেইজন্যই গীতা সাবধানে জ্ঞানের সহিত অগ্রসর হইতে বলিয়াছে, কারণ অজ্ঞান অন্ধতার বশে যদি আমরা নিজেই নিজের শক্তি ক্ষয় করি তবে নিজেই নিজের প্রতি পরম শত্রুতা করা হইবে, আর তখন অন্য কেহ আসিয়া আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে না।

শক্তি ক্ষয় হয় কিসে? কাম ক্রোধাদি রিপুর হস্তে নিজদিগকে ছাড়িয়া দিলে শক্তি ক্ষয় করা হয়, আত্মাকে অবসন্ন করা হয়, অতএব কখনই রিপুর বশ হইতে নাই, কামক্রোধাদির প্রেরণায় কোন কর্ম্ম করিতে নাই। আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও বুদ্ধির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে তাহারই আলোকে ভাল মন্দ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়—এই ভাবেই আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে হয়। আবার আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব প্রেরণা রহিয়াছে সে-সবকে যদি জোর করিয়া নিগ্রহ করা যায় তাহা হইলেও শক্তি ক্ষয় হয়, আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়সংযমের নামে অনেকেই নিজের উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে ফল ভাল হয় না। সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নানা বিধিনিষেধ রচনা করে, সাজা

---

but only by the statistical laws of probability. The only determinism of which modern physics is at all sure is of a merely statistical kind.—The New Background of Science by Sir James Jeans.

ও পুরস্কারের দ্বারা মানুষকে সে-সব পালন করিতে বাধ্য করে। সমাজের বাহ্য শৃঙ্খলা রক্ষা প্রয়োজন, সেজন্য এ-সব বিধিনিষেধের কিছু উপযোগিতা আছে—কিন্তু তাহাদের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠে, তখনই আচার অত্যাচারে পরিণত হয়—এইভাবে অনেক সভ্য সমাজেই মানুষের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। বাহিরের চাপে মানুষ নিজেকে উন্নত করিতে পারে না, নিজের চেষ্টাতে নিজের ভিতর হইতেই তাহাকে ঊর্দ্ধগামী হইতে হইবে—অতএব মানুষকে যত স্বাধীনতা দেওয়া হয় ততই মঙ্গল। মানুষকে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে যে তাহার মধ্যে শুভ কি রহিয়াছে অশুভ কি রহিয়াছে, নিজের অন্তরের আলোকে এই শুভ অশুভের প্রভেদ করিতে হইবে, প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে পুনঃ পুনঃ অশুভকে বর্জ্জন করিতে হইবে, শুভকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে (তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিকে সকল রকমে নিগ্রহ করাকেই অনেকে ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যাত্ম সাধনা বলিয়া মনে করেন—কিন্তু ইহা মিথ্যাচার ও অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়। কোন বাসনা কামনা যখন খুব প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কিছু ভোগ দিয়া কতকটা প্রশমিত করিলে পরে তাহাকে জয় করা সহজ হয়। নতুবা প্রবল বেগের উপর জোরজবরদস্তি করিলে আত্মশক্তি, প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিজেই শান্তভাবে বিচার করিয়া এইরূপ সংযম অভ্যাস করিতে হয়। ভোগের মধ্যে পড়িলেও অবসন্নতা আসে—গীতা উভয়দিকেই সাবধান করিয়া দিয়াছে। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি সত্য প্রেরণা আছে—সেগুলি আমাদের সত্তার অন্তর্নিহিত, তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা কল্যাণকর হয় না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Mother পুস্তকে মহালক্ষ্মী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"Ascetic bareness and harshness are not pleasing to her nor the suppression of the heart's deeper emotions and the rigid repression of the soul's and the Life's parts of beauty. For it is through love and beauty that she lays on men the yoke of the Divine." অর্থাৎ "তপস্বীর রিক্ততা ও রুক্ষতা, হৃদয়ের গভীরতর আবেগ সব দমন, অন্তরাত্মায় এবং জীবনে সৌন্দর্য্যের যাবতীয় অভিব্যক্তি রূঢ়ভাবে নিষ্পেষণ, তাঁর তৃপ্তিকর নয়। কারণ ভালবাসা ও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়েই তিনি মানবকে ভগবানের পাশে আবদ্ধ করেন।"

প্রকৃতির মধ্যে যে- সব প্রেরণা মূলগত নহে, পরন্তু যেগুলি অবান্তর ও বিকারি-স্বরূপ—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি, এইগুলিকেই দমন করিতে হইবে, নিগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু শুধু নিগ্রহ করিলেই যে ইহারা দূর হইবে তাহা নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ বিচার করিতে হইবে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে আত্মা রহিয়াছে, অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির বিকারি-সকলকে পুনঃ পুনঃ বর্জ্জন করিতে হইবে—তাহা হইলেই প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে আত্মার বা পুরুষের উদ্ধার সাধন করা হইবে (৫।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ। আত্মাই আত্মার বন্ধু। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিজেই নিজের বন্ধু কারণ অন্য কেহ সংসার হইতে মুক্তিলাভের সহায় স্বরূপ বন্ধু হয় না ; আর পুত্রাদি যে লৌকিক বন্ধু তাহারা স্নেহানুবন্ধ জন্মাইয়া বন্ধনের কারণই হইয়া থাকে। লৌকিক সম্বন্ধসকলের মূলে রহিয়াছে অহংভাব, "আমার" "আমার" ভাব। মূল আত্মসত্তায় সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়, কারণ এক আত্মাই সকলের আত্মা ; কিন্তু অজ্ঞান অহংভাবের বশে মানুষ নিজের পুত্রাদিকেই আত্মীয় বলিয়া মনে করে—অর্জ্জুন এই অহংভাবের বশেই তাঁহার ভগবদ্‌দত্ত কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। এই অহংভাব বর্জ্জন করা অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন এবং গীতা পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষা দিয়াছে, নিরাশী নির্ম্মম হইতে বলিয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে গীতা সেই প্রসঙ্গ অবতারণা করে নাই। এখানে গীতার বক্তব্য হইতেছে এই যে, আমাদের মধ্যে যে ঊর্দ্ধতর আত্মা রহিয়াছে তাহারই সাহায্যে আমাদের নিম্নতর আত্মাকে বশীভূত করিতে হইবে—এইভাবে যে নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, সেই নিজে নিজের বন্ধু। সাধারণ লৌকিক ধারণা আছে যে, বংশধরগণ পিণ্ডদান করিলে পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন হয়, গীতা এই মতের সমর্থন করে নাই। বস্তুতঃ পিণ্ডের দ্বারা পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি বা মুক্তি হয় এই বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল তাহা বিস্ময়ের বিষয়, * কারণ হিন্দু পুনর্জন্ম স্বীকার করে, কর্মফল স্বীকার করে। মৃত ব্যক্তিগণ কোন স্থানে গিয়া তাহাদের বংশধরগণের পিণ্ডের আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে—এ-ধারণা হিন্দুমতের বিরোধী। মৃত্যুর পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সকলেই আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে পুনরায় নূতন জন্ম গ্রহণ করে—তাহা হইলে যাবজ্জীবন পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের সার্থকতা কি ?

* সম্ভবত ভারতের আদিম অনার্য্যগণের নানা প্রথার সহিত এই প্রথাটিও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। অনেক আদিম ধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষ-পূজা প্রচলিত আছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই করিতে হইবে, পুত্রপৌত্রাদির পিণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া কোন লাভ নাই।"

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে। নিজের চেষ্টাতেই যদি নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হয় তাহা হইলে মুক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনার সার্থকতা কি? ভগবদ্ কৃপার স্থান কোথায়? সাধক কবি তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

যদি আপনারই কর্ম্মফল ফলিবে আমারে,
তারা, তোমার ভরসা বল কে করে?

বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভের জন্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখাইয়া দিয়াছেন—"সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক আচরণ, সম্যক আজীব, সম্যক চেষ্টা, সম্যক ধ্যান ও সমাধি। সংক্ষেপতঃ, আমরা যদি জগৎকে চঞ্চল, দুঃখাত্মক অনাত্মরূপে ধারণা করিবার চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করি, মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্কশ ও অসার বাক্য পরিত্যাগ করি, প্রাণী হিংসা, চৌর্য্য ও ব্যাভিচার বর্জ্জন করি, সৎপথে জীবিকার্জ্জন করি, এবং সৎগুণাবলী অর্জ্জন ও পরিরক্ষণে যত্নবান হই তাহা হইলে আমাদের অবিদ্যা, অজ্ঞান বা তৃষ্ণার নিরসন হইবে। ইহাতেই আমাদের নির্ব্বাণ ঘটিবে—দুঃখ ও জন্মান্তর পরিগ্রহণের অবসান ঘটিবে। এই নির্ব্বাণ মনুষ্য বা দেবতা কেহ কাহাকেও দিতে পারেন না। বুদ্ধ পথ-প্রদর্শক মাত্র। নিজের চেষ্টা দ্বারা অবিদ্যা নাশ ব্যতিরেকে নির্ব্বাণলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা চেষ্টা ও সাধন সাপেক্ষ।"

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও অনুরূপ কথা বলা হইয়াছে, বুদ্ধের আষ্টাঙ্গিক মার্গ যোগশাস্ত্রের আষ্টাঙ্গিক মার্গেরই প্রকার ভেদ। যোগশাস্ত্র বলেন, যম নিয়ম আসনাদির দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। বিষয়াসক্ত মনই সঙ্কল্প বিকল্পের ভিত্তিভূমি, মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করা যায় তবে উহা আত্মস্বরূপে অবস্থান করে—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" (যোগসূত্র ১।৩)। ইহাই প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে আত্মার উদ্ধার। ইহা নিজ চেষ্টা ব্যতীত সংসাধিত হয় না, ইহার জন্য যত্ন করিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়, তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ (যোগসূত্র ১।১৩)।

অন্যদিকে ভক্তি মার্গের শিক্ষা হইতেছে এই যে, ভগবদ্কৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় মানুষ কখনই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারে না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই মতবাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খ্রীষ্টান মতে মানুষ মাত্রেই জন্মাবধি পাপী। ভগবান খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মানবজাতিকে এই মূলগত পাপ হইতে উদ্ধার করিবার

জন্য। তিনি নিজে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন যে-কোন মানব তাঁহার শরণাগত হইবে, নিজ পাপের জন্য অনুশোচনা করিবে, খ্রীষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, শেষ বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না, সে চিরকাল স্বর্গে বাস করিবে। যীশুখ্রীষ্ট মানবের হইয়া দুঃখবরণ করিলেন তাহাতেই মানবজাতির মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইল, একের দুঃখবরণে অন্যের উদ্ধার হইল—ইহাকেই বাইবেলে Vicarious suffering বলা হইয়াছে। এই মত আপাতদৃষ্টিতে গীতার মতের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ মূলে কোন বিরোধই নাই। গীতা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ন্যায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রচার করে নাই। লৌকিক ধর্ম্মসকল হইতেছে এমন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহাদের সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ নাই, সে-গুলিকে অন্ধভাবেই মানিয়া লইতে হয়—এই সব বিশ্বাসকেই creeds, dogmas বলা হয়। এই সব বিশ্বাসের মধ্যে অনেক সময় সত্য ও অসত্য মিশ্রিত থাকে, সাধারণ লোকের মনের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে প্রচারিত করিতে হয়—সেজন্য দেশে দেশে, যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সব ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে যে সনাতন অবিমিশ্র সত্য রহিয়াছে গীতা তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষ যে জন্মাবধি পাপী, গীতা তাহা স্বীকার করে—কিন্তু এই পাপের মূল কোথায় গীতা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে এবং কেমন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতে হয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষের প্রকৃতিতে যে রজঃ ও তমঃ রহিয়াছে, ইহারাই সকল পাপের মূল—মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। তবে ইহার অর্থ নহে যে সে আর কাহারও কোন সাহায্য পাইবে না, বা শুধু নিজের চেষ্টাতেই সে মুক্ত হইতে পারে। যে মানুষ নিজের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করে ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন, গীতা যেমন বলিয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু, তেমনই আবার স্পষ্ট বলিয়াছে যে, ভগবানই সর্ব্বভূতের বন্ধু,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতনাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥৫।২৯

ভগবান মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হন ইহা গীতারও শিক্ষা। যীশুখ্রীষ্ট বলিতেন, Repent, all ye sinners. Come unto me, all ye who labour and are burdened, and I will refresh you. অর্থাৎ "হে পাপীগণ! অনুতপ্ত হও। পাপীতাপী কে কোথায় আছ, আমার নিকট এস, আমি তোমাদের প্রাণে শান্তি দান করিব।" গীতাতেও অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

"এই দুঃখময় অনিত্য সংসারের মধ্যে আসিয়া কে দুঃখ ভোগ করিতেছ, এস, আমার ভজনা কর, আমি তোমাদের উদ্ধার সাধন করিব।" তবে যীশুখ্রীষ্ট আসিয়া যে দুঃখ-বরণ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সেইটির উপরেই সমধিক জোর দিয়াছে; গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দুঃখবরণের কোন কথা নাই—তিনি নিজের জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহার যে দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম্ম—তাহারই অনুসরণ করিয়া মানুষ মুক্তিলাভ করিবে (৪।৯)। ভগবান যখন মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে মানবজীবনের সকল দুঃখ ও অপূর্ণতাই বাহ্যতঃ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সেই সবকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয় তাহা তিনি নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়া দেন, নিজ চরিত্রের মহিমায় লোক-সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, সত্য বাণী প্রচার করিয়া তাহাদের সকল সংশয় দূর করিয়া দেন। কিন্তু অবতারের আগমনের ফল তাহারাই লাভ করিতে পারে, যাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হয়—এইখানেই মানুষের নিজের চেষ্টার স্থান রহিয়াছে। মানুষকে নিজের অবনত অবস্থা হইতে উঠিবার সঙ্কল্প করিতে হইবে, ভগবানের শরণ লইতে হইবে—যে মানুষ তাহা করে সেই নিজে নিজের বন্ধু। এবং যে ভগবানকে, অবতারকে অগ্রাহ্য করিয়া নিম্ন প্রকৃতির তুচ্ছ ভোগসুখের মধ্যে আসক্ত হইয়া থাকে সে নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করে। খ্রীষ্টানধর্ম্মও বলে না যে, মানুষ নিজে কোন চেষ্টা না করিলেও ভগবান কৃপাবলে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। ধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী যাহারা পবিত্র জীবন যাপন করিবে তাহারাই ভগবদ্ কৃপালাভের অধিকারী—অতএব মানুষের নিজের চেষ্টা ও ভগবদ্কৃপা এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, পরন্তু এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে। তবে যাহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নির্ব্যক্তিক বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদের মতে মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তিলাভ করিতে হয়। তাহাদের পন্থাই জ্ঞানযোগ—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কাহাকেও তাঁহার নিকট পৌঁছিতে সাহায্য করেন না। বৌদ্ধদের শিক্ষা কতকটা ইহারই অনুরূপ। গীতা এইরূপ সাধনারও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে—ইহাও একটা পথ, তবে দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে ইহা কঠিন পথ (১২।৫)। যাহারা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের সমবায়ে ভগবান পুরুষোত্তমের উপাসনা করে, ভগবান নিজে তাহাদিগকে এই দুঃখময় মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দেন,

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥১২।৭

তবে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা সাধকের নিজ চেষ্টার উপরেই জোর দিয়াছে, কারণ ইহা না হইলে ভগবদ্ কৃপাও লাভ করা যায় না। বেদেও আছে "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋক্ ৪।৩৩।১১)—নিজে শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতারাও সাহায্য করেন না।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দ্বারা যদি এ-জন্মে মানুষের ভাগ্য নির্ণীত হয় তাহা হইলে মানুষ এ-জন্মের চেষ্টার দ্বারা কেমন করিয়া নিজের উদ্ধার সাধন করিবে? মানুষ এ-জন্মে চেষ্টা করিয়া যাহা করে তাহাকেই পুরুষকার বলা হয়, আর পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকেই দৈব নামে অভিহিত করা হয়। দৈব ও পুরুষকার এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রবল ইহা লইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী অতিমাত্রায় দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে বলিয়াই তাহারা সাংসারিক জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই। কিন্তু অদৃষ্টবাদ ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া নহে, সকল দেশে সকল যুগেই লোক অদৃষ্ট বিশ্বাস করিয়াছে—সেজন্য যদি তাহাদের অবনতি না হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের অবনতির জন্য অদৃষ্টবাদকে দায়ী করা সমীচীন হয় না। আরও একটি কথা এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে Fate বলা হয়, ভারতে অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। Fate বলিতে বুঝায় মানুষের জীবনের উপর এমন কোন শক্তির প্রভাব আছে যাহা খেয়াল মত কার্য্য করে, তাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। গ্রীকজাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল, তিন ভগ্নী পাশা খেলিয়া মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করে —তাহারাই Fate, নিয়তি, ভাগ্যদেবী। তাহাদের পাশায় হঠাৎ যাহা উঠিবে, মানুষের জীবনের গতি সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইবে। মানুষের জীবনের অনেক অংশ যে অনিশ্চয়তার অধীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা হইতেই ঐরূপ বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছে। দেখা যায় একটা মানুষ সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কখনও বা তাহাও পারে না, আবার আর একটা লোকের এমনই যোগাযোগ হইয়া যায় যে সে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠে। তাহা হইলে মানুষের চেষ্টা অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রবল বলা ঠিক হয় না কি? ভারতের অদৃষ্টবাদ কিন্তু ঠিক এইরূপ নহে— কোন অদৃশ্য শক্তি মানুষের জীবন লইয়া জুয়া খেলিতেছে হিন্দু তাহা বিশ্বাস করে না। হিন্দুমতে অদৃষ্ট আর কিছুই নহে, তাহা মানুষের আপন আপন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল—এ-জন্মের কর্ম্ম দেখা যায়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সেরূপ দেখা যায় না, জানা যায় না অথচ তাহা ফল প্রসব করে, এই জন্যই তাহাকে অদৃষ্ট বলা হয়—ইহারই

'আর এক নাম দৈব। আর এ-জন্মে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে বলা হয় পুরুষকার। ইহাতে মানুষের চেষ্টাকে নিম্নস্থান দেওয়া হয় না, বরং খুবই উচ্চস্থান দেওয়া হয়—কারণ এই মত অনুসারে মানুষের কর্ম্ম কেবল তাহার বর্ত্তমান জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, পরন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে—ইহাতে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান অনেক বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদ মানিয়াও শত শত বৎসর ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতবাসী যে প্রচুর কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অদৃষ্টবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে. অদৃষ্টবাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হয় নাই। যখন মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, বর্ত্তমানে কোন চেষ্টা করে না, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এই বিশ্বাসকে ধরিয়া বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তখনই সে ভুল করে, কর্ম্মহীনতার জন্য তাহার অবনতি অনিবার্য্য হয়। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এইরূপ ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদকে নিন্দা করা হইয়াছে। এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মতটি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেই অধ্যায় হইতে আমরা এখানে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং ভবতি নিষ্ফলম্।
তথা পুরুষকারেন বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৭

"ক্ষেত্র কর্ষিত হইলেও বীজ না হইলে যেমন তাহা ফল প্রসব করে না তেমনই পুরুষকার বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত দৈব কোন ফল প্রসব করে না।"

অকৃত্বা মানুষং কর্ম্ম যো দৈবমনুবর্ত্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সংপ্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা ॥২০

"যে ব্যক্তি মানবীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, নপুংসক স্বামীর স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে ব্যর্থ হইতে হয়।"

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ ॥ ২৭

"আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষী-স্বরূপ।"

দৈবানাং শরণং পুণ্যং সর্ব্বং পুণ্যৈরবাপ্যতে।
পুণ্যশীলং নরং প্রাপ্য কিং দৈবং প্রকরিষ্যতি ॥২৯

"মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদয় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়।"

পাণ্ডবানাং হৃতং রাজ্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ ।
পুনঃ প্রত্যাহৃতং চৈব ন দৈবাদ্ভুজসংশ্রয়াৎ ॥৪০

"প্রবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত পাণ্ডবগণ ভুজবলেই তাহা পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, দৈববলে নহে।"

দৈব ভোগ ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিলেও পুরুষকারবিহীন লোক তাহা রক্ষা করিতে পারে না, ভোগ করিতে পারে না—

বিপুলমপি ধনৌঘং প্রাপ্য ভোগান্ স্ত্রিয়ো বা
পুরুষ ইহ ন শক্তঃ কর্ম্মহীনো হি ভোক্তুম্ ।
সুনিহিতমপি চার্থং দৈবতৈ রক্ষ্যমাণং
পুরুষ ইহ মহাত্মা প্রাপ্নুতে নিত্যযুক্তঃ॥ ৪৫

"ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্‌যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকার প্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন।"

পাপমুৎসৃজতে লোকে সর্ব্বং প্রাপ্য সুদুর্লভম্ ।
লোভমোহসমাপন্নং ন দৈবং ত্রায়তে নরম্ ॥৪২
যথাগ্নিঃ পবনোদ্ভূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ ।
তথা কর্ম্মসমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবর্দ্ধতে ॥৪৩

"দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপীদিগের অধিকৃত হইয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভ-মোহের বশীভূত নরাধমগণকে দৈব কথনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ু সহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়।"

ন চ ফলতি বিকর্মা জীবলোকে ন দৈবং
ব্যপনয়তি বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্ ।৪৭

"ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা কথনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়।"

অতএব দেখা যাইতেছে কর্ম্মবিমুখ অদৃষ্টবাদ ভারতের আদর্শ, ভারতের শিক্ষা নহে। কোন অনির্দ্দিষ্ট শক্তি খেয়ালমত আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এই পাশ্চাত্য বিশ্বাস মানুষকে কর্ম্মে উৎসাহহীন করিতে পারে। ভারতবাসী জানে কর্ম্মের

দ্বারাই তাহার দৈব সৃষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারাই তাহা জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব্বজন্মে যদি আমি ভাল কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা আমার এজন্মের কর্ম্মে সহায় হইবে, পূর্ব্বে আমি যদি মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকি, এজন্মের কর্ম্মের দ্বারা তাহার ফল প্রতিহত, নিরাকৃত হইবে—আমার বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই বিশ্বাস যাহাদের আছে তাহারা কখনই কর্ম্মে নিরুৎসাহ হয় না। ভারতবাসী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কর্ম্মে আলস্য দেখাইয়াছে কেবল তখন—যখন কালক্রমে তাহাদের মধ্যে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার জন্য ভারতের আদর্শ, ভারতের অদৃষ্টবাদ বা কর্ম্মবাদ দায়ী নহে।

মানুষ নিজের চেষ্টাতেই সব কিছু করিতে পারে না, ঐহিক জীবনেও তাহাকে অনেক বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়—কিন্তু এইরূপ সাহায্য পাওয়াও নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। মানুষের নিজের ব্যবহারের ফলেই কেহ তাহার বন্ধু হয়, কেহ তাহার শত্রু হয়। অতএব গীতা যে জোর দিয়া বলিয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু—ইহা খুবই ঠিক। শুধু অপরে নহে, আমরা নিজেরাই যে নিজেদের বন্ধু বা শত্রু হই, সেটাও নিজেদেরই ব্যবহারের ফলে। আমাদের মধ্যেই দুই রকম আত্মা বা সত্তা রহিয়াছে—একটি ঊর্দ্ধতর, একটি নিম্নতর। যে ব্যক্তি তাহার ঊর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা তাহার নিম্নতর আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, তাহার আত্মা তাহার বন্ধু; কিন্তু যে ব্যক্তি "অনাত্মা", যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধতর আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার নিম্নতর আত্মা শত্রুবৎ হয় এবং শত্রুবৎ ব্যবহার করে।

আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। মানুষ যখন নিজে নিজের শত্রুতা করে তাহা অপেক্ষা বড় শত্রুতা আর কিছুই নাই—আর মানুষ নিজের শত্রুতা করে তখন যখন সে পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পাপের ফলে মৃত্যুর পর ভীষণ নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে, এমনকি অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হইবে এ-সব লৌকিক ধর্ম্মমত কল্পনামাত্র। তবে পাপের ফলে মানুষ এই শোকদুঃখময় সাংসারিক জীবনের মধ্যে অতিশয় বদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা হইতে নিজেকে উদ্ধার করা কঠিন হয়—যে দিব্য শান্তিময় আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় জীবনলাভের জন্য মানুষ এই জগতে আসিয়াছে তাহা হইতে সে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে—ইহাই আত্মার অধোগতি বা অধঃপতন। অতএব যাহা পাপ বলিয়া মনে হইবে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেই হইবে। কিন্তু সংসারের যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া, মানুষ বর্ত্তমানে যেরূপ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ জীবন যাপন করা কোন মানবের পক্ষেই সম্ভব নহে। মানুষ যে পাপ করে তাহার জন্য সে নিজে যতখানি দায়ী তাহা

অপেক্ষা যে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে তাহা অধিক দায়ী—অথচ সমাজ পাপী ব্যক্তিকে শাসন করিতে অতি ব্যগ্র। ইহাতে কি ব্যক্তি, কি সমাজ কাহারও কল্যাণ হয় না। ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচার লইয়া সমাজ চলে না, অন্ততঃ এতদিন চলে নাই—তাই সামাজিক মানুষের দুঃখ তাপ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আশা করা যায় এতদিনের অভিজ্ঞতার পর সমাজ আর নিজেই নিজের শত্রুতা করিবে না, সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিসকলকে সহানুভূতির সহিত দেখিয়া তাহাদিগকে পাপ ও ভ্রান্তি হইতে নিজ চেষ্টায় উঠিতে সাহায্য করিবে। পাপীকে নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে সংশোধন করিতে হইবে, সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তি কোন মানুষকে জোর করিয়া ভাল বা পুণ্যবান করিতে পারে না।

অনেক ধর্ম্মেই পাপীকে অনুতাপ করিতে বলা হয়, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলা হয়—কিন্তু এ-সবের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি কতটা সংসাধিত হয় তাহা সংশয়ের বিষয়। পাপকর্ম্মের জন্য সকলেরই দুঃখিত হওয়া উচিত, নতুবা পাপী নিজেকে সংশোধন করিতে অগ্রসর হইবে না, এই হিসাবে অনুতাপের সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহার মাত্রা বাড়াইলে আত্মাকে অবসন্ন করা হয়। আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি অধম, আমাকে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা অবসাদ আনয়ন করে। মানুষ নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারায়, এইভাবে নিজেই নিজের উদ্ধারের পথ বন্ধ করে। এই হিসাবে যে-ধর্ম্ম পাপ ও অনুতাপের উপরেই অধিক জোর দেয়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহা মানুষের পক্ষে অনুকূল নহে। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে ; আমায় আবার বাঁধে কে ?···খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে ব'ল্লুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'! তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপী'। যে-ব্যক্তি রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই, কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাক্‌বে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?···ভগবানের নাম কর্‌লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়, কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এইসব কথা কেন?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ পৃঃ ৫৩)। গীতা যে বলিয়াছে ঊর্দ্ধতর আত্মার সাহায্যে নিম্নতর আত্মার

উদ্ধার সাধন করিবে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলিতে তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

অনেকে আবার শুধু অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেহকে নানারূপ পীড়ন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাকেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এ-সব হইতেছে বস্তুতঃ লৌকিক আচার, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই—বরং ইহার দ্বারা শরীর মন অবসন্ন হইতে পারে এবং তাহাতে নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করা হয়। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টানগণ শরীরকে কষ্ট দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। এমন কি চলিত ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল পাঠ করা রূপ "মহাপাপের" প্রায়শ্চিত্তের জন্য মধ্যযুগে তাহারা বহু নর-নারীকে জীবন্ত দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্মের নামে জগতে এইরূপ যে কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আধুনিক যুগে এইরূপ অত্যাচার কম হইলেও এখনও মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অত্যাচার করিতেছে এবং অজ্ঞানের বশে সমাজও তাহা সমর্থন করিতেছে। অপরের বা নিজের ভুল ভ্রান্তি পাপের জন্য দেহকে পীড়ন করা এখনও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার পদ্ধতি হইতেছে অনশনের দ্বারা দেহকে কষ্ট দেওয়া, তাঁহার মতে ইহার দ্বারা নিজের ও অপরের শুদ্ধি সাধন করা হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"Crucify the flesh by fasting"—"অনশনের দ্বারা শরীরকে ক্রুশবিদ্ধ কর অর্থাৎ যন্ত্রণা দাও।" ঐ Crucify কথাটি হইতেই প্রমাণিত হয় যে এ বিষয়ে তিনি যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকৃতি বলিয়াই মনে হয়, কারণ যীশু নিজে ইচ্ছা করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। আর বস্তুতঃ যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি কখনও ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সমস্ত জিনিষটাই একটা অধ্যাত্ম জীবনের রূপক হইতে পারে। নিম্নতন প্রকৃতির কাম-ক্রোধাদিকে নির্জ্জিত করিয়াই আমরা অধ্যাত্ম-জীবন লাভের যোগ্যতা লাভ করি—Crucifixion তাহারই স্থূল রূপক মাত্র।

হিন্দুধর্ম্মেও প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রচলিত আছে—কিন্তু গীতা এই সব লৌকিক ধর্ম্মাচরণকে সমর্থন করে নাই, ধর্ম্মের মধ্যে যে নানা গ্লানি প্রবেশ করে গীতা তাহা স্পষ্ট বলিয়াছে—এবং সেই গ্লানি দূর করিয়া সত্য পন্থা দেখাইয়া দিতে ভগবানকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শরীরকে পীড়ন করা

এইরূপই একটি গ্লানি, ইহাতে আত্মাকে অবসন্ন করা হয় (১৭।৬)। বস্তুতঃ পাপের জন্য আমাদের এই দেহটা দায়ী নহে, পাপের জন্য দায়ী হইতেছে আমাদের অশুদ্ধ প্রাণ; অতএব দেহকে শাস্তি দিলে রামের অপরাধে শ্যামকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর শাস্তি দেওয়াও সংশোধনের প্রকৃত পন্থা নহে, মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া, তাহার মধ্যে উচ্চতর প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত হইতে প্রকৃত ভাবে সাহায্য করা হয়। গীতা পাপীকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলে নাই, কেবল একান্তভাবে ভগবানের শরণ লইতে বলিয়াছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥৯।৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩১

"অতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে কারণ সে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যথার্থ সাধনার পথ ধরিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি অতি শীঘ্র পুণ্যাত্মা হইয়া উঠে এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার যে ভক্ত সে কখনই বিনষ্ট হইবে না, ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিতেছি।"

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ।

অনুবাদ। আত্মজয়ী প্রশান্ত ব্যক্তির পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ অথবা মান-অপমানে সমাহিত থাকে।

ব্যাখ্যা

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য। ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যোগারূঢ় ব্যক্তির শম বা শান্তিই কারণ হয়। কিসের কারণ হয় এখানে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। ঊর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা যিনি নিম্নতর আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই জিতাত্মা। নিম্নতর আত্মা অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের যে প্রাকৃত সত্তাকে সাধারণতঃ মানুষ আত্মা বলিয়া মনে করে; শঙ্কর এই আত্মাকে বলিয়াছেন কার্য্যকারণাদিরূপসঙ্ঘাত আত্মা। যে-ব্যক্তি এই প্রাকৃত সত্তাকে বশীভূত করিয়াছে সে যে শান্ত অবস্থা লাভ করে সেই পূর্ণ শান্তির মধ্যে

তাহার ঊর্দ্ধতম আত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু শঙ্কর শুধু এই কথাটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, তিনি এই সঙ্গে "সন্ন্যাসী" কথাটিও যোগ করিয়া বলিয়াছেন—"জিতাত্মা ও প্রসন্নচিত্ত হইলে সন্ন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হয়।" অর্থাৎ সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ না করিলে কেহই এই উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু গীতা এখানে আভ্যন্তরীণ শান্তির উপরেই জোর দিয়াছে, বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগের কোন কথাই এখানে নাই। নিম্নতন প্রকৃতি বশীভূত হওয়ায় অন্তর হইতে যখন সমস্ত বাসনা কামনা রাগদ্বেষ দূর হইয়াছে, তখন যে আভ্যন্তরীণ শান্তভাব লাভ করা যায়, মুক্ত যোগীপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম সেই শান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই যে শান্তি ইহা অতি গভীর, পূর্ণ,—কর্ম্ম করা না করার ন্যায় কোন বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা ইহা ক্ষুণ্ণ হয় না। এই শান্তিই হইতেছে অধ্যাত্ম-জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি। ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম অভ্যাস করিলে আমাদের মধ্যে এই শান্ত প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠে, আমরা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে আমাদের অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান পাই।

মানুষের সাংসারিক জীবন এখন যে-ভাবে চলিতেছে, সর্ব্বত্র যেরূপ দ্বন্দ্ব, অশান্তি, কোলাহল—ইহার মধ্যে থাকিয়া অধ্যাত্মজীবনের উপযোগী শান্তভাব রক্ষা করা সম্ভব নহে—এই জন্যই ভারতে পুরাকালে নির্জ্জন স্থানে আশ্রম রচনা করিয়া অধ্যাত্ম সাধনা করিবার ব্যবস্থা ছিল। গীতা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দেয় নাই, অধ্যাত্ম চৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। তবে এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্য সাময়িকভাবে যে নির্জ্জনে থাকিয়া তপস্যা করা প্রয়োজন হইতে পারে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে তাহারই উপদেশ দিয়াছে এবং এজন্য অনেকটা রাজযোগের প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছে। অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে ঠিক এই পন্থাই যে অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া আসন প্রণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে তাহা নহে। তবে যেখানে থাকিয়াই সাধনা করি, এমন অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রয়োজন যেন সাধনজীবন গড়িতে না গড়িতে বাহিরের চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়, এবং এমন শান্ত ও সৌন্দর্য্যময় পরিবেশ থাকে যাহাতে মানুষ নিম্নপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সকলকে শান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেগুলিকে ধীরে ধীরে নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারে। ইহার জন্য যেমন শান্ত, পবিত্র, সৌন্দর্য্যময় পরিবেশ প্রয়োজন, তেমনই যোগ্য দিশারী ও গুরু প্রয়োজন। যে-মানুষ নিজেকে এইরূপ অনুকূল অবস্থার মধ্যে আনিয়া আত্মার সন্ধানে, অধ্যাত্ম জীবনলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত

হয়; সেই প্রকৃতপক্ষে নিজে নিজের বন্ধু। আর যে অজ্ঞান অহং ও বাসনা-কামনার বশে সংসারের তুচ্ছ ভোগ সুখের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখে সে নিজেই নিজের শত্রুতা করে। যতক্ষণ না তাহার এই নেশা ছুটিতেছে ততক্ষণ তাহার মুক্তি বা উদ্ধারের কোন আশাই নাই।

পরমাত্মা সমাহিতঃ। "পরমাত্মা সমাহিত হয়," এই কথাটির ব্যাখ্যায় অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। শঙ্কর বলিয়াছেন, জিতাত্মা ও প্রসন্নচিত্ত হইলে সন্ন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়, সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শঙ্কর আত্মা ও পরমাত্মা এই দুইয়ের মধ্যে, কোন প্রভেদ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় অদ্বৈতবাদীরা এরূপ প্রভেদ করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা যখন প্রকৃতি বা মায়াতে বদ্ধ তখনই সে জীব; এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সে পরমাত্মা হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহার যে কোন পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে, আত্মা যেমন ছিল তেমনই থাকে, তবে এক অবস্থায় তাহাকে জীব বা আত্মা বলা হয়, অন্য অবস্থায় তাহাকেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়। মহাভারতে অন্যত্র বলা হইয়াছে,

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্ত সংযুক্ত প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

—শান্তিপর্ব্ব ৮৭।২৪

আত্মা ও পরমাত্মা যে মূলতঃ একই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি গীতা এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছে সেটি মনে না রাখিলে গীতার অদ্বৈত মতটি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শরীরের সঙ্গে, প্রকৃতির গুণসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেই যে আত্মা বদ্ধ হয় গীতা তাহা স্বীকার করে না—

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩।৩১

মানুষ মুক্তই হউক আর বদ্ধই হউক, জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানই হউক তাহার মধ্যে যে অক্ষর পুরুষ রহিয়াছে তাহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিবর্ত্তনীয়, প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়াও তাহার সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে থাকে অর্থাৎ সে-সব তাহাকে বিচলিত করে না, তাহা কূটস্থ। এই আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে বলিয়াই গীতা ইহাকে "পরং" বলিয়াছে, পরমাত্মা বলিয়াছে (৩।৪২,৪৩)। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তাহার অন্তরস্থিত এই পরমাত্মাকে জানে না, সে নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়াসকলের সহিত এক করিয়া দেখে, সেই সবে আসক্ত হয়—সাধারণতঃ আত্মা বলিতে প্রকৃতির গুণে আসক্ত

পুরুষকেই বুঝায়—তাই গীতা এখানে প্রকৃত আত্মাকে বুঝাইতে পরমাত্মা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২১ ও ২২ শ্লোকে গীতা এই প্রভেদটি সুস্পষ্ট করিয়াছে।

আমাদের মধ্যে এই যে অক্ষর পুরুষ পরমাত্মা রহিয়াছে—প্রকৃতিতে আসক্তির বশে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া হৃদয় মনকে সমস্ত বাসনা কামনা আসক্তি হইতে মুক্ত করিলে আমরা যে শান্তভাব লাভ করি তাহাতে এই পরমাত্মা আমাদের বাহ্য চৈতন্যে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার অচল, অব্যয়, গুণাতীত, অক্ষর স্বরূপ উপলব্ধি করি এবং তাহার সহিত তাদাত্ম্যের ফলে আমরা আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও সেইরূপ অচল, অটল, নির্ব্বিকার হইয়া উঠি—পরমাত্মা সমাহিত হয় বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতার অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার শঙ্করের অনুসরণ করিয়া আত্মা ও পরমাত্মার কোন প্রভেদ স্বীকার করেন নাই, তবে "পরং" বিশেষণটি কেন যোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। শ্রীধর বলিয়াছেন, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে পরমাত্মা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—এই ব্যাখ্যা সমীচীন। আত্মা সকল সময়ে আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহাকে জানি না, আমাদের বাহ্য চৈতন্যে আমরা সেই আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান। কিন্তু আত্মসংযম ও শান্তভাব অভ্যাস করিলে আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও আমরা আত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে পারি (৬।৮)। এ-ব্যাখ্যা ঠিক, কিন্তু পরং বিশেষণটি কেন ব্যবহার করা হইল? কেহ কেহ "পরং" ও "আত্মা" এই দুইটি পদকে পৃথক করিয়া 'পরং'কে সমাহিতের ক্রিয়াবিশেষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা নীলকণ্ঠ—পরমুৎকর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিপ্রাপ্তো ভবতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে সমাহিত হয়। তিলক বলিয়াছেন, "এই অর্থ ক্লিষ্ট; কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনো করেন।" আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতেই এই "পরং" বিশেষণটির সার্থকতা সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়। আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা বা সত্তা রহিয়াছে, একটি অধ্যাত্ম সত্তা, একটি প্রাকৃত সত্তা। দেহ, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের প্রাকৃত সত্তা; অধ্যাত্ম সত্তা ইহাদের ঊর্দ্ধে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এখানে 'পরং' বিশেষণটি ব্যবহার করা হইয়াছে। কেশবাচার্য্য এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পরমাত্মা অর্থাৎ মন বুদ্ধি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মা।" "জিতাত্মা" কথাটির মধ্যে যে "আত্মাকে" বুঝান হইয়াছে তাহা হইতেছে আমাদের নিম্নতর আত্মা, অহংকে কেন্দ্র করিয়া দেহ,

প্রাণ, মন, বুদ্ধি লইয়া আমাদের মধ্যে যে আত্মভাব সৃষ্ট হইয়াছে সেই প্রাকৃত আত্মাকে ঊর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা নিম্নতর আত্মাকে জয় করিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা প্রাকৃত সত্তাকে জয় করিতে হইবে—ইহাই মানুষের পূর্ণতা ও মুক্তিলাভের পন্থা। যাহারা এই ঊর্দ্ধতর আত্মার সন্ধান পায় নাই, তাহারা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহারাই পূর্ব্বশ্লোকে "অনাত্মা" শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে; পঞ্চদশ অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে অকৃতাত্মা বলা হইয়াছে; এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের নিম্নতর আত্মা, তাহাদের প্রাকৃত সত্তা তাহাদের শত্রুবৎ হয় এবং অহিত সাধন করে।

গীতা এই শ্লোকে (এবং ১৩।৩১ শ্লোকে) পরমাত্মা বলিতে প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত অক্ষর পুরুষকে বুঝিয়াছে। ক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সহিত এক, প্রকৃতির খেলায় নিমগ্ন—আমরা যে শুধুই ক্ষর নহি, আমাদের মধ্যে অক্ষর পুরুষ রহিয়াছে এই জ্ঞান লাভ করা, অক্ষরের শান্ত কূটস্থ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ইহাই মুক্তিলাভের পন্থা। কিন্তু এই অক্ষর পুরুষেরও ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, গীতা অন্যত্র তাঁহাকেও পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (১৩।২২; ১৫।২৭)। ইহাতে কোনই বিরোধ হয় নাই, কারণ ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম এই তিনই ভগবান, ইহারা একই ভগবানের তিনটি ভাব (status)—ইহাদের মধ্যে ক্ষর হইতেছে প্রকৃতির লীলায় নিমগ্ন, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম সেই খেলার ঊর্দ্ধে, তাই অক্ষর পুরুষকে এবং পুরুষোত্তমকে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"সমাহিত" কথাটির অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু শুধু "প্রকাশ পায়" বলিলে "সমাহিত" কথাটির সম্যক অর্থ প্রকাশিত হয় না। শ্রীধর ও তিলক বলিয়াছেন, পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে। কিন্তু পরমাত্মা ত সকল সময়ে সর্ব্বত্রই সম ও স্থির থাকে, তাহা হইতেছে কূটস্থং অচলং ধ্রুবং, অতএব "স্থিতো ভবতি," স্থির হয়—এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। সম্যক ধারণাযোগ্য হয়, অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়, সুখে থাকে, সমাধির বিষয় হয়, স্বরূপে অবস্থিত হয়, সমাধি প্রাপ্ত হয়—এইরূপ অন্যান্য ব্যাখ্যা দেখা যায়। বস্তুতঃ পরমাত্মা সকল সময়েই স্বরূপে অবস্থিত, সমাধিস্থ; এবং তাহা সর্ব্বভূতের মধ্যেই অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছে,

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
—শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

কিন্তু আমাদের গোপনহৃদয়বাসী এই দেবতাকে আমরা জানি না চিনি না, ইনি আমাদের বাহ্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত নন, আমাদের বাহ্য চৈতন্যের যাহা কেন্দ্রস্বরূপ আত্মা তাহা হইতেছে অহং, তাহা এই অন্তরাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা বাহ্য চৈতন্যে ঐ অন্তরাত্মারই ছায়া বা আভাস। যখন ঐ পরমাত্মা বা অন্তরাত্মা আমাদের অহংয়ের স্থান গ্রহণ করে, আমাদের বাহ্য চৈতন্যেরও কেন্দ্র হয়, আমাদের বহিরাত্মা অহং তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তখনই বলা যায় যে পরমাত্মা আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও সমাহিত অর্থাৎ সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেমন আভ্যন্তরীণ চৈতন্যে তেমনিই বাহিরের সকল দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের মধ্যেও আপনাতে আপনি সমাহিত বা সমাধিস্থ রহিয়াছে।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু। শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান—এই সব দ্বন্দ্ব লইয়াই আমাদের সাধারণ জীবন। শীত-উষ্ণ দেহের দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ প্রাণের দ্বন্দ্ব, মান-অপমান মনের দ্বন্দ্ব—এইরূপ দ্বন্দ্বসকলের দ্বারা আমাদের বাহ্য চৈতন্য সর্ব্বদা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাই আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না, অজ্ঞান ও মোহের মধ্যে বাস করিয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করি,

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭।২৭

কিন্তু এই সব দ্বন্দ্ব আমাদের অন্তরাত্মাকে, পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না, তাহা সকল সময়েই আপনার অচল অটল শান্তি ও আত্মানন্দে পূর্ণ, প্রসন্ন, প্রশান্ত। আমাদের বাহ্য চৈতন্যে এই আত্মার ধ্যান করিয়া যদি আমরা শান্তভাব অভ্যাস করি তাহা হইলে ঐ আত্মাই হইয়া উঠে আমাদের জীবনের কেন্দ্র, তখন আমরা বাহ্য চৈতন্যে, বাহ্য জীবনেও উহারই ন্যায় প্রশান্ত হইয়া উঠি। তখন আর আমাদের রাগ বা দ্বেষ থাকে না, বাসনা কামনা থাকে না—সর্ব্বত্র পূর্ণ সমভাবই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বরূপ। এই পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করা, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করা ইহাই গীতার যোগের মর্ম্ম, কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

অন্বয়। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু সাধুষু অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার, অচঞ্চল, জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড ও সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীপুরুষকেই যুক্ত বলা হয়।

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষযোগ্য, বন্ধু—এই সকলের প্রতি, এমনকি সাধু ও পাপীর প্রতি যাঁহার সমবুদ্ধি তিনিই উত্তম।

ব্যাখ্যা

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। গীতা এখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ করিয়াছে। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন, জ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহের পরিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রের দ্বারা পরিজ্ঞাত সেই পদার্থ সমূহকে সেইভাবে নিজের অনুভবের বিষয় করা। মধুসূদন সরস্বতী এইটিই আরও বিশদ করিয়াছেন—"জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত পদার্থের বিষয় বলা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ঔপদেশিক অর্থাৎ উপদেশশ্রবণজন্য পরোক্ষ জ্ঞান, আর বিজ্ঞান অর্থ যেরূপ বিচার করিলে সেই শাস্ত্রীয় উপদেশশ্রবণজন্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপর যে অপ্রামাণ্য শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইয়া থাকে সেইরূপ বিচার করিয়া নিজ অনুভব দ্বারা সেইগুলির সেই প্রকার স্বরূপের যে অপরোক্ষ করা তাহাই বুঝায়।" কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে স্বানুভবসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান বুঝাইতে "জ্ঞান" শব্দই ব্যবহৃত হয়, অন্য যে জ্ঞান তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। গীতাও বলিয়াছে,

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১৩।১১

বস্তুতঃ গীতা সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ন্যায় এখানেও "বিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা বিশেষ জ্ঞান বুঝাইয়াছে। সে বিশেষ জ্ঞান কি? রামানুজ বলিয়াছেন, আত্মার স্বরূপ বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, আর প্রকৃতি হইতে আত্মা পৃথক এই জ্ঞানই বিজ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতিকে আত্মা হইতে পৃথক সত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে সাংখ্য মত, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মত সাংখ্যের ন্যায় দ্বৈত নহে,

অদ্বৈত। তথাপি গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে, তাহা মূলগত পার্থক্য নহে, কিন্তু ক্রিয়ায় ও প্রকাশে পার্থক্য। আত্মা মূল সত্তায় কি, তাহার জ্ঞানকেই গীতা এখানে জ্ঞান বলিয়াছে এবং প্রকৃতি কি, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ কি, পুরুষ ও আত্মার সংযোগে এই জগতের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল—এই সবের বিস্তারিত জ্ঞানকেই গীতা "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিয়াছে। তিলক বলিয়াছেন, "সৃষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক পদার্থে একই অবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন—ইহা বুঝিবার নাম জ্ঞান (১৮।২০) এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে বিজ্ঞান বলে (১৩।৩০)"। শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ, 'আত্মা ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানটির উপরেই জোর দিয়াছেন, কিন্তু অন্ন (দেহ) ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম—উপনিষদের এই বাক্যগুলি তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ইহা শ্রুতির মত নহে, শ্রুতির মতে—সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম। গীতাও শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। এই যে জগতের সব কিছুকেই আত্মা বলিয়া, ব্রহ্ম বলিয়া, ভগবান বলিয়া জানা—গীতা ইহাকেই বিজ্ঞান বলিয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই যাহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছে, সকল সংশয় দূর হইয়াছে তিনিই জীবন ও কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন—এইরূপ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই দিব্য কর্ম্ম, দিব্য জীবনের অধিকারী, প্রকৃত কর্ম্মযোগী হইতে পারেন।

বিজ্ঞানের সহিত যে জ্ঞান তাহাই সমগ্র জ্ঞান (৭।১,২), এই জ্ঞান লাভ করিলে আর জানিতে কিছুই বাকী থাকে না, সকল সংশয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, তাই এইরূপ জ্ঞানেই মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ সমগ্র জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের চৈতন্যের, আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রগুলিকেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আত্মা অচল, অক্ষর, কূটস্থ, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ—ইহা অতি উচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতি। কিন্তু ইহাই সব নহে, সমগ্র জ্ঞান নহে। ইহা শুধু ভগবানের অক্ষর স্বরূপের জ্ঞান—ইহা ছাড়াও ভগবানের ক্ষর রূপ আছে, তাহাই এই জগৎলীলা, এবং এই দুইয়েরই ঊর্দ্ধে তিনি পুরুষোত্তম। মায়াবাদীরা কেবল অক্ষরের জ্ঞানের উপরেই সব জোর দিয়াছেন—এইটিই তাহাদের ত্রুটি, তাহাদের ভ্রান্তি। অন্য পক্ষে জড়বাদীরা বাহ্য মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং ইহাদের বিষয়স্বরূপ জড়জগৎকেই সব সত্য বলিয়া ধরিয়াছে—ইহারাও সত্য, ইহাদিগকে বাদ দিলে সমগ্র জ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া জগতের কোন অস্তিত্ব নাই, জড়জগৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি ও আত্ম প্রকাশ—ইহা না জানিলে

সমগ্র জ্ঞান হয় না। যেমন জগৎ সম্বন্ধে তেমনই ব্যষ্টিগত মানব সম্বন্ধে। আমাদের এই বাহ্য মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ই আমাদের সমগ্র সত্তা নহে—ইহাদের পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম মন, প্রাণ, দেহ, তাহাদেরও পিছনে রহিয়াছে আত্মা—এই আভ্যন্তরীণ সত্তাই আমাদের প্রকৃত সত্তা, ইহাকে না জানিলে আমরা নিজদিগকে সমগ্রভাবে জানিতে পারি না, আর সম্যক জ্ঞান না থাকিলে আমাদের কর্ম্ম, আমাদের জীবনও পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ সাফল্যময় হইতে পারে না। জড়বাদী বহির্মুখী পাশ্চাত্য জাতি মানব-জীবনের বাহ্য ব্যাপারের উপরেই অত্যধিক দৃষ্টি দিয়াছে, তাহারা অন্তর ও অন্তঃকরণকে তেমন সন্ধান করিয়া দেখিতে পারে নাই, তাই যেমন ভারতবাসী মায়াবাদের প্রভাবে বাহ্য জীবনকে অবহেলা করিয়া ঐহিক ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়াছে তেমনই পাশ্চাত্য জাতিও অন্তর্জীবনকে উপেক্ষা করিয়া ঐহিক জীবনকে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত করিবার সকল চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য জাতির মনোভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে—জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য্যময় আবিষ্কার-সকল মানবজীবনকে দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই দেখিয়া তাহারা অন্তর্জীবন সন্ধান করিয়া দেখিতেছে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে মানবজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এই সত্যটি তাহারা ক্ষীণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এই সমন্বয় কার্য্যতঃ কেমন করিয়া হইতে পারে, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি ভারতই জগৎকে তাহা দেখাইতে পারে—এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে এই মহান সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"বিজ্ঞান কি না 'বিশেষরূপে জানা'···বিজ্ঞান হলে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন,—তিনি সংসার ছাড়া নন।"

"তিনিই সব হয়েছেন;—তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে এই সংসার 'মজার কুটী', (মায়াবাদী) জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটী।"

"আমি সবই লই। তুরীয়—আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি; আমি তিন অবস্থাই লই। আমি ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে। ব্রহ্ম—জীব-জগৎ-বিশিষ্ট। প্রথম 'নেতি নেতি' করবার সময় জীব জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। বেলের সার বল্‌তে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বল্‌তে গেলে, শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে

হবে না। ওজন করবার সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ-সংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়্‌বে।”

কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। “কূটস্থ” শব্দটি খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ; অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে এটি একটি বীজ-মন্ত্র স্বরূপ। গীতা অক্ষর পুরুষকেই পরে কূটস্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে (১৫।১৬)। ভগবান দুইটি নিগূঢ় ভাব ও তত্ত্বে নিজেকে জগতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, একটি ভাবে তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সব কিছুই হইয়াছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, আর একটি ভাবে তিনি এই সবের ঊর্দ্ধে শাশ্বত শান্তি ও নীরবতার অবিকম্প অচলতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই ‘অক্ষর’ ভাবটি বুঝাইতেই গীতা ‘কূটস্থ’ বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে। আমাদের মধ্যে ভগবান এই দুই ভাবেই রহিয়াছেন—আমরা কখনও একটি, কখনও অপরটির দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হই—কখনও সংসারের বিরামহীন কর্ম্মস্রোতে, পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিয়া চলি, আবার কখনও এ-সবকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া অক্ষরের শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল কূটস্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হই। পুরুষোত্তমের মধ্যে এই দুইটি ভাব একই সঙ্গে রহিয়াছে—তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে আমাদের সমস্ত জীবন ও কর্ম্মকে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্বে জানিয়া যখন আমরা তাঁহার ভাব লাভ করিব তখন আমাদের মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই ভাবেরই সমন্বয় হইবে—আমরা সংসারের সকল কর্ম্ম, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়াও ভিতরে অক্ষরের শান্ত নির্ব্বিকার অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব। এই উচ্চতম মুক্তির অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে নিম্নপ্রকৃতির বিক্ষুব্ধ ক্রিয়াসকলকে সংযত করিয়া অক্ষরের শান্তভাব লাভ করা অভ্যাস করিতে হইবে, অক্ষরের ন্যায়ই কূটস্থ হইবার সাধনা করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত বলিতে গীতা এই কূটস্থ অবস্থাই বুঝাইয়াছে। তাঁহার বাহ্য মানসিক চৈতন্যে এবং দেহের ক্রিয়ায় সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ প্রবল বা ক্ষীণ হইতে পারে, তাহার ফলে তাঁহার মধ্যে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের খেলা চলিতে পারে,—কিন্তু গুণাতীত ব্যক্তি ইহাদের কোনটি আসিলে বা যাইলে হর্ষান্বিত বা ব্যথিত হন না (১৪।২২), তিনি এক ঊর্দ্ধতর চৈতন্যের আলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উদাসীনবদাসীনো, এবং তাঁহার সেই ঊর্দ্ধতর চৈতন্য গুণসকলের ক্রিয়ার দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, ঠিক যেমন যাহারা ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়াছে, মেঘের উপর সূর্য্য

তাহাদের নিকট সদা অবিচলিতভাবে প্রকাশমান থাকে। সেই ঊর্দ্ধস্থিতি হইতে তিনি দেখেন যে গুণসকল আপন আপন কার্য্য করিতেছে, তাহাদের বিক্ষোভ বা বিরাম লইয়াই তাঁহার নিজ সত্তা নহে, সে-সব হইতেছে কেবল প্রকৃতির খেলা। তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তা এই সবের ঊর্দ্ধে অবিচলিত থাকে, তাহা অনিত্য বস্তুসকলের নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দেয় না (১৪।২৩), এইটি হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির নির্ব্যক্তিক ভাব, কারণ ঐ ঊর্দ্ধতর তত্ত্ব, ঐ মহত্তর উদার উদাসীন চৈতন্য—উহাই অক্ষর ব্রহ্ম। কূটস্থ শব্দের দ্বারা এই অক্ষর ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন।

"কূট" শব্দের একটী অর্থ হইতেছে আকাশ, অতএব কূটস্থ শব্দের দ্বারা এই অক্ষর ব্রাহ্মীস্থিতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কূটে আকাশে স্থিতা কূটস্থা। "আকাশে সংস্থিতা স্তেবা ততঃ কূটস্থিতা মতা"—ঋগ্বেদ। কূট শব্দের আর একটি অর্থ, লৌহপিণ্ড বিশেষ, যাহার উপর হাতুড়ীর ঘা মারা হয়, কিন্তু তাহাতেও তাহা অবিচলিত থাকে। অতএব ব্রাহ্মীস্থিতির অবিকম্প নির্ব্বিকার ভাবটিও কূটস্থ শব্দের দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কূটস্থ ব্যক্তি প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃতির মধ্যে বিষয় সন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার কোনরূপ বিকার বা চাঞ্চল্য হয় না। এই জন্যই তিনি আবার জিতেন্দ্রিয়। বিজিতেন্দ্রিয় বলিতে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, বিষয়গ্রহণে নিবৃত্ত, কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় জয় বলিতে এইরূপ বাহ্যত্যাগ বুঝায় না। যে-ব্যক্তি বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে বিচলিত হন না, ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারেন, ইচ্ছামত সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে টানিয়া লইতে পারেন তিনিই জিতেন্দ্রিয়। জ্ঞানলাভের দ্বারা রাগ ও দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত ভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া যায় (২।৬৪)। জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ কূটস্থ ও বিজিতেন্দ্রিয় হন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম, কূটস্থ-বুদ্ধি। হাজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিঘ্ন হোক্—নির্ব্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার,—খুব রোখ্। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কর্ছে তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত পা একবার ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাট্‌লেও আর বার কর্‌বে না।"

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী। আমাদের প্রাকৃত সত্তার সকল বিক্ষোভ ও পরিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে যে অক্ষর পরমাত্মা কূটস্থ রহিয়াছেন, যোগী যখন তাঁহারই ন্যায় কূটস্থ হয়, সকল বাহ্যদৃশ্য ও পরিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে উঠে, আত্ম-জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়, সকল বস্তু ও ব্যক্তি ও

ঘটনার প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখনই তাহাকে যুক্ত বলা যায়। যোগী শব্দে এখানে বুঝিতে হইবে যিনি যোগ সাধনা করিতেছেন, পরবর্ত্তী দশম শ্লোকেও যোগী শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর "যুক্ত" শব্দে বুঝিতে হইবে যখন তিনি যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন, যোগারূঢ় হইয়াছেন, ঊর্দ্ধে পরমাত্মা ও ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হইয়াছেন। গীতা অন্যত্র "যুক্ত" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছে (২।৬১ ; ৪।১৮ ; ৫।২১,২৩)। তবে এখানে অক্ষর পুরুষের সহিতই যোগের কথা বলা হইয়াছে, ইহা খুবই উচ্চ অবস্থা হইলেও উচ্চতম অবস্থা নহে, উচ্চতম অবস্থা তখনই হয় যখন যোগী অক্ষরেরও ঊর্দ্ধে পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হন। এই অধ্যায়ের শেষে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে গীতা এই পুরুষোত্তমের সহিত যোগকেই "যুক্ততম" শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছে। অক্ষরের সহিত যোগের ফলে আইসে অবিচল শান্তি, প্রকৃতির সকল বিক্ষোভ হইতে মুক্তি, এবং পূর্ণতম সমতা। কিন্তু ইহাই দিব্য অধ্যাত্ম জীবন নহে, পূর্ণতম সিদ্ধির অবস্থা নহে। পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সকল কর্ম্ম, সকল জীবন সজ্ঞানে তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াই এই উচ্চতম সিদ্ধির অবস্থা লাভ করা যায় এবং এইটিই গীতার উচ্চতম শিক্ষা, পরম রহস্য। এই অবস্থায় যোগী শুধু আত্মাতেই ভগবানের সহিত এক হইয়া থাকেন না, তাঁহার প্রকৃতিও ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। তিনি তখনও আত্মাকে দেখেন শাশ্বত, অক্ষর, কূটস্থ, কিন্তু তিনি তখন, প্রকৃতিকেও আত্মারই শক্তি, ভগবানেরই অভিব্যক্তি বলিয়া দেখেন। তিনি দেখেন, এই যে আমাদের ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি, ইহাই সব নহে—ইহারও ঊর্দ্ধে রহিয়াছে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, আমাদের দেহ, প্রাণ মনে যাহা এখন অপূর্ণভাবে, খণ্ডভাবে বিকৃতভাবে প্রকট হইতেছে সেই সবের সত্য ঐ পরা প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এখনও প্রকট হয় নাই। এই পরা প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়াই যোগী সকল অহংভাব হইতে মুক্ত হন, নিজেকে সর্ব্বভূতের সহিত মূলতঃ এক বলিয়া অনুভব করেন এবং তাঁহার কর্ম্মময় বাহ্য প্রকৃতিতেও নিজেকে বিশ্বাতীত অনন্ত ভগবানেরই একটি শক্তি বলিয়া অনুভব করেন। তিনি সব কিছুকেই ভগবানের মধ্যে দেখেন, ভগবানকে সব কিছুর মধ্যে দেখেন। নিম্ন প্রকৃতির সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে, আশা নিরাশা হইতে পাপ পুণ্য হইতে মুক্ত হন। তাহার পর তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি ও অনুভবের সম্মুখে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিশ্বচৈতন্য ও শক্তির একটি সত্তা ও অংশরূপে তিনি জীবন যাপন করেন ; তিনি বিশ্বাতীত দিব্য পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন।

সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। গীতা যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও সমতাকেই যোগের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছে। সাধরণতঃ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াই যোগী অধ্যাত্মপুরুষের বিচার করে—কৌপীন পরিধান, স্বল্পাহার, শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সাধন, বাহ্য বিষয়ত্যাগ এই সব দেখিয়াই আধ্যাত্মিকতা নির্ণয় করিতে চায়। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি, অজ্ঞান। যাঁহার চৈতন্যের প্রসারতা হইয়াছে, মন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত আত্মার সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত অধ্যাত্ম পুরুষ, তাঁহার সকল লক্ষণই অভ্যন্তরীণ, প্রসারিত উন্নীত চৈতন্যের জ্ঞাপক এবং সমতা হইতেছে এই অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই শ্লোকে গীতা যুক্ত পুরুষের যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেছে পরবর্ত্তী বিশেষণটির কারণ স্বরূপ—এইরূপ ব্যাখ্যা অনেকেই করিয়াছেন। যথা শ্রীধর বলিয়াছেন—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা অতএব কূটস্থ (নির্ব্বিকার), অতএব বিজিতেন্দ্রিয়, অতএব সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন। কিন্তু এই সকল অবস্থাই পরস্পরসাপেক্ষ—একটিতে অপূর্ণতা থাকিলে অন্যগুলি পূর্ণ হয় না, যখন জ্ঞান, নির্ব্বিকারতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সমতা সবগুলিই সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ হয় তখনই সেই যোগীকে যুক্ত বা যোগারূঢ় বলা যায়।

গীতা অন্যত্র সমতাকেই যোগ বলিয়াছে, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)। এখানেও বলা হইল যে, মাটি, পাথর ও সুবর্ণে যাহার সমান জ্ঞান তাহাকেই যুক্ত বলা যায়। গীতা পুনঃ পুনঃ সমতার উপরে জোর দিয়াছে (২।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যে উদার ও গভীর সমতা গীতার লক্ষ্য তাহা একেবারেই লাভ করা যায় না, সেজন্য গুণত্রয়ের অতীত হইয়া কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় (১৪।২২-২৫)। প্রথম প্রথম সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিচারের দ্বারা সমতা অভ্যাস করা যায়। কামিনী কাঞ্চনের প্রতি মানুষের তীব্র আসক্তি, উহারা ঈশ্বর হইতে মানুষকে বিমুখ করে, সেদিকে যাইতে দেয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া এই সবের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিতে বলিতেন :—"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্ব্বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?"

ঈশ্বর কি, জগৎ কি, মানুষ কি, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি—এ-সব সম্বন্ধে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিচারের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, সমতা অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু আত্মাকে লাভ না করিলে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে

কখনই এ-সব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। আবার আত্মাকে জানিতে হইলে অন্তর্মুখী হইতে হয়—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করিতে হয়, সকল জিনিষ সকল ঘটনার প্রতি সমভাব অভ্যাস করিতে হয়। যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তেমনই সমতাও সুদৃঢ় হয়, আবার যেমন সমতা বর্দ্ধিত হয় তেমনই ইন্দ্রিয়সংযমে অধিকতর সাফল্য লাভ করা যায়, অধিকতর অন্তর্মুখী হওয়া যায়, এইভাবে আত্ম-জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়। সমতা অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে যে সমম্ ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষ রহিয়াছেন তাহার আভাস পাই, আবার সেই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমতা, ইন্দ্রিয়জয় এই সবই পূর্ণতা লাভ করে। অতএব জ্ঞান, নির্ব্বিকারতা, ইন্দ্রিয়জয়, সমতা এ-সবই পরস্পরসাপেক্ষ, একই সঙ্গে এই সবেরই সাধনা করিতে হয়, যথাকালে একের পূর্ণতাতে অন্যগুলিও পূর্ণ হইয়া উঠে।

গীতা মাটি ও সোনাকে সমান দেখিতে বলিয়াছে, কাঞ্চনকে, অর্থকে ত্যাগ করিতে বলে নাই, অধ্যাত্ম শাস্ত্র হিসাবে এইটিই গীতার বৈশিষ্ট্য। অনেক অধ্যাত্ম সাধনা আছে, তাহাতে বলা হয়, অর্থম্ অনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্, অর্থই সকল অনর্থের মূল, অর্থ বর্জ্জন করিয়া দরিদ্র ও নগ্নের জীবন যাপন করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। * কিন্তু এটা ভুল। বস্তুতঃ অর্থ হইতেছে একটি বিশ্বশক্তির প্রতীক, বাহ্যজীবনকে পূর্ণভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে গঠন করিবার জন্য এই শক্তি অপরিহার্য্য। এই শক্তি মূলতঃ ভগবানের কাছ হইতেই আসিয়াছে এবং ইহার লক্ষ্যও হইতেছে ভগবানের কাজ করা, জগতে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনে সহায়তা করা। ভগবান মানুষকে অর্থ দেন যেন মানুষ তাহার সদ্ব্যবহার করে, সকল অর্থকে ভগবানেরই ন্যস্ত ধন মনে করিয়া ভগবানের কাজে লাগায়। কিন্তু অজ্ঞানের বশে মানুষ তাহা করে না, অর্থের অপব্যবহার করে, অহংভাবের বশে ব্যক্তিগত তুচ্ছ ভোগের জন্য অর্থকে ধরিয়া রাখিতে চায়—এই ভাবেই অর্থ অনর্থ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ অর্থে আসক্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়। তুচ্ছ ভোগের আশায় এইভাবে মানুষ আসুরিক শক্তির হস্তে যন্ত্র হইয়া উঠে। যেমন কাঞ্চন, তেমনিই কামিনী—এই দুইটির প্রতি মানুষের অহংয়ের অতি তীব্র আসক্তি, এবং মানুষের অহংয়ের ভিতর দিয়া অসুরও এই দুইটি শক্তিকে, অর্থশক্তি ও যৌনশক্তিকে নিজ কবলে রাখিয়াছে, অসুরের প্রভাবের বশে মানুষ এই দুইটি শক্তির অতিশয় অপব্যবহার করে, নতুবা জ্ঞানের সহিত ঠিকভাবে ব্যবহৃত হইলে এই দুইটি শক্তিই পূর্ণ দিব্য জীবন গঠনে সহায় হয়। অর্থশক্তির উপর অসুরের প্রভাব এমনভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অর্থের সংশ্রবে

* বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী অই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

আসিয়া নিজেকে খাঁটি রাখিতে পারে—এরূপ লোক সংসারে খুব কমই আছে। কামিনী সম্বন্ধেও তাই। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছেন।

কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা সকলেই যদি অর্থ বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে সংসারের সকল অর্থ অসাধুর হস্তে থাকিবে, আসুরিক শক্তির কবলে থাকিবে, এবং অর্থশক্তির অপব্যবহারের ফলে সংসারে দুঃখ ও অশান্তির সীমা থাকিবে না। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। প্রলুব্ধ ধনীরা লোককে শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন করিয়া অধিকাংশ ধনসম্পত্তি নিজেদের কবলে রাখিয়াছে, ফলে এই বসুন্ধরা অসীম ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইলেও অধিকাংশ মনুষ্যকেই অতি দীন দরিদ্রের জীবন যাপন করিতে হইতেছে, ফলে সংসারে দুঃখ ও পাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব সাধু ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য হইতেছে আসুরিক ও অশুভ শক্তির কবল হইতে অর্থশক্তিকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের কাজে নিয়োগ করা। সন্ন্যাসীদের ন্যায় অর্থকে একেবারে বর্জ্জন করা, কাঞ্চনের সম্মুখে সঙ্কুচিত হওয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে, আবার ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্য কাঞ্চনে আসক্ত হওয়া, অর্থের দাস হইয়া পড়াও ঠিক নহে। টাকাকে নিজের ভোগের উপাদান বলিয়া মনে না করিয়া, ভগবানের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে হইবে, ভগবানের জন্য উহা অর্জ্জন করিয়া ভগবানেরই কাজে লাগাইতে হইবে। আমাদের মধ্যে টাকার প্রতি যদি কোন আসক্তি না থাকে তাহা হইলে ভগবানের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমরা বিশেষভাবে সমর্থ হইব। এই আসক্তিহীনতার লক্ষণ হইতেছে সমতা। টাকা সম্বন্ধে মনে যদি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, উহার ব্যবহারে যদি কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা কৃপণতা আইসে, নিজের জন্য উহা রাখিবার যদি একটুও প্রবৃত্তি থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আসক্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই, টাকার দোষ হইতে আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। দারিদ্র্যই মানবজীবনের আদর্শ নহে, ভারতে দারিদ্র্যকে কখনও জাতীয় আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হয় নাই, কাঞ্চন, অর্থ, ভারতে লক্ষ্মী বলিয়া পূজিত হইয়াছে, দরিদ্রকে ভারতবাসী লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী যে দারিদ্র্যের আদর্শ প্রচার করিতেছেন উহা ঠিক ভারতীয় আদর্শ নহে, উহা হইতেছে খ্রীষ্টান আদর্শ, যদিও পাশ্চাত্য জাতি নামে খ্রীষ্টান হইলেও কার্য্যতঃ জীবনে ঐ আদর্শ গ্রহণ করে নাই। পূর্ণযোগের আদর্শ-সাধক তিনি "যিনি প্রয়োজন হলে দরিদ্রের জীবন যাপন করতে পারেন অথচ কোন অভাবের বোধ তাঁকে স্পর্শ করবে না, তাঁর অন্তরে ভাগবত চেতনার অবাধ লীলাকে ব্যাহত করবে না। আবার ধনীর মত

জীবন যদি তাঁকে যাপন করতে হয়, তা'ও তিনি পারেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাসনার কবলিত হবেন না ; অর্থ বা যে দ্রব্য সব তিনি ব্যবহার করেন তাতে আসক্ত হয়ে পড়বেন না, অসংযত ভোগলালসার দাস হবেন না, কিম্বা অর্থ থাকলে যে সকল অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাতে অবশ, অসহায়ের মত আবদ্ধ হবেন না।"—

(শ্রীঅরবিন্দের The Mother).

ইহাই বস্তুতঃ গীতার আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ভাবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর জোর দিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে যে তিনি এই পূর্ণ আদর্শ প্রচার না করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময়ে কি কার্য্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে মানুষ ভগবানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেছিল, ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগকেই মানব জীবনের পরম কাম্য বলিয়া গণ্য করিতেছিল, আধ্যাত্মিকতাকে লোকে একটা মানসিক ব্যাধি বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে এই স্রোত ফিরাইতে হইয়াছে, তাই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই তাঁহাকে ঝোঁক দিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"সব দেখ্‌ছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে ভুলে যায় ; টাকা, ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায় ; কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।"

"কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জেঠা বোধ থাকে না ···বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে। কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত ; হুঁস নাই।" বিষয়ী লোকের এই নেশা ছাড়াইবার জন্যই তিনি কমিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসকে তিনি মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন নাই। তিনি যেমন অন্যান্য সাধনা করিয়াছিলেন, তেমনই সন্ন্যাসে দীক্ষাও লইয়াছিলেন—এক জীবনে সকল রকম সাধনা করিয়াই তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিকতা বুজ্‌রুকি নহে এবং সকল সাধনা, সকল পথের মধ্যেই সত্য আছে—যত মত তত পথ। সন্ন্যাসও একটা পথ, তবে তিনি নিজে পূর্ণতর আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "মায়াবাদ শুক্‌নো, আমি নিত্যও চাই, লীলাও চাই।" ইহা ঠিক গীতার শিক্ষা, গীতাও সন্ন্যাসকে একটি পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু বলিয়াছে ঐটিই একমাত্র পথও নহে আর শ্রেষ্ঠ সাধনাও নহে (৫।২)। লোকশিক্ষার জন্য যে কতকগুলি লোকের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করিতেন

সংসারী মানুষ বিষয়মদে মাতাল হইয়া রহিয়াছে—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে তাহারহুঁস হইতে পারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন,—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য। সন্ন্যাসীর ভারি কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে, তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে।...কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়।"

"চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু!—তাঁকে দেখে তবে ত লোকের চৈতন্য হবে!"

"যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবেনা। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বল্‌ছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐসব ভোগ করেন। সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে থাকে,—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না।"

এখন আমরা বুঝিতে পারি কেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছিলেন। ঐটিই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে, উহাতেই জীবনের পূর্ণতা নহে—তবে জীবনকে পূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই ভগবদুপলব্ধি এবং আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া থাকিলে কখনই তাহা সম্ভব নহে—কিন্তু এই আসক্তি ত্যাগ অতিশয় কঠিন। কতকগুলি লোক যদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগী ও ন্যাসী হইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে তাহা হইলেই লোকে অধ্যাত্ম জীবনের পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা পাইবে, সাহস পাইবে—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য। ভগবানকে লাভ করিলে যে সংসারের কোন কিছু ত্যাগেরই প্রয়োজন হয় না, বিদ্যার সংসারে সব কিছু লইয়া থাকা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। তবে সেই বিদ্যার সংসার কার্য্যতঃ কিরূপ হইবে, দিব্যজীবন কি, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে তিনি কিছুই বলেন নাই—তিনি কেবল ঐ জীবনের অধ্যাত্ম ভিত্তিটির উপরেই জোর দিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে বিদ্যার সংসার করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—এবং সেইটিই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ। লোকশিক্ষার জন্য কতকগুলি লোককে সন্ন্যাসী হইতে হয়, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা সকল মানবের জন্য নহে,

সকলের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা উপযোগীও নহে, আর এটি শ্রেষ্ঠ আদর্শও নহে। এমন লোক আছে যাহাদের পক্ষে নিগুর্ণ, নির্ব্যক্তিক, নিরাকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপলব্ধিই সহজ ও স্বাভাবিক—তাহাদের জন্যই মায়াবাদ, তাহারাই সন্ন্যাসের প্রকৃত অধিকারী, কিন্তু এই সাধনা খুবই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর।" আর সন্ন্যাসী হইতে হইলে শুধু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই হয় না, কর্ম্মও ত্যাগ করিতে হয়। আজকাল দেখা যায়, সন্ন্যাসী হইয়াও অনেকেই জনহিতকর, সমাজ-সেবামূলক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন—ইহা হইতেছে আদর্শ-বিপর্য্যয়। কর্ম্মে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি অপেক্ষা কম প্রবল নহে, উহা ঐ একই রজোগুণের ক্রিয়া। অতএব লোককে আসক্তি-ত্যাগ শিখাইতে হইলে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল-প্রকার কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন। শঙ্কর এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদর্শের বিপদ আছে, এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ হইতে পারে, তাহারা তামসিকতায়, আলস্য ও জড়তায় পতিত হইতে পারে, এইভাবে সংসার সমাজ উৎসন্ন যাইতে পারে, সেই জন্যই গীতা পুনঃ পুনঃ ভিতরের ত্যাগের উপরই জোর দিয়াছে, বাহিরে ত্যাগের দৃষ্টান্তকে বিপজ্জনক বলিয়াছে।

কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে "বিদ্যার সংসার" করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন:—"মনে ত্যাগ হলেই হলো। তা হলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো।"

"টাকাতে যদি কেউ 'বিদ্যার সংসার' করে, ঈশ্বরের সেবা, সাধু-ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা তিনিই এই মায়ার রূপ,—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক 'মা' বোধ হলে তবে 'বিদ্যার সংসার' করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

স্ত্রীলোককে আনন্দময়ীর এক একটি রূপ বলিয়া দেখা, শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ বস্তু বা পাপ* বলিয়া মনে করিতেন না—সে-বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচার ছিল। তবে সাধন অবস্থায়

---

* খ্রীষ্টানধর্ম্মে নারীর সৌন্দর্য্য পাপ বলিয়া পরিগণিত। শঙ্করাচার্য্য নারীকে বলিয়াছেন, নরকের দ্বার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এক নারীকে তাঁহার গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, নারী স্বর্গের দ্বার।

স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিবার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন—"সাধনের অবস্থায় কামিনী দাবানল স্বরূপ—কাল সাপের স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান দর্শনের পর, তবে মা আনন্দময়ী। তবে মার এক একটি রূপ বলে দেখবে।

টাকাকেও তিনি তুচ্ছ বস্তু বা পাপ বলিয়া মনে করিতেন না। টাকার প্রতি আসক্তি যাহাতে দূর হয় সেই জন্য তিনি এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি লইয়া "টাকা মাটি" "মাটি টাকা" এইরূপ বলিতে বলিতে দুইকেই সমান জ্ঞান করা অভ্যাস করিয়াছিলেন—এবং শেষে টাকা ও মাটি দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই আবার তাঁহার ভাবনা হইল, মা লক্ষ্মীকে জলে ফেলিয়া দিলেন, তিনি যদি রুষ্ট হইয়া অন্ন বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে কেমন করিয়া জীবন ধারণ হইবে? এই সাধনাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ—টাকার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে, সমভাব লাভ করিতে হইবে, কিন্তু টাকাকে অবহেলা করা ঠিক নহে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা—"বিদ্যার সংসারের জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা করবে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়; ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয়, তো সে টাকায় দোষ নাই।" অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সুস্পষ্ট—"অতিমানস সৃষ্টিতে অর্থশক্তি ভাগবত শক্তির নিকট ফিরাইয়া আনিতে হইবে, জগন্মাতা তাঁহার সৃজনাত্মক দৃষ্টিতে যে-ভাবে নির্দ্দেশ করেন সেই অনুসারে অর্থকে ব্যবহার করিয়া এক নূতন দিব্যভাবে রূপান্তরিত দেহ ও প্রাণের জীবন সুগঠিত করিবার উপযোগী সুন্দর ও সুসমঞ্জস উপচার সকল সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে দরকার জগন্মাতার জন্য অর্থ জয় করিয়া লইয়া আসা। আর এই জয়ের সামর্থ্য তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে যাহারা তাহাদের প্রকৃতির এই অংশে সরল, উদার অহংভাবশূন্য হইবে, যাহারা নিজেদের জন্য কোন কিছু দাবী না করিয়া, নিজেদের জন্য কিছু না রাখিয়া অকুণ্ঠভাবে নিজদিগকে সমর্পণ করিয়া দিবে, যাহারা পরমাশক্তির শুদ্ধ ও বলবান যন্ত্র হইবে।" (The Mother)

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। মৃৎপিণ্ড ও কাঞ্চন, শত্রু ও মিত্র, সাধু ও পাপী—এই সবের প্রতি যাঁহার সমান জ্ঞান হইয়াছে তিনিই সিদ্ধযোগী বা যোগারূঢ়, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া শ্রীধর প্রভৃতি টীকাকারগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে-ব্যক্তি প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়াই এবং পূর্ব্বস্নেহ বা পূর্ব্বসম্বন্ধ না থাকিলেও উপকার করে তাহাকে সুহৃদ বলা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান নিজকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ বলিয়াছেন। যে স্নেহবশতঃ উপকার করে সে মিত্র। অরি শব্দের অর্থ ঘাতুক বা অপকারক। যে

উপেক্ষা করে সে উদাসীন। দুইজন কলহকারী ব্যক্তির উভয়েরই যে হিতৈষী সে মধ্যস্থ। যাহাকে ভাল লাগে না সে দ্বেষ্য। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে সে বন্ধু। সাধু শব্দে—সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি।

বাংলা ভাষায় সুহৃদ, মিত্র, বন্ধু এসব শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে বিশেষভাবে বন্ধু না বলিয়া কুটুম্ব বলা হয়। কিন্তু এই শব্দগুলির যে অর্থই ধরা হউক, এখানে গীতার বক্তব্য স্পষ্ট। সাধারণতঃ আমরা মানুষকে দেখি আমাদের অহংয়ের সহিত তাহার কিরূপ ব্যবহার সেই বিচার করিয়া—কারণ অজ্ঞানের মধ্যে আমরা যতদিন বাস করি অহংই থাকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র। কে আমার শত্রু, কে আমার মিত্র, কাহাকে আমার ভাল লাগে, কাহাকে ভাল লাগে না—এইরূপ বিচার করিয়াই আমরা মানুষে মানুষে ভেদ করি এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য করি। ইহাতে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা, আর বস্তুতঃ সাধারণ জীবনে অন্য মানুষের সহিত আমাদের ব্যবহার ভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং তাহার ফলে জীবন দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পূর্ণ হয়। কোন্ মানুষের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে—সে-সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে আছে, তাহা সকল সময়েই আমাদিগকে সত্য প্রেরণা দিতেছে, কিন্তু আমাদের বাহিরের মানস চৈতন্যে আমরা অজ্ঞান ও অহং-ভাবময় বলিয়া ভিতরের সেই নির্দ্দেশ শুনিতে পাই না, শুনিলেও তাহার মর্ম্ম ঠিক মত বুঝিতে পারি না, আবার বুঝিলেও অনেক সময়েই তাহা গ্রাহ্য করি না, তাহা অমান্য করিয়া আমাদের প্রাণের বাসনা কামনা রাগদ্বেষ অনুসরণ করিয়া চলি। কিন্তু যোগীপুরুষ এই অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত হন, সর্ব্বত্র এক আত্মাকে দেখেন—তাই সকলের প্রতি তাঁহার সমবুদ্ধি, সমান ভাব,

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

যিনি সর্ব্বত্র এক আত্মাকে প্রতিভাত দেখিয়া সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী—তিনি অন্তরাত্মার বাণী, হৃদিস্থিত ভগবানের বাণী অভ্রান্ত ভাবে শুনিতে পান এবং তদনুযায়ী মানুষের সহিত ব্যবহার করিতে অগ্রসর হন, অহংয়ের রাগদ্বেষের বশে নহে। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অহংজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাই যাহারা অধর্ম্ম পক্ষে যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, যাহাদিগকে নিহত, পরাজিত করা অর্জ্জুনের ভগবদ্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল, তাহারা তাঁহার স্বজন, বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। অতএব যাহাতে আমরা সঙ্গীন

মুহূর্ত্তে এইরূপ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হই সেজন্য সর্ব্বত্র সমতা অভ্যাস করা প্রয়োজন। মিত্র বলিয়া কাহারও প্রতি স্নেহে অন্ধ হইতে নাই, শত্রু বলিয়াও কাহারও প্রতি দ্বেষে অন্ধ হইতে নাই—সমতার সহিত, জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া ক্ষেত্র অনুসারে কর্ম্মের বিধান করিতে হয়। এই সমতা পূর্ণ হয় যখন আমরা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করি, আত্মাকে জানি, ভগবানকে জানি, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। আলিপুর বোমার মামলার সময়ে কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ এই গভীর দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন—তাই তিনি শত্রু পক্ষের মধ্যেও বাসুদেবকে দেখিয়া সকল ভয় ও দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে।" দার্শনিক পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু, মিত্র, উদাসীন, নিরপেক্ষ সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন কারণ তিনি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখেন যে এই সব সম্বন্ধ সাময়িক, আজ যে শত্রু, কাল সে মিত্র হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে এ-সব সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হয়। ইহা সাত্ত্বিক সমতা। ইহারও উপরে হইতেছে যোগীজন-সুলভ আধ্যাত্মিক সমতা, তাহা আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে ও ভগবানকে দেখিয়া এই সমভাব লাভ করা যায়।

সাধুষ্বপি চ পাপেষু। সাধারণ লোকে সাধু ও অসাধুর মধ্যে, পাপী ও পুণ্যবানের মধ্যে যে ভেদ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার দ্বারাও বিভ্রান্ত হন না। তিনি জানেন মানুষ যে নিজেকে ভারি সাধু ও পুণ্যবান মনে করিয়া অন্যকে পাপী বলিয়া নিন্দা করে, ঘৃণা করে, সেটা মিথ্যা আত্ম-গৌরব। মানুষ যতদিন অজ্ঞান অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে ততদিন কাহারও পক্ষেই সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ নিষ্পাপ হওয়া সম্ভব নহে। প্রাচীন ইহুদীগণের মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোন স্ত্রীলোক ব্যাভিচারিণী হইলে তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। এইরূপ একটি অভাগিনী নারীকে জনতা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে যীশুখ্রীষ্ট সেই উন্মত্ত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি কখনও কোন পাপ কর নাই সে-ই প্রথমে এই নারীর উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর।" তখন আর কেহ সে-কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল না, স্ত্রীলোকটিও নিষ্ঠুর মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

জগতের সকল বস্তু, সকল ঘটনার পশ্চাতে ভগবানের ইচ্ছা, ভাগবত শক্তি কার্য্য করিতেছে যেমন সাধুর মধ্যে তেমনই অসাধুর মধ্যেও। মানুষ সসীম, খণ্ড—কিন্তু অসীমতার দিকে, অখণ্ডতার দিকে তাহার প্রবৃত্তি রহিয়াছে—তাহার অন্তর্নিহিত

ভাগবত সত্তা তাহাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে দেয় না। এই ভাগবত-প্রেরণাই অজ্ঞানের মধ্যে বাসনা-কামনারূপে দেখা দেয়, মানুষ অপরকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেকে বড় করিতে যায়, সব কিছুকে নিজের প্রাপ্য বলিয়া ধরিতে যায়, গ্রহণ করিতে যায়, ভোগ করিতে যায়—আর ইহা সে অজ্ঞানের সহিত করে, অহংভাবের বশে নিজেকে অন্য সকল হইতে পৃথক মনে করিয়া করে, পরস্পরের সহিত ঐক্য ও আদান-প্রদানের নীতি অনুসরণ না করিয়া দ্বন্দ্ব, কাড়াকাড়ি, জোর জবরদস্তির নীতি অনুসরণ করে, এইভাবেই অশুভ ও পাপের উদ্ভব হয়। ভগবান ইহা ঘটিতে দেন কারণ এই সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই মানুষের চেতনার বিকাশ হয়, যেমন পুণ্যের ভিতর দিয়া তেমনই পাপের ভিতর দিয়াও মানুষ পরিণামে অমৃতত্বের জন্য, দিব্য-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। তাই দেখা যায় প্রকৃতির ক্রিয়ায় সাধু অসাধু পাপ পুণ্যে ভেদ নাই—কখনও শুভ হইতে অশুভ হইতেছে, কখনও অশুভ হইতে শুভ হইতেছে—এককালে যাহা পাপ বলিয়া গণ্য ছিল তাহাই আবার কখনও পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, তেমনিই পুণ্য পাপ বলিয়া গণ্য হইতেছে—প্রকৃতি যখন যাহাতে সুবিধা পায়, সুযোগ পায় তাহার দ্বারাই নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলে, পাপ-পুণ্যের ভেদ করিয়া নিজ চরম লক্ষ্য হইতে সে কখনও ভ্রষ্ট হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই ভগবান যুদ্ধের ন্যায় পরম অশুভ ও পাপও ঘটিতে দেন। মানুষকে তাহার পুরাতন সংস্কার ও বন্ধনসকল হইতে মুক্ত করিবার জন্য, নূতন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও হত্যালীলা ভগবানের বিধানেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়।

প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া তাই মনে হয় যে, জগতে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সাধু অসাধুর বিচার নাই—প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যের জন্য উভয়কেই সমানভাবে কাজে লাগায়। তথাপি ঐ প্রকৃতিই আবার মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ দিয়াছে, পাপকে বর্জ্জন করিবার, পুণ্যকে গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষের জীবন অনেক সময়েই সংশয়াকুল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তাহা হইতেছে তাহার সহজাত স্বাভাবিক প্রেরণা। এই পাপ-পুণ্য বোধেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, সার্থকতা আছে—প্রকৃতি মানুষকে ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে দিব্য গতির দিকে লইয়া চলিয়াছে, এই পাপ-পুণ্য বোধের দ্বারা তাহাতে সহায়তা হয়, অতএব ইহা অপরিহার্য্য—মানুষকে তাহার গন্তব্য পথে অনেক জিনিষ বর্জ্জন করিতে হইবে, অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবে সে একদিন সকল সাময়িক শুভ অশুভ পাপ-পুণ্যের ঊর্দ্ধে এক শাশ্বত ও অনন্ত শুভের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মানুষকে পাপ-পুণ্য ভেদে সাহায্য করিবার জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে নানা

ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব বিধিনিষেধ আংশিক মানসিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-সবের দ্বারা উপসর্গেরই চিকিৎসা করা হয়, মূল রোগের প্রতিকার হয় না। অশুভ প্রবৃত্তিসকল কেন প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, আমাদের প্রাণ ও মনে কোন্ জিনিষ তাহাদিগকে সমর্থন করিতেছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—সে-সবের পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় ঐ গতানুগতিক বিধিনিষেধের দ্বারা স্থায়ী কোন রূপান্তর সাধিত হয় না। আমাদের দেহ ও প্রাণের প্রবৃত্তি ও কামনাসকলের উপর একটা মানসিক সংযম, বুদ্ধিগত সংযম প্রয়োজন, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এই সংযমের যে আদর্শ দেয় তাহা দ্বারা আমরা নিজদিগকে চালিত, নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। এইভাবে আমরা সাধু ও সদাচারী হই, কিন্তু ইহা কখনই সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পূর্ণ সমাধান নহে। এ-সব সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল যেমন ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ ছিল, এখনও তেমনই রহিয়া গিয়াছে —সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্ মানুষ সাধু এবং কোন্ মানুষ অসাধু বা পাপী এইরূপ লৌকিক ভেদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। মানুষ এখন যে ত্রিগুণময়ী নিম্ন প্রকৃতিতে বাস করিতেছে, ইহাতে সে বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া সাত্ত্বিক চরিত্রে গঠিত হইতে পারে, সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব, সকল ব্যবহারে ও কর্ম্মে সুসামঞ্জস্য ও সুব্যবস্থা, শান্ত, সংযত, সুরুচিসম্পন্ন জীবন—ইহার অধিক আর কিছুই সম্ভব নহে। প্রকৃত সমাধান তখনই আসিতে পারে যখন আমর আত্ম-জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিকাশের দ্বারা সর্ব্বভূতের সহিত আত্মায় নিজেদের একত্ব অনুভব করি, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, সকলকে আমাদেরই সত্তার অংশ বলিয়া মনে করি, অপরের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করি যেন তাহারা আমারই অন্য রূপ, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি।

সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাধু অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী, আর পাপী অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করে। এইরূপ সাধু ও পাপীর প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে হইবে এরূপ অর্থ শঙ্কর গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই তিনি "সমবুদ্ধি" শব্দের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কঃ কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থ অর্থাৎ "কে কি কর্ম্ম করিতেছে তাহা ভাবিয়া যিনি নিজ বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করেন না।" শ্রীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীধর বলিয়াছেন, সমা রাগদ্বেষাদি শূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্ট। সর্ব্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মধ্বাচার্য্য আরও গভীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

পাপ পুণ্য ইত্যাদি প্রভেদ রহিয়াছে প্রকৃতিতে; জীবাত্মা চৈতন্যময়, তাহাকে এই সব দোষ স্পর্শ করে না, কি সাধু, কি পাপী সকলেরই অন্তরাত্মা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আর প্রকৃতির বশে মানুষ যে পাপ ও পুণ্য আচরণ করে, তাহারও পিছনে ঈশ্বরেরই শক্তি কার্য্য করিতেছে, (১৮।৬১)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে,

স্বতঃ সর্ব্বেপি চিদ্রূপাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।
জীবাস্তেষাং তু যে দোষাস্ত উপাধিকৃতা মতাঃ॥

সর্ব্ব চেশ্চরতন্ত্রেষাং ন কিঞ্চিৎ স্বত এব তু।
সমা এবং হৃতঃ সর্ব্বে বৈষম্যং ভ্রান্তিসম্ভবম্॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, ইহার অর্থ নহে যে সকলের প্রতিই তিনি সমান ব্যবহার করেন। হৃদয়ে সকলের প্রতি সমভাব, মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকিবে, কিন্তু কাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহা অজ্ঞান অহংভাবের বশে নির্দ্ধারণ না করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্ প্রেরণা অনুসরণে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

অন্বয়। যোগী সততং রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিতাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মানং যুঞ্জীত।

অনুবাদ। যোগী নির্জ্জন স্থানে একাকী অবস্থিত হইয়া সমগ্র সত্তা ও চৈতন্যকে সংযত করিয়া, সকল বাসনা ও পরিগ্রহ বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিবেন।

ব্যাখ্যা

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং। দেহ, প্রাণ ও মনের উর্দ্ধে আমাদের মধ্যে যে অক্ষর আত্মা রহিয়াছে, যাহা চির শান্ত ও নির্ব্বিকার, প্রকৃতির কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিক্ষোভ যাহাকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে না—তাহার সহিত যুক্ত হইবার সাধনা করিয়া যিনি তাহারই ন্যায় কূটস্থ নির্ব্বিকার হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সিদ্ধ যোগী, তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংসারের সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল মানুষের প্রতি তাহার সমভাব। এইরূপ যোগ সাধনা সহজ নহে, এই যোগের বর্ণনা শুনিয়া অর্জ্জুন পরেই যেমন বলিয়াছিলেন, চঞ্চল মনের পক্ষে এই উচ্চ অবস্থা হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে,

বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হইয়া সাধক আবার শোক দুঃখ, কাম ক্রোধের বেগে ভাসিয়া যায়, সমতা হারাইয়া ফেলে। নিখিলে যত সুন্দরী যুবতী রমণী আছে তাহাদের প্রতীক স্বরূপ উর্ব্বশীকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় আনি পদে তপস্যার ফল।'

ইন্দ্রিয়জয়ী না হইলে যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, কিন্তু এ-বিষয়ে সাধক যত অগ্রসর হয়, ততই অন্যদিক হইতে তাহার উপর আক্রমণও প্রবল হয়; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকিলে হয়ত নিরাপদ থাকা যায়, কিন্তু তীব্র সুখপ্রদ ভোগসুখের বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাতে কত সাধকের বহু যত্নে অর্জ্জিত সাধনার ফল যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই মন ও তাহার ক্রিয়াসকলকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার জন্য গীতা নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনার সহিত রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। ইহাই গীতার প্রণালী। গীতার যোগ রাজযোগ নহে, জ্ঞানের সহিত সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগের সাধনা করিবার কথাই গীতা এতক্ষণ বলিয়াছে এবং এইটিই গীতার নিজস্ব শিক্ষা। তবে গীতা অন্য কোন সাধনাকেই অবহেলা করে নাই, আত্মজয়ের কঠিন সাধনায় যে পন্থা হইতে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাহা লইতে গীতার কোন বাধা নাই—সকলেই যে এক বাঁধাধরা পথে একই ভাবে অধ্যাত্ম সাধনা করিবে ইহা গীতার মত নহে।

এই কথাগুলি বলা আবশ্যক হইল কারণ অনেকেই গীতার এমন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, রাজযোগের শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, উহাই গীতার যোগ, গীতায় আর যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা অবান্তর। মন সংযমের একটি প্রণালীরূপে রাজযোগ যে খুবই শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে বস্তুতঃ পক্ষে গীতার শিক্ষায় উহা হইতেছে অবান্তর। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ই গীতার নিজস্ব যোগ—উহারই একটি শক্তিশালী সহায়রূপে গীতা রাজযোগের বর্ণনা দিয়াছে। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, রাজযোগ যেমন গণা-গাথা বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হয়, যম নিয়মাদি অষ্ট অঙ্গ, আবার যম পাঁচ প্রকার, নিয়ম পাঁচ প্রকার,—গীতা এই ভাবে সাধনা করিবার উপদেশ দেয় নাই। রাজযোগের একটি প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা রাজযোগ প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা দিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখই করে নাই। বস্তুতঃ রাজযোগের যে-সব শক্তিশালী প্রণালী আছে তাহাদের মধ্য হইতে সাধক যে সাহায্য ও সুবিধা পায় গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই গীতার মত বলিয়া মনে হয়।

শঙ্কর এই শ্লোকে যোগী শব্দে ধ্যায়ী অর্থাৎ ধ্যানযোগী বুঝিয়াছেন, রামানুজ বুঝিয়াছেন কর্ম্মযোগী, মধ্ব বুঝিয়াছেন সমাধিযোগী, শ্রীধর বুঝিয়াছেন যোগারূঢ় ব্যক্তি। এখানে গীতা যে যোগ সাধনার কথা বলিয়াছে তাহা ধ্যানযোগ, উহা দ্বারা সমাধির অবস্থা লাভ করা যায় অতএব ইহাকে সমাধিযোগ বলা যায়। বস্তুতঃ ইহা রাজযোগ, কিন্তু গীতা রাজযোগ শব্দ ব্যবহার না করিয়া পরে এই সাধনা-প্রণালী বুঝাইতে ধ্যানযোগ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে (১৮।৫২)। ইহার কারণ মনে হয় এই যে, অষ্টাঙ্গ রাজযোগ শিক্ষা দেওয়া গীতার উদ্দেশ্য নহে, অষ্ট অঙ্গের মধ্যে ধ্যানটির উপরেই গীতা জোর দিয়াছে এবং যাহাতে ধ্যানের সুবিধা হয় সেইরূপ প্রণালীই অবলম্বন করিতে বলিয়াছে। আনন্দগিরি বলিয়াছেন গীতা এই শ্লোকে যোগের পঞ্চ অঙ্গ দেখাইয়াছে, রহসি, একাকী, যতচিত্তাত্মা, নিরাশী, অপরিগ্রহ। এইরূপ হিসাব করিলে এই যোগকে পঞ্চাঙ্গ যোগ বলা যাইতে পারে —কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা এইরূপ গণা গাঁথার পক্ষপাতী নহে। পরে গীতা আসনাদি অন্য অঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছে—অতএব এইরূপ অঙ্গ গণনা করিবার কোনই সার্থকতা নাই—গীতা যে-সাধনার কথা বলিয়াছে তাহার উপরেই দৃষ্টি দিতে হইবে।

আর ধ্যানযোগী, কর্ম্মযোগী, সমাধিযোগী এইরূপ প্রভেদ করাও গীতার উদ্দেশ্য নহে—যে যোগের অভ্যাস করিতেছে তাহার পক্ষে যেমন ধ্যান প্রয়োজন, তেমনই কর্ম্মও প্রয়োজন (৬।১৭)—আবার এই যোগের উৎকর্ষের জন্য ভক্তিও প্রয়োজন (৬।৩১,৪৭), সেই জন্যই গীতা এখানে সাধারণ ভাবে যোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে —যে-ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতেছে তাহাকেই যোগী বলা হইয়াছে। যেমন নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যোগী যোগাভ্যাসপরো।

যুঞ্জীত আত্মানং, আত্মাকে যোগযুক্ত করিবে। এখানে আত্মা শব্দে কেহ বুঝিয়াছেন মন, কেহ বুঝিয়াছেন বুদ্ধি, শঙ্কর সাধারণভাবে বলিয়াছেন অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি, হৃদয় সব লইয়াই আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। এখন আমাদের হৃদয় মন বুদ্ধি সবই বহির্মুখী, বাহিরের বস্তু-সকল লইয়াই ইহারা ব্যাপৃত, সর্ব্বদা সেই দিকেই ধাবিত—তাহাদিগকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে, আত্মায় নিবদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হৃদয়ের ঊর্দ্ধে, তাহাদের ক্রিয়ার অবিচলিত সাক্ষী স্বরূপ আত্মা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাই আমাদের প্রকৃত সত্তা, আমাদের প্রকৃত "আমি", সেই আত্মার ধারণা করিতে হইবে, মনকে তাহাতেই সংলগ্ন রাখা অভ্যাস

করিতে হইবে। সেই আত্মার সন্ধান কেমন করিয়া পাওয়া যায়? আমরা নিজদের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিলেই আত্মার সন্ধান পাইব। আমরা কখন কোন কিছু চিন্তা করি, বা কাম ক্রোধাদি আবেগের বশীভূত হই, বা সুখ দুঃখ অনুভব করি—তখন আমাদের মধ্যে একটি দ্রষ্টা থাকে, সে দেখে যে আমরা চিন্তা করিতেছি, ক্রুদ্ধ হইতেছি, সুখদুঃখ বোধ করিতেছি—কিন্তু সে দ্রষ্টা এই সব বাহ্য ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, এ-সবে সে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয় না—সেই দ্রষ্টাই আমাদের আত্মা—পুনঃ পুনঃ সেই আত্মায় মন-বুদ্ধিকে লাগাইয়া যোগ অভ্যাস করিলে আমরা ক্রমশঃ সেই আত্মাই হইয়া উঠিব অর্থাৎ ইহা উপলব্ধি করিব যে ঐ আত্মাই আমাদের প্রকৃত "আমি", আর যাহা কিছু সে-সব বাহ্য, বহিরঙ্গ, অস্থায়ী উপাধি বা আধার মাত্র।

আত্মায় মন নিবিষ্ট করিতে হইলে, আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। গুরুমুখে এবং শাস্ত্র হইতে আত্মার স্বরূপ জানিয়া লইতে হয় এবং সর্ব্বদা সেই আত্মায় মনবুদ্ধিকে লাগাইয়া রাখা অভ্যাস করিতে হয়। উপনিষদে বলা হইয়াছে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইহাই হইতেছে আত্মলাভের, ব্রহ্মলাভের সাধনা। গীতা প্রথমেই অর্জ্জুনের শোককে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছে। আত্মার উপলব্ধি হইলে সকল শোক দুঃখের চির অবসান হয়, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মজ্ঞান হইলে সকল মোহ, সকল শোক চিরদিনের জন্য দূর হয়, তত্র কো মোহ কঃ শোকঃ। আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই কারণ আমরা নিজদিগকে ক্ষণস্থায়ী জীব বলিয়া মনে করি, সংসারের অনিত্য বস্তুসকলের সহিত, স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ইত্যাদির সহিত নিজদিগকে এক করিয়া দেখি—তাই কখন তাহাদিগকে হারাইব সর্ব্বদা আমাদের সেই ভয়, আর কোন প্রিয় বস্তু নষ্ট হইলে আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা অজ্ঞান মায়া, কারণ সদ্‌বস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। আমরা ক্ষণস্থায়ী জীব নহি,

দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে,
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে—

এইরূপ আর্ত্তনাদ মোহান্ধ অজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। জ্ঞানী দেখেন যে, তিনি অবিনাশি, নিত্য সনাতন—ধূলা হইতে আমাদের জন্ম,

ধূলাতেই আবার ফিরিয়া যাইব, এ-কথাটা কেবল আমাদের এই বাহ্যরূপটা সম্বন্ধে, দেহটা সম্বন্ধেই খাটে, আত্মা সম্বন্ধে নহে—আমাদের জীবন অনাদি অনন্ত, সেই অনন্ত জীবনে আমরা লীলাবশে কত দেহ গ্রহণ করিয়াছি, কত দেহ বর্জ্জন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই—এক জন্মের মধ্যেই দেহটাকে অনবরত নূতন করিয়া গড়িতেছি —যখন ইহার কাজ শেষ হইতেছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ নূতন দেহ গ্রহণ করিতেছি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত আমাদের তুলনা হয়, তাহারা যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, আমরাও তেমনই আত্ম-জ্যোতিতে চির-জ্যোতিষ্মান। চন্দ্র সূর্য্যের তুলনা দিলাম, কারণ সাধারণ লোকে দুঃখ করে—এই শস্যশ্যামলা অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী থাকিবে, নিয়মিত ভাবে আবহমান কাল ধরিয়া আকাশে সূর্য্য উঠিব, চাঁদ হাসিবে, কেবল আমরাই থাকিব না—

হেসে নাও দুদিন বইত নয়
কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়!

কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের তুলনায় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলের জীবনই "দু'দিনের"—উহাদের আদি অন্ত আছে, কোটি কোটি বৎসর পরে উহারা নিভিয়া যাইবে, আবার অকল্পনীয় অন্ধকারের মধ্যে হইতে নূতন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আবির্ভাব হইবে—কিন্তু আমরা শাশ্বত সনাতন, আমাদের আত্মজ্যোতি কোন দিনই নির্ব্বাপিত হইবে না। কবি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

কত চতুরানন মরি মরি যায়ত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোয়ে জনমি পুনঃ তোয়ে মিলায়ত
সাগর লহরী সমানা।

এই আশ্চর্য্যময় অসীম বিশ্বজগৎ—সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় ভগবানের মধ্যে উঠিতেছে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, আমরা আমাদের মূল আত্মসত্তায় এই ভগবানের সহিত এক, নিত্য ও সনাতন।

আমরা শুধু নিত্য নহি, আমরাও ভগবানেরই ন্যায় চৈতন্যময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দ—আমাদের এই চৈতন্য, এই আনন্দ কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় না, আত্ম-আনন্দকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য আমরা যে বিচিত্র বাহ্যরূপ গ্রহণ করি, উপাধিস্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন গ্রহণ করি তাহাতেই সাময়িক ভাবে অজ্ঞান ও সেই সঙ্গে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব সম্ভব হয়—কিন্তু আমাদের মূল সত্তায় আমরা সকল

জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখের অতীত চির-আনন্দময়। বেদান্তশাস্ত্র হইতে আমরা আত্মার এই স্বরূপ অবগত হই, গুরুর উপদেশ ও অধ্যাত্মপ্রভাবে আমাদের অন্তরে এই আত্মা সম্বন্ধে উপলব্ধি জাগ্রত হয়, নিরন্তর যোগ অভ্যাসের দ্বারা এই আত্ম-জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া লইতে হয়।

অমৃতত্ব (Immortality) মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গীতা ও উপনিষদে কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ নহে যে, মানুষ অমর নহে, তাহাকে সাধনার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে হইবে। মানুষ কখনই মরে না, তাহার দেহই মরিয়া যায়, সাধক অসাধক সকল মানুষই মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিবে, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু মানুষ তাহার এই অমরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান—তাহার নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সে অবগত নহে, সেই জ্ঞানলাভ করা, আত্মচৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া—অমৃতত্ব লাভ বলিতে ইহাই বুঝায় এবং ইহার জন্যই সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ আমরা যে নিরন্তর বাহিরের বস্তু লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যাপৃত, দেহ, প্রাণ, মনের বাহ্য ক্রিয়ায় নিমগ্ন—এই বহির্মুখীনতাকে সংযত শান্ত করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে। ইহার দুইটি পন্থা বা প্রণালী প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে—একটি হইতেছে বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচার করা, চিন্তা করা, ধ্যান করা, অপরটি হইতেছে চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, মনকে শান্ত নীরব করা। প্রথমটি জ্ঞানের পন্থা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে যোগের পন্থা। জ্ঞান আবার দুই প্রকার, সাংখ্য ও বেদান্ত। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি পৃথক সত্য, ইহাদের সংযোগেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; বেদান্ত মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র নহে—প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি। গীতা সাংখ্য ও বেদান্তের এই প্রভেদ স্বীকার করে নাই, পরন্তু সাংখ্যের পুরুষকেই বেদান্তের ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। গীতা যেখানে সাংখ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছে সেখানে প্রচলিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকায় ব্যাখ্যাত সাংখ্য বুঝে নাই, পরন্তু উপনিষদে সাংখ্যতত্ত্ব যে-ভাবে প্রচারিত হইয়াছে সেই বৈদান্তিক সাংখ্য বুঝিয়াছে—ইহাই গীতার বেদান্ত এবং গীতা ইহাকেই সাংখ্য নামে অভিহিত করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা বেদান্তের আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াই বলিয়াছে, এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ (২।৩৯)। ইহাই গীতা-কথিত জ্ঞানযোগ। ইহার সহিত প্রভেদ করিয়া গীতা বলিল, যোগে বুদ্ধি যেরূপ, এইবার তোমাকে তাহাই বলিব, যোগে ত্বিমাং শৃণু। ইহা বলিয়া গীতা যোগের যে ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়াছে—গীতার ভাষায় তাহাই হইতেছে কর্ম্মযোগ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও গীতা এই প্রভেদ করিয়াছে, 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম-

যোগেন যোগিনাম্।' পরে গীতা এই দুই যোগের সমন্বয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতার শিক্ষা বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু গীতা-প্রচারের পূর্ব্বে "যোগ" শব্দ আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত "যোগ" শব্দের এক সংজ্ঞা পাওয়া যায় পতঞ্জলির যোগসূত্রে, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (১।২), চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। বৃত্তি-নিরোধ বলিতে বুঝায়—কোন অভীষ্ট বিষয়ে মনকে স্থির রাখা, অতএব অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। এই যোগ অভ্যাসের দ্বারা মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, যে-কোন বিষয় সূক্ষ্মভাবে, গভীর ভাবে অবগত হওয়া ও আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তাই মোক্ষধর্ম্মে আছে,

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং
নাস্তি যোগসমং বলং।

চিত্তস্থৈর্য্যের চরম সীমার নাম সমাধি অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে এমন ভাবে নিবিষ্ট হওয়া যাহাতে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হইয়া যায়, কবির ভাষায় সমাধির বর্ণনা—

কবে তোমাতে হয়ে রব আমার "আমি"-হারা।

এই যে আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়া, ইহাই সমাধি, ইহা ভিন্ন প্রকৃত আত্মজ্ঞান, ভগবদ্জ্ঞান লাভ হয় না—অতএব সকল সাধনাকেই সমাধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পতঞ্জলির রাজযোগের চরম পরিণতি সমাধি। উপনিষদেও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ সমাধির উল্লেখ করা হইয়াছে, "শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিবে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪)। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ শমদমাদি অনুষ্ঠেয় বলা হইয়াছে (৩।৪।২৭) এবং এই জাতীয় শ্রুতির আদেশ অনুসারে বেদান্তী শঙ্করাচার্য্যও শমদমাদি সম্পত্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধন বিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ সমাহিততার জন্য রাজযোগবর্ণিত অষ্টাঙ্গ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা অপরিহার্য্য কি না। আসন প্রাণায়ামাদি অভ্যাস না করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যায়—শ্রুতিবাক্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন হইতেছে সেই পন্থা। এই ভাবে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ—দুই প্রকার পন্থায় প্রভেদ হইয়াছে—দুইয়েরই লক্ষ্য এক, সমাধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ ও মোক্ষ, তথাপি আরম্ভ ও প্রণালী লইয়া প্রভেদ হইয়াছে। প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া নিত্যবস্তু আত্মার ধ্যান অভ্যাস করেন,

তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ বা জ্ঞানযোগী। আর যাঁহারা কোন বস্তু বা তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস করিয়া পরে আত্মতত্ত্বে উপনীত হন তাঁহারাই যোগনিষ্ঠ বা যোগী। জ্ঞাননিষ্ঠগণ আত্মার ধারণা ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ ভিতর হইতে বাহ্যকরণেও স্থৈর্য্য লাভ করেন। যোগনিষ্ঠগণ বাহ্যকরণের স্থৈর্য্য অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানে উপস্থিত হন। কেহ কেহ প্রথমটিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেন। কল্পতরুকার অমলানন্দ বলেন, "বেদান্তবেদ্য বস্তুর ভাবনা হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার মূল নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়া উহা কখনও ভ্রমাস্পদ হয় না।" রাজযোগ প্রণালীতে সমাধির সময়ে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সমাধি ভঙ্গ হইলে সে জ্ঞান নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেদান্ত-বাক্য হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা স্থায়ী। অন্যপক্ষে স্মৃতিকার দক্ষ বলেন, "জন্মান্ধ যেমন ঘটপটাদি পদার্থের চাক্ষুষজ্ঞান পায় না, কুমারী যেমন স্ত্রীসুখ বুঝিতে পারে না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।"

যাহাই হউক "যোগ" শব্দে যদি চিত্তস্থৈর্য্যের অভ্যাস বুঝায় তাহা হইলে মানসিক বল বৃদ্ধির উপায় ও সাধন রূপে সকল সাধনাকেই উহা স্বীকার করিতে হয়, এবং কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে—যোগ হইতেছে practical psychology, কার্য্যকরী মনোবিজ্ঞান, এবং ভারতের সকল ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনায় বিভিন্ন ভাবে যোগপ্রণালী গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ পতঞ্জলি যে যোগ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একেবারে নূতন কিছুই নহে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" যোগ চিরবর্ত্তমান, সেইজন্য হিরণ্যগর্ভও উহার অনুস্মারক ও বক্তা। বৌদ্ধগণ রাজযোগের ন্যায়ই যোগপ্রণালীর বিকাশ করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"ককারাদি বর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্ত্রবোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে" (স্বচ্ছন্দঃ-শাস্ত্র)। বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে —এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩)—অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগ খণ্ডিত হইল; ইহার দ্বারা পাতঞ্জল যোগসূত্রের দার্শনিক ভাগই খণ্ডিত হইয়াছে, উহা সাংখ্যেরই অনুরূপ—কিন্তু ইহার দ্বারা চিত্তসংযমরূপ যোগপ্রণালী খণ্ডিত হয় নাই। একটি অবলম্বন ব্যতীত চিত্তসংযম দুর্ঘট বলিয়াই যোগশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের অধ্যাত্ম-বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, পরন্তু বেদান্ত দর্শনের অধ্যাত্মবিদ্যা অনুসরণ করিলেও রাজযোগ অনুযায়ী চিত্ত-সংযম অভ্যাস করা যায়। যদি কেহ সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বেদান্তবেদ্য অদ্বয় আত্মা বা ব্রহ্মকে অবলম্বন করে তাহা হইলেও যোগপ্রণালী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যোগীরাও বলিয়াছেন, ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)। ইহাই বেদান্তের অনুমত যোগ বা

সমাধি। বেদান্ত দর্শন কখনও যোগের খণ্ডন করিতে পারে না, কারণ উহা শ্রুতিমূলক। যোগ সম্বন্ধে শ্রুতিসমূহের উদাহরণ যথা,

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্—শ্বেতাশ্বতর ২।৮

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—কঠ ২।৬।১১

বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্—কঠ ৬।১৮

তবে রাজযোগের অষ্ট অঙ্গই যে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। মৈত্রী উপনিষদে বলা হইয়াছে, ষড়ঙ্গা ইত্যুচ্যতে যোগঃ। রাজযোগেও যমনিয়মাদি সমগ্র অষ্ট অঙ্গের সাধন সকলের পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই, অধিকারী ভেদে সাধন ভেদও স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ যাঁহাদের অভ্যাস ও বৈরাগ্য স্বতঃ উদিত হয় তাঁহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহাদিগকে সিদ্ধিলাভের জন্য আর অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। যাঁহারা তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা যোগসিদ্ধ হন, তাঁহারা মৃদু সংবেগশালী মধ্যম অধিকারী; আর যাঁহারা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ অনুশীলন করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহারা মন্দ সংবেগশালী সাধারণ অধিকারী। তবে সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ রাজযোগের সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

ব্রহ্মসূত্র শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব ধ্যান করাকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা বলিয়াছে। "এষ মে আত্মা"—পরম পুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইতে হইবে, এবং শিষ্যদিগকেও "এষ তে আত্মা" —ব্রহ্মই তোমার আত্মা এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতে হইবে, আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৩)। রাজযোগ যে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অন্য অঙ্গের উল্লেখ করে নাই—আসীনঃ সম্ভবাৎ, ধ্যানাচ্চ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৭,৮)। তবে ব্রহ্মসূত্র যজ্ঞাদি কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়াছে এবং শমদমাদি সম্পত্তিকে অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়াছে—ইহাই ব্রহ্মসূত্রোক্ত জ্ঞানযোগ। শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানযোগেরই বহুল প্রচার করিয়াছেন। এ-বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের সহিত গীতার প্রভেদ প্রণিধান-যোগ্য। গীতা রাজযোগের শুধু আসন ও ধ্যানই গ্রহণ করে নাই পরন্তু প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছে। গীতা রাজযোগোক্ত যম ও নিয়মের উপর জোর দেয় নাই, বাহ্য বিধিনিষেধ পালনের উপর গীতার তেমন আস্থা নাই, তবে গীতা সাধারণ ভাবে বলিয়াছে যে যোগ-সাধনা করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ ও সংযত করিতে হইবে, যতচিত্তাত্মা। গীতার রাজযোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত

হইয়াছে, ইহা প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে পতঞ্জলির যোগের সহিত এক না হইলেও মূলতঃ ঐ একই প্রণালী। তবে গীতা যোগ বলিতে পতঞ্জলির ন্যায় শুধু এই রাজযোগই বুঝে নাই—রাজযোগকে গীতা যোগের একটি শক্তিশালী সহায়রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ তাহার বাহ্য-চৈতন্যে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছে, ভগবান যে তাহার অন্তরের মধ্যে অন্তর্য্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন, সে যে প্রকৃতিতে সেই ভগবানের অংশ এবং মূল সত্তায় তঁহার সহিত এক, এই সত্য সে জানে না, উপলব্ধি করে না এবং এই বিচ্ছেদ ও অজ্ঞানই হইতেছে তাহার যত দুঃখ, অশান্তি ও অপূর্ণতার মূল। এই বিচ্ছেদ দূর করিতে হইবে, মানুষের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ সজ্ঞান সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—গীতা "যোগ" বলিতে মূলতঃ ইহাই বুঝিয়াছে, যদিও এই যোগের লক্ষণ ও ফল অনুযায়ী নানা স্থানে ইহাকে নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছে, যথা, সমতাই যোগ, দুঃখের সহিত চিরবিচ্ছেদই যোগ ইত্যাদি। গীতা এই যে সংযোগ অর্থে "যোগ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে ইহা হইতেছে উহার ধাতুগত অর্থ—যুজ্ ধাতুর অর্থ হইতেছে সংযুক্ত করা। অন্যান্য শাস্ত্রেও "যোগ" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"সংযোগো যোগো ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ।" জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের দ্বারাই ভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হওয়া যায় এবং এইরূপ বিভিন্ন উপাসনাকে গীতা জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ নামে অভিহিত করিয়াছে—গীতার পূর্ব্বে এই সব কথা তেমন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু এই সকলপ্রকার যোগেই চিত্তের একাগ্রতা সাধন প্রয়োজন এবং তাহার জন্য রাজযোগের অভ্যাস বিশেষ সাহায্যস্বরূপ হয় বলিয়া গীতা তাহা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাকে ধ্যানযোগ নামে অভিহিত করিয়াছে। গীতার পূর্ব্বে জ্ঞানের দ্বারা উপাসনা এবং কর্ম্মের দ্বারা উপাসনা "নিষ্ঠা" নামে অভিহিত হইত, "লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা"—গীতা এইগুলিকে "যোগ" নামে অভিহিত করিয়াছে।

গীতা "যোগ" শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে কর্ম্মকে একটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বা যোগ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই—কর্ম্মকে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের একটি প্রাথমিক সহায় রূপেই গণ্য করা হইয়াছে। পাতঞ্জল মতে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। পাপীদের কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম কৃষ্ণ। সাধারণের কর্ম্ম, গৃহস্থের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, তাহারা পাপও করে, পুণ্যও করে। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে জীবহত্যা, পরপীড়ন ইত্যাদি অপরিহার্য্য। সেই সঙ্গে তাহারা দানাদি নানা পুণ্যকর্ম্মও করে। যাহারা

কেবল তপঃ স্বাধ্যায় ও ধ্যান করে. তাহাদের কর্ম্ম মানসিক, বাহ্যোপকরণনিরপেক্ষ, তাহাতে পরকে পীড়া দেওয়া হয় না, তাহাই বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময়। আর সন্ন্যাসীদের কর্ম্ম হইতেছে অশুক্ল ও অকৃষ্ণ, তাঁহারা ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাই তাহা অশুক্ল, এবং তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, পাপ কর্ম্ম বর্জ্জন করেন বলিয়া তাহা অকৃষ্ণ।

পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্ম্মই ফল প্রদান করিয়া বন্ধনের কারণ হয়, অতএব যোগীদের পক্ষে উভয়ই বর্জ্জনীয়। তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কর্ম্মগুলি যদি ফলকামনাশূন্য হইয়া কেবল চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য করা হয় তাহা হইলে তাহারা অবিদ্যাদি ক্লেশকে ক্ষীণ করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং নিরোধের সহায় হয়, তাই এই কর্ম্মগুলি পাতঞ্জলসূত্রে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব পাতঞ্জলের মতে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সহায় নহে। ব্রহ্মসূত্রও কর্ম্মকে জ্ঞানলাভের গৌণ উপায় বলিয়াছে—উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহায় হয়, তবে ব্রহ্মসূত্র পাতঞ্জলের ন্যায় যজ্ঞকর্ম্মকে অবহেলা করে নাই। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন"—ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপ শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র দেখাইয়াছে যে যজ্ঞও জ্ঞান লাভের সহায় হয় (৩।৪।২৭), যদিও সাক্ষাৎভাবে নহে, গৌণ ভাবে। ব্রহ্মসূত্রের মতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতেছে জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন এবং শম দম তিতিক্ষা উপরতি ও সমাধি হইতেছে অন্তরঙ্গ সাধন। তবে ব্রহ্মসূত্র ইহাও বলিয়াছে যে, মুক্তি লাভের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম অপরিহার্য্য নহে। "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" (৩।৪।২৫)—বিদ্যাই মুক্তি লাভের একমাত্র হেতু বলিয়া মুক্তিলাভ অগ্নি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সাধ্য যজ্ঞাদি আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্যতীতও কেবল বিদ্যাপ্রভাবেই মুক্তিলাভ ঘটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্র উভয়ের মতেই কর্ম্ম হইতেছে গৌণ, বিদ্যা বা জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু। তবে পাতঞ্জল যেমন যজ্ঞাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র তাহা করে নাই—ব্রহ্মসূত্র চারি আশ্রমেরই উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে এবং যদিও কোন আশ্রমে না থাকিয়া এবং আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিয়াও সিদ্ধিলাভ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় (৩।৪।৩৬-৩৭) তথাপি ব্রহ্মসূত্রের মতে অনাশ্রমী ভাব হইতে আশ্রমী ভাবই শ্রেষ্ঠ (৩।৪।৩৯)। গীতা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে যে, মোক্ষলাভের উপায় রূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সমান পর্য্যায়,

কোনটিই মুখ্য বা গৌণ নহে—বস্তুতঃ গীতা নিষ্কাম কর্ম্মকে জ্ঞানেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করায় কার্য্যতঃ গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মে কোন বিরোধই নাই। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিরোধ দেখাইয়াছে, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডক ২।২), আরও বলিয়াছে যে ঊর্দ্ধরেতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের নহে (৩।৪।১৬-১৭)। ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, সকাম কর্ম্মের সহিতই বিদ্যা বা জ্ঞানের বিরোধ, নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত নহে। আর গীতা সন্ন্যাস আশ্রমের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নাই (৬।১) এবং এ-বিষয়ে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসার সহিত গীতার মতের মিল রহিয়াছে। অবশ্য ব্রহ্মসূত্রও বলিয়াছে, জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে না (৩।৪।১৪), তথাপি ব্রহ্মসূত্রের মতে গার্হস্থ্য আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমও অবশ্য অনুষ্ঠেয় (৩।৪।১৯)। এইখানে ব্রহ্মসূত্রের সহিতও গীতার প্রভেদ হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই গীতার নিশ্চিত মত, এ-বিষয়ে গীতা কোন সন্দেহের স্থান রাখে নাই (১৮।৪-১১)। আর যজ্ঞ দান ও তপস্যা বলিতে গীতা সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই বুঝিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি—এইটিই হইতেছে বেদান্ত ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। পরে যোগবাশিষ্ঠ এ-বিষয়ে গীতারই মত সুস্পষ্ট ভাবে অনুসরণ করিয়াছে—মহাকর্ত্তা মহাভোক্তা মহাত্যাগী ভবানঘ (৬।১১৫।১)।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইলে জ্ঞান প্রয়োজন, আত্মসংযম প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়জয় প্রয়োজন—এবং ইহার জন্য রাজযোগের ধ্যান পদ্ধতি বিশেষ সহায় বলিয়া গীতা তাহার উপদেশ দিয়াছে। পাতঞ্জল কর্ম্মকে ধ্যান ও সমাধির একটি গৌণ সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, গীতা ধ্যান ও সমাধিকে কর্ম্মযোগের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার যে কর্ম্মযোগ তাহা একই সঙ্গে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেই গীতা তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে (৬।২৯-৩২)। ব্রহ্মসূত্রে জ্ঞানযোগই মুক্তি লাভের পন্থা (৩।৪।১), কর্ম্ম ও ভক্তি সেখানে গৌণ—কিন্তু গীতায় এই তিনের কোনটিকেই নিম্নস্থান দেওয়া হয় নাই, পরন্তু গভীর ও উদার অধ্যাত্ম সত্যের ভিত্তিতে তিনেরই সমন্বয় করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও গীতার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নহে, উত্তম রহস্য নহে। তৎকালে প্রচলিত সকল প্রকার সাধনারই উপযোগিতা গীতা স্বীকার করিয়াছে (৪।৩১—৩৩) এবং বলিয়াছে যে,

তাহাদের সকলেরই মূল হইতেছে কর্ম্ম, কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্। গীতা যাহাদের একটি সমন্বয় করিয়াছে, তাহাই গীতার যোগ, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-মূলক। কিন্তু এইটিই গীতার শেষ কথা নহে—গীতার শেষ কথা হইতেছে এই যে, মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে আর তাহার কোন সাধনারই প্রয়োজন হয় না—ভগবানের কৃপা-শক্তিই তাহাকে সকল সিদ্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু এই পরম গুহ্য কথাটি গীতা সর্ব্বশেষে বলিয়াছে। কারণ অন্যান্য সাধনার দ্বারা দেহ, প্রাণ, মন কতকটা প্রস্তুত হইলে মানুষের পক্ষে এইরূপ সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করায় অনেকটা সহায়তা হইতে পারে। এই ভাবেই গীতা এখানে রাজযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে।

গীতা বলিয়াছে সর্ব্বদা এই যোগ সাধনা করিতে হইবে, সততং। ইহার অর্থ নহে যে যাবজ্জীবন রাজযোগের অভ্যাস করিতে হইবে। যতদিন না অধ্যাত্ম চেতনায় প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয় ততদিন নিয়মিত ভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, ইহাই গীতার মত। পাতঞ্জল সূত্রে বলা হইয়াছে, "অভ্যাস দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়" (১।১৪)। নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক ; রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সততমহরহর্যোগকালে। প্রত্যহ কতক্ষণ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম দেওয়া যায় না ; অন্য সকল কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া শুধুই ধ্যান করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, এবং সাধারণতঃ এরূপ চেষ্টা অতিশয় কষ্টকর এবং তাহাতে ধ্যানও ভাল হয় না। তাই গীতা বলিয়াছে যাহারা পরিমিত নিয়মিত ভাবে আহার বিহার ও কর্ম্ম করে এবং যথোচিত সময় নিদ্রা যায় তাহাদের পক্ষেই যোগ সুগম হয়। তবে যত বেশীক্ষণ ভাল ভাবে ধ্যান করিতে পারা যায় ততই চিত্ত-স্থৈর্য্যলাভে অগ্রসর হওয়া যায়।

রহসি স্থিতঃ। নির্জ্জনস্থানে একাকী যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"একান্তে পর্ব্বতগুহাদিতে অবস্থিত ও 'একাকী' অসহায় হইয়া ; একান্তে স্থিত ও একাকী এই দুইটি বিশেষণ থাকাতে 'সন্ন্যাস করিয়া' এই প্রকার অর্থই পাওয়া যাইতেছে।" পাতঞ্জল দর্শনেও রাজযোগের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহা সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, গৃহস্থের পক্ষে নহে। অষ্টাঙ্গ রাজযোগের প্রথম অঙ্গ যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তিই এই সকল যথাসাধ্য আচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগীদের পক্ষে এই সব আচরণ সার্ব্বভৌম মহাব্রত হওয়া চাই অর্থাৎ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়া চাই (২।৩২)। গৃহস্থের পক্ষে

এই মহাব্রত সম্ভব নহে, কেবল সন্ন্যাসীরাই এই সব পরিপূর্ণরূপে আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা এইরূপ সন্ন্যাসের পক্ষপাতী নহে। অতএব গীতা যে রাজযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহা সর্ববিষয়ে পাতঞ্জল দর্শনের অনুযায়ী নহে। ব্রহ্মসূত্র সন্ন্যাস সমর্থন করিলেও এমন কথা বলে নাই যে, সন্ন্যাস না করিলে ধ্যানযোগ অভ্যাস করা যায় না বা জ্ঞানলাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সমাবর্ত্তন করিয়া পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে পবিত্র স্থানে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না।" এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, গৃহস্থের পক্ষে যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম যেমন কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রম-বিহিত বিদ্যোপাসনাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য ; এই বিদ্যাবলেই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয় (৩।৪।৪৮)।

কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই যদি ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিলাভ করা যায় তাহা হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের আবশ্যকতা কি ? এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে কোন যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই, কেবল শ্রুতির প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদে কোথাও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান নাই, বরং "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করা হইয়াছে। বাদরায়ণের যুক্তি এই যে, গার্হস্থ্য আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রম উভয় সম্বন্ধেই শ্রুতিবাক্য তুল্য, অতএব উভয় আশ্রমই অনুষ্ঠেয়। "আমাদের পক্ষে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব ?" (বৃহদারণ্যক ৪।৪) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ত্যাগের উল্লেখ দেখাইয়া (৩।৪।৫) বাদরায়ণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্বান ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারেন ; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে তিনি কোনো প্রকারে লিপ্ত হন না। গীতাও বলিয়াছে যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই শ্রেয় লাভ করা যায়, তবে গীতার সুস্পষ্ট মত এই যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা উভয়েই শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তবে ব্রহ্মসূত্র সন্ন্যাস আশ্রমের উপর যেরূপ জোর দিয়াছে, গীতা তাহা দেয় নাই—গীতা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদের কোন কোন অংশের শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা যে উত্তরোত্তর সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতেছিল, ব্রহ্মসূত্রে যাহার নিদর্শন পাওয়া যায়, গীতা সেই প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল

তার পরে ভারতে যে যুগ আসিয়াছিল তাহাতে ভারতবাসী সন্ন্যাসকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেও গার্হস্থ্য জীবনের উপরে, সকল প্রকারে জীবনকে ভোগ করার উপরে, বিকশিত করিবার উপরে জোর দিয়াছিল—এবং ইহার সুন্দর নিদর্শন আমরা পাই কালিদাসের কাব্যে। জীবনে যে আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, ভোগ আছে, কালিদাস তাহারই কবি, তিনি প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, ইন্দ্রিয়ভোগের কবি এবং এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার যুগের যোগ্য প্রতিনিধি, "a true son of his age."

কালিদাসের যুগে লোকে জীবনের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ কিরূপ উপভোগ করিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা এখানে তাঁহার ঋতুসংহার কাব্যের প্রথম কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে লোকে তাপ-শান্তির জন্য কত কি করিতেছে, কবি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্॥
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রি-গীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ॥
নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়-বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্॥ ১।২-৪

"প্রিয়ে! তিমির-হীন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী, বিচিত্র জলযন্ত্রযুক্ত গৃহ, নানাবিধ মণি এবং সরস চন্দন এই গ্রীষ্মকালে সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে।

রাত্রিতে পুরুষগণ মনোহর-সুগন্ধযুক্ত অট্টালিকায় সুখাসীন হইয়া প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিত মধু এবং কামোদ্দীপক তানলয়াদিসঙ্গত বীণার সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ করিয়া থাকে।

রমণীগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বসন ও মেখলায় শোভিত নিতম্ব, সচন্দন হারমণ্ডিত স্তন ও মনোমুগ্ধকর গন্ধদ্রব্যানুবাসিত কেশ-কলাপ দ্বারা প্রিয়জনের গ্রীষ্মসন্তাপ নিবারণ করে

